আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্।

একবিংশ বর্ষ।

১৩২৪।

কার্য্যালয়—

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড্, হাওড়া

হাওড়া

৪নং তেলকলঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে

শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৪ সালের সূচীপত্র।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকালীকায়ৈ নমঃ।

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

একবিংশ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২৪। [প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষের অঞ্জলি।

(সূচনা।)

কে আমি? কে আছে মোর বিনা ভগবান?
তাঁহারি শকতি পেয়ে,
তাঁরি পূত নাম গেয়ে,
তাঁরি রচা ফুল-ফল,
বিল্বপত্র গঙ্গাজল,
তাঁহারি রাতুল পদে করিতে প্রদান,—
তাঁহারি আদেশ স্মরি,
রেখেছি অঞ্জলি ভরি,
অধমের পাপ—করে,
যদি বা মলিন করে,
পূজার পবিত্র অর্ঘ্য হয়ে যায় ম্লান,
যদি বা কুসুম দল,
হারা হ'য়ে পরিমল,
হ'য়ে থাকে তুচ্ছ হীন,
তাহাতে না ক্ষুণ্ণ দীন,
ভাল মন্দ তাঁরি সব, সকলি সমান;
এ "অঞ্জলি" আমিত্বের শুধু অভিমান।

(অঞ্জলি।)

১

প্রকৃতির চারু অঙ্গে
যাঁর রূপ ভেসে যায়,
রবি-শশী যাঁর তেজে,
হইয়াছে জ্যোতিষ্মান;
তাঁহারি রাতুল পদে
করিনু "অঞ্জলি" দান।

২

গগন-সাগর-গিরি
বিশালত্ব ঘোষে যাঁর,
অনাদি চিন্ময় জ্ঞানে
বিশ্ব যাঁর করে ধ্যান;
সে বিরাট পুরুষ-পদে
আমার এ "অঞ্জলি" দান।

৩

অনন্ত সুষমাময়
চির পুণ্য পারাবার,
শুভ্র শান্তিময় যিনি

নিবেদন—আমরা ক্রমশঃ সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিতে আরম্ভ করিব। কোন গ্রাহক এই দুর্দিনে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন—ইহাই প্রার্থনা।

নিত্য অচ্যুত মহান্;
তাঁহারি রাতুল পদে
করি এ "অঞ্জলি" দান।

৪

আনন্দ ভাণ্ডার যিনি
চির মধুরতাময়,
যাঁহারে স্মরিলে হয়
পুলকিত মন-প্রাণ;
তাঁহারি রাতুল পদে
আমার এ "অঞ্জলি" দান।

৫

অনন্ত মহান্ ভাব
যাঁর ধ্যানে জাগে প্রাণে,
সদা সঞ্জীবিত ধরা
পুণ্যের পরশে যাঁর;
সেই শান্তিময় করে,
নত শিরে হর্ষ ভরে,
এ ক্ষুদ্র "অঞ্জলি" মোর
দিনু ভক্তি উপহার।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

হিসাব-নিকাশ।

সকল কাজেরই একটা নিয়ম আছে। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া ধারাবাহিকরূপে কর্ম্ম সুসম্পন্ন করত তাহার গতিবিধি নির্ণয় করা, তারপর হিসাব নিকাশ করিয়া তাহার একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ম্মী মাত্রেরই উচিত। কার্য্যটা কেমন চলিতেছে—লাভ হইতেছে কি. লোকসান হইতেছে, ভাল করিয়া দেখিয়া তার পর পরিবর্ত্তনশীল জগতের গতি অনুসারে ব্যবসায় স্থায়িত্ব কামনা করিয়া নবোদ্যমে নব বর্ষের সূচনা করিতে হয়। নূতনের প্রেমে মাতিয়া নূতনত্ব লাভের জন্য সদাই প্রাণ আত্মহারা হয়—এ ভাব জীবের স্বভাবজ, কারণ যতদিন সে আপনাকে নূতন করিয়া রাখিতে পারিবে, যতদিন সে আপনাকে নূতন ভাবে দেখিতে পারিবে—ততদিন সে জীবন-পথে দিশাহারা হইবে না—নূতনের আনন্দ-উৎসাহে সে ভোরপুর হইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তমা গতি লাভ করিবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া বৎসরান্তে নূতন আনন্দে মত্ত হইতে আমাদের এত আনন্দ, এত উৎসাহ হয় কেন এবং তাহার জন্য এই উৎসবই বা করি কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে—আমরা চির পুরাতন, আমাদের অন্তরাত্মা সনাতন, শাশ্বত পুরাণ পুরুষ, জীবনের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাটিলেই বার্দ্ধক্যের সূত্রপাতে আমরা যেন পুরাতনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ি, সমগ্র জীবনটাকে পুরাতন বোধ করিলেও নূতনের নবীনতা বড়ই প্রিয়, বড়ই মনোরম, বড়ই শান্তিপ্রদ, শুধু ব্যবসাদারীর দিক দিয়া কেন, হিসাব-নিকাশ করিয়া জীবন-বাণিজ্যে একটা নূতন রূপ পত্তন করিয়া নূতন সুখ সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা আমাদের অতিশয় বলবতী ছিল। পূর্ব্বে বৎসরের এই একটা দিনকে আমরা প্রথম ভাবিয়া পঞ্জিকার সাহায্যে তাহার ফলাফল গণনা করিতাম, গ্রহ দেবতার পূজা করিতাম, এই সময় কত আনন্দে মত্ত হইয়া জীবনটাকে কত আনন্দময়

করিয়া তুলিতাম কিন্তু এখন এই বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রলোভনে পড়িয়া আমরা জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তটাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেছি; হিসাব-নিকাশ করিয়া জীবন-বাণিজ্যে আর নূতনত্বের পাল তুলিয়া নব জীবন লাভ করিতে, মরজীবনে সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে আর আমরা তত ইচ্ছা করি না, এখন এই শুভ কার্য্য কেবলমাত্র নকল-নবীন হীন, বিদেশীয় জ্ঞান বুদ্ধি বিহীন স্বাধীন দোকানদারের নিকট সমাদৃত হইতেছে; তাহারা এই কার্য্যে এখনও উৎসবামোদে মত্ত হইয়া নববর্ষে দুর্গা, গণপতি এবং কালীমাতার নাম কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতেছে।

এ জগতে ব্যবসা কে না করে, বণিক নয় কে? জীবন-বাণিজ্যে আমরা সকলেই বণিক পদবাচ্য। তাই পূর্ব্বে আমরা জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া এই নববর্ষের শুভ দিনে কত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম—কত দেব-দেবীর পূজা করিয়া ধন্য হইতাম—তখন এই নববর্ষে নবজীবন লাভ করিয়া কত উৎসব কার্য্য সমাহিত হইত। হায়! এখন শিক্ষা দোষে আমরা সে সকল ভুলিয়া গিয়াছি, এদিনে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা এখন আমরা আর স্মৃতি পথে আনয়ন করি না, আমরা যে সকলেই একে একে ভব নদীর সুবিস্তৃত বন্দরে দেহ-তরীতে কর্ম্মফল ভরা করিয়া জীবন-বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি; এখন এ কথা একবারও মনের কোণে স্থান দিই নাই; কিন্তু যদি মানুষ হইতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিসাব-নিকাশ করিয়া নববর্ষের সূচনায় ইহাতে আনন্দোন্মত্ত হইতে হইবে—জীবনে ধর্ম্মের ভাব নব ভাবে জাগরিত করিতে হইবে—তাহা হইলে আমরা পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হইব।

পূর্ব্বে করিয়াছি, এখন করি না বলিয়াই আমাদের জীবন এত দুঃখময়—এত দরিদ্রতার আধার হইয়া আমাদিগকে সতত এত যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে।

দেহ-তরি কর্ম্মফলে ভরিয়া ভবের বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কি লাভ করিলাম, কি লোকসান হইল—তাহার হিসাব-নিকাশ এখন আমাদের মধ্যে কয়জন করিয়া থাকেন? কর্ম্মফলের জীবন-বাণিজ্যে যতটুকু পাপ—ততটুকু লোকসান, যতটুকু পুণ্য ততটুকু লাভ বা সঞ্চয়, ইহার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জনই বা হিসাব করিয়া চলি এবং তাহার নিকাশের জন্য কয় জনই বা চেষ্টা করি? পূর্ব্বে কর্ম্মফল প্রশমনের জন্য এই নববর্ষে পঞ্জিকা দৃষ্টে বর্ষের ফলাফল এবং গ্রহ পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইত, জীবন-বাণিজ্যে যাহাতে লোকসান না হয়, অর্থাৎ কেবল পাপ সঞ্চিত না হইয়া লাভরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়—তাহার চেষ্টা করা হইত; এখন আমাদের নিকট এ সকলের একটা আবশ্যক আছে বলিয়া মনেই হয় না।

জীবন অনবরত বহিয়াই যাইতেছে—বাণিজ্যে অজস্র লোকসান হইতেছে; লাভে-মূলে হারাইবার উপক্রম হইয়াছে—তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না—ইহার গতিরোধ করিবার জন্য আমরা ব্যবসার খাতিরে কোন একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করি না। অনেকে হয়ত

বলিবেন—কর্ম্মফলে বাধা হইতেছে, তাহার গতিরোধ করা মানব ক্ষমতার অতীত, এইরূপ একটা অন্ধ বিশ্বাস স্রোতে গাভাসান দিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তথাপি কর্ম্মডুরি কাটিবার ইচ্ছা আমাদের মনোমধ্যে তিলেকের জন্ত উদিত হয় না। উৎকট তপস্যায় যে কর্ম্মফল-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায়—শক্তি আরাধনা করিলে যে কর্ম্মবন্ধন ছেদন সুসাধ্য হইয়া থাকে, ইহা আমরা একবারও মনে ভাবিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হই না। মুনিপুঙ্গব মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের জীবনে কর্ম্মফল অত্যন্ত প্রবল ছিল—অতি অল্প দিন মাত্র তাঁহার জীবন গতি পরিগণিত হইয়াছিল—কিন্তু শিবশক্তির আরাধনায় মঙ্গলময়ের কৃপা লাভ করিয়া সেই দুর্লঙ্ঘ্য কর্ম্মফলও তিনি খণ্ডন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অতএব মানুষ চেষ্টা করিলে কি না করিতে পারে? কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা, সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সে বৈধ অনুষ্ঠান এই জীবনে কি হইতেছে, না হইতেছে, তাহার হিসাব-নিকাশ আমাদের কই, যে আমরা কর্ম্মফল ছেদনে নবজীবন লাভ করিয়া ধন্ত হইব? তেমন করিয়া শক্তির উদ্বোধন আমরা করিতে পারি কই—যাহার দ্বারা অসীম শক্তিমন্ত হইয়া মরজগতে অমরত্ব লাভ করিব! মতুবা শক্তিসাধকের আবার কর্ম্মফল কি, শক্তি সাধনায় আবার পারক-অপারক কি? মা যার শক্তির আধার, তার ছেলেরা এত শক্তিহীন, নির্জীব—দুর্ব্বল, পাপতাপ ক্লিষ্ট কেন? আজ আমরা শক্তি আরাধনায় বিরত হইয়াছি বলিয়াই সকল কাজে এত অশক্ত, সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে এত অপারক, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে এত অমঙ্গলে সর্ব্বদা জড়ীভূত। এ জীবন যে শক্তির পদে বিক্রীত রহিয়াছে—শক্তি ভিন্ন, মা ভিন্ন যে আমাদের কিছু নাই—তাহা একবারও ভাবি না; কেবল অসার বিষয় বিষ ভোজনে আমাদের প্রাণ অস্থির—শরীর জরজর মর মর, তথাপি চৈতন্ত হয় না। জননী জঠরের সেই অন্ধকূপে অবস্থান কালে দুর্ব্বিসহ কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া বলিতাম—"মা! এবার ভূমিষ্ঠ হইলে আর তোমায় ভুলিয়া থাকিব না,—সুপুত্র হইয়া তোমার পাদপদ্ম ত্রিপত্র দিয়া পূজা করিব। কিন্তু কই জীব! এখন ধরায় পতিত হইয়া তোমার সে কাতর ক্রন্দন, সে প্রাণান্তিক প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল. এখন পতিতোদ্ধারিণীর নাম একবার ভুলেও কর কি বাল্য গেল, যৌবন গেল, বার্দ্ধক্য আসিল কিন্তু

"যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে",

শেষের দিনের কথা ত কই একবার স্মরণ কর না—দীনমনী সুতের আগমন দিনের কথা ত কই একবার ভুলেও ভাব না—তবে দোষ কার?

এই জন্তত বলি—এস সকলে মিলে আবার পূর্ব্বের ন্যায় জীবন বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখি—কত লোকসান হইয়াছে এবং তাহা পরিপুরণের জন্তএই নববর্ষোৎসবে অপূর্ণ আমরা সেই চির-পরিপূর্ণা আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করি এবং সাধকের সেই অন্তরল নিহিত গানের সুস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি:—

ও মোর পামর মন এখন বলনা কালী।
ওরে কাল এলো, কাল গেল,

কেন কালি পদে না বিকালি।
(আর) করো মারে মন আজি কালি,
ওরে আজি কালি করে কি
কাল কাটাবি চিরকালি ॥

সাধকের এ সাধন-সঙ্গীতে যেন আমাদের চমক ভাঙ্গিয়া যায়—নববর্ষের প্রথম হইতেই যেন জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া আমরা আবার শক্তি সাধনায় ব্রতী হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। আজ মাতৃ চরণের অর্ঘ্য "আলোচনার" এই শুভ নববর্ষে একুশ বর্ষব্যাপী সাধনা আরম্ভ হইল, আমরা মহানন্দে আমাদের পাঠক ও পৃষ্ঠ-পোষকবর্গকে আনন্দময়ীর আনন্দে অভিমন্ত্রিত করিয়া যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া ইহার উন্নতি কল্পে আহ্বান করিতেছি, মায়ের কৃপায় এবং তাঁহাদের সাহায্যে "আলোচনার" নব একবিংশ বর্ষ আনন্দময় রূপে পরিণত হউক ?

সম্পাদক।

বিচার।

(গল্প)

আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ;—কর মহাশয়েরও তাই। সন ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে রাম-কুমার কর মহাশয় যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, সেই গৃহের ভিতর হইতে চালের শত শত ছিদ্রের দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ, আকাশের শোভা, নক্ষত্রের ঝিকি মিকি প্রভৃতি বাহিরের দৃশ্য সহজেই পরিলক্ষিত হইত, আর ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসে যখন তিনি চক্ষু বুজিলেন, তখন ঐ সকল শোভা দেখিবার ঐ বাড়ীর কাহারও সখ হইলে, তাহাকে ত্রিতল বাটীর ছাদে উঠিতে হইত। এই ৬।৫ বৎসর বিধাতা পুরুষ রামকুমারকে অনেক রকমে নাড়া-চাড়া করিয়া অতুল ধন সম্পত্তির অধীশ্বর করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, বৃহৎ জমিদারী, বিপুল ব্যবসা, বাগান, পুষ্করিণী, নগদ টাকা প্রভৃতি সমস্ত সৌভাগ্যের চিহ্ন রাখিয়া দিয়া কর মহাশয় ইহলীলা সংবরণ করিলেন আর রাখিয়া গেলেন,—একমাত্র পুত্র হরকুমার এবং দ্বিতীয় পক্ষের এক পত্নী।

হরকুমার পিতার অতিশয় আদরের পাত্র ছিল; হইবারই কথা, বৃদ্ধ বয়সে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া পুত্র রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। অত্যধিক আদর-যত্নে হরকুমার প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে, সে যখন যে আব্দার করিয়াছে, যখন যাহা চাহিয়াছে, বৃদ্ধ রামকুমার তখন তাহাই সাধন করিয়া আসিয়াছেন, পুত্রের হৃদয়ে কখনও কোন প্রকারে কষ্ট দেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়—এজন্য রামকুমারকে নাকি একবার হনুমান সাজিতে হইয়াছিল। ঘটনা এই,—হরকুমার তখন ৪।৫ বৎসরের, এক দিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সে আব্দার ধরিল,—"বাবা, আমি হনুমান দেখিব," পিতা সান্ত্বনা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, বলিলেন,—"কাল দেখাইব" কিন্তু বালক তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কেবল কাঁদিয়াছিল; অগত্যা বৃদ্ধকে হনুমান সাজিয়া ঘরময় লাফালাফি করিতে হইয়াছিল। যাক, সে সব কথা। বৃদ্ধ যখন চোখ বুজিলেন, হরকুমারের বয়স তখন উনিশ বৎসর। হর-কুমার সমুদয় বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইল,

অতুল ধন তাহার হাতে পড়িল। যে উদ্দাম প্রবৃত্তি লইয়া হরকুমার বাল্য, কিশোর, যৌবন স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এবার প্রচুর ইন্ধন আসিয়া জুটিল। পাড়ার ইয়ার বন্ধু সকলে হরকুমারের বাড়ীর মধ্যে আড্ডা চালাইতে লাগিল। প্রথমে বিশুদ্ধ আনন্দ, অর্থাৎ গান বাজনা আরম্ভ হইল, বন্ধুবর্গেরা বুঝাইয়া দিল সঙ্গীতের অপেক্ষা বিদ্যা নাই। তাহার পর ক্রমে মাত্রা বাড়িতে লাগিল,—শ্বেতদ্বীপাগত তরল পদার্থ বিশেষও যথাসময়ে কর মহাশয়ের বাড়ীতে স্থান পাইতে লাগিল; বন্ধুবর্গেরাও বুঝাইয়া দিল, ইহাতে কোন দোষ নাই; বিশেষতঃ (moderate doseএ) পরিমিতমাত্রায় খাইলে ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু মাত্রা আর কত দিন পরিমিত থাকে? ক্রমে ক্রমে মাত্রা চড়িয়া যথাসময়ে হরকুমারকে ঠিক তৈয়ারী করিয়া তুলিল। নিষেধ করিবার কেহই নাই, মাথার উপর লোকাভাব; বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরাও ভয়ে বড় একটা কিছু বলিতে পারিত না। কেবল বলিয়াছিল একজন,—সে গোপাল দত্ত। গোপাল অনেক দিন হইতে করেদের বাড়ীতে গোমস্তাগিরি কাজ করিয়া আসিয়াছে, রামকুমার যখন সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন গোপাল তাঁহার এক মাত্র সহায় ছিল। গোপাল সমস্ত দেখিয়াছে, কত কষ্টে যে কর্ত্তা মহাশয় ব্যবসায় উন্নতি করিয়াছেন, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া-করিয়াছেন, কত সংযম অবলম্বন করিয়া যে খরচ পত্রাদি চালাইয়া আসিয়াছেন,তাহা গোপালের সমস্তই স্বচক্ষে দেখা। সুতরাং হরকুমার যখন বিষয় উড়াইতে লাগিল, তখন গোপালের আর সহ্য হইল না। সে একদিন হরকুমারের মুখের উপর বলিয়া ফেলিল,—"দেখ, হরকুমার, বিষয় যদি নিজেকে কর্‌তে হত, তা হলে বুঝতে পারতে, কত ধানে, কত চাল। বাপ না খেয়ে না দেয়ে, বিষয় করে গেলেন, আর তুমি এখন উড়িয়ে দিচ্ছ, এ আর কত কাল থাক্‌বে।

হরকুমার গলার স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিল—"তোর বাবার কি, আমার বিষয়, আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব; তোর বাবার কি?" গোপাল বসিয়াছিল, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পড়িল। চক্ষু দিয়া যেন তাহার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—"তবে র‍্যা নচ্ছার, জান না, এ বিষয় কি করে হয়েছে, এই গোপাল দত্ত না থাক্‌লে, আজ তোর অবস্থা কি হ'ত তা জানিস্?"

হৈ হৈ করিয়া চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল। হরকুমারের বন্ধুবর্গ আসিয়া বলিতে লাগিল—"বুড়োর ভারি স্পর্দ্ধা, বাবুকে এমন করে বলা, ছোট মুখে বড় কথা।" হরকুমার আর থাকিতে পারিল না। দরোয়ান রামদয়ালকে হুকুম দিল,—"বুড়োকে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দাও।" গোপাল বলিল,—"দরকার নাই, এ পাপ পুরীতে আর আমি থাকিতে চাই না, যে বাটীতে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়াছি, সে বাড়ীতে দানবের তাণ্ডব নৃত্য আর দেখিতে পারি না। আমাকে একদিন না দেখিতে পাইলে যে রামকুমারের চলিত না, তারই ছেলে দরোয়ান দিয়ে আমায়

তাড়াতে চায়! নরক আর কোথায়? সয়তান আর কে? বলিতে বলিতে বৃদ্ধ স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। অতঃপর সে বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর আসে নাই।

(২)

হরকুমারের উদ্দাম বিলাস-তরঙ্গ অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। ব্যবসা বাণিজ্য দেখিবার তাহার সময় নাই, জমিদারীর দিকে লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি স্বপ্নেও তাহার হয় নাই, অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির অবস্থাও ঐ রকম। কর্ম্মচারিগণের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা বুঝিয়াছিল, বাবুকে কোন রকমে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে যাহা ইচ্ছা করা যায়। বাবু চান, তাঁহার বিলাস-বাসনার কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়। যথাসময়ে তাঁহার নিকট টাকা আসিয়া পৌঁছিলেই হইল। পিতার বহু কষ্টের অর্জিত অর্থ হরকুমার এইরূপ অসদ্ব্যবহারের দ্বারা ব্যয় করিতে লাগিল।

হরকুমারের অত্যাচার নিজ বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সে একটী ভয়ানক লম্পট হইয়া পড়িল। গ্রামের বৌ ঝি সকলে তাহার অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত; বড় লোক বলিয়া কেহ বড় একটা সহজে কিছু বলিতে পারিত না।

গ্রামের এক প্রান্তে এক নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার একটী বিধবা কন্যা ছিল; হরকুমার তাহার বাড়ী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের লোকের আর সহ্য হইল না। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামে সমাজ-বন্ধন আজকালকার ন্যায় শিথিল হয় নাই। আজকাল সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও কথা মানে না, কেহ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। যার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, গ্রামের লোক বেশী পীড়াপীড়ি করিলে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া নির্ব্বিয়ে বাস করিতেছে। তার পর হরকুমারের কথা যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি। গ্রামের লোক সকলে স্থির করিল, এর একটা বিহিত করিতে হইবে। গ্রামের মধ্যস্থলে সাধারণের একটী জায়গা আছে, তথায় সারি সারি খুঁটীর উপর খড়ের চাল বিশিষ্ট একটী বড় আট চালা। তাহারই নীচে গালিচা পাতা হইয়াছে। আজ হরকুমারের বিচার হইবে, গ্রামের সকল লোকেই, বিশেষ আগ্রহান্বিত, কারণ তাহার অত্যাচারে সকলেই উত্যক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে বিচার আরম্ভ হইবে; ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া সকলে আসিয়া জুটীতে লাগিল। বিচার ভার গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের উপর ন্যস্ত, কিন্তু তন্মধ্যে বৃদ্ধ গোপাল দত্তও ছিল। রং দেখিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। এইবার বিচার আরম্ভ হইবে—খোঁজ লওয়া হইল, হরকুমার আসিয়াছে কি না। যত বড় পাপীই হউক, যে এরূপ দোষের দোষী সে কি সহজে মজলিসে মুখ দেখাইতে পারে? হরকুমার আসে নাই। যাঁহারা হরকুমারকে ঐ কার্য্য স্থানে যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে তাহার দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে লাগিল। বিচারে হরকুমারের দোষ সাব্যস্ত হইয়া গেল এবং চির প্রথানুসারে সেই দোষের যে শাস্তি প্রদান করা হইবে, তাহাও স্থির হইয়া গেল, অর্থাৎ হরকুমার একঘরে হইলেন, ধোপা নাপিত বন্ধ হইল, তাহাকে কেহ নিমন্ত্রণ করিবেন না, তাহার বাড়ীতে কেহ নিমন্ত্রণ লইবেন না,তাহার সহিত কেহ এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন না ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থাই সকলে একবাক্যে

সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধ গোপাল দত্ত মনে মনে ভাবিলেন—এইবার হরকুমার শুধরাইতে পারে, সমস্ত সমাজ যখন একদিকে এবং হরকুমার একদিকে তখন হরকুমার কয় মহাশয়ের আশা ভরসা সমস্ত নির্ম্মূল হইল, সকলে বলিলেন--হরকুমার যদি সমাজের নিকট তাহার কৃত দোষের জন্য ২০০৲ টাকা দণ্ড স্বরূপ প্রদান করে, তাহা হইলে পুনরায় জাতিতে তুলিয়া লওয়া হইবে।

দত্ত মহাশয় এই বিচারে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন,—তাহা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি গর্হিত কার্য্য করিয়া জাত হারাইয়াছে, সে কখনও জাতে উঠিতে পারে না। পয়সা দিয়া কখনও জাত পাওয়া যায় না। তাহা হইলে পাপীর উপযুক্ত শাস্তি কি দেওয়া হইল? হরকুমার যে দোষের দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইল, অর্থদণ্ড তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইতে পারে না"। সকলে হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, সে বিকট বিদ্রূপের হাসিতে দত্ত মহাশয়ের কথা কোথায় ভাসিয়া গেল। দত্ত মহাশয়ের অন্যায় হইয়াছে! যে কার্য্যে লাভের সম্ভাবনা আছে, সে কার্য্যে বাধা দেওয়া কি তাঁহার উচিত হইয়াছে। এই দেখুন না, হরকুমারের দোষের বিচার হইয়া গেল, হরকুমার তাহার পরদিনই ১০০৲ এক শত টাকা দিয়া নির্দ্দোষী হইয়া গেল। আবার সাধারণে সে টাকা লইয়া কি করিলেন?—দু' দিন পরে দেখা গেল, সেই নাটমন্দিরে এক বিখ্যাত খেমটা ওয়ালীর তয়ফা নাচ গান চলিতেছে, গ্রামের লোক দলে দলে তথায় আসিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছেন, আর যুবকদের জন্য যে অন্য রকম আমোদ আহ্লাদের আয়োজন না হইয়াছিল, তাহা আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। সে রাত্রে আমরা দত্ত মহাশয়কে নাটমন্দিরে দেখিতে পাই নাই। কি বদ্‌রসিক হে, বলেছিল কি না, অর্থ দণ্ড উপযুক্ত শাস্তি হইতে পারে, সেই জন্য রাগ করিয়া এখানে আসে নাই। আচ্ছা! দত্ত মহাশয়, সাবধান, সাধারণের কুদৃষ্টি আপনার উপর পতিত হইয়াছে আর হরকুমারও তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম বি, এল।

বিদায়।

(ইংরাজীর ছায়া অবলম্বনে)

(১)

মলিন হয়েছে আজি দিনমণি,
তমোময়ী নিশা আসিছে এখনি
এই ত সময় লইতে বিদায়
পাখীগণ সবে সুখে নিদ্রা যায়
সাথী সবে এবে দাওহে বিদায়!

(২)

বিদায় হইনু হে ছোট পাখী!
দিবালোকে যেন তোমারেই দেখি,
মিনতি করি পারি যেন গাতে
তোমারি ভাষায় তোমারি কথায়
বিদায়ের সেই সুমধুর গান?

(৩)

(এবে) বিদায় আমার প্রিয় ফুলগুলি!
যেওনা ঘুমাতে অধমেরে ফেলি!
তারারাজি শোভে গগণের গায়
উজ্জ্বল কিরণ জাগায় তোমায়
দেয়নি এখনো দেয়নি বিদায়!

(৪)

বিদায় আমার ওগো মম পিতা!
বিদায় চুম্বনি দাওনা গো মাতা,
দাও হে বিদায় চির সঙ্গিগণ!
তো'সবার কাছে বিদায় এখন!
আসি যদি ফিরে মিশিব তখন।

শ্রীবলাই লাল মুনসী।

"অনুতাপ অশ্রুজলে।"

(১)

অপরাহ্নকালে সুবোধচন্দ্র বসিয়া জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূর সহিত কথোপকথন করিতেছিল। সুবোধচন্দ্রের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, উজ্জ্বল কান্তি-বিশিষ্ট বালক। তাঁহার বৌদিদি নিকটেই বসিয়াছিল—নাম চারুশীলা।

চারুশীলা সুন্দরী—অতি সুন্দরী যেন দেবী প্রতিমা। প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ঢল ঢল মুখ, মৃণালের মত বাহুযুগল, নাগিনীনিন্দিত সুকৃষ্ণ চাঁচর কেশরাশি, ভাসা ভাসা তৃপ্তিপূর্ণ নয়ন দু'টি—মুখাবয়বে, বর্ণে ও সুপুষ্ট দেহগঠনে সুশোভিনী—সৌন্দর্য্যশালিনী কিন্তু সুবেশিনী নহে। পরিধানে মাত্র মলিন একখানি নীলাম্বরী, বাম হস্তে একগাছি লোহার খাড়ো, দু' হাতে দু'গাছি শাঁখা ও দু'গাছি চুড়ী আয়তির চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। চারুশীলার আনন হাস্ত-দীপ্ত। সুবোধচন্দ্র পুস্তক-খাতা-পত্র বিক্ষিপ্ত টেবিলের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া বৌদি'র দিকে চাহিয়া ছিল ; বৌদিদি মেজেয় বসিয়া সুচের কাজ করিতেছিল। সুবোধচন্দ্র একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"এতে তোমার অমত কেন বৌদি ?"

"আমার মন যে কেমন করবে, তোমায় না দেখে থাকতে পারব না ঠাকুর পো ! তুমি যেও না।"

"না আমি যাব"।

"চারুশীলার হাস্ত বিরঞ্জিত মুখখানি ম্লান হইল। মলিন মুখে কাতর স্বরে বলিল—তুমি যাবে,—আমার জন্ত তোমার মন কেমন করবে না ঠাকুর পো ?"

সুবোধ—"তা' মুখে কি বোলব বৌদি ! শৈশবেই মাতৃহারা হইয়া তোমায় মাতৃরূপে পেয়েছি,—মাতার ন্যায় তোমার নিকট অসীম স্নেহমমতা পাইয়া আসিতেছি ;—তোমার জন্ত আর মন কেমন করবে না ?"

বৌদিদি—"তোমার পরীক্ষার ফল বে'র হয়েছে কি ?"

সুবোধ—"হাঁ"।

বৌদি—"তবে আমার কথা শুনবে না ?

সুবোধ—"বল দেখি বৌদি ! এত অল্প বয়সে লেখা পড়া ছেড়ে—কি করবো ?"

বৌ—চাকরীর জন্য ত আর লেখা পড়া শিখা নয়, তোমাদের যাহা আছে, তাহাই দেখে শুনে খেলে, স্বচ্ছল ভাবে দিন কেটে যাবে ; পরের চাকরিও আর করতে হবে না।"

সু—"সকলেই কি চাকরি করবে বলে লেখা পড়া শিখে ?"

বৌ—"না"

সু—"তবে তুমি এতে অমত কর কেন ?"

বৌদি কোন উত্তর করিল না,—উদাসভাবে সুবোধের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল—"ঠাকুর পো !"

"কি বৌদি ?"

বিষাদমলিন বেদনাসিক্ত আননে, বৌদিদি আবার ম্লান দৃষ্টিতে সুবোধের পানে তাকাইয়া বলিল—"ঠাকুর পো ! তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না।" দুই ফোঁটা অশ্রু গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িল। পুনরায় অশ্রু-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে

বলিল—"তোমার দু'টি হাতে ধরি ঠাকুর পো! তুমি সেখানে যেও না।"

আহা চারুশীলার হৃদয় কি স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ, কি অতুলনীয় ভালবাসা মাখান তাহা সুবোধ বেশ বুঝিত তথাপি কলিকাতায় আসিবার মায়া সে ছাড়িতে পারে নাই।

রায়পুরের ৺রাধা কমল মিত্র মহাশয় স্ত্রী ও দুইটী পুত্র রাখিয়া কালের কুটিল স্রোতে গা' ভাসাইয়া কালভবনে চলিয়া গিয়াছেন। কিয়দ্দিন পরে সতী সাধ্বী হর-সুন্দরীও জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধের বিবাহ দিয়া কর্ত্তার অনুগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় পুত্র-বধূর করে—স্নেহের বিগ্রহ কাণ্ঠ পুত্র সুবোধকে সঁপে দিয়ে বলে যান—"মা! আজি আমি আমার স্নেহের বিগ্রহ সুবোধকে তোমায় দিয়ে গেলাম, পাগলকে স্নেহাদর করো, মায়ের মত লালন-পালন করো।" চারুশীলা স্বর্গগতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর—সে অন্তিম-বাণী প্রাণপণে প্রতি পালন করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক চারুশীলা সুবোধকে বড়ই স্নেহ মমতা করিত; অপত্যনির্বিশেষে পালন করিত। কোনও দিন স্কুল হইতে তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে, সে উৎকণ্ঠিতা হইয়া সুবোধের আগমনপথ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। আবার কোন কোন দিন স্বামীকে তাহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিত,—সুবোধই যেন তার অন্ধের যষ্টি,—আরাধনার ধন,—যক্ষের নিধি। বৌদিদির এইরূপ স্নেহ-মায়া-মমতার মধ্যে, দিয়া, সুবোধ চন্দ্র আজ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর (Second grade scholership) সহিত পাশ করিয়া কলিকাতায়—এফ-এ পড়িতে যাইবে;—তাই চারুশীলার হৃদয়ে বড় কষ্ট হইয়াছে। স্নেহের সুবোধকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে তাহার ভরসা হইল না, কি জানি আজব সহর কলিকাতায় আসিলে পাছে সুবোধ খারাপ হইয়া যায় এই জন্য তার স্নেহপ্রবণ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হায়! কেমন করে সে আত্মীয় পরিজন শূন্য সুদূর কলিকাতায় একাকী সুবোধকে পাঠাইবে?

(২)

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে! জগতের বক্ষদেশ হইতে কোলাহল সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে; জীবজগতে আর কোন সাড়া শব্দ নাই, টিপ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে,—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত চমকিয়া রজনীর অন্ধকারকে গভীরতর করিতেছে। চারুশীলা শয্যাশয়ন করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না, কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়—তাহাকে অধিকতর আকুল করিয়া তুলিতেছে। হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় রজনী যাপন করিয়া তাহার উদরের পীড়া হইয়াছে তাই সে দুই হাতে উদর চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। শেষ নিশার আর্দ্র বায়ু তখন শন্ শন্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। দূর হইতে শিবাকুল—যাম-ঘোষণা করিল। চারুশীলা বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বামীর বিছানার নিকট গিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"ওগো! একটু ঘুম ভাঙ্গনা?" সদ্যসুপ্তোত্থিত প্রবোধ চক্ষু রগড়াইয়া আমতা আমতা স্বরে বলিল—

"কেন, কি হয়েছে?"

"আমার দুই বার দাস্ত ও বমি হয়েছে!"

স্বামী নিদ্রা-জড়িত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—"এঁ্যা! কখন হ'তে?"

"এই অল্পক্ষণ হ'ল—দুইবার দাস্ত ও এক বার বমি হয়েছে।"

"এ্যা বলকি? সুবোধকে ডেকেছিলে?"

"না"

স্বামী পাগলের মত বাহিরে ছুটিয়া গেল।

পর দিন প্রভাত হইতে না হইতেই সুবোধ ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবু রোগিনীকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া বলিয়া গেলেন—"খুব সাবধান, নিয়মিত রূপে ঔষধ সেবন করাইবেন;—এবং সেবাশুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

সুবোধ নিয়মিতরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং সেবা শুশ্রূষায় রত হইল।

দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, চারুশীলার অবস্থা আরও একটু খারাপ হইল। সন্ধ্যার পরে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। প্রফুল্ল কমল সদৃশ অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি বৃন্তচ্যুত কুসুমবৎ পরিম্লান ও বিশুষ্ক হইল। শারদাকাশের অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রমাটিকে যেন করাল মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল।

এই সময় আবার ডাক্তার আসিলেন,—নাড়ী, জিহ্বা, চক্ষু, বুক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আর আশা নাই। ডাক্তার বাবু 'প্রেসক্রিপসন্' লিখিয়া দিয়া বিষাদিত মুখে আশাভরসা দিয়ে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাত্রি আসিল, রোগিনীর অবস্থা অধিকতর খারাপ হইল। সুবোধ দয়াময় ভগবানের নিকট কত আকুল প্রার্থনা, কত ব্যাকুল ক্রন্দন করিল;—কিন্তু তাহা দয়াময়ের দরবারে পৌঁছিল না, সুবোধের এত চেষ্টা, এত আকুল প্রার্থনা, সব বৃথা হইল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথ যামিনীর নৈশ সমীরণ যেন উন্মুক্ত সঙ্কেতে বলিয়া দিল,—"আর আশা নাই।"

হায় অবোধ মানব! তুমি মরণোন্মুখ আত্মীয়কে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুলভাবে কত কাঁদ, ব্যাকুলভাবে কত ডাক, বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা কর, কিন্তু কই আকাঙ্খিত প্রিয় জনকে রাখিতে পার কি? যাহার কালের ডাক পড়িয়াছে, সে থাকিবে কেমন করিয়া? হায়রে, নির্ম্মম সংসারের নিষ্ঠুর বিধান!

বৌদির ম্লান, পাংশু বর্ণ মুখের নিকট সুবোধ মুখ লইয়া ডাকিল—"বৌদি! বৌদি আমার!"

চারুশীলা ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিল,—আবার মুদিল। সুবোধ বৌদিদির দক্ষিণ হস্ত খানি নিজের দুই হস্তের মধ্যে তুলিয়া লইল,—অশ্রু-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার কহিল,—"বৌদি! বৌদি! একবার আমার দিকে চাও, একবার তেমনি করে 'ঠাকুরপো' বলে ডাক!—আমার আর কে আছে বৌদি? তুমি যে আমার সব, তুমি যে আমার স্নেহময়ী বাৎসল্যপ্রতিমা—তবে আজ স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় ছেড়ে কোথায় যেতে চাও!—তুমি গেলে আমায় স্নেহ-মমতা-আদর আর কে করবে,—তেমনি স্নেহ মধুর স্বরে কে আর 'ঠাকুরপো'

বলে ডাকবে? বৌদি তুমি যেওনা,—তুমি গেলে আমি কার কাছে থাকব, কে আমায় দু'টো খেতে দিবে? কে আমায় যত্ন করবে? কে আমায় আদর করে কাছে ডেকে নিয়ে স্নেহবাণী বলবে বৌদি? তোমার পায়ে পড়ি বৌদি—একবার চাও!" আর বলিতে পারিল না, অন্তর্জ্বালায় হু হু করিয়া সুবোধ কাঁদিয়া ফেলিল। শোক-পীড়িত আর্তনাদে গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণে আবার শোকসন্তপ্ত সুবোধ চক্ষুজল মুছিয়া ডাকিল—"বৌদি!"

বৌদির চক্ষুর পাতা ঈষৎ উন্মুক্ত হইল। সুবোধ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে—শূন্য দৃষ্টিতে—ব্যাকুলভাবে বৌদির পরিম্লান মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিল,—ধীরে ধীরে বলিল—"বৌদি আমি আর কলিকাতা যাব না—তুমি ভাল হইয়া উঠ—আমি আর তোমার চক্ষুর অন্তরাল হইব না।" সন্তানের মত তোমার কাছে কাছে থাকিব।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব। তারপর? তারপর চারুশীলা সঙ্কেতে স্বামীর চরণ ধূলি চাহিল;—প্রবোধ কাঁদিয়া আকুল হইল। অনন্তর ক্ষীণহস্তে দেবরের হস্ত ধরিয়া স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া—স্বামীর দক্ষিণ হস্তে দেবরের হস্ত সংলগ্ন করিল। যেন কি সঙ্কেত করিল;—চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইল, সুবোধ বৌদির মুখের কাছে মুখ লইয়া অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে—শোকাবেগভরে ডাকিল—"বৌদি!" বৌদিদি অন্তর্জ্বালার ভীষণোচ্ছ্বাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। প্রবোধ স্ত্রীর নয়ন অশ্রু মুছাইয়া দিয়া ডাকিল—"চারু!" সুবোধ ডাকিল—"বৌদি আমার!"

চারুশীলার নয়নে পুনরায় দুই ফোটা অশ্রু ভাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সুন্দরীর দেহ হইতে প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুতে মিশিয়া গেল। সুবোধ শোকোচ্ছ্বসিত আবেগ স্বরে ডাকিল—"বৌদি! বৌদি আমার!" আর নাই—সব শেষ! নৈশ বায়ু শাঁ শাঁ করিয়া বিষাদগীতি গাইতে লাগিল।

(৩)

চারুশীলার মৃত্যুর পর হইতেই, প্রবোধের মন বড় বিচলিত হইল। সমস্ত সংসার শূন্যময় দেখিল। জগতের আলো তাহার চক্ষে নিভিয়া গেল,—সমস্ত বিশ্ব সংসার আঁধার বোধ হইতে লাগিল। সে কি যেন একটা দারুণ অভাব অনুভব করিতে লাগিল। যাহার সঙ্গে সে এই সুদীর্ঘ সাত বৎসর একত্রে বাস করিয়া আসিয়াছে, সেই সোহাগের চারুশীলা আজ কোথায়? কোন্ অচেনা দেশে চলিয়া গিয়াছে, কোন্ দেবতা তার জীবনসঙ্গিনী চারুশীলাকে কাড়িয়া লইয়াছে। প্রবোধ যেথায় যায়—সেইখানেই দেখে চারুশীলার স্মৃতিজড়িত,—ঘর দোর সমস্তই তার স্মৃতিমাখা।

প্রিয়তমা পত্নীর শোকে প্রবোধ গৃহ ত্যাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু একমাত্র স্নেহের সুবোধের জন্য তাহা পারে নাই—পারিবেও না; সুবোধ যে তার বড় স্নেহের ভাই। তাকে ফেলে যাইবেই বা কেমন করিয়া?

এই সময় পাড়ার দুই একজন হিতৈষী

দাদার অনুরোধ সে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। অগত্যা সে পুনবায় বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল।

কি সুন্দর চিত্তের পরিবর্ত্তন! কি সুন্দর এই জগতের ভাব! চারুশীলার মৃত্যুর পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই, এক ডানা কাটা পরী এসে প্রবোধের আঁধার ঘর উজ্জ্বল করিয়া তুলিল; প্রবোধের অশান্ত হৃদয়ে শান্তি-স্রোত প্রবাহিত হইল। কিন্তু সুবোধের প্রাণে যে শোক-বহ্নি জ্বলিয়াছে, তাহার আর শান্তি হইল না, দিনে দিনে আরও অশান্তির তীব্র হুতাশন তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার হৃদয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল—ক্ষণেক্ষণে আবার তাহাতে চারুশীলার স্মৃতি-বিদ্যুৎ চমকিয়া সেই অশান্ত হৃদয়-আঁধার আরও গভীরতর করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বহু মূল্যের সাড়ী, লেস্ দেওয়া রেশমী জ্যাকেট, স্যামিজ, বডি, কোট প্রভৃতিতে আল্না ঝলমল করিতে লাগিল। সুবাসিত তৈল, এসেন্স, চিরুণী, খোঁপাবাধা ফিতা, তরল আল্তার শিশি প্রভৃতিতে গৃহ সজ্জিত হইতে লাগিল। চারুশীলা সময় কিন্তু এই সকল সে চক্ষেও দেখে নাই।

বিবাহের পর হইতেই প্রবোধের ভাবগতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হইয়া উঠিল। যে সুবোধ প্রবোধের স্নেহের বিগ্রহ, আদরের ধন ছিল—যাহাকে ছাড়া তাহার একদিনও চলিত না,—নিমিষে অন্ধকার দেখিত। হায় আজ সেই সুবোধ তাহার চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল! দাদা আর তাহার সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না; তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারে না। হায় রে নির্ম্মম সংসার!

যে সুবোধ পূর্ব্ব-বৌদির স্নেহের সম্বল,—অন্ধের যষ্টি—নয়নের তারা ছিল, হায় আজ সে নূতন বৌদির জীবন-কণ্টক হইয়া পড়িল, তার বিষ-মাখা-বাক্য-বাণ সদাই সুবোধকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। নূতন বৌদির বাক্য বাণ শ্রবণ করিয়া, এক্ষণে তার অন্তরে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইল। যখন সে নির্জ্জনে বসিয়া মাতৃসমা পূর্ব্ব বৌদির কথা ভাবিত, তখন হৃদয় ফাটিয়া হু হু করিয়া কান্না আসিত। প্রবাহিত অশ্রু স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত,—কিন্তু পারিত না; শোকের অশ্রু বুক ভাসাইয়া আপনিই ঝরিয়া পড়িল। সুবোধ মনে ভাবিত—যে দাদা তাকে এত স্নেহাদর করিত—সেই দাদা আজ নূতন প্রেমের বন্ধনে পড়িয়া তাহার স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিল কিরূপে?

সে দিন রাঁধুনী আসে নাই,—সুতরাং দ্বিতীয় প্রহরে রান্না হইল না। প্রবোধ দীনু ময়রার দোকানের মিঠাই লইয়া আসিল। সেই মিঠাই খাইয়া সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট মিঠাই আশালতা তুলিয়া রাখিল। সুবোধের কথা তাহার মনে পড়িল না।

বৈকালে আশালতা যখন কেশ বিন্যাসান্তে স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বীয় বদন কমল সম্মার্জ্জন করিতেছিল, সেই সময়ে সুবোধ আসিয়া বলিল,—"বৌদি! চাট্টি খেতে দাও।"

"কি খেতে চাও—শুধু চাট্টি খৈ আছে,

তাই খাবে ?”

“কেন আজ রাঁধ নাই ?”

আশালতা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো কি কথা গো, আমি কি এ বাড়ীর রাঁধুনী নাকি ?”

“তুমি রাঁধতে পার না কেন ? আগের বৌদি, তিনি ত নিজেই রাঁধতেন।”

“ও তুমি বুঝি সকলকে সমান দেখ—আমি তেমন ছোট লোকের মেয়ে নই।”

“তুমি কোন্ রাজা জমিদারের মেয়ে ?” বলিয়া সুবোধ সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। আশালতা চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল—“উঃ ভারি আস্ফালন দেখছি যে, আচ্ছা,—বাড়ী আসুক আগে ?”

(৪)

সন্ধ্যার পর প্রবোধ যখন ঘরে ঢুকিল, তখন দেখিল—আশালতা মেজে বসিয়া কাঁদিতেছে। ঘরে সাঁঝের দীপও দেয় নাই, আর তেমন করে সাজসজ্জাও করে নাই। প্রবোধ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—“আশা! কাঁদছ কেন ?”

স্বামীর স্নেহার্দ্রস্বরে ক্রন্দনের মাত্রা আরও বাড়াইয়া সে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

স্বামী শশব্যস্তে বলিল—“তোমার হয়েছে কি, বল না ?”

“কিছু হয় নি, তুমি আমার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও! আমি আর এ শত্রুপুরীতে থাকব না।”

“সুবোধ কিছু বলেছে নাকি ?”

“বলবে না,—তার বলবার বরাত।”

“কি বলেছে ?”

“আমি চাষা-মজুরের মেয়ে, আমার সাজসজ্জা, চুল বাঁধা, আলতা লাগান, ডবল লেস কাপড় পড়া কেন ?”

“তুমি তাকে কিছু বলেছিলে ?”

“খেতে বলেছিলাম গো, খেতে বলেছিলাম ;—ঐ দেখ না——মেজে মিঠাইয়ের রেকাবখানা ফেলে দিয়ে চোক রাঙ্গিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলতে লাগলো। এই আমার অদৃষ্টে ছিল ?” রোদন-কাতরা আশালতাকে বুকের নিকট টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত পুষ্পপুট তুল্য রক্তাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া প্রবোধ বলিল—“তুমি কেঁদ না, আচ্ছা কালই ও হতভাগাকে বাড়ী ছাড়া করে দিব। যত বড় মুখ—তত বড় কথা ? দুধ দিয়ে কাল সাপ ঘরে পুষছি—না জানি কোন্ দিন দংশন করে-বসবে ?”

হায় স্ত্রৈণ প্রবোধ! আজ স্ত্রীর পরামর্শে তুমি কি ঘৃণিত কাজ করিতে মনস্থ করিলে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিলে না ? স্ত্রীর কু-পরামর্শে মজিয়া অতুল স্নেহের ভ্রাতাকে বিতাড়িত করিতে শপথ করিলে,—হায় হায়! কে দোষী, কে নির্দ্দোষী তার একবার বিচারও করিলে না ?

পরদিন প্রত্যুষে প্রবোধ সুবোধের শয়ন কক্ষের দ্বারে গিয়া দেখিল—দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল সুবোধ গৃহে নাই। গৃহ প্রবেশ মাত্র কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, দেখিল—শয্যার

উপর একখানি পত্র প্রভাত সমীরণে নড়িতেছে, প্রবোধ ধীরে ধীরে কম্পিতহস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

দাদা!

আমি চলিলাম—আর ফিরব কি না জানি না। শৈশব হইতে তোমার স্নেহাদর পাইয়া আসিতেছিলাম! কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তোমার অনন্ত স্নেহরাশি বেশীদিন ভোগ করিতে পারিলাম না। কোথা হইতে একটা দুঃখের ঝড় আসিয়া আমার সুখের ঘরখানি উড়াইয়া লইয়া গেল। আজ আমি সংসার-সাগরে একখণ্ড তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম, কোথায় কুল পাইব জানি না।

গত রাত্রিতে তোমার ও বৌদিদির সমস্ত কথা আড়ালে থাকিয়া শুনিয়া জানিলাম—এই নির্ম্মম সংসারে আর মমতার লেশমাত্র নাই। যদি থাকিত—না আর সে কথায় কাজ নাই। এই বিশ্ব সংসারে যদি ধর্ম্মের বিচার থাকে—তা'হলে একদিন অবশ্যই সে ধর্ম্মের ভেরী গম্ভীরভাবে বাজিয়া উঠিবে!

দাদা! পূর্ব্বের কথা মনে কর দেখি? সেই বৌদিদির কথা মনে পড়ে কি? তুমি আমায় কত স্নেহ-মমতা করতে, বৌদিদি কত আদর করতেন, হায়! আমার সে সুখের দিন কোন্ জোয়ারে ভেসে গেল?

দাদা! চলিলাম, মনে রেখো যে উপরে একজন বিশ্বকর্ত্তা আছেন! প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আজ স্নেহেরবন্ধন ছিন্ন করলে, কিন্তু ইহার জন্য একদিন অবশ্যই তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। ভাই! তোমার স্নেহচ্যুতের শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। মনে কিছু করো না, আর আমার খোঁজও লইও না। এক্ষণে বিদায়—নিবেদন ইতি।

হতভাগ্য সুবোধ।

পত্রখানি পড়িয়া প্রবোধের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। একে একে অতীতের দিন গুলি তাহার স্মৃতিপটে নাটকের দৃশ্যের মত ভাসিয়া উঠিল। হায় কি করিতে কি হইল? শোকে, দুঃখে, অনুশোচনায় তাহার বুক ফাটিয়া হু হু করিয়া কান্না আসিল। প্রবাহিত অশ্রুস্রোত রোধ করিতে তাহার ক্ষমতা হইল না।

তারপর একদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল। আবার বেলা ৯টার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিল। আশালতা বলিল—"কোথা গিয়াছিলে?"

"স্বর্গে,—রাক্ষসি! পিশাচি! তোর মনে এই ছিল; মিথ্যা প্রবঞ্চণায় আমায় ভুলাইয়া আমার স্নেহের ভাইকে আমার কাছছাড়া করিলি। কালসাপিনী! পাপিণি! এইবার চলিলাম, যেদিন ভাইয়ের দেখা পাইব, সেই দিন ঘরে ফিরিব,—সেইদিন তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইব! দেখা না পাইলে আর ফিরিব না! এই বলিয়া প্রবোধ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৫)

প্রবোধ যে দিন উন্মত্তের ন্যায় গৃহত্যাগ করিল—সেইদিন সেই সুযোগে, আশালতাও তাহার হৃদয়ের উদ্দাম আশা-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। আশা অনেক অর্থ আনিয়াছে, কাজেই পিতার অবস্থানন্যায়

সংসারে স্বচ্ছলতার সূচনা হইল। রূপচাঁদ পাইয়া, বুড় কালাচাঁদ প্রাণ ভরিয়া সেবা আরম্ভ করিল। আর তস্য পুত্র শ্রীমান্ বিপিন চন্দ্র সুরাদেবীর অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিল।

আজ তিন মাস অতীত হইল সুবোধ চলিয়া গিয়াছে। প্রবোধও এ তিন মাস ঘরে ফিরে নাই। সে কলিকাতা, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথায়ও সুবোধের দেখা পাইল না। তাহার দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ শেল বিষম বাড়িয়াছে; অসহ্যবোধে অবশেষে সে একদিন তাহার নিরস বিশুষ্কজীবন ত্যাগ করিতে মানস করিল।

সন্ধ্যাকালে প্রবোধ চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে নৈহাটির গঙ্গাসৈকতে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল, আর দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতেছিল। সে দিন মাঘীপূর্ণিমা তিথি। তাহার উপর চন্দ্রগ্রহণ; সুতরাং নানা দিক্ দেশ হইতে দলে দলে নরনারী গঙ্গা স্নান করিবার জন্য নৈহাটির স্নানঘাটে সমবেত হইয়াছে। চারিদিকে কোলাহল, আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। প্রবোধ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল, নির্জ্জনে পরিতপ্ত প্রবোধ অনুতাপ-দগ্ধ শীর্ণ দেহখানি লইয়া, পবিত্র সলিলা জাহ্নবীনীরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইল। নয়ন হইতে অনুতাপ অশ্রুজল মুছিয়া শোকোচ্ছাসিত স্বরে বলিল,—সুবোধ! প্রাণের ভাই! কোথা তুই, দেখে যা এসে আজ তোর বিহনে তোর পাপিষ্ঠ দাদা জাহ্নবী জীবনে কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে।" প্রবোধ প্রাণের উত্তেজনায় গঙ্গার অগাধ জলে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভীষণ জনতা ভেদ করিয়া আর একজন জলে ঝাঁপ দিল! এবং ডাকিল,—"দাদা, দাদা!"

নদীমধ্য হইতে উত্তর আসিল—"কে?"

"দাদা! আমি তোমার সেই স্নেহের ভাই সুবোধ, এই জনতার মধ্যে সুবোধ উপস্থিত ছিল দাদাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়া আবেগভরে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল বটে কিন্তু সাঁতার জানিত না বলিয়া স্রোতে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে প্রবোধ সুবোধের জলমগ্ন অজ্ঞান দেহ জল হইতে তিরোপরি উঠাইল। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, দেহে প্রাণ নাই। হায় হায়! সব শেষ। অকালে কুসুম-কোরকটি বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

তারপর, তারপর অনুতপ্ত প্রবোধ সুবোধের মৃতদেহ কোলে করিয়া "অনুতাপ-অশ্রু-জলে" ভাসিতে লাগিল।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

এই বিবিধ নাম এবং রূপে অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কিরণ জালের আশ্রয়ীভূত অংশুমালীর ন্যায় প্রাণী জগতের মণ্ডলস্থানীয় স্বয়ং সিদ্ধ ভগবৎস্বরূপেই সন্নিবেশিত ছিল। তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য এই দ্বৈত্য ভাবের কোন পরিচয় ছিল না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"সদেব সৌম্যে দমগ্র আসীৎ

একমেব দ্বিতীয়ং"। হে সৌম্য! এই জগত সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ স্বরূপেই বিদ্যমান ছিল।" "নাম রূপেণ আত্তাম" নাম রূপাদি কিছুই ছিল না। কালক্রমে অব্যক্ত রূপা প্রকৃতি হইতে ভগবৎ শক্তি প্রভাবে সত্ত্বহুল বিজ্ঞান রূপ মহত্ত্ব জন্মিল। সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান অঙ্কুর হইতে বৃক্ষোৎপত্তির ন্যায় এই মহত্ত্বই বীজরূপে নিহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজদেহ হইতেই সমুৎপাদিত করিলেন। নিমিত্ত কারণ বিদাভাস, উপাদান কারণ সত্ত্বাদিগুণ এবং গুণ ক্ষোভের কাল এই তিনের সমবায়েই মহত্ত্ব। ভগবান সৃষ্টির ইচ্ছায় যখন এই মহতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন মহত্ত্ব স্বয়ং বিকৃত হইল। এই বিকৃত মহতত্ত্ব হইতে আদিভূত, আধ্যাত্ম এবং আধিদৈব এই ত্রিবিধ ভাবের আধার স্বরূপ এই পরিদৃশ্য-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই মহতত্ত্ব জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ নহে। সর্ব্বমূলভূতা ভগবৎশক্তি মায়া বা অবিদ্যাই জগতসৃষ্টির আদিকারণ—"মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভূঃ।" হে মহাভাগ ভগবানের মায়া নামক শক্তি প্রভাবেই এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন—

"মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ, সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥"

হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান স্বরূপ, আমি সেই মায়াতে সত্ত্বরূপ গর্ভ আধান করিয়া থাকি, সেই গর্ভাধান হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এ জগতস্থ যাবতীয় পদার্থ বা কার্য্য মায়োৎপন্ন বা অবিদ্যা প্রসূত। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, এই ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে সৃষ্ট বস্তু বা তজ্জৎ অবয়বাদি ও কার্য্য সমূহেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তাই এই জগৎ বৈষম্যময়। ভগবান মনু বলিয়াছেন

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নির্ব্বচ্ছয়েৎ॥"
১ম অঃ ৩১

অর্থাৎ লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি-বর্ণের সৃষ্টি করিলেন।

"সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মানি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"
১ম অঃ ২১

সৃষ্টির আদিতে হিরণ্য গর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা বেদানুক্রমে সকলের পৃথক পৃথক কর্ম্ম, পৃথক পৃথক নাম এবং পৃথক পৃথক বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন।

ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারেই যখন এ জগত স্থাবর অস্থাবর নানাবিধ জীবে পরিপূর্ণ, তখন তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মাদিও যে নানাবিধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এইরূপ গুণ বিভাগ অনুসারে মানব জাতির ধর্ম্ম কর্ম্মাদি নির্ব্বাহের জন্য পরমেশ্বর যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—তাহাই ভারতের আর্য্য-জাতির—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি জাতি বা বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। আর্য্যভারতে এই

চারি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই ; এতদ্ভিন্ন যে যে বর্ণ তাহা শঙ্কর বর্ণ এবং এই চারি আশ্রম ভিন্ন অন্য কোনও আশ্রম নাই। এই চারিবর্ণ এবং আশ্রমের যে যে কর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুতরাং প্রত্যেক বর্ণকে স্ব স্ব বর্ণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে। এক বর্ণ অপর বর্ণের কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী নহেন। আর এইরূপ স্ব স্ব বর্ণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানই জীবের শ্রেয় সাধক। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায়।

কালবশে অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আজকাল ভারতের আর্য্যদিগের মধ্যে অনেকেই আর্য্য জাতির সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ঘোর বৈষম্যবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং এই বৈষম্য ভারতের সর্ব্ববিধ অবনতির মূল কারণ। আবার অনেকে আর্য্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে আদিকালে বর্ণভেদ ছিল না, সকলেই এক বর্ণ ছিল, কেবল কর্ম্মানুসারেই বর্ণ বিভাগ হইয়াছে, সুতরাং আজ যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় আচারবান হয়, তাহা হইলে সে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে না পারিবে কেন? আবার আজকাল এক নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হইয়াছে যে—যাহা ইচ্ছা তাহা কর, যাহা ইচ্ছা তাহা খাও, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, অথচ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও পালন কর। এরূপ যথেচ্ছ যাওয়া-আসা অথবা খাওয়া দাওয়াতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনের কোনও ক্ষতি হইবে না। বর্ণাশ্রম বিরোধীদিগের উপরোক্ত বাক্যগুলি যে নিতান্ত অসার এবং ভিত্তিহীন আমরা একে একে তাহাই প্রমাণ করিব।

আর্য্য শাস্ত্র মতে এই জগৎ সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিয়াছে। সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় জগতের এই তিন অবস্থা। ভগবান যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন :—

"এব মেতদনাদ্যন্তং চক্রং বিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ এই প্রকার প্রবাহরূপে অনাদি সংসার চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এই পরিদৃশ্যমান জগত এককালে বীজাবস্থায় আসিয়া সহস্র সহস্র বৎসর পরমব্রহ্মে প্রলীন থাকিবে। ইহাই হইল প্রলয় বা অব্যক্তাবস্থা। কালক্রমে সেই পরম ব্রহ্মেরই ঈক্ষণে মূল নির্গুণা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইলে সেই নির্গুণা প্রকৃতি সগুণা হইয়া ক্রিয়াশীলা হইলেই আবার সেই ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তদনুরূপ হইয়াই সৃষ্টি হইবে। সুতরাং এ জগৎ সংসার প্রবাহরূপে নিত্য। জগতের একেবারে ধ্বংস কোনও কালে নাই। অবস্থান্তর ঘটে মাত্র। যাহা প্রলয় তাহা অব্যক্তাবস্থা, যাহা সৃষ্টি তাহা ব্যক্তাবস্থা। বেদান্ত বলিয়াছেন :—

"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি মধ্যমে অপি তত্তথা।"

অর্থাৎ আদিতে যাহা ছিল না, অর্থাৎ অব্যক্ত ছিল, অন্তে যাহা থাকিবে না অর্থাৎ আবার অব্যক্ত হইবে, কেবল মধ্য দশায় প্রতীয়মান হয় মাত্র।

ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন :—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্ত নিধনান্যেব ॥"

এই বিশ্ব সংসার প্রথমে অব্যক্ত ছিল, আবার পরে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে, কেবল মধ্য দশায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব সৃষ্টি-কালে সেই পূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড, যাহা বীজাবস্থায় আসিয়া অব্যক্ত ছিল, ঠিক সেই রূপে আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং সৃষ্টির আদিকালে সৃষ্ট পদার্থ সমূহ সবই একরূপ হইবে, এই যে "একরূপ" ইহা কেবল আকৃতিতে মাত্র, বীজগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য সকল পদার্থে থাকিবেই থাকিবে। সে সময়ে সকল পদার্থ এক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট বলিয়াই একবর্ণ বিশিষ্ট বলা যায় মাত্র। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তু পর্য্যায়।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথাকর্ম্মানিদেহিনঃ॥"

ঋতু সমাগমে ঋতু চিহ্নসকল যেমন আপনা আপনি দেখা দেয়, প্রাক্তন কর্ম্মফল সকলও তদ্রূপ যথাকালে আপনা আপনি দেহ ধারীগণ সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে।

বসন্ত কালে বৃক্ষের পত্রাবলী নিপতিত হইয়া গেলে সকল বৃক্ষই তখন একরূপ দেখায়, কোনটী কোন বৃক্ষ সে পার্থক্য নির্ণয় সহজে করা যায় না, সকল বৃক্ষ একরূপ দেখাইলেও বীজগত পার্থক্যের কোন হানী হয় না, আম্র-বৃক্ষ আম্রবৃক্ষই থাকে। আবার নব পত্রোদ্গমে বৃক্ষের পার্থক্য সহজেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু প্রথম যখন পত্র নির্গত হয়, তখন সকল পত্রের বর্ণ একরূপই থাকে সুতরাং সে সময়ে বৃক্ষের পত্র দেখিয়া পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, পত্রাবলী যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই বৃক্ষের পার্থক্য নির্ণয়ও সহজ হইয়া পড়ে। সেইরূপ জগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে সকল পদার্থই একবর্ণ বিশিষ্ট হইয়াই সৃষ্ট হয় বটে কিন্তু বীজগত পার্থক্য থাকে, উত্তরোত্তর সৃষ্টি যতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, জীবগণ যতই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহাদের বীজ বা প্রকৃতিগত পার্থক্যের পরিচয় হইতে থাকে। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি এবং ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মাদি নির্ব্বাহের জন্য, ইহাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও অনাদি অনন্ত কাল হইতে বর্ত্তমান।

ভগবৎ বলিয়াছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ॥

"ধর্ম্ম এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয় সকরো নৃনাং।
বর্ণাশ্রমাচাররতাং তমূদ্ধবং নিবোধ মে॥
আদৌকৃত যুগে বর্ণো নৃনাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃত কৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃত
যুগং বিদুঃ॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপো নিষ্ঠা হংসং মাং মুক্ত কিল্বিষা॥
ত্রেতা যুগে মহাভাগে প্রাণাথে হৃদয়াত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিচিত্রয়ঃ॥
বিপ্র ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা মুখবাহুরুপাদজাঃ।
বৈরজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ॥
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদোমম।
বক্ষস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসশিরসিস্থিতঃ॥"

অর্থাৎ—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে উদ্ধব! তোমার এই প্রশ্নটী ধর্ম্ম বলিত এবং জন সমাজের নিতান্ত হিতকর এবং মোক্ষ সাধক। অতএব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সৃষ্টির আদি কল্পে কৃত যুগে মানবগণের একটী সাধারণ বর্ণ ছিল। যাহাকে তখন হংস নামেই কীর্ত্তন করা হয়। তৎকালে প্রজাবর্গ জন্ম হইতেই কৃত কৃত্য ছিলেন, সুতরাং সেই যুগের নাম কৃত যুগ বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। প্রণবরূপী বেদ এবং চতুষ্পাদ ধর্ম্মমূর্ত্তিতে বৃষরূপ ধারী আমিই তৎকালে বিরাজ করিতাম। মানবগণ নিষ্পাপ ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন। এবং বিশুদ্ধ স্বরূপ আমার হংস মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতেন। হে মহাভাগ! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিরাটরূপী মদীয় হৃদপদ্মে প্রাণশক্তি ঋগ, যজুঃ সাম লক্ষণ অবয়বত্রয় বিশিষ্ট মূল বিদ্যাবেদ বিনির্গত হয়, এবং সেই একটী বেদ হইতে হোতা, অধ্বর্য্যু, উদগাত্ত এই রূপত্রয় বিশিষ্ট যজ্ঞরূপে আমিই আত্মপ্রকাশ করি। অনন্তর মানসিক বৃত্তি এবং তদনুরূপ শমাদি আচার সহ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র নামক চারিবর্ণ যথাক্রমে মদীয় বিরাটমূর্ত্তির মুখ, বাহু, ঊরু এবং পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। আমার এই বিরাট মূর্ত্তির জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, বক্ষের নিম্নভাগ হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে বাণপ্রস্থ এবং শীর্ষস্থান হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের উদয় হইয়াছে।

অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল এই যে সৃষ্টির প্রথমে সকল মানবই একবর্ণ বিশিষ্ট থাকিলেও বীজ বা প্রকৃতিগত পার্থক্য সকল মানবেরই ছিল। সকল সেই এক পরম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই একবর্ণ বলা হইয়াছে মাত্র। প্রলয়ের পূর্ব্বে যিনি যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই কর্ম্মজনিত সংস্কার রূপ বীজ লইয়া প্রলয়কালে সেই পরম ব্রহ্মে প্রলীন হইয়াছিলেন, আবার সৃষ্টি সময়ে সেইরূপ প্রবৃত্তি অনুসারেই জন্মগ্রহণ হইবে। প্রত্যেক সৃষ্টি সময়ে কোনও নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ের পূর্ব্বে যেমন জগত ছিল, সৃষ্টিকালেও ঠিক সেইরূপ হইয়াই সৃষ্ট হইবে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"যন্তু কর্ম্মানি যস্মিন স ন্যযুঙক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমান পুনঃ পুনঃ॥"

প্রভু পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও স্বতই সেই কার্য্যই আচরণ করিতে লাগিল।

"হিংস্রা হিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোহদধাৎ সর্গেতৎতস্য স্বয়মাবিশৎ॥"

১ম অঃ ২৪।২৫

অর্থাৎ হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রুরতা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা যাহার যে গুণ তিনি সৃষ্টিকালে বিধান করিলেন সৃষ্ট্যন্তরকালেও সেই গুণ তাহাতে স্বয়ং প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুতরাং এ জগতে বৈষম্য থাকিবেই। এই বৈষম্যই প্রকৃতির নিয়ম। যাহারা সাম্য-বাদী বৈষম্য মানিতে চাহেন না, তাহারা প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘনকারী সুতরাং স্বেচ্ছা-

চারী। স্বেচ্ছাচার কখনও সমাজকে উন্নত করিতে পারে না যে কোনও সমাজই হউক না কেন মানব স্বেচ্ছাচারী হইলেই সে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তবে জগত বৈষম্যময় হইলেও আর্য্য শাস্ত্র বৈষম্য বাদী নহে। বৈষম্যবাদই জীবের সংস্কার বন্ধনের মূলীভূত কারণ। তাই আর্য্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—যে বৈষম্যের মধ্য দিয়া জীবকে সাম্যে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু ইহাও বড় সহজ সাধ্য নহে, সাধনা চাই, সেই সাধনার উপায় স্বরূপ মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু পরমেশ্বরের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিচিত্র বিধানের সুদৃঢ় নিগড়ে মানব জাতিকে বন্ধন করিয়াছেন বলিয়াই এ জগতে মানব সমাজ শান্তি সুখে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহা খাইলে, যাহা ইচ্ছা তাহা করিলে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কদাচ প্রতিপালিত হইতে পারে না—এরূপ খাওয়া, এরূপ করা, এরূপ যাওয়া বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ, যাহারা এরূপ বিরুদ্ধাচরণে উপদেশ দেন, তাহারা স্ব সমাজ এবং ধর্ম্ম বিরোধী। সুতরাং স্বদেশদ্রোহী।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম জীবোব্রহ্মৈব কেবলম্। সমস্ত জগত ব্রহ্মময় এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মব্যতীত এ জগতে আর কোন পদার্থ নাই ইহাই আর্য্য ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। কিন্তু কয়জন এই বেদান্ত শাস্ত্র প্রতিপাদ্য অদ্বৈত তত্ত্বে বিশ্বাসবান? কয়জনে এই বেদান্তবাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম? কেবল সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ শাস্ত্রের কথাটী তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধাচার প্রচার করিলে তোমার কথা শুনিবে কে? তুমি জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন জীব, তুমি সংসার সন্তপ্ত, শোক, দুঃখে মুহ্যমান, অহংজ্ঞানে উন্মত্ত, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণানন্দময়, অজয়, অমৃতসিন্ধু এই জগতের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের যাবতীয় পদার্থে যিনি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেই পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম কি এক? ঐ অচেতন বৃক্ষ লতাদি, ঐ বিষ্ঠার কৃমি, এবং ব্রহ্ম কি এক হইতে পারে? কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন যে বস্তুই এক "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পর।" কিন্তু অজ্ঞানই জীবের যাবৎ অনর্থের মূল। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাপ্রভাবে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে। এবং আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ জ্ঞানে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং এই অবিদ্যা হইতেই জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়। এই অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অদ্বৈত মার্গে উপস্থিত হইবার সোপান স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। এই বর্ণ এবং আশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে যদি অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে পার তাহা হইলে তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার সহ অবিদ্যা সেই জ্ঞানাগ্নিতে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তখন আর তোমার কোন বর্ণ বা আশ্রম ভেদ থাকিবে না, তখন তুমি সকল বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ অপেক্ষাও উচ্চবর্ণ এবং

তুমি সকল আশ্রমের অতীত। তখনই তুমি জীবব্রহ্মৈক্যবোধ বলিবার অধিকারী। সে অধিকারের অধিকারী না হইয়া, সে সাধনার ধার না ধারিয়া, বর্ণাশ্রমধর্মের বিধি নিষেধ, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা খাইবার, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইবার, যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ঘোর বিরোধী দেখিয়া, তোমার অসংযত ভোগ লালসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আর অন্তরায় জানিয়া, আজ তুমি সেই বর্ণাশ্রম ধর্মের উচ্ছেদ কল্পে দল বাঁধিয়া বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ, পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের যে ফল, তোমাদের পরিণামও সেই রূপ দাঁড়াইবে। শিক্ষিত তোমরা, ইতিহাসজ্ঞ তোমরা, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অবশ্যই জান, বলিতে পার, ভারতের ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—ভারত হইতে কখনও গিয়াছিল কি? সেই বৌদ্ধ বিপ্লবের কথা স্মরণ কর, সে সময়েও ভারত প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শূন্য হয় নাই, আবার বৌদ্ধ বিপ্লব অন্তে ভারতের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার প্রমাণ ভারতে এখনও জাজ্বল্যমান। অতএব এ বর্ণাশ্রম—সনাতন বর্ণাশ্রমকে লইয়া আর তোমরা নাড়া চাড়া করিও না।

অনেকে বলেন—"বর্ণাশ্রমের আর আছে কি? ব্রাহ্মণের সে যজন-যাজন ধর্ম্ম কোথায়? এখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্রাহ্মণ না করিতেছে কি?" আমরাও এ কথা অস্বীকার করি না। ব্রাহ্মণগণ পরিবার ভরণ-পোষণের জন্য স্ব স্ব বৃত্তি ছাড়িয়া নানাবিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিলেও তাহা অশাস্ত্রীয় বা বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধাচরণও হইতেছে না; কারণ, আর্য্যশাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আপৎকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইলে, অপরের বৃত্তি অনুসারেই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।" ভারতের এখন সেই আপৎকালই উপস্থিত, এ সময়ে স্ব স্ব বর্ণনির্দ্দিষ্ট বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, সুতরাং পরবৃত্তি অবলম্বন করিতেই হইবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য পরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও স্বধর্ম্ম হইতে একপদও বিচ্যুত হন নাই, এরূপ ব্রাহ্মণের অভাব ভারতে এখনও হয় নাই। এরূপ ব্রাহ্মণ ভারতে এখনও যথেষ্ট আছেন! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতাপ ভারত হইতে এখনও যায় নাই, যাইবেও না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা সদানন্দ পরলোকগমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনারোহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। মহম্মদ তোগলকের ভীষণ অত্যাচারে অনেক রাজপুতবীর দিল্লীর বহদুরশাহী নামক পরিপূর্ণ

বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ তাঁহারা নিজ ভুজবলে এক একটী জনপদের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। রাজপুতবংশীয় বিষ্ণুদাস নামক জনৈক বীরপুরুষ ভাজীপাড়া কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী একটী স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেই স্থান সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগম্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন; এইস্থান অধুনা বাহিরগড় নামে প্রসিদ্ধ। রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাহিরগড়ে এখনও বাস করিতেছেন।

রাজপুত বিষ্ণুদাস একজন যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি স্থানীয় বাগদী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য-জাতীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে লাঠী ও তরবারি চালনায় সুনিপুণ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে ধনীদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রভূত ধনের অধীশ্বর হন এবং রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া বাহিরগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করিতে থাকেন ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাধান্য অস্বীকার করেন।

বিষ্ণুদাসের এইরূপ আচরণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমন্তকে বহুসংখ্যক সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। রাজা শ্রীমন্ত দিলাকাশের অদূরবর্ত্তী তাড়াজল নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন। এক্ষণে বোন বা মাদারের খাল নামে বিখ্যাত নদীতে বহু রণতরি শ্রীমন্তের পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন নিশীথকালে বিষ্ণুদাস, রাজা শ্রীমন্তকে আক্রমণ করিলেন; রাজা শ্রীমন্তের সৈন্যগণ তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। এইরূপ অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজা শ্রীমন্তের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা শ্রীমন্ত রণতরির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুদাসের সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া রাজা শ্রীমন্তকে ধরিবার জন্য নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রণতরী সকল গণ্ডারচর্ম্মে আবৃত ছিল, সেই জন্য বিষ্ণুদাসের সৈন্যগণ নৌসেনার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না, কিন্তু নৌকাস্থিত তীরন্দাজগণের অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহার বহু সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। এদিকে রাজা শ্রীমন্ত অরবিন্দ নামক জলযুদ্ধকুশল এক ধীবর কৈবর্ত্তকে পলাতক সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া শত্রুর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবার জন্য অনুমতি করিলেন, অরবিন্দ তাড়াজলের উত্তরদিকে প্রায় ১মাইল দূরে সৈন্যগণকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিল। উভয়দিকে আক্রান্ত হইয়া বিষ্ণুদাসের সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যমে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অরবিন্দের সৈন্যগণ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবমান হইল। পথিমধ্যে বিষ্ণুদাস নিহত হইলেন।

নদী হইতে আক্রান্ত হইয়া বিষ্ণুদাস সসৈন্যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান "তাড়াজল" নামে এবং অরবিন্দ যে স্থানে

পলাতক সৈন্যগণকে সমবেত করিয়াছিলেন, সেই স্থান "অরবিন্দপুর" নামে অভিহিত হয়। এখনও ধীবরগণ অরবিন্দপুরের প্রধান অধিবাসী।

রাজসৈন্য বাহিরগড় অবরোধ করিল। বৎসরাধিক কাল উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল, তৎপরে খাদ্যাভাবে গড়ের লোকগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। সঞ্চিত শস্য নিঃশেষিত হইলে তাহারা ছাগ, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। পুরীমধ্যে ব্যাধীর প্রকোপ বৃদ্ধি হইল এবং অনেক বালকবালিকা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। পুরীমধ্যে এই মহাদুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুদাসের বীরা রমণী নিষ্কাশিত অসি করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আমি রাজা শ্রীমন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষিণী।"

সৈন্যগণ দুর্গদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া মহোল্লাসে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। রমণী অসি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন—"সৈন্যগণ তোমরা আর অগ্রসর হইও না; আমি দুর্গদ্বারে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত থাকিতে তোমাদের পুরী প্রবেশের সাধ্য নাই। তোমরা রাজা শ্রীমন্তকে আমার প্রণাম জ্ঞাপন কর। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছি।

সৈন্যগণ মহাশক্তি স্বরূপিণী বীরনারীর এই তেজোগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীত হইল এবং রাজা শ্রীমন্তের নিকট গমন করিয়া সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র রাজা সসম্ভ্রমে রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নির্ভীক ভাব দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমিই রাজা শ্রীমন্ত; আপনি কুলমহিলা, আমার সহিত আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন কি?"

রমণী সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—"যুদ্ধে আমার স্বামী নিহত হইয়াছেন; সুদীর্ঘ অবরোধে পুরীমধ্যস্থ জনগণ খাদ্যাভাবে ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতেছে; আমি জীবিত থাকিয়া পুরীর এই দুরবস্থা আর দেখিতে পারিতেছি না। আমার প্রার্থনা—আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান. তাহাতে যদি অস্বীকৃত হ'ন, তবে অসি গ্রহণ করুন, শক্তি থাকে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমায় পরাস্ত করিয়া পুরীপ্রবেশ করুন।" রাজা শ্রীমন্ত বলিলেন—"স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করা কাপুরুষতা।"

রমণী বলিলেন—"পুরী অবরুদ্ধ করিয়া অনাহারে শত শত নর-নারীর প্রাণবধ করাই কি মহাপৌরুষ?"

তেজস্বিনী মহিলার এই শ্লেষোক্তি শ্রবণে রাজা শ্রীমন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আপনি বশ্যতা স্বীকার করিলেই ত সকল দিক রক্ষা হয়। আপনার স্বামীই বলপূর্ব্বক আমার রাজ্য হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এই অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ছলে বলে কৌশলে দুর্বৃত্তকে দমন করা রাজার

কর্ত্তব্য। অতএব আপনি আমার কার্য্যে দোষারোপ করিতে পারেন না। আপনার বীরত্বে আমি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি, আপনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করুন, আমি এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।

রাজা শ্রীমন্তের এই কথা শুনিয়া রমণী বলিলেন—আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার স্বামীর অধিকৃত রাজ্য আমার বংশধরগণ শাসন করিবে।

রাজা শ্রীমন্ত উত্তর করিলেন—আপনার স্বামী দস্যুদলপতি ছিলেন, তিনি রাজা ছিলেন না; লুণ্ঠনই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল; আমার রাজ্যের যে অংশ তিনি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুদ্ধের অবতারণা। অতএব আপনি কিম্বা আপনার বংশধরগণ আপনার স্বামীর অধিকৃত স্থান আর শাসন করিতে পাইবেন না। তবে আপনার বীরত্বে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, সেইজন্য বাহিরগড় আপনাকে জায়গীরস্বরূপ দান করিলাম; কিন্তু যুদ্ধকালে আবশ্যক হইলে আপনার বংশধরগণ রাজাকে সাহায্য করিতে বাধ্য রহিল। বাহিরগড়ের এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাজা শ্রীমন্ত ভবানীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাহিরগড় অবরোধ কালে রাজা শ্রীমন্ত যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থান রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুসারে অদ্যাপি কৃষ্ণনগর নামে প্রসিদ্ধ। রাজা বহুসংখ্যক তন্তুবায় ও ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করান। বাগীশ উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বকালে মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারাই রাজার স্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন বলিয়া 'বাগীশ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে অনেক দুর্দ্দান্ত রাজপুত বাস করিতেন; তাঁহারা লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিতেন, নগরবাসী নিরীহ প্রজাগণ তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত, সেইজন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজপুতগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য কৃষ্ণনগরে প্রভূতবলশালী, মহাধনুর্দ্ধর, সমরনিপুণ, সুদীর্ঘ দেহ তারাশঙ্কর নামক এক ব্রাহ্মণকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ কৃষ্ণনগরের উত্তরসীমায় বাস করিত বলিয়া সেই স্থান জঙ্গীপাড়া নামে অভিহিত হয়। তারাশঙ্করের কলেবর সুবৃহৎ ছিল বলিয়া রাজা তাঁহাকে দীর্ঘাঙ্গী উপাধি দান করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন এবং দীর্ঘাঙ্গী নামে অভিহিত হইতেছেন। তৎকালে কৃষ্ণনগরে হাট, বাজার, বিদ্যালয় বিচারালয় ও বহু লোকের বাস থাকায় ইহা একটী মহানগরীতে পরিণত হইয়াছিল। অধুনা এই স্থানে ম্যালেরিয়ার মহাপ্রকোপ সত্বেও তিন চারি হাজার লোকের বাস আছে এবং ইহা একটী গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিচিত। আজকাল কৃষ্ণনগর বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর একটী নগর স্থাপন করিয়া তথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানেরও কৃষ্ণনগর নাম হয়। জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর হইতে প্রভেদ করিবার জন্য ইহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করা হয়। তৎকালে খানাকুল কৃষ্ণনগরে মনোবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, স্মৃতি, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণও পরিবর্ত্তন করিতেন। এখনও হিন্দু-সমাজে খানাকুল কৃষ্ণনগরের মতে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। বহুকাল যাবৎ খানাকুল কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার একটী কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই খানাকুল কৃষ্ণনগরেই বঙ্গের সুকৃতি সন্তান স্বনাম বিখ্যাত রাজা রাম মোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। এখনও এই স্থানে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনুজ শ্রীমন্তের বুদ্ধি ও বাহুবলে রাজ্য মধ্যে শত্রু নাশ ও পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে রাজ্যের আয়তন ও আয় বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজা শ্রীমন্ত একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ ও অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তজ্জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যের দক্ষিণার্দ্ধভাগ সুশাসনের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। রাজা শ্রীমন্ত ভবানীপুর হইতে কিছু দক্ষিণে দামোদরের এক শাখা অধুনা (মোহায়ের খাল নামে বিখ্যাত) নদী তীরে পার-রাধানগর নামক স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহা অগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন হইয়া নিজ রাজ্য শাসনে মনোযোগী হন। অধুনা পার-রাধানগর পাঁড়ুয়া নামে পরিচিত।

রাজা শ্রীমন্ত অপরিমিত বলশালী, রণনিপুণ ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পৃথক রাজ্য লাভ করিলেও জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ ছিলেন ও ইহাঁরই পরামর্শে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজা শ্রীমন্ত স্বীয় বাহু বলে উড়িষ্যা রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর হইতে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ অধিকার করেন। তাঁহার সুসজ্জিত রণতরি সকল দামোদর ও রূপনারায়ণ নদে ভাসমান থাকিয়া শত্রুর গতিরোধ করিত। তিনি তমলুকে বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা শ্রীমন্তের পরাক্রমে বঙ্গদেশীয় ভূপতিগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। তিনি যেমন শত্রুদিগের ভীতিস্থান ছিলেন, সেইরূপ প্রজাবর্গের সুখসম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিজের ভোগ-বিলাস কিছুই ছিল না, তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন; রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে রাজকার্য্য নির্ভর করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তিনি প্রায় ছদ্মবেশে রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাগণের ও রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজা শ্রীমন্তের বাল্যজীবন সম্বন্ধে একটী আখ্যান প্রচলিত আছে। রাণী তারাদেবীর পরিণত বয়সে

শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া শ্রীমন্তকে রাণী অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বহু পরিচারিকা সত্বেও শিশুর লালন-পালন কার্য্য স্বীয় হস্তে সম্পন্ন করিতেন এবং তাহাকে একদণ্ডও চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না। তারাদেবী একদিন স্বামীর ক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নাথ আপনার নিকট দাসীর একটী প্রার্থনা আছে; যদি অভয় দান করেন, তাহা হইলে মনের অভিলাষ শ্রীচরণে নিবেদন করি।" রাজা সদানন্দ রাণীর এই বিনয়-নম্রবচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যাহা বলিবার জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছ, নির্ভয়ে বল, যদি অন্যায় না হয়, তবে তোমার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।" রাণী বলিলেন,—"মহারাজ, আপনার ক্রোড়স্থ শিশু আপনার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি। আমি ইহাকে এত ভালবাসি যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারি না, এই শিশু আপনার কনিষ্ঠ পুত্র, আমার ইচ্ছা ইহাকে রাজ্যের কিছু অংশ দান করেন।" রাণীর এই কথা শুনিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মায়াবর্ত্তে পড়িয়া তোমার ন্যায়ান্যায় জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে? তুমি কি জান না যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের পূর্ণ অধিকারী। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ পুত্রকে আমি কিছুই দিতে পারি না। ভগবান ইচ্ছা করিলে ইহাকে রাজ্য দিতে পারেন, তুমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি ভিন্ন আর কেহই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবে না। রাণী স্বামীবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া শিবিকারোহণে রাজবল্লহাটে উপনীত হইলেন। এবং রাজবল্লভী দেবীর নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া শিশুকে মৃত্তিকোপরি শয়ান করাইলেন ও প্রহরীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, রাজপুত্র যদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যায়, তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাকে স্পর্শ না করে, এই বলিয়া রাণী যুক্তকরে দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"মা জগজ্জননি! দাসী আজ শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল, দেখিস্ মা, যেন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রাজবিধি অনুসারে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী—আমার সেই পুত্র রাজা হইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যেন সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হয়, আর ভূমি-নিপতিত আমার এই কনিষ্ঠ পুত্রও যেন রাজ্য লাভ করিতে পারে। মা! তোর করস্থিত বিল্বপত্রের মালা যখন আমার ভূপতিত পুত্রের মস্তকে আসিয়া পড়িবে, তখন বুঝিব যে সে রাজ্যলাভ করিবে, এবং তখনই তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যপান করাইব, নচেৎ আমি তোর সম্মুখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থা হইলাম এবং বালকও মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিল। এই বলিয়া রাণী ধ্যানস্থা হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। তিনি তন্ময় হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন। এইরূপ প্রায় প্রহরাধিক কাল অতিবাহিত হইল। রাজপুত্র প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, হাত পা ছুড়িতে লাগিল কিন্তু রাণীর নিষেধে কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। শিশুর বয়ঃক্রম তখন পাঁচ

যাগ মাত্র, সেও নিজে উঠিতে পারিল না। কার্য্যেই সে নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িল, হস্ত পদের গতি বন্ধ হইল, চক্ষু নিমীলিত হইয়া জীবনের সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(গুরু শিষ্য সংবাদ)

'বৎস! বহুদিন পরে কি মনে করিয়া আসিয়াছ; তোমরা সকলে কুশলে আছ ত? তোমাদের আফিস কয়দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে? কিছুকাল বাড়ীতে থাকিবে ত?'

'দেব! আপনার আশীর্ব্বাদে দাস শারীরিক কুশলেই আছে—কিন্তু—'

'বৎস, কিন্তু বলিয়াই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে কেন? কি যেন বলিতেছিলে—'

'দেব, বলিতে কি—আপনি যে একদিন বলিয়াছিলেন—মৃতাত্মার আবির্ভাব হয়, তাহা এবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে অভিনব প্লানচেট আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই প্লানচেট এবার আমার অন্ধবিশ্বাস বিদূরিত করিয়াছে। ক্ষমা করিবেন,—আমি তখন আপনার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু এবার ইয়ুরোপ গৌরবরবি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আমার সে ভ্রম অপনোদন করিয়াছেন। আমি একান্ত নিবিষ্ট মনে প্লানচেটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রূপ চিন্তা করিয়াছিলাম,—কিছুক্ষণ পরেই ঐ যন্ত্রটি বেগে ঘুরিয়া কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় সজোরে ঘুরিতে লাগিল। আমি প্রশ্ন করিলাম—'মহাশয়! আপনি কে? আপনি যেই হউন না কেন, আপনার স্বাক্ষর করুন।' তৎক্ষণাৎ প্লানচেট ঘুরিতে ঘুরিতে কিছুক্ষণ পরে ক্ষান্ত হইল,—তখন উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া দেখিলাম-কাগজে নাম লেখা হইয়াছে—'আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র, লোকে বিদ্যাসাগরও বলিত।' তখন আরও কত কি প্রশ্ন করিলাম—ক্রমে ক্রমে সকল প্রশ্নেরই উত্তর পাইলাম। কি আশ্চর্য্য!

"বৎস, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; মৃতাত্মার যে আবির্ভাব হয়—তাহা অনেকদিন তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহা তুমি বিশ্বাস কর নাই। তোমরা সকলেই পণ্ডিত, অথচ বাগ্মী, আমরা সেরূপ ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হইতে পারি নাই। বহুদিন হইল, তোমাকে বলিয়াছিলাম—জলপিণ্ডের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন; সুতরাং শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। তদুত্তরে তুমি বলিয়াছিলে—শ্রাদ্ধ করিয়া কি হইবে! "মরা গরু কি কখনও ঘাস খায়?" প্লানচেটে যদি মৃতাত্মার আবির্ভাব হয়, তবে বল দেখি—সে আত্মা শ্রাদ্ধাদি গ্রহণ না করিবে কেন?'

'দেব, প্রত্যক্ষের উপর আর অনুমান নাই। বৈজ্ঞানিকগণ অন্ধবিশ্বাসী এবং অনুমানবাদী নহেন। মৃতাত্মার যে আবির্ভাব হয়, তাহা অনেকদিনই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তেমন প্রত্যক্ষ কিছুই না দেখিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এক্ষণে উহার প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করাইয়াছেন। যাহা একজন প্রত্যক্ষ

দেখাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া, 'মুখস্বাৎ' অনুমান খণ্ডের উপর নির্ভর করা কি অন্ধবিশ্বাসীর কার্য্য নহে ?'

'কি বলিলে—মুখস্বাৎ ? হায় হায়! 'কালো হি বলবত্তরঃ।' হিন্দুত্ব চরম সীমায় উপনীত। যে হিন্দু শাস্ত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, আর্য্যগণ আমরণ ধর্ম্মাচরণ করিয়া গিয়াছেন—আজ সেই আর্য্যগণ আচরিত হিন্দুধর্ম্মে আমাদের অবিশ্বাস ? এক্ষণে আমরা আর্য্য-সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে কুণ্ঠিত নহি—অথচ তাঁহাদের বিধি-ব্যবস্থা ক্রিয়া কলাপ পালন করিতে আমরা পরাঙ্মুখ! হায়! কালে সকলই সম্ভব ?'

"দেব, অনুতাপের বিষয় কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি দ্বারা আরও কত কি অসম্ভব সম্ভব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? এই যে এরোপ্লেন, প্রভৃতি কত কি হইতেছে, তাহাত প্রত্যক্ষীভূত ? প্লান্‌চেটে ত আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি– মৃতাত্মার আবির্ভাব হয়।'

"আমরা তোমার এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না। প্লান্‌চেটে মৃতাত্মার আবির্ভাব হয়—এই কথা আমাদের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসীর বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। কেননা আর্য্যাচারে আমরা মুগ্ধ। কিছুক্ষণের ঐকান্তিক চিন্তা মৃতাত্মার আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। আর যে এরোপ্লেন প্রভৃতির কথা বলিতেছ—সেই এরোপ্লেন কি নূতন ?'

'আজ্ঞে, তবে এরোপ্লেন সম্বন্ধে আপনি কি বলিতে চান ?'

'বৎস, এরোপ্লেন প্রভৃতি যন্ত্রে নবীনত্ব কিছুই নাই। কেবল নামান্তরিত হইয়াছে মাত্র। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে পুষ্পক রথের নাম শুনিয়াছ কি ? বলত, পুষ্পক রথে আর এই এরোপ্লেনে প্রভেদ কি ?'

'দেব, রামায়ণ মহাভারতের—'

'হাঁ হাঁ!! রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির কথা বলিলেই ত বলিবে, হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন, অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, গরুড়বাণ, সর্পবাণ প্রভৃতি কবির অলীক কল্পনা। কিন্তু বাস্তবিক হিন্দুর চক্ষে উহা কবির কল্পনা প্রসূত নহে। অগ্নিবাণের প্রতিরোধক বরুণবাণ, সর্পবাণের প্রতিরোধক গরুড়বাণ প্রভৃতি। আর্য্যগণ যে বিজ্ঞানবিদ না ছিলেন—এমন নহে। ক্রমে উহার বিলোপ সংসাধিত হইয়াছে।'

'দেব, আর্য্যগণ যে বিজ্ঞানবিদ ছিলেন না এমন নহে, মানিলাম আপনার কথাই সত্য, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই—যখনই প্রয়োজন বশতঃ তাঁহারা অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, সর্পবাণ, গরুড়বাণ প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়াছেন—তখনই মন্ত্রঃপূত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অধুনা ত আর তেমন করিতে হয় না, ইহাতেই ঐ সকল কল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়।'

'ইহাই তোমাদের ভুল ধারণা। এক্ষণে নামান্তরিত হইয়াছে মাত্র কিন্তু আজও "সিদ্ধানি অস্ত্রাণি।'

'তবে প্লান্‌চেট সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ ?'

'পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কিছুক্ষণের চিন্তা মৃত

আত্মার আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কোনও হাল্‌কা জিনিষ ধরিয়া একান্ত নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে হস্তের উপর মনের সম্যক্‌ ক্রিয়া হয়, তখন আপনিই উহা ঘুরিতে থাকে এবং যাহা কিছু ইচ্ছা লিখিয়া যায়। প্লান্‌চেট যে হাল্‌কা জিনিষ, তাহা মানিতে কোনও আপত্তি আছে কি ?'

'প্লান্‌চেট হাল্‌কা জিনিষ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অল্পক্ষণের চিন্তা মৃতাত্মাকে আকর্ষণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি করিলে যে মৃতাত্মার আবির্ভাব হয়—তাহার প্রমাণ কি ? শ্রাদ্ধাদি মৃতাত্মার আকর্ষণ করিবে কিরূপে ?'

ঈশ্বর যে আছেন—তাহার প্রমাণ কি ? বৈজ্ঞানিকগণত বলিয়াছেন—চন্দ্র,সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি কিছুই নহে ? কিন্তু আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকারগণত চন্দ্র সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ? আমরা যে জল দ্বারা সন্ধ্যা করি—বৈজ্ঞানিকগণ ত সে জলও কিছু না বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কি জানি দুইটী গ্যাস একত্র করিলেই নাকি জল হয় ? হিন্দুগণ ইহা মানিবে না। তবে শুন, শ্রাদ্ধাদিকালে যে মৃতাত্মা এবং দেব-দেবী পূজা প্রভৃতিতে যে দেবতার আবির্ভাব হয়—উহার কারণ আর কিছুই নহে—মন্ত্রশক্তি। উদাত্তানুদাত্তরূপে উচ্চারিত মন্ত্রই মৃতাত্মা ও দেবতা আকর্ষণে সমর্থ। মন্ত্র শক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই।

শ্রাদ্ধকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে যমালয়ে,
উজ্জ্বল জ্যোতিষাবর্ত্ম প্রপশ্য ন ব্রজন্তে।

বলত ইহা দ্বারা তোমার কি অনুমান হয় ?'

'ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে নিশ্চয়ই মৃতাত্মার আবির্ভাব হয়, আবাহন না করিলে যেরূপ বিসর্জ্জন নাই, তদ্রূপ মৃতাত্মার আবির্ভাব না হইলে উজ্জ্বল জ্যোতিষাবর্ত্মে গমন করিবে কে ?'

'কেন, উহা আর্য্য ঋষিগণের কল্পিত বলিয়া মনে করিবার কোনও অন্তরায় আছে কি ?'

মন্ত্রশক্তি যে সত্য, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। আমরা ত আর্য্যবংশধর, মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস করিবই, জর্ম্মনদেশীয় পণ্ডিতগণও মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস করেন। অল্প দিন হইল দেখিলাম—জর্ম্মনদেশীয় জনৈক পণ্ডিত মন্ত্রশক্তিকে পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গীয় সাধক-শ্রেষ্ঠ একজন মহাত্মার কয়েকখানা তন্ত্র মুদ্রিত করিয়া ঐ তন্ত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—তিনি মন্ত্রশক্তি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাহারাও বলেন—হিন্দুর মন্ত্র ও সাধন তত্ত্ব অতি অদ্ভুত, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, আর তুমি হিন্দু হইয়া বিশ্বাস কর না ?

'ভগবন! শত সহস্র অপরাধ, আপনার নিকট মার্জ্জনীয়। আজ আমার সকল ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে। ভবাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু পাইয়া আজ আমি ধন্য—পবিত্র। আজকে একটা কথার সমাধান করিবার জন্যই শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করিলে নিবেদন করিতে পারি '

'কোন্‌ কথা জিজ্ঞাসা করিবে ? বলনা শুনি।'

'স্বপ্ন সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে আমার বাসনা। আমি সপ্তাহ দুই পূর্ব্বে দিন তিনেক কয়েকটী স্বপ্ন দেখিয়াছি। তখন হইতেই আমার কৌতুহল হইতেছে যে, স্বপ্নের গূঢ় রহস্য আপনার নিকট অবগত হইব। তাই মাত্র সপ্তাহ খানেকের বন্ধ পাইয়াই ভবদীয়

চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। স্বপ্ন কি ? ইহা আমাকে সুন্দর রূপে বুঝাইলে, আমার বাসনা পূর্ণ হয়।'

'বৎস, আমি যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছি তখন অবশ্যই বলিব। আচ্ছা, এই সম্বন্ধে তোমাদের বৈজ্ঞানিক মত কি ?'

'বৈজ্ঞানিক মত কি কেবল আমাদের।'

'বৎস, বৈজ্ঞানিক মত যে কেবল তোমাদের তাহা নহে। ভারত যে এক সময়ে বিজ্ঞানালোচনায় জগতের নিকট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল—তাহা কি প্রাচ্যবাসী, কি পাশ্চাত্য বাসী কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করিয়াই জ্ঞান-বিজ্ঞান-রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছি। আর্য্যগণ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন কিন্তু ক্রমে উহার বিলোপ সাধিত হইতে হইতে এখন একেবারে উহার অস্তিত্বই ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা বংশ পরম্পরা ক্রমে বিজ্ঞান-কৌশল ভুলিয়া গিয়াছি।'

'বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমাদের এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, স্বপ্ন কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার ফলে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন—স্নায়বিক দুর্ব্বলতাই নানাবিধ স্বপ্ন দেখার অন্যতম কারণ। এই কথা ভিন্ন তাঁহারা আর কোনও বাগবিন্যাস করেন নাই। আমাদের আফিসের বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী বড়বাবুকে আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতেই এরূপ দেখা গিয়াছে, এক্ষণে দিন কয়েক পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে ও কিছুদিন স্নিগ্ধ কেশ তৈল ব্যবহার করিলেই সারিয়া যাইবে। এইত বৈজ্ঞানিকদের মত। এ সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্র কি বলেন ?'

আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকারগণ উপাধি পরিচিত মহাকাল নহেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—স্বপ্ন শুভাশুভ ফল লাভের পূর্ব্ব সূচনা। মহর্ষিগণ প্রণীত ভগবদ্বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেই চিরমধুর, চির-শান্তির নিকেতন আর্য্যধর্ম্মানুসারী স্বপ্নতত্ত্ব বলিতেছি—যাহা অদ্যাবধি সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট সুখ-শান্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট ইহা কিরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে—বলিতে পারি না, তবে শাস্ত্রবাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর—

'স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্য ফলপ্রদং
স্বপ্নাধ্যায়ং নরঃ শ্রুত্বা গঙ্গাস্নান ফলং লভেৎ।'

যে স্বপ্নাদি বিষয়ক লিখিত অধ্যায় পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে গঙ্গাস্নান ফল লাভ হয়, সেই বহুপুণ্য ফলপ্রদ স্বপ্নাধ্যায় আমি বিবৃত করিতেছি।

'স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সংবৎসর ফলপ্রদঃ
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভিমাসৈস্তৃতীয়কে।
চতুর্থে চার্দ্ধ মাসেন স্বপ্নস্যাৎ তু ফলপ্রদঃ
দশাহে ফলদ স্বপ্নোহপ্যরুণোদয় দর্শনে।

*　*　*　*

প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদ স্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ।
চিন্তাব্যাধি সমাযুক্তোনর স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি,
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং তাৎ প্রয়াত্যেব ন সংশয়ঃ।'

রজনীতে নিদ্রাবস্থায় মানব প্রথম প্রহরে যে স্বপ্ন দর্শন করে, সেই স্বপ্ন-ফল এক বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে আটমাসের মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে তিন মাসের মধ্যে, চতুর্থ প্রহরে চারি মাস মধ্যে, অরুণোদয় কালে দশ দিনের মধ্যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাভাতিক স্বপ্নের ফল সেই দিনই প্রাপ্ত হওয়া যায়—যদি স্বপ্ন দেখার পর আর নিদ্রিত না হয়। চিন্তাভিঃশয্যা প্রযুক্ত স্বপ্ন দর্শন করিলে কোনও ফল লাভ হয় না।

যে কোনও শুভ স্বপ্ন দর্শন করিলেই আর নিদ্রিত হওয়া উচিত নহে। শুভ স্বপ্ন দেখিবা মাত্রই শয্যাত্যাগ করিবে। তাহা হইলেই স্বপ্ন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'দেব, যদি কেহ অশুভ স্বপ্ন দর্শন করে, তবে তাহার বিনষ্টের বিধান কি ?'

'দৃষ্টাস্বপ্নঞ্চ নিদ্রালু র্যদি নিদ্রাং প্রয়াতি চ
বিবুদ্ধোব্যক্তি চেন্দ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজংফলং।'

ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শুভ স্বপ্ন দর্শন করিলে যেরূপ নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে, সেইরূপ অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিলে নিদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই অশুভ স্বপ্নজ ফল বিনষ্ট হইবে। তাহার পর শুন—

'অতঃ উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামিপুণ্যাপুণ্য ফলং শৃণু?'

স্বপ্ন দর্শনাদি বিষয়ে শুভাশুভ ফল ব্যাখ্যা করিতেছি।'

'পক্ষীণাং মানুষানাঞ্চ ভুঙক্তেমাংসং নরোযদি
বহ্বর্থং শুভ বার্ত্তাঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।'

স্বপ্নে কেহ পক্ষীমাংস কিংবা মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিলে বহু অর্থ লাভ ও শুভ বার্ত্তা লাভ হয়।

'পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বহ্নিং পুষ্পং তাম্বুল মন্দিরং
শুক্লধান্যং নটং বেশ্যাং দৃষ্ট্বাশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ।'

স্বপ্নে কেহ পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্বানর, কুসুম, তাম্বূল, মন্দির, শুক্লধান্য, নট এবং বেশ্যা দর্শন করিলে, লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করেন।

'স্বপ্নেতু পূর্ণকলসং কশ্চিৎ কস্মৈ দদাতি বা,
পুত্রলাভোভবেত্তস্য সম্পত্তিং বা সমালভেৎ।'

স্বপ্নে পূর্ণকলস কেহ কাহাকে দান করিতে দেখিলে, সম্পত্তি কিম্বা পুত্রলাভ হয়।

'প্রাপ্তোতিপুস্তকং স্বপ্নে পথিক যত্র তত্র চ,
সপণ্ডিতো যশঃস্বী চ বিখ্যাতশ্চ মহীতলে।'

স্বপ্নে কেহ, পথে বা যেখানে সেখানে কোনও পুস্তক পাইয়াছেন দেখিলে সেইব্যক্তি এসংসারে পণ্ডিত, যশস্বী ও বিখ্যাত হয়।

'দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি মমস্বামী ভবান্‌ভব,
স্বপ্নে দৃষ্টাচ জাগর্ত্তি সচরাজা ভবিষ্যতি।'

যদি স্বপ্নে দেখা যায় যে, কোনও সুশ্রী যুবতী স্ত্রী বলিতেছে,—'মহাশয়! আপনি আমাকে বিবাহ করুন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজত্ব প্রাপ্ত হয়—যদি স্বপ্ন দর্শন করিয়া আর নিদ্রা না যায়।

'দেব, স্বপ্নতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আমি মোহিত হইতেছি। এবং ভবদীয় উপদেশানুসারে উহা পালন করিতে যত্ন করিব। সংস্কৃত অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা বলিলেই দাসের পক্ষে সুবিধা হয়। বহুদিন ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় সংস্কৃত প্রায় স্মৃতিপথ হইতে বিদূরিত হইয়াছে।'

'হায় হায়!! কি দুঃখের কথা! যে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বলিয়া অভিহিত, যে সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতৃ-ভাষা, সেই ভাষায় আমরা অনভিজ্ঞ! এতদপেক্ষা আর দুর্দ্দৈব কি হইতে পারে? যাউক আমি শ্লোকের যথাযথ বাঙ্গালাই বলিতেছি।'

'স্বপ্নে মৎস, বাস, মুক্তা, শঙ্খ, চন্দন, হীরক দর্শন করিলে বিপুল অর্থ লাভ হয়।'

'স্বপ্নে জলৌকা (জোঁক) বৃশ্চিক, সর্প দর্শন করিলে—ধন, পুত্র, প্রতিষ্ঠা এবং বিজয়শ্রী লাভ হয়।

'স্বপ্নে যদি দেখা যায়——কোন ব্রাহ্মণ কোনও ব্রাহ্মণকে মহামন্ত্র প্রদান করিতেছেন, তবে সেই ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, ধনবান্, গুণবান্ ও পণ্ডিত হয়।'

'স্বপ্নে কেহ ছত্র, উপানহ, নির্ম্মল তীক্ষ্ণ অসি এবং পথে গমন করিতেছেন দেখিলে, বহু শুভ বার্ত্তা ও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

'বৎস, তুমি কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ বল ত শুনি।'

'দেব, আমার স্বপ্ন সবগুলিই আপনার কথিত স্বপ্নফলে মিলিয়াছে। তবে আর একটী স্বপ্নের কথা বলিতে বাসনা।'

'আচ্ছা—অদ্য আর নয়, সন্ধ্যা সমাগতা; এখন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হইবে। যাও তুমিও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া জলযোগ করগে, আর একদিন তখন অন্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমাকে বলিব।'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।

ভারতীয় উন্নতির মূলতত্ত্ব

যে যতই বলুক—যাহার ইতিহাসই ভারতবাসীকে যতই ছোট করিতে চেষ্টা করুক, আমরা সকলের আদি। সকল উন্নতি ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা যে আমাদেরই দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল—তাহা যিনি আমাদের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবনত মস্তকে স্বীকার করিবেন। ভারতীয় আর্য্যের অস্তিত্ব সামান্য দিনের নহে। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে গরু তাড়াইতে তাড়াইতে কাস্পিয়ান সাগরের ধার হইতে আমরা ভারতে প্রবেশ করি নাই। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্ব, যতদিন পৃথিবীর সৃষ্টি, ততদিন আমরা বর্ত্তমান আছি, ততদিন আমাদের সভ্যতাভিমান উন্নতি সোপান স্বরূপ দেদীপ্যমান। কোন ইংরেজী নকল-নবীশের লেখনী-প্রসূত ইংরাজী পুস্তকে আমাদের সামগানকে চাষার গান বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু যিনি জানেন—তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন—আর্য্য-সঙ্গীত সামবেদ-ওঁকারের কলধ্বনি-মুখরিত, যাহা হইতে জগৎজীবের স্পন্দন সমাহিত হইয়াছে। এখন আবার কেহ কেহ বলেন—ভারতবাসী ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া নিজে উৎসন্ন গিয়াছে, দেশটাকেও উৎসন্ন দিয়াছে। এই জন্য তাহারা ধর্ম্মের দিক দিয়াও না যাইয়া আজকাল কর্ম্মে মন দিয়া কর্ম্মবীররূপে দেশের ও দশের নিকট সম্মানার্হ হইতে প্রয়াসী হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে কর্ম্ম করে—তাহার কর্ম্ম কত দিন, আর সে কর্ম্মের দ্বারা কতদূর উন্নতি হইতে পারে—তাহা সহজেই বিবেচ্য। কর্ম্মের মূল ধর্ম্মজড়িত না হইলে, তাহা কখন ফলপ্রদ হইতে পারে না। ভারত যে এত বড় হইয়াছিল, জ্ঞান-গরিমায় যে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে কেবল ধর্ম্মবলে—ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়াই সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আজ অবধি ভারত আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া এখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কত অত্যাচারের প্রবল বন্যা, কত নির্য্যাতনের দারুণ ঝটিকা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—তথাপি ভারত অচল-অটল ; একটু আধটু চুণবালি খসিয়াছে বটে কিন্তু ভিত্তি পাকা বলিয়া অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এখনও সমভাবে

দাঁড়াইয়া আপন অস্তিত্ব, আপন দেবদত্ত মহিমা বজায় রাখিয়াছে। কত গেল, কত আসিল, অনন্ত-কাল-গর্ভে কত শত জাতির উত্থান-পতন হইল কিন্তু ভারতীয় আর্য্যজাতি শাশ্বত—সনাতন,পুরাণ পুরুষের ন্যায় অক্ষত শরীরে এখনও দণ্ডায়মান। ধর্ম্মহীন কর্ম্মের তেজ দুদিনের, আর ধর্ম্মজড়িত কর্ম্মের তেজ অক্ষয়-অব্যয়, কষিত কাঞ্চনের ন্যায় চির সমুজ্জ্বল। তবে যে আজকাল আমাদের একটু আধটু তেজোহীন দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল নিজদোষে। ধর্ম্মহীন কর্ম্ম করিয়া এইরূপ হইতেছে। কিন্তু হাওয়া আবার ফিরিয়াছে, গতির আবার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ভিন্ন যে উন্নত হওয়া যায় না, জড়বিজ্ঞান যে আমাদিগকে চিরস্থায়ী উন্নতির পথ দেখাইতে পারে না, তাহা এখন আমরা আবার বুঝিতে পারিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া, ভিন্ন ভাষায় কথা কহিয়া যে আশ মিটে না—তাহা এখন আমরা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি—তাই মোহনিদ্রা ঘুচিয়া আবার চারিদিকে একটা মাতৃভাষা শিক্ষার উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। শিক্ষায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় মাত্র কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। আধ্যাত্মিক বলই বল এবং তাহার বলে বলবান্ হওয়াই প্রার্থনীয়, নতুবা আসুরিক ভাবে বল সঞ্চয়ের আশা—দুর্ব্বলতার পূর্ব্বলক্ষণ, একবার পতন হইলে হাড়গোড় চূর্ণ হইয়া যাইবে, আর উত্থানের শক্তি থাকিবে না।

আধ্যাত্মিক উন্নতিই ভারতীয় উন্নতির মূলতত্ত্ব—ইহা যথার্থভাবে সাধিত হইলে নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যে আর ভাবিতে হয় না—ভারতীয় আর্য্যগণ তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—তাই তাঁহারা সকল জাতির শীর্ষদেশে সমাসীন হইয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন—আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া ভারত অধঃপাতে গিয়াছে—আধুনিক শিক্ষার বলে যাঁহারা এরূপ ভ্রান্তি হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহাদিগকে বলি—কোনও যুগেই ত আমাদের অধঃপতন হয় নাই—কোন যুগেই ত আমরা হিতাহিত বিবেচনাশূন্য, শৌর্য্যবীর্য্য হীন হই নাই, কেবল আত্মবিস্মৃত হইয়া এই কলিযুগে আমাদের যত অবনতি ঘটিয়াছে; ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়া কেবল দাসত্ব লোলুপতাই ভারতের যত অধোগতির মূল কারণ; সত্যযুগে যখন দেশে বেদের প্রভাব প্রকটিত, সে সময় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধনে দৈহিক,নৈতিক এবং মানসিক উন্নতি কত অধিক সাধিত হইয়াছিল; কত বড় দেহ, কত দীর্ঘ পরমায়ু এবং কিরূপ ধর্ম্মভাব লইয়া জগতীতলে আমরা বিচরণ করিতাম, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তার পর পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ ত্রেতা ও দ্বাপরের বিষয়ও রামায়ণ,মহাভারতাদির অন্তর্গত এবং দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভে স্মৃত্যাদির যুগে আমরা কিরূপ ছিলাম, রাজপুতনার ইতিহাস রাজস্থান তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সেই ধর্ম্মের অভ্যুদয় সময়ে আমরা কিরূপ ছিলাম, আর এখন কিরূপ হইয়াছি; দেহের গঠনপ্রণালী,সে শক্তি-সামর্থ্য,সে পরমায়ু কতদূর হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আধ্যাত্মিক

অবনতিই কি ইহার মূলীভূত কারণ নহে? ধর্ম্মহীনতাই কি ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বলিয়া প্রমাণিত হয় না? ধর্ম্মহীন হইয়াই আজ আমাদিগকে যাবতীয় দুষ্কৃতি ভোগ করিতে হইতেছে। রোগ শোক জর্জ্জরিত হইয়া অকাল মৃত্যু আমাদের নিত্য সহচর হইয়াছে। পূর্ব্বে লোক কতদিন জীবিত থাকিত, আর আমরা আজকাল পঞ্চাশ হইলে জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করি কেন? একমাত্র আধ্যাত্মিক অবনতি ইহার কারণ নহে কি? পূর্ব্বে সংসারের চিন্তা, জীবন ধারণের অত্যধিক চিন্তা এখনকার মত আমাদের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করিত না; দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের মর্ম্মঘাতী ভাবনা আমাদিগকে এমন করিয়া জীবনমধ্যাহ্নে সন্ধ্যার তীব্র অন্ধকার দেখাইয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিত না। আজ ত গেল—কাল কি হইবে, পুত্র-পরিবার লইয়া কিরূপে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিব—এখন এই চিন্তাই আমাদের দুর্ব্বিসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর ইহার জন্যই আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষয় হইয়া, আধি-ব্যাধি প্রপীড়িত আমরা অকালে কাল-কবলিত হইতেছি। কিন্তু এই শস্যশ্যামলা, কানন-কুন্তলা, মহামায়ার শান্তিময় আবাসে কি আমাদের এ চিন্তা কখন করিতে হইত? যাহারা মায়ের সুখময় ক্রোড়ে শায়িত—গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা আবার তাদের কোথায়? কিন্তু সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র আমাদিগকে আধ্যাত্মিক অবনতির ফলে, ধর্ম্মহীনতার মহাপাপে কিরূপ বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যাহাদের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ সদা সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণে অতুল আনন্দ দান করিত, আজ তাহা কয়জনের আছে; কয়জনই বা তাহার জন্য স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? এই যে অজন্মা, এই যে অভাব, ধর্ম্মময় যাগযজ্ঞ দেশ হইতে তিরোহিত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ নয় কি? আধ্যাত্মিক উন্নতিই উন্নতি, কেবল লেখাপড়া শিখিয়া, পরকীয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যেটুকু উন্নতি হয়, তাহাতে কেবল উপার্জ্জনের পথ সামান্য প্রশস্ত করিয়া দেয় মাত্র, আত্মোন্নতি কিছু মাত্র হয় না—যাহার বলে মানুষ মানুষ হইতে পারে—দেবত্বের দাবী করিয়া বিশ্বে আপন মাহাত্ম্য বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয়, তাহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ ভিন্ন হইতে পারে না। সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই,সাধক না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া যথার্থ শক্তিশালী হওয়া অসম্ভব। সে আজ বেশী দিনের কথা নহে—গদাধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সামান্য পাঠশালের ছাত্র হইয়া সাধনবলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব নাম ধারণ করতঃ দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে কি অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন—তাহাত কাহার অবিদিত নাই; অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিও কি আজ পর্য্যন্ত সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন? কোথা বিদ্বান্ আর কোথা তিনি, আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাঁহার অমিত শক্তি—প্রভাবশালী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া কত দেশ মাতাইয়া গিয়াছে, তাঁহার অমৃতময় উপদেশ-বাণী ভগবদ্বাক্য বলিয়া এখন সকলে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছে—কই শিক্ষিত, বহু ভাষাজ্ঞ তুমি, তোমার কথাত কেহ

শুনে না? আর তারাপীঠের "বামাক্ষেপা"ই বা কি পণ্ডিত ছিলেন; আজ তাঁহার কত শিষ্য তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে একবার দেখ দেখি। এ সকল তোতা পাখীর মত পুস্তক কণ্ঠস্থ করিবার ফল,—না সাধনার অনন্ত শক্তি? আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা, ধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইহাপেক্ষা আর কি হইতে পারে? তাই বলি—ধর্ম্মে মানুষ গড়ে, ভাঙ্গে না; আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মানুষ দেবতা হয়—দাসত্ব আসিতে পারে না। ইহাতে সনাতন শাশ্বত শান্তি লাভ হয়, যাবতীয় অশান্তি ইহার নিকট তিষ্টিতে পারে না। আর্য্যজাতি যাহা করিত, বলিত, শিখিত, তাহা পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষা-দীক্ষার, আদর্শ স্থল, তাহার তুলনা বা সমালোচনা হইতে পারে না।

সম্পাদক।

বিচার।

গল্প।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৩)

গরীবের দুঃখ কেহ বুঝে না; বুঝি ভগবানও না। তাহা না হইলে দয়ালচাঁদের মত দারিদ্রের উপর বিধাতা এত দুঃখ বর্ষণ করিতেছেন কেন? দয়ালচাঁদ ত্রয়োদশ বৎসরের বালক, সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা পিসিমা আছেন। দুই মাস হইল তাহার পিতা স্বর্গগমন করিয়াছেন, সংসার এক রকম অচল হইয়া পড়িয়াছিল, দয়ালের পিতা সামান্য মাহিনার চাকরী করিতেন, অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন এবং গ্রামের নিকটস্থ হাই স্কুলে দয়ালকে পড়াইতেছিলেন; এখন তাহার অভাবে সব দিকই অচল হইয়া পড়িতেছিল। দয়ালের মা ভাবিয়া ভাবিয়া এমনটা হইয়া গিয়াছিল, শেষে তাহাকেও গ্রহণী রোগে আক্রমণ করিল। চিকিৎসা অভাবে বৃদ্ধা ভুগিয়া ভুগিয়া যখন ইহলীলা সম্বরণ করিল, তখন সে সকল জ্বালার হাত হইতে এড়াইল বটে, কিন্তু যাহাকে রাখিয়া গেল, তাহার আর দুঃখের অবধি রহিল না।

ভবিষ্যতের ভাবনা পরে। এখন ভাবনা এই যে, এই অসহায় অবস্থায় কি করিয়া দয়াল শব-সৎকার করে। বৃদ্ধা পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে দয়ালের হাত ধরিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিল; সকলেই আপত্তি তুলিল যে, যে রোগে দয়ালের মাতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করান আবশ্যক। গরীব চক্ষে অন্ধকার দেখিল। টাকা নাই যে, এ বিপদ হইতে রক্ষা হইবার কোন উপায় হইতে পারে, গ্রামময় এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এ আমাদের সেই গ্রাম, যে গ্রামে হরকুমারের বিচারের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় নাটমন্দির আবার লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। দয়ালের মাতার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক কি না, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। গরীবের শব সৎকারে আপত্তি দিতে কে না চায়? তাহা হইলে নিজেরাও যে এ কুকর্ম্মের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে। লোকে লোকারণ্য; বৃদ্ধেরা হুঁকা হাতে করিয়া গম্ভীর

ভাবে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে যেন কত ভীষণ সমস্যার সমাধান করিতে ব্যস্ত আছেন, যুবকেরা বৃদ্ধদের অর্দ্ধ আড়ালে দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতেছেন। ঠিক যে সময়ে সকলে স্থির করিলেন যে, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে শব-সৎকার হইতে পারে না, সেই সময়ে নাটমন্দিরের সম্মুখ দিয়া কাহারা "বল হরি হরিবোল" বলিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া সম্মুখে মশাল জ্বালাইয়া শব লইয়া যাইতেছে, দেখা গেল। "কে যায়, কে যায়" বলিয়া নাটমন্দির হইতে একটা গোল উঠিল। জনকতক লোক উহাদের নিকট গিয়া দেখিল, এক দিকে গোপাল দত্ত আর এক দিকে দয়াল শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। গোপালের কাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহারও কোন কথার উত্তর দেওয়া নাই, হন্ হন্ করিয়া শ্মশানের দিকে শব লইয়া চলিয়া গেল। দেশশুদ্ধ লোক গোপালের উপর চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইল, গোপালই যত নষ্টের গোড়া, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইলেন। তদ্দণ্ডেই গোপাল ও দয়াল একঘরে হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইল যে, ৫০০৲ শত টাকা অর্থ দণ্ড দিলে উহাদিগকে সমাজে লওয়া যাইতে পারে। হায় সমাজ, অর্থের বাঁধন তোমার কাছে কি এতই মূল্যবান্?

যাহা হউক, গোপাল দত্তের বিচার হইয়া গেল, যথাসময়ে তাহা তাহার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। গোপাল প্রথমে তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু বালক দয়ালের অবস্থা ভাবিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল দেখিল, তাঁহারই জন্য দয়ালকে একঘরে হইতে হইয়াছে; বালক এই বয়স হইতে যদি সমাজচ্যুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কষ্টের অবধি থাকিবে না। তাহার প্রতি গোপালের বিশেষ টান হইয়া পড়িল, তাহাকে রক্ষা করা তাহার পড়া শুনার ব্যবস্থা করা, কোন রকমে তাহার কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা গোপালের এক মহা কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, অর্থ দণ্ড দিতে হয় দেওয়া যাইবে কিন্তু খেমটা নাচ হইবার জন্য নয়। সাধারণের অর্থ অপব্যয় হইবার জন্য তিনি টাকা দিবেন না। যদি ইহার সদ্ব্যয় হয়, তাহা হইলে তিনি ইহা দিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট। "দশের পুকুর" বলিয়া একটী বড় পুষ্করিণী গ্রামের মধ্যে আছে কিন্তু তাহার সংস্কারাভাবে জল অতিশয় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে বাধ্য হইয়া সেই দূষিত জল পান করিতেছে। দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, তিনি নিজে ঐ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিবেন। সকলে তাহাতে রাজী হইল না, যে একঘরে হইয়া রহিয়াছে, তাহারই ইচ্ছা অনুসারে কেন কার্য্য হইবে? তাহা হইলে কি তিনি নিজের জেদ বজায় রাখিয়া সাধারণের অপমান করিতে চান? এরূপ দুষ্ট লোকের দ্বারা সংস্কৃত পুষ্করিণীর জল কেন তাঁহারা পান করিবেন,তাহা কি হইতে পারে? বটেই ত। দত্ত মহাশয়! লোককে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার আপনি কে, বলুন ত'?

গোপাল দত্ত লোককে কত বুঝাইলেন, কত সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। দত্ত মহাশয় দেখিলেন, ইহাদের নিকট যুক্তি তর্ক বৃথা, ইহারা চায় টাকা, ইহারা চায় আমোদ আহ্লাদ সুতরাং এরূপ গ্রামে একঘরে অবস্থায় বাস করিয়া থাকা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া তিনি দয়ালচাঁদ ও তাহার পিসিকে লইয়া দেশত্যাগ করিলেন। গোপাল দত্তের ভিটেয় চাবি পড়িল, দয়ালচাঁদের ভিটেয় চাবি পড়িল। এমন গ্রাম যে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার কেহ রহিল না। বরং গ্রামের এক কণ্টক উৎপাটিত হইল বলিয়া অনেকে মনে করিল। আমরা জানি, যখন তাঁহারা গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন দয়ালচাঁদ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আমরা কেন দেশ ছেড়ে যাচ্ছি, জ্যেঠা মশাই ?" দয়াল দত্ত মহাশয়কে জ্যেঠা মশাই বলিয়াই ডাকিত।

গোপাল। কেন, কি বল্‌ব, দেশ আমাদের সয়তানের রাজ্য হয়েছে।"

দয়ালচাঁদ। বুঝতে পারছি না, জ্যেঠা মশাই।"

গোপাল। এখন বুঝবি কি ? বছর কত পরে দেখিস্ ;"—বলিতে বলিতে টস্ টস্ করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু বৃদ্ধের কপোল বাহিয়া পড়িতেছিল, তাহা তিনি দয়ালের অজ্ঞাতে মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর এক দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলেন।

ধন্য সমাজ! ধন্য তোমার বিচার! আজ যে রত্ন তুমি তোমার বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলে, তাহার মূল্য যে কত তাহা তুমি বুঝিলে না।

(৪)

কে বলে বিধাতার বিচার নাই ? আমাদের চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিচারের শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান্ থাকিতে কোন্ সাহসে লোকে বলে, তাঁহার রাজ্যে সুবিচার হয় না ? দেখিবার মত চক্ষু থাকা চাই, চিন্তা করিবার শক্তি থাকা চাই—তাহা হইলে বিধাতার সুবিচারের দৃষ্টান্তের অভাব হয় না।

উক্ত ঘটনার পর ছ'মাস কাটিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক জুড়াইয়াছে, হরকুমার জুড়াইয়াছে, সমাজের কার্য্য যথারীতি সম্পাদিত হইতেছে।

বৈশাখ মাস। নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে যেন পৃথিবীকে জ্বালাইয়া দিতেছে। লোকে বাড়ীর বাহির হইতে পারে না, রৌদ্র যেন খাঁ খাঁ করিতেছে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই যেন সন্ত্রস্ত হইয়া আশ্রয় স্থান ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এক বিন্দু জলের জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িতেছে।

মনোহরপুরের সেই দশের পুকুরের অবস্থা এ বৎসর আরও শোচনীয় হইয়াছে। জল ঘোলা, জীবাণু-পরিপূর্ণ, কিন্তু উপায় নাই; গ্রামের মধ্যে ত ভাল পুষ্করিণী নাইই, গ্রামের পাঁচ ক্রোশের মধ্যেও সুপেয় জলের সম্পূর্ণ অভাব। লোকে বাধ্য হইয়া "দশের পুকুরের" সেই কর্দ্দমাক্ত অপেয় জলই পান

করিতে লাগিল। ফলে, গ্রামে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। ২।১ জন মরিতেই লোকের মনে বিভীষিকা আসিয়া উপস্থিত হইল; অষ্টপ্রহরব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন, কালীপূজা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু ব্যাধি ক্রমে ক্রমে গ্রামময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। লোকে বুঝিতে পারিল, জলাভাবই ইহার প্রধান কারণ, "দশের পুকুরের" জল খাইয়াই এই ব্যারামের দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইতেছে। তাহার শীঘ্র সংস্কার করা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া জমিদার হরকুমার বাবুর নিকট যাইয়া বলিল,—"বাবু, আমাদের রক্ষা করুন, দশের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিন, তাহা না হইলে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইবে।"

বাবু তখন জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত, তিনি ভয়ে সপরিবারে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, দুইখানি পাল্‌কী পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে, এখনও একখানি সদরের উঠানে বসান রহিয়াছে, সেইটীতে বাবু নিজে যাইবেন। বাবু পাল্‌কীর ছাদের উপর এক হাত রাখিয়া পালকীর ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বেহারাদিগকে হুকুম করিলেন,—"শীঘ্র পালকী উঠাও"—পরে গ্রামের লোকদের দিকে যেন অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—"আর দেখুন, ওসব আমার দ্বারা হবে টবে না, পারেন ত নিজেরা করুন গে। এবার থেকে আমি কলকেতাতেই থাকব, দেশের জন্যে আমার কিসের মাথাব্যথা বলুন?"

পালকী হাঁকাইয়া হরকুমার বাবু চলিয়া গেলেন, গ্রামের লোক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। হায় রে, কপাল!

(৫)

তারপর,—তারপর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিবার নয়। আহা হা, এক বিন্দু বিশুদ্ধ জলের জন্য গ্রামের লোক ছটফট করিয়াছিল. সকলে চেষ্টা করিয়া যে "দশের পুকুর" সংস্কার করিবে, এমন অবসর আর রহিল না। ওলাউঠার প্রকোপ বাড়ীতে বাড়ীতে দেখা দিল, আজ এ ঘরে, কাল সে ঘরে, কে কার মুখে জল দেয়। কে কাকে দেখে, কে কার খোঁজ রাখে। প্রথমে ২।১টা শব-সৎকার হইয়াছিল, তাহার পর শব-সৎকারের লোক পাওয়া যায় নাই। সে ভীষণ ব্যাপার মনে করিলে এখনও দেহ শিহরিয়া উঠে। বাড়ীতে বাড়ীতে শব পচিতে লাগিল। শৃগাল কুকুরের রাজত্ব হইয়া পড়িল। অন্য গ্রামের লোকও ভয়ে আর গ্রামের ভিতর দিয়া যাওয়া বন্ধ করিল। সংবাদ পত্রে বাহির হইল:—

ভীষণ ব্যাপার।

"গত ১০ দিন যাবৎ * * * জেলার অন্তর্গত মনোহরপুরে ভীষণ বিসূচিকার প্রকোপ হইয়াছে; গ্রামের লোক প্রায় সকলেই আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। জলাভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অচিরে ইহার কোন উপায় না হইলে গ্রাম জনশূন্য হইবে। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দয়

মহাশয় ছিলেন কানপুরে; যথাসময়ে তাঁহার নিকটও এই সংবাদ পৌঁছিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, জন্মভূমির দুর্দ্দশাসংবাদ পড়িয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ তিনি গ্রামের প্রধান শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দাস মহাশয়ের নামে ৫০০৲ টাকার এক টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার পাঠাইলেন, কিন্তু প্রেরকের স্থলে তাহার নিজ নাম না দিয়া তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর নাম দিলেন, ভয়—পাছে তাঁহার নিজের নাম দেখিলে টাকা গ্রহণ না করেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি চিঠিও দিয়া জানাইলেন যে, সংবাদপত্রে আপনাদের গ্রামের জলাভাব অবগত হইয়া এই টাকা পাঠাইলাম; যদি কোন পুরাতন পুষ্করিণী থাকে, তাহা হইলে এই টাকার দ্বারা তাহার সংস্কার করাইবেন। লেখকের নাম রহিল—সেই বিশ্বস্ত বন্ধু হীরু। দত্ত মহাশয় মণি-অর্ডারের রসীদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু দিন গত হইতে লাগিল, রসীদ আর ফিরিল না। অনেক দিনের পর মণিঅর্ডারের ফরম, টাকা ও চিঠি সমস্তই একসঙ্গে ফিরিয়া আসার সংবাদ যখন বন্ধুটী দত্ত মহাশয়কে দিলেন, তখন দত্ত মহাশয়ের বুক ছ্যাৎ করিয়া উঠিল; গ্রহীতা মৃত বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় মনিঅর্ডারে ও চিঠির উপরে লিখিয়া দিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের উদ্বেগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, বরাতে যাহাই থাকুক, তিনি একবার গ্রামে গিয়া লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া হউক, কিম্বা যেমন করিয়াই হউক, লোকের মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করিবেন। সেই দিনই মেলে তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাত্রি তিনটার সময় গন্তব্য ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। এখান হইতে দত্ত মহাশয়ের জন্ম-ভূমি দুই ক্রোশ রাস্তা। পূর্ব্বে ষ্টেশনে গোশকট পাওয়া যাইত, মনোহরপুরে যাইবার কথা শুনিয়া কেহ যাইতে স্বীকার করিল না। দত্ত মহাশয় ভাবিতে ভাবিতে পদব্রজেই চলিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতে এখনও কিয়দ্দূর আছে, দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি পুলিশের লোক দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একজন দত্ত মহাশয়ের গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি "মনোহরপুর" বলিবামাত্রই তাহারা বলিল, ও গ্রামে আর লোক নাই, বাহিরের লোককেও ঐ গ্রামে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। শুনিয়া দত্ত মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঠিক এই সময়ে প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলে ললিত-বিভাস রাগিণীতে মাঠের উপর দিয়া এক গান ভাসিয়া আসিতেছিল :—

কেবল আশার আশা, ভবে আসা,
আসা মাত্র সার হ'ল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রইল।
মা, নিম খাওয়ালি চিনি বলে, কথায় করে ছল,
(ওমা) মিঠের লোভে তেত মুখে,
সারা দিনটা গেল।
মা খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে, নাবালি ভূতলে,
এবার যে খেলা খেলিলি মাগো আশা না পূরিল
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হল
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম।

পরিণাম।

অসার সংসারে এসে মজিয়া বিষয় রসে,
বৃথায় কাটিয়া গেল দিন।
শৈশব কৈশোর আর যৌবন স্ফটিকাকার,
দেখিতে দেখিতে বিমলিন!

(২)

প্রৌঢ়তা ত যায় যায় বার্দ্ধক্য আগত প্রায়,
স্ফূর্ত্তিহীন, ক্ষীণ দেহ মন!
গলিত দশন পাঁতি, পলিত চিকুর ভাতি,
ললিত স্খলিত সুগঠন!

(৩)

তাবত মস্তিষ্ক যুড়ে মৃত্যুর নিশান উড়ে,
শুক্ল কেশ কার্পাসের প্রায়!
ঘোষণা করিছে তায় "শমন আগত প্রায়
সাবধান দিন বহে যায়!"

(৪)

ভুলিয়া আশার মোহে, সে দিকে কেহ না চাহে,
কে শুনে সে স্বভাবের বাণী?
কামনার কণ্ডুয়ণে ছুটি অতীতের পানে,
ভবিষ্যতে ভিলেক না গণি!

(৫)

ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আশা শূন্য কদাকার,
তারে লয়ে কিবা সুখ আছে?
অতীত সুখের স্মৃতি ত্রিদিবের প্রতিকৃতি,
ভাতে নয়নের কাছে কাছে!

(৬)

হায় রে জীবন মোর, হায় রে হৃদয়, তোর
এখনও গেল না সুখ আশা?
অতীতের মোহময়ী মরীচিকা যায় বহি
তাহা দেখি বাড়িতেছে তৃষা?

(৭)

যে দিন চলিয়া গেছে তা'র কি তুলনা আছে?
পুনর্ব্বার পাইবে কি তাহা?
পাইবে কি সে রতনে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে,
অবহেলে হারায়েছ যাহা?

(৮

আর কি তোষিতে তোরে স্বর্গীয় সুষমা ধরে'
প্রকৃতি দেখাবে নানা নাট?
আর কি নয়নে তোর আছে সে অঞ্জন ঘোর,
হেরিবে রঞ্জিত মাট মাট?

(৯)

সে আলোক নিবিয়াছে, তিমিরে ভরিয়া গেছে,
সে সজ্জিত ভব রঙ্গালয়!
নিকট কঠোর কাল পাতিয়া কঙ্কাল জাল
বসে আছে, দেখে লাগে ভয়!

(১০)

অতীত সুখের স্মৃতি মনোরম প্রতিকৃতি
দেখাইয়া ভুলাইছে সবে!
শৈশব কৈশোর আর যৌবন অমৃতাগার,
মনে করি ভাসি সুখার্ণবে!

(১১)

সে হেন সুখের দিনে সংসারের কুঞ্জবনে
মুগ্ধ হয়ে খেলিতাম কত,
রজনী প্রভাত হলে স্বর্গীয় সুষমা ঢেলে
দিবাকর হইত উদিত!

(১২)

সুবর্ণ কিরণে তায় হাসিত ইহ সংসার,
ভাসিত হৃদয় সুধা-স্রোতে,
উৎসাহে পূরিত বুক, হরষে উৎফুল্ল মুখ,
অন্তরে বাহিরে চারি ভিতে—

(১৩)

উথলিত সুখ রাশি ! প্রকৃতি মোহন বাঁশী
বাজাইত ছড়ায়ে মাধুরী,
সে সঙ্গীত সুধা পানে প্রমত্ত হইয়া প্রাণে
বেড়া'তাম ছুটাছুটি করি !

(১৪)

এবে ভাবি ধুলা যাহা, সুবর্ণ বলিয়া তাহা,
মাখিতাম সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া !
এবে এ রাজ শয়নে নিদ্রা না আসে নয়নে,
তৃণাসনে শয়ন করিয়া,—

(১৫)

দুর্ভাবনা-শূন্য মনে, নিদ্রা-সুখ আস্বাদনে
সুখে নিশা প্রভাত হইত !
বিহঙ্গ কাকলী তানে জাগাইত সযতনে,
দিকচয় আনন্দে ভাসিত !

(১৬)

সে দিন হয়েছে গত, দুঃখ শোক প্রতিহত
জরাজীর্ণ কঙ্কাল ক'খানা,
সংসার শ্মশান পরে এক পার্শ্বে আছে প'ড়ে,
কেহ তাহা দেখেও দেখে না !

(১৭)

হায়রে অবোধ, তোর এখনো মোহের ঘোর
ঘুচিল না, হইল না জ্ঞান ?
দিবস অতীত প্রায় রবি অস্তাচলে যায়,
কাল রাত্রি হ'ল আগুয়ান,—

(১৮)

তিমিরে ভরিল বিশ্ব, বিকট কঠোর দৃশ্য !—
ঘন জালে ছাইল অম্বর !
হতেছে অশনি মন্দ্র গর্জ্জিয়া জীমূত বৃন্দ
ঢালিতেছে বৃষ্টি ঘোরতর,—

(১৯)

বায়ু বহে ঘোরতর, কাঁপে ক্ষিতি থর থর !
প্রলয় পয়োধি উথলিছে !
চারিদিক অন্ধকার, জল স্থল একাকার !
সমুদয় অতলে ডুবিছে !

(২০)

যায় বিশ্ব রসাতলে, এ হেন শঙ্কট কালে
কে কাহারে করে নিরীক্ষণ ?
দারা পুত্র সহোদর, সকলে হয়েছে পর,
কা'র তরে কে ভাবে এখন ?

(২১)

আমার অস্তিত্বাভাবে "তাহাদের কি হইবে,"
এই ভাবি সকলে কাঁদিবে !
এ হেন দারুণ দিনে, পরাৎপর হরি বিনে,
কেহ নাই তরাইতে জীবে !

(২২)

অতএব শুন মন, কেন সদা অকারণ
"আমার আমার করি মর ?"
অসার সুখের লাগি অশেষ দুঃখের ভাগী
কেন এত, বুঝে কার্য্য কর !

(২৩)

সেই হরি নারায়ণে সেই সত্য সনাতনে
কর শীঘ্র আত্মসমর্পণ
তিনি ভিন্ন সে সঙ্কটে কেহ না যাবে নিকটে,
অগতির গতি সেই জন !

(২৪)

হে হরি করুণাময় ! তুমি মাত্র সে সময়
একমাত্র আশ্রয় নিদান !
সংসারের মোহ পাশে ছেদন করিয়া, দাসে
কর নাথ অভয় প্রদান !

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তন্ত্রের সাধনা।

বেগবতী স্রোতস্বতী যেমন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া এক হইয়া যায়; মিলনের পর যেমন তাহার কোন চিহ্ন থাকে না; সাধ্য বস্তুকে লাভ করিবার জন্য আমাদের তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পন্থা অবলম্বন করিতে হইলেও উদ্দেশ্য কিন্তু সকলের এক; সেই এক সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া এক হইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। পন্থা স্বতন্ত্র হইলেও উদ্দেশ্য এক, কার্য্য এক, পরিণতি এক ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

বেদ বলেন—তুমি কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপস্যা করিয়া বিশেষ ভাবে ত্যাগ স্বীকারে আত্ম-বলিদান দিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভাব উপলব্ধি কর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহাকে ভাল করিয়া জ্ঞাত হও, তাহা হইলেই তুমি ইহার অধীশ্বর বিশ্বেশ্বরকে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবে। তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে হইলে তার কৃত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সম্যকভাবে জানিতে হইবে—নতুবা বিশ্বেশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

তন্ত্র কিন্তু তাহা বলেন না। তন্ত্র বলেন—এত বড় একটা বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বিশেষভাবে জানা, তাহার জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়া কি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল কলির জীবের পক্ষে সম্ভব? সাধক! তোমাকে অতবড় একটা বিরাট ভাবে বিভোর হইয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে না, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, অত কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই, তুমি তোমার নিজের এই দেহ ভাণ্ডটীকে ভাল করিয়া দেখ, বুঝ এবং জান, তাহা হইলেই তোমার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা হইবে—কারণ যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে এই দেহভাণ্ডে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই তোমার দেহভাণ্ডে অবস্থিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনু-রূপ করিয়াই তোমার এই দেহভাণ্ড গঠিত, ইহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই তোমার সমস্ত জানা, সমস্ত বুঝা হইবে—ঘরে বসিয়া তুমি বিশ্বের সকল সংবাদ দিতে পারিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বেদের পন্থা অনুসরণ করিয়া সাধনা করি-বার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বে মানুষ বহুসহস্র বৎসর জীবিত থাকিত, দীর্ঘদেহ ধারণ করিত, কলিরজীবের মত তাহাদের আয়ু এত অল্প ছিলনা; বলও এত কম ছিল না, দেহও এত খর্ব্ব ছিল না; সামান্য পরিশ্রমে, অল্পাহারে বা অনাহারে তখন কষ্ট বোধ হইত না; তাই তখন আমাদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য যোগ-সাধনা করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বেদের উপদেশানুসারে বিশ্বভাব হৃদয়ে পোষণ করতঃ ক্রমশঃ বিশ্বেশ্বরের সমীপস্থ হইতে হইত, সম্যক প্রকারে তাঁহাকে জানিয়া তাহারই ভাব-সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মময় হইতে হইত। কিন্তু কলির জীবের এত পরমায়ুই কোথা যে এতদিন ধরিয়া যোগসাধনা করিবে, আর তাহাদের দেহই বা এত সুদৃঢ় কই যে এত কষ্ট-সাধ্য সাধনার পরিশ্রম সহ্য করিবে। এরূপ অবস্থায় এই বিরাট বিশ্বের ভাব পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপরে ইহার কারণ স্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে জ্ঞাত হওয়া কত দূর সহজ সাধ্য

তাহা সহজেই বিবেচ্য। সংসারের সামান্য একটী স্থূল বিষয়ের সমাধান করিতে যাহাদের চিন্তা শক্তি কুলায় না, মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া যায়; আহার করিতে একটু অধিক বিলম্ব হইলে যাহারা জগৎ-সংসার অন্ধকার দেখে, এইরূপ ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র দেহ এবং অল্প পরমায়ু লইয়া কেমন করিয়া তাহারা কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনায় ভগবান লাভ করিবে? এই জন্য জীব-নিস্তারিনী ভগবতী ভগবান শঙ্করের নিকট কলির জীবের জন্য তন্ত্রের এই সুগম ও সহজ-সাধ্য পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বেশী কিছু করিতে হইবে না; তুমি কে এবং কোথায় আছ; যাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছ, সেটা কি; এই টুকু ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই তোমার সব জানা হইবে; এ জগতে অজানা বলিয়া আর তোমার কিছু থাকিবে না। এই যে জানিবার একটা শক্তি তাহা আমাদের মধ্যেই আছে, নিদ্রিত নির্জীব অবস্থায় আছে, আমাদের কার্য্য দোষে সে কেবল চৈতন্যহীন হইয়াছে—তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রাণায়ামাদির দ্বারা এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হইত, এক্ষণের তন্ত্রের ক্রিয়া দ্বারা ইহাকে জাগরিত করিতে হইবে। ঐ শক্তি কুণ্ডলিনী নামে অভিহিতা, আমাদের মূলাধারপদ্মে কুণ্ডলী-কৃত হইয়া লিঙ্গমূলে তিনি নিদ্রিতা, তাঁহাকে জাগরিত করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই সাধকের সিদ্ধি সুনিশ্চয়—সাধারণ করতলগত। পূর্ব্বে বৈদিকযুগে বেদের উপদেশানুসারে ভোগের নিবৃত্তি করিয়া ত্যাগী সংযমী হইয়া প্রাণায়াম যোগে এ শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল কিন্তু কলির জীবের পক্ষে উহা অসম্ভব; কারণ সকলেই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তি এখনকার জীবের অতিশয় বলবতী, এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের অধীনতায় থাকিয়া প্রবৃত্তি মার্গের সাধক ক্রমশঃ ঐ শক্তির উদ্বোধন করিবে। শক্তি জাগ্রত হইলে নিবৃত্তি আপনি আসিবে।

আমাদের দেহে সাতটী পদ্ম আছে। মেরু দণ্ডের দুই পার্শ্বে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী লিঙ্গ-মূল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে। মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী, ইহাও মস্তিষ্ক অর্থাৎ সহস্রার অবধি উত্থিত হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ীতে এই সাতটী পদ্ম গ্রথিত। গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের চারি অঙ্গুলি অধোভাগে চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে মূলাধার পদ্ম—ইহা হরিদ্রাবর্ণ, চতুর্দ্দল বিশিষ্ট; এই চতুর্দ্দলে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বং শং ষং সং এই চারি বর্ণ আছে; এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে এক চারি কোণ চক্র, মধ্যভাগে পৃথ্বী বীজ এবং কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণ চক্র বিদ্যমান, এই পদ্মমধ্যে লিঙ্গাকৃতি শিব আছেন, তাহার অমৃত নির্গমন স্থানে মুখ সংলগ্ন করিয়া সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। দ্বিতীয় পদ্ম স্বাধিষ্ঠান—উহা শ্বেতবর্ণ ষড়দলবিশিষ্ট, ছয় দলে বং ভং মং যং রং লং এই ছয় বর্ণ, মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বরুণ মণ্ডল, তন্মধ্যে অর্দ্ধ-চন্দ্র তাহাতে বং বীজ এবং বরুণ দেবতা ও বারুণী শক্তি বিদ্যমান। নাভিমূলে তৃতীয় পদ্ম মণিপুর, উহা রক্তবর্ণ দশদল বিশিষ্ট, ঐ দশদলে

ডং ঢং নং তং থং দং ধং ণং পং ফং এই দশ-বর্ণ; মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল; তাহার মধ্যে রং বীজ অর্থাৎ অগ্নিদেব ও লাকিনী শক্তি বিরাজমানা। ৪র্থ অনাহত পদ্ম হৃদয়ে, ইহা ধুম্রবর্ণ,দ্বাদশ দল বিশিষ্ট, ঐ দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ বর্ণ, মধ্যে ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল, তাহাতে যং বীজ অর্থাৎ বায়ুদেব ও কাকিনী শক্তি বাস করিতেছেন।

নীলবর্ণ বিশুদ্ধ নামক পঞ্চম পদ্ম কণ্ঠদেশে অবস্থিত অং হইতে অঃ এই ষোড়শ বর্ণবিশিষ্ট। ইহা হং বরুণ বীজ ও শাকিনী শক্তির ক্ষেত্র। ৬ষ্ঠ ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র ঈষৎ পীতবর্ণ, হং ক্ষং দ্বিদলবিশিষ্ট, মধ্যস্থলে হাকিনী শক্তি, তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ওঁ বীজ পরমাত্মা, তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু, তাহার উপর অধোমুখ পঞ্চাশৎ বর্ণময় পরম শিব অবস্থিত। পরমতত্ত্বে তত্ত্ববান হইয়া লিঙ্গমূলস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতঃ প্রত্যেক স্তরে স্তরে উপাপিত করিয়া সহস্রারে নীত করিতে পারিলেই জীব শিব হইতে পারে।

ঈড়া ও পিঙ্গলা শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ঈড়া চন্দ্রাংশে এবং পিঙ্গলা সূর্য্যাংশে শুক্রশোণিত উদ্ভবা,ঈড়া ও পিঙ্গলা ব্রহ্মস্বরূপিনী সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ আত্মার সত্তার অবলম্বনে শোণিত শুক্রের অবস্থান হয়। চন্দ্রসূর্য্য যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করেন। ঈড়া পিঙ্গলাও তদ্রূপ; বহির্জগতে সূর্য্যপ্রভাবে দিবায় জগৎ উত্তপ্ত হয়, নিশায় চন্দ্রপ্রভাবে শীতলীকৃত হয়। তদ্রূপ শরীরস্থা পিঙ্গলা প্রভাবে শোণিত উদ্ভূত হইয়া শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে, ঈড়া প্রভাবে বায়ুর সাহায্যে শীতল হয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ষটচক্র ভেদ করিয়া সাধনা করিতে শিক্ষা করিলে সহজেই দেহ ভাণ্ডের সমস্ত বিষয় এরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, যে ভাব সকলেই সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, যে ভাব লইয়া আমাদের জন্ম, বাল্যকালে যে জননীর চরণতলে আমা-দের নিরাশ্রয় দেহভার ন্যস্ত হইয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, যে প্রাণারাম মধুর বুলি আমাদের অস্থি-মজ্জাগত,—তন্ত্র আমাদিগকে সেইভাবে ভবভাবিনীর দ্বারে পৌঁছিবার উপদেশ দেন। কাজেই এরূপ সহজসাধ্য সাধনা আর নাই। আমরা বারান্তরে এই সহজসাধ্য সাধনার কিছু কিছু নির্দ্দেশ করিব।

সম্পাদক।

প্রাণোচ্ছাস।

(১)

এই ত জীবন!

এত তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী নগণ্য এমন!

সামান্য পবন ঘায়

ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়

তাসের রচিত গৃহ যতনে যেমন

এই দেখিবারে পাই

ফিরে দেখি—নাই—নাই

নিভায়ে দিয়াছে দীপ নির্দ্দয় শমন।

(২)

স'ধেনা পলক দেরী—নির্ম্মেঘ গগন

এমন উজল রবি
প্রকৃতির চারুছবি
চাঁদের মোহন হাসি — ভূধর কানন
কুসুমের রূপ রাশি
প্রিয়-জন-মুখ-শশী
আঁখি হ'তে নিভে' যাবে এমন ভুবন।

(৩)

এই তুচ্ছ প্রাণ লাগি এতনা যতন।
সংসার জলধি মাঝে
নিত্য নব নব সাজে
প্রতিকূল ঊর্ম্মি সনে করি ঘোর রণ,
দুঃখানলে দগ্ধ বুক
রোগে শোকে শুষ্ক মুখ
যাতনা লাঞ্ছনা কত কাতর রোদন।

(৪)

লোভে-মোহে মত্ত সদা লাগি এজীবন
অহঙ্কারে স্ফীত বক্ষ
সদসৎ নাহি লক্ষ্য
কামে ক্রোধে অন্ধ সদা তুচ্ছ ত্রিভুবন।
দয়া-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন
পাপে মতি অনুক্ষণ
বিলাস বাসন স্রোতে, আমিষে মগন।

(৫)

ভগবন! আর তুমি ক'রো না সৃজন
শুধু প্রহেলিকা প্রায়
ক্ষণ স্থায়ী নর-কায়
পাঠা'ওনা এধরায় করিয়া গঠন।
যদি কভু সৃজ প্রভু!
লীলাময় ওহে বিভু!
আমিষ তাহার সনে দিও না কখন।

শ্রীশিতি কণ্ঠ রায়।

পল্লী-প্রতি।

(১)

আমি আজ কার সাথেতে, কোন্ দেশেতে এসে।
ঘুরে মরি একা শুধু এমন মলিন বেশে॥
ওগো, কত কাল পল্লী-মাঝে,
ভুলে আছি বিভোর হয়ে,
হঠাৎ তাঁরে মনে পড়ে আচ্‌কে উঠে প্রাণ,
(আজ) খুলে দিয়ে বাঁধন মোর কর পরিত্রাণ!

(২)

(ওগো) সমাজ-শাসনের ঘোর বাঁধনে
শুধু বাঁধা রবনা ক্ষুণ্ণ প্রাণে
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল জ্বালা,
মুছিয়ে ফেলি মনের মলা,
মিটিয়ে' দিয়ে আমার পালা প্রবাস-হাটেতে,
বসে রব একলা শুধু আমার পল্লী-পাটেতে॥

(৩)

দুটী চরণ করে ধারণ পূজব যতনে।
আনন্দে তুষিব তাঁরে বন ফুল এনে॥
মুছিয়ে তার রাঙ্গা চরণ,
পরায়ে দিব চারু বসন,
উঠবে বেজে মোহন হাসি তরুণ তপনে।
(আমি) সারা জনম পূজব তাঁরে অতি যতনে!

(৪)

সে ভুবন-ভরা মনোহরা মূর্ত্তি দরশনে,
আমার মোহাগ্নি নিবে যাবে এ পাপ জীবনে॥
আপন জনে ভুলে যাব,
পরকে আপন করে নিব,
নিখিল বিশ্ব আমার হয়ে যাবে একদিনে
(আমি) সারা জনম পূজব তাঁরে অতি যতনে!

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

পরপারে।

তুমিই আমার নিরাশ জীবনে
আশার আলোক-রেখা ;
তুমিই আমার আঁধার হৃদয়ে
চিরদীপ্ত দীপ-শিখা।
তব চিন্তা—দেয় ঢালি প্রাণে মোর
অসীম আনন্দ-ধারা ;
ভুলি সব—ডুবে যাই তব মাঝে
হই আমি আত্মহারা।
যদিও তোমায়—হে চির বাঞ্ছিত !
নাহি পাই কভু হেথা,
কিন্তু 'পরপারে' মিলিব দু'জনে
পাইব তোমায় সেথা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

গ্রহের ফের।

(কোন একটী সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে)

(১)

জিতেন সবে মাত্র ছাত্র জীবনটা শেষ করিয়াছে, এমন সময় তাহার মাতৃদেবীর স্বর্গলাভ ঘটিল। সে কি করিবে না করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার পিতা যদিও বর্ত্তমান আছেন কিন্তু তিনি সংসারের কোন ধার ধারেন না। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সস্ত্রীক তিনি এখন পশ্চিমে বাস করেন, একরূপ নিরুদ্দেশ বলিলেও বলা চলে, কারণ তাঁহার ঠিকানা সে জানিত না বা তিনিও তাহাদের তত্ত্ব তল্লাস কিছু লইতেন না ; কাজেই সে উপায় থাকিতেও নিরুপায়ের ন্যায় চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিল। দিন যায় থাকে না, তাহারও সেইরূপে দিন যাইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে কালাশৌচ গত হইল, কোনও গতিকে জিতেন তাহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করতঃ কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মনে করিল, যে এবার নিশ্চিন্ত মনে চাকুরীর সন্ধান করিব। কারণ চাকুরী নহিলে আর যে চলবে না। আমরা বাঙ্গালী, আমাদিগকে ভগবান যে শ্ব-বৃত্তি করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই আমরা যথা তথা চাকুরীর জন্য লালায়িত ; উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া হা হুতাশে গগন কম্পিত করিতেছি। হায় দীন তারণ প্রভো ! কবে বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক ঘুচিবে ? বাল্যকালে জিতেন মনে মনে চিন্তা করিত, যে পরের দাসত্ব করিব না ; ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। একদিন সে স্কুলে একটি ক্লাসের ছেলের হাতে একখানি সংবাদ পত্র দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিল,—"দেখি ভাই, কি কাগজ ওটা ?" "না ভাই, এ কাগজ কা'উকে দিব না।" জিতেন অনেক কাকুতি মিনতি করিল কিন্তু কিছুতেই সে কাগজটী দেখিতে দিল না, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, সে কতক গুলি খণ্ডিত সুপারী লইয়া বলিল,—"ভাই যদি কাগজটা একবার দেখিতে দাও, তাহা হইলে এই সুপারী গুলি তোমায় দিব।" সুপারী দেখিয়া বালকের রসনা আর্দ্র হইল ; সে বলিল,—"ভাই, যদি দাও তবে পাঁচ মিনিটের বেশী দিব না।" জিতেন তাহাতেই সম্মত

হইয়া কাগজ লইয়া ভাঁজ খুলিল; খুলিয়াই দেখিল বড় বড় অক্ষরে হেডিং লাইনে লেখা আছে;—

রামদেবপুর কলে অদ্ভুত কাণ্ড !
কেরাণীর পীলে ফেটে হল লণ্ড ভণ্ড !!

ব্যাপারটী এইরূপ,—

"বিগত ১০ই নবেম্বর মাসে রামদেবপুর কলে, রাম জীবন রায় নামক একটী কেরাণী বাবু বেলা ২টা সময় অফিসের কার্য্য করিতে ২ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় কলের ম্যানেজার মিষ্টার ডিগবী তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া ডাকিতে থাকেন. তাহাতে হতভাগ্যের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই; তখন ম্যানেজার মহোদয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার পৃষ্ঠে সবুট পদাঘাত করেন, তাহাতে হতভাগা তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া যায় ও রক্ত বমন করিতে থাকে; তদবস্থা দেখিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অদ্য দুই দিন হইল—তাহার মৃত্যু হইয়াছে, প্রকাশ প্লীহা ফাটিয়া যাওয়াতে তাহার এই মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। মিষ্টার ডিগবী ২০০৲ টাকার জামিনে খালাস আছে।"

কি ভয়ানক কাণ্ড! সামান্য ত্রুটিতে শমন ভবনের অতিথি!

চাকুরিতে দশ সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কাগজখানি সে তাহাকে ফেরৎ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল জীবনে কাহারও দাসত্ব করিব না।

মানুষ ভাবে এক, ভগবান কিন্তু তাহার বিপরীত করেন। আবার এদিকে শাস্ত্রাদেশ কিন্তু তাহা নয়; ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন জীবের মঙ্গলের জন্যই; আমরা বুঝি না, তাঁহার লীলা চাতুর্য্য কিরূপ। কাহারও হয়ত অগাধ ঐশ্বর্য্য কিন্তু উত্তরাধিকারী নাই। তিনি সর্ব্বদাই হা হুতাশ করিতেছেন যে যদি একটি মাত্র সন্তান হইত, তাহা হইলে সংসার কিরূপ সুখের হইত! সারাজীবন আকাঙ্ক্ষা করিয়া হয়ত বা বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তান হইল কিন্তু ৩।৪ বৎসর পর যদি সেই সন্তানটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে কিরূপে বুঝিব যে ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই এইরূপ করিয়াছেন। অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী কন্যা বিধবা হইল, কিরূপে বুঝিব কোথায় তাহার মঙ্গল নিহিত আছে। হায়! অজ্ঞানান্ধ জীব আমরা, কিরূপে বুঝিব তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা কোথায়? করুণাময় স্বামী! এ অজ্ঞানান্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞানালোকে চিত্ত উদ্ভাসিত কর!! একদিন জিতেন বলিয়াছিল চাকুরী করিব না. কিন্তু অগ্রেই অধীনতা তাহাকে বরণ করিল। তাহার পিতার সম্পত্তি যাহা ছিল, মাতার মৃত্যুর পর সে শুনিল—তিনি সমস্তই বিক্রয় করিয়াছেন, অথচ তাহাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেন নাই। তাহার মন বড়ই বিষাদ ভারাক্রান্ত হইল; সেই দিনই সে মনে মনে মাতৃ-ভূমির নিকট, স্বর্গগতা মাতার নিকট, আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। মন হতাশ-বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। এরূপ হওয়া খুব সম্ভব।

(২)

সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই; অন্ধকার তস্করের ন্যায় ধীরে ধীরে পা টিপিয়া অতি সন্তর্পণে বৃক্ষের ক্রোড়ে আত্মগোপন করিতেছে, বায়সকুল কা কা রবে উড়িয়া আপন নীড়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, ভাগীরথী আপন মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সোহাগে হেলিয়া দুলিয়া স্বামী মিলনাশায় চলিয়াছে। তীরের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকুল যেন শান্তি-পাহারার ন্যায় সতর্কভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার পথের বিঘ্ন দূর করিতেছে। এ হেন সময়ে একটি যুবা পথিক হতাশভাবে একটি বট-বৃক্ষ-মূলে ঠেস দিয়া বসিয়া বোধ হয় তাহার গত জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাস করিতেছিল। পথিকের হাব-ভাব দেখিলেই মনে হয়, সে কোন গভীর মর্ম্ম-পীড়ায় একান্ত কাতর হইয়া সেই নিত্য নিরঞ্জন শ্রীহরির পাদপদ্মে অভয় যাচ্ঞা করিতেছে। ক্রমশঃই সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল; পথিক ধীরে ধীরে বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া নদীর জলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া করযোড়ে বলিল :—

"মাতর্গঙ্গে! এ অধম সন্তান এই অল্প বয়সেই সংসার-তাপে জীর্ণশীর্ণ হইয়া তোর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে; দে মা এ অভাগাকে একটু স্থান দে।" বলিয়া যুবক ক্রমশঃ গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিল; এমন সময়ে কে যেন বলিল,— "অপরিণামদর্শী যুবক! ভয় নাই; তীরে উঠিয়া এস, তোমার আশ্রয়দাতা পশ্চাতেই আছেন,— অন্বেষণ কর।

আহা হা! কে গো! আতপ-তাপ-তপ্ত শুষ্ক বৃক্ষে জল সেচন করিলে কে? হায়! আর সে স্বর শুনিতে পাওয়া গেল না; সমস্তই নিস্তব্ধ হইয়াছে; মাত্র সেই স্বরের ধ্বনি যুবার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আর গভীর জলে যাওয়া হইল না, নব আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যুবক তীরে ফিরিয়া আসিল। কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া যুবক সেই অশরীরী বাণীর উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটী লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসায় জানা গেল, এই জনপদটীর নাম চাতরা, আরও একটু অগ্রসর হইলে সেই প্রাচীন দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে যাওয়া যায়। শ্রী-রা-ম-পু-র—নামটী শুনিয়াই প্রাণে যেন অকূল আনন্দের উদয় হইল। সাহ্লাদে যুবক অগ্রসর হইতে লাগিল, মনে হইল যেন এই শ্রীরামপুরেই তাহার আশ্রয় মিলিবে। পরক্ষণেই আবার নিরাশায় প্রাণটা ভরিয়া উঠিল, কারণ কিরূপে সে লোকের নিকট আশ্রয় চাহিবে। এই চিন্তাতেই যুবকের তখন মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইতে লাগিল। কাজ কর্ম্ম সে কিছুই জানে না, পুস্তক ছাড়িয়া সবেমাত্র সে এই বাটীর বাহিরে আসিয়াছে; তা ছাড়া কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে নিজের ব্যয়েই তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। যুবক বিত্তশূন্য, অসহায়; এক্ষণে তাহার কি করা কর্ত্তব্য? হায়! কে বলিয়া দিবে, তাহার কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য। উপবাসে শরীর ক্লিষ্ট, আর বুঝি পা চলে না;

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুবক সম্মুখে একটী ঘড়ির দোকানের রোয়াকে বসিয়া পড়িল।

"ওহে বাপু? কোথায় যাবে? কোথায় বাড়ী?"

ঘড়িওয়ালা তখন দোকানের কপাট বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে ঐ যুবকটীকে তথায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিল। পাঠক মহাশয় বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐ যুবকটী কে?

যুবক বলিল—"আজ্ঞে, আমার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। আমি একান্ত নিরুপায়।"

ঘড়িওয়ালা। তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার নাম কি?

যুবক। আমার নাম শ্রীজিতেন্দ্র কুমার রায়। বাড়ী রামচন্দ্রপুর। মহাশয় যদি আমাকে একটা চাকুরীর সন্ধান বলিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই, নতুবা আর আমার উপায় নাই।

ঘড়িওয়ালা। তুমি কি চাকরী করবে বাপু? এদেশে ত অফিস নাই যে, তোমায় চাকুরীর সন্ধান দিব। তবে এক কাজ করতে পার, এখানে ২।৩টা ছাপাখানা আছে, যদি তাহাতে কোন রকমে চেষ্টা করে ঢুকতে পার, তা'হলে হতে পারে।

যুবক। মহাশয় যদি বললেন, তবে একটু দয়া করে বলে দিলে ভাল হয়, নতুবা আমায় ত কেউ চিনে না।" লোকটা বড়ই দয়ালু, খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা বাপু, তুমি এক কাজ কর এই সামনেই একটী ছাপাখানা আছে, ঐ স্থানে যাইয়া তিনকড়ি বাবুকে ডাকিয়া আন।

যুবক জিতেন এই অভাবনীয় অনুগ্রহে নিতান্তই আহ্লাদিত হইয়া সেই প্রেসে যাইয়া তিনকড়ি বাবুকে ডাকিয়া আনিল, কিন্তু তাহাদের লোকের আবশ্যক না থাকায় অগত্যা তাহাকে সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। তখন ঘড়িওয়ালা অধরবাবু জিতেনকে বলিল—"দেখ বাপু, তুমি এক কাজ কর; এই সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাও, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর গাঙ্গুলী প্রেস আছে। তাঁহাদের নিকট আমার নাম করিয়া বলিও; আমার খুব বিশ্বাস সেই স্থানে কর্ম্ম পাইবে, আর যদিই একান্ত না পাও, আমার নিকট আসিও, যাহাতে তোমার ভাল হয় করিয়া দিব।" সেই হিতৈষী বন্ধুকে জিতেন অসংখ্য ধন্যবাদান্তে গাঙ্গুলী প্রেসানুসন্ধানে চলিয়া গেল।

(৩)

"ম'শায় ভিতরে কে আছেন?"

"কে গা, কি চাই?" ভিতর হইতে একটী পক্ককেশযুক্ত বৃদ্ধ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"আপনাদের বাবু কোথায়? তাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।"

পরক্ষণেই একজন প্রশস্ত বক্ষ, সহাস্যানন, তেজস্বী ব্রাহ্মণ যুবক আসিয়া বলিলেন—"কি চাই, কোথা হতে আসছ?" জিতেন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"মহাশয়, আমি আপনারই কৃপাপ্রার্থী; নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া আপনার নিকট আসিতেছি যদি দয়া করিয়া এ অধমকে চরণে স্থান দেন,

তবেই এ যাত্রা রক্ষা পাই ; নচেৎ আমার আর অন্য উপায় দেখিতেছি না।" সদাশয় ব্রাহ্মণ যুবক জীতেনের কাতরতাপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন।

৺ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাহেশ গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু, ধনবান্, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত আমাদের আখ্যায়িকায় বর্ণিত এই গাঙ্গুলী প্রেস। তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া অদ্য ১০।১১ বৎসর হইল বৈদ্যনাথ ধামে সজ্ঞানে শ্রীশ্রী৺হরপার্ব্বতীর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্গাচরণ ও কনিষ্ঠের নাম ধীরেন্দ্র নাথ। দুই ভাইয়ে এই প্রেসটী চালাইতেছেন। যুবক জীতেনকে তাঁহারা সাদরে আশ্রয় দান করিয়া, তাঁহাদের মহৎ অন্তঃকরণেরই পরিচয় দিলেন। জিতেন প্রেসের অন্য কিছু কাজ জানিত না, কিন্তু তাঁহারা তাহার মার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তি এবং অক্লান্ত কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া তাহাকে প্রেসের অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত করিলেন। বলা বাহুল্য জীতেন অধরবাবুকে তাহার আশ্রয় প্রাপ্তির কথা তদ্দণ্ডেই বলিয়া আসিয়াছিল।

* * * *

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আজ জীতেন দুর্গাচরণ বাবুর পরিবারবর্গের মধ্যে যেন এক জন হইয়া গিয়াছে, বাটীস্থ সকলেরই স্নেহের ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া মনের আনন্দে কালযাপন করিতেছে। এক দিন দুর্গাচরণ বাবু জিতেনকে বলিলেন—"দেখ একটা নূতন ধরণের ব্যবসা করি এস, প্রেস ধীরেন চালাইবে, আর তোমায় আমায় মিলিয়া একটী পারফিউমারী কারখানা স্থাপন করিব। কেমন তুমি রাজি আছ ?"

জিতেনের বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায়ে ঝোঁক, সে ইহাতে আনন্দে গদগদচিত্ত হইয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, আমি ইহাতে খুব রাজি আছি ; আপনি কার্য্য আরম্ভ করুন।"

"আচ্ছা, তবে একটা ফর্দ্দ তৈয়ারী করিয়া কালই তুমি কলিকাতা হইতে মালপত্র আনাও, সমস্ত ঠিক হইলে পরে কার্য্য আরম্ভ করিব। কিন্তু বাপু, দেখো, শেষে যেন বল না যে, আমি পারব না।"

"আজ্ঞে না তা ব'লব না।"

পরদিন সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ২০০৲টাকার মালপত্র আনান হইল। মাস দুই যাবৎ মহা উৎসাহের সহিত পরীক্ষা হইতে লাগিল। "পরিশ্রমের ফল আছেই আছে," এই মহাবাক্য একদিন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল, তাঁহারা পরীক্ষার ফল স্বরূপ সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়া দ্রব্য সম্ভার প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে লাগিলেন। সমস্ত কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য দুর্গাচরণ বাবু জ্বর রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তিনি জিতেনের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার পড়িল ; একা অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

(৪)

কল্যাণীয় জিতেন,

আমি পশ্চিম হইতে ফিরিয়া অদ্য প্রায় ৪।৫ মাস হইল কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছি। এখানে আসিয়া তোমার অনেক অনুসন্ধান

করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন তত্ত্ব পাই নাই। অন্য একটী ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তায় তুমি শ্রীরামপুরে আছ জানিতে পারিলাম। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া ৩৬ নং বেলগাছিয়া রোড কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিবে। আমি এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছি। বাবা জিতু, মনে কিছু কষ্ট করিও না, আমি যে তোমায় বঞ্চিত করিয়া জায়গা জমি বিক্রয় করিয়াছিলাম, তাহা সাময়িক চিত্তবিভ্রমের ফল। যাই হ'ক, তুমি আসিলেই আবার জায়গা-জমি কিনিয়া ঘর বাড়ী করিয়া দিব। বাবা, আমার যা, কিছু আছে সে ত তোমারই; তুমি আমার একমাত্র সন্তান, আমার অন্য আর কে আছে বল? তোমার মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের কথা আমি জানিতাম না, তজ্জন্য সে সময় আসিতে পারি নাই বলিয়া আমি নিজেই দুঃখিত আছি। জিতু, বাপ আমার, আসিতে ভুলিও না. তোমার বিমাতার ও আমার একান্ত অনুরোধ জানিবে। আমার ভয়ানক কাজের ঝঞ্ঝাট, নতুবা নিজে যাইয়া তোমায় লইয়া আসিতাম. যাই হ'ক তজ্জন্য কিছু মনে করিও না। তোমার বৃদ্ধ পিতার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিও।

আশীর্ব্বাদক তোমার পিতা।

জিতেন একবার. দুইবার, তিনবার, বার বার পত্র খানি পাঠ করিল। পাঠান্তে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিতে লাগিল— "তাই-ত এযে বাবার চিঠি, হায়! ভগবান কি এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, পিতা আজ হঠাৎ আমায় খুঁজিলেন কেন, আর এত দিনই বা কোন সংবাদ রাখতেন না কেন? যাই হ'ক, আমি ত তাঁর সন্তান বটে। পিতা হয়ে কি কেহ পুত্রকে একেবারেই ভুল্‌তে পারেন! না—না—না তাহা কি কখন হইতে পারে? যাক ওসব কথা, এখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করাই মঙ্গল। অদ্যই যাইব, দেখি বাবুর নিকট ২।৪ দিনের ছুটী পাই কি না, এইরূপ চিন্তা করিয়া জিতেন দুর্গাচরণ বাবুর নিকট যাইল। তিনি সবে মাত্র ১ দিন পথ্য করিয়াছেন। শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল, এখনও বাটীর বাহির হন নাই।

"বাবু! আমায় দিন দুইয়ের ছুটী দিন, আমি আজ বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। এই দেখুন, তিনি আজ আমায় পত্র দিয়াছেন।"

"তাইত জিতেন, আজই যাবে। দিন চার পরে যাইলে ভাল হয় না? এই ত আমি সবে মাত্র ২ দিন পথ্য করিয়াছি। শরীর বড়ই দুর্ব্বল, দিন চার যাইলে বাহিরে যাইতে পারিব, সেই সময় যাইলে ভাল হয় না?" "আজ্ঞে দেখুন—তিনি আজ আমায় হঠাৎ ডেকেছেন, তাঁর সহিত ৫.৬ বৎসর কোন সম্বন্ধ ছিল না, আমার মন ভয়ানক ব্যাকুল হইয়াছে, আজই আমাকে ছুটী দিন।" দুর্গাচরণ বাবু কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তবে যদি একান্তই যাইবে, তবে ২ দিনের বেশী দেরী করিও না, শীঘ্রই আসিও, আমি এই মাস হইতে তোমার একটা ভাল রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিব, যাহাতে তোমার সুখে সচ্ছন্দে চলিয়া যায়।"

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া জিতেন বিদায় লইয়া

তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিল।

* * * *

স্নেহের ডাক বড় ডাক; সে ডাকে যখন বারিধিও উথলায়, অভ্রভেদী গিরি-শিখরও যখন গলিয়া যায়, তখন আমাদের জিতেনের মন যে ব্যাকুলিত হইবে, তাহা কি বেশী কথা? সেইদিন রাত্রেই জিতেন তাহার পিতার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ করিল। পিতা পুত্রে বহুদিনের পর মিলন হইল; কেহ কাহাকেও ছাড়িল না, উভয়েই উভয়ের নিকট সুখ-দুঃখ বিমিশ্রিত কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিল। পরিশেষে জিতেনের পিতা তাহাকে কলিকাতায় থাকিয়া চাকুরী করিতে বলিলেন কিন্তু জিতেন বলিল,—"বাবা! উপস্থিত কিছু দিন শ্রীরামপুরেই থাকিব, নচেৎ ব্রাহ্মণের নিকট আমাকে ভয়ানক অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে, কয়েকমাস পরে আসিয়া এই স্থানেই থাকিব" বলিয়া জিতেন তাহার আশ্রয়-প্রাপ্তি হইতে সমস্ত ঘটনা তাহার পিতাকে বিস্তারিত বলিল, কিন্তু তাহার পিতা তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল,—"তা হ'ক, তুমি বাবুকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমার পিতা আমায় কলিকাতা থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন, অতএব আমি সেইস্থানে থাকিব।" জিতেন পিতৃ-স্নেহে অন্ধ হইয়া, তাহাই স্বীকার করিয়া শ্রীরামপুরাভিমুখে রওনা হইল।

(৫)

দুই দিন গত হইয়া গিয়াছে; জিতেন দুর্গাচরণ বাবুর নিকট বিদায় চাহিতেছে কিন্তু তিনি তাহাকে বুঝাইতে ক্রটী করিতেছেন না। অবশেষে জিতেন আর অন্য কিছু না বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই কর্ম্ম করিতে লাগিল। বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে; দুর্গাচরণ বাবু আফিসে বসিয়া তাঁহার মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব করিতেছেন, এমন সময়ে পোষ্ট পিয়ন একখানি বেয়ারিং পত্র তাঁহাকে দিল, তিনি পত্র খানি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, জিতেনের পিতা জিতেনকে পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে কড়া পত্র দিয়াছেন এবং অবিলম্বে তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। পত্র খানিতে তাঁহার আত্ম-মর্য্যাদার হানি হইল, কারণ তিনি ত জিতেনকে লইয়া আসেন নাই, জিতেনই বিপদের সময় তাঁহার বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল এবং তিনিও তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া মহৎ কার্য্যই করিয়াছিলেন; তবে তাঁহাকে আজ জিতেনের পিতা এরূপ অপমানসূচক পত্র দিলেন কেন? তিনি মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া জিতেনকে ডাকাইয়া পত্রখানি দেখাইলেন কিন্তু হিতে বিপরীত ফল হইল, অগ্নিতে ইন্ধন যোগান হইল, যদিও জিতেন তাহার পিতাকে বলিয়াছিল যে, সে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে কিন্তু শ্রীরামপুরে আসিয়া দুর্গাচরণ বাবুর উপদেশে এবং সঙ্গী কর্ম্মচারীদের সহিত বসবাসে একরূপ নিশ্চিন্ত মনে ছিল কিন্তু আর তাহা হইল না। সে বলিল,—"বাবু, আমায় ছাড়িয়া দিন, আর আমার উন্নতিতে বাধা দিবেন না।"

জীতেনের কথা শুনিয়া দুর্গাচরণবাবুর মর্ম্মে আঘাত লাগিল, তিনি বলিলেন,—"ওহে বাপু,

তখন তোমার অসময় ছিল তাই আমার নিকট আসিয়াছিলে, কিন্তু এখন একবার মনে করে দেখ, তোমার অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এতটা কৃতঘ্নতা কোথা হইতে শিক্ষা করিলে. দেখ আমি তোমার হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি, এরূপ করিয়া যাইলে তোমার অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না।"

"কি ক'রব বলুন, বাবার আদেশ কি রূপে অমান্য করি।"

"কিন্তু জানিও জিতেন ? পিতার আদেশ অপেক্ষা কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। যে কর্ত্তব্যচ্যুত হয় সে মহাপাপী, জিতেন এতটা পাপ সহ্য ক'রতে পারবে ?"

"আজ্ঞে, পাপ আবার কি, আপনি আশ্রয় দাতা, আমার পূজনীয় গুরু বটেন ; কিন্তু পিতার কাছে নহেন, যখন তিনি ডাকিয়াছেন, তখন আমাকে যাইতেই হইবে, আমায় বিদায় দিন।"

এত বুঝাইয়াও যখন দুর্গাচরণ বাবু জিতেনকে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন সক্রোধে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,--"যাও জিতেন, অদ্যই আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও, আর তোমায় বুঝাইব না—যথেষ্ট হইয়াছে, তুমি মনে করিয়াছ—বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছ, কিন্তু তাহা নয়, যথেষ্ট বিপদ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে।'' জিতেন তাহাতেও নিরস্ত হইল না।

মানবের গতিই প্রায় ঐরূপ দেখা যায়—বিপদের সময় যতদূর সম্ভব সরল, নম্র, বিনয়ী কিন্তু বিপদটী কাটিয়া গেলেই তাহারা পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে আমাদের সমাজের ঘোরতর অবনতি হইতেছে। জিতেন সেই ঘটনার পর দুর্গাচরণ বাবুর বাটী হইতে চলিয়া আসিয়া ২।৩ মাস হইল পিতার নিকট আছে কিন্তু বিমাতার সহিত বনিবনাও হইতেছে না ; তাহার বিমাতা যখন দেখিল যে, জিতেন আর কোন কাজকর্ম্ম করিতে চায় না, তখন এরূপ যুবাকে বৃথা পালন না করিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিল। জিতেন যদিও নিতান্ত বসিয়া খায় না, সে তাহার পিতার আদেশে একটী সওদাগরী আফিসে শিক্ষানবিশী করিতেছে, তত্রাচ তাহার স্নেহময়ী বিমাতাটী তাহার পিতাকে বলিল,—"ওগো আর শুনেছ, জিতেনের আজ দুই মাস ১২৲ টাকা করিয়া মাহিনা হইয়াছে, তত্রাচ আমাদিগকে কিছু বলে না। তা ছাড়া ছেলের বউও হয়েছে শুনতে পাই, অতএব আর আমাদের ভাবনা কি, এবার বুড়ো বয়েসে বসে বসে বউ রান্না ভাত খাব কি বল ?"

"মাইনে হয়েছে কে বল্লে ?"

"সেইদিন নিজের কাণেই শুনেছি—বাবুতে আর তাহার বন্ধুতে বসে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, খুব ফুর্ত্তির কথা, আর তোমার বউএর কথা আর আর কত কথা হ'ল তা কি আর সব মনে থাকে ছাই।"

এইরূপে বিমাতা নানাপ্রকারে স্বামীর কাণ ভারি করিয়া দিল। সে যে জিতেনের প্রতি আশঙ্কা, তাহা ঘৃণাক্ষরে প্রকাশ হইল না। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যার কথায় কে না বশ হয়! বৃদ্ধ স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া

পুত্রের প্রতি বিরূপ হইল, একদিন পুত্রকে ডাকিয়া সে যথোচিত তিরস্কার করিল। তাহার জননী জীবিতা থাকিলে পিতার এ তিরস্কার বোধ হয়, জিতেনের অসহ্য হইত না অথবা পিতা তাহাকে বিনা অপরাধে এরূপ গালি দিতে পারিতেন না। আজ জিতেনের এ তিরস্কার বড়ই অসহ্য হইল, সে আর কাহাকে কিছু না বলিয়া বিমাতার দুরভিসন্ধির প্রতিকূলাচরণ করতঃ সেইদিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, বুঝিল—প্রাণ যায় যাক্, ধর্ম্ম ত বজায় থাকিবে।

(৬)

না বুঝিয়া কাজ করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। এইবার জিতেন বুঝিল—দুর্গাচরণের কথার অবাধ্য হইয়া সে কি কুকাজই করিয়াছে, অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রভুর যে মনোকষ্ট দিয়াছে, বুঝি সেই মহাপাপের জন্য এজগতে আর তাহার স্থান হইবে না, বুঝি এ জগতে আর কাহারও সহানুভূতি সে কখন লাভ করিতে পারিবে না, হায় মানব! তুমি বুঝ না এ জগতের রীতি, যে পিতা সামান্য ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষে প্রমত্ত হইয়া উপযুক্ত পুত্রকে ভুলিতে পারে, প্রথমা সহধর্ম্মিনীর মৃত্যুকালেও যে একবার ফিরিয়াও দেখে নাই, সেরূপ পিতাকে বিশ্বাস কি? তথাপি জিতেন ধর্ম্মভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, এত অত্যাচার অনাচারেও পিতার প্রতি ভক্তিহীন না হইয়া, পিতা ডাকিবামাত্রই তাহার ভবিষ্যতের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিল—তাহার কুকর্ম্মের ফল কতদূর গড়াইবে,কতদূর তার দুর্ব্বিষহ পরিণাম তাহাকে জগতের কোন অতল তলে টানিয়া ফেলিবে। উপরে ত একজন ভগবান আছেন, তিনিত সব দেখিতেছেন—দুর্গাচরণ আমার অসময়ে, আমার দারুণ দুঃখের সময়ে কি উপকার করিয়াছেন, কিরূপভাবে আমাকে নিজের ভ্রাতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন, অজস্র ধনসম্পত্তি আমার উপর ন্যস্ত করিয়া একদিনের জন্যও তিলমাত্র অবিশ্বাস করেন নাই; হায়! তাঁহার সেই সময়ে,—সেই দারুণ পীড়ার সময়ে তাঁহাকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া আসা কি আমার উচিত হইয়াছে? আসিবার কালে ব্রাহ্মণের সেই হতাশব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, তাঁহার সেই কাতর বচন "জিতেন, আমার এ অসময়ে ফেলিয়া যাইও না, দুই দিন থাক, আমি একটু আরাম হই" প্রভৃতি অনুনয়-বিনয় বাক্য কি আমার জীবনের পথে ঘোর প্রতিবন্ধক হইবে না? সে পাপ কি আমাকে ভুগিতে হইবে না, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দারুণ কষ্ট দিয়া, তাঁহার ব্যবসায় ক্ষতি করিয়া, পরম উপকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া যদি আমি জগতে সমান ভাবে বিচরণ করিতে পারি—তাহা হইলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হইল কই? ব্রাহ্মণের অভিশাপ আমার প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, পাপের প্রতিফল ভোগ হইল কই? যে মহাপাপ করিয়াছি—তাহার জন্য অবশ্যই আমাকে ভুগিতে হইবে। যাহা হউক, লোকালয়ে আর আমি এ মুখ দেখাইব না, আর কাহাকেও নিজের দুঃখ জানাইয়া প্রলুব্ধ করতঃ তাহার সর্ব্বনাশ করিব না।

যে গুরুতর পাপের ভার মাথায় চাপাইয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত জন্য লোকালয় ত্যাগ করিব, অনাহারে অনশনে জীবন যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি উৎকট তপস্যা করিয়া এ জীবন ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিব—দেখি জীবনে শান্তি পাই কিনা। ভগবান আমার প্রতি সদয় হন কি না?

জিতেন প্রবল অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সেই দিনই কোথায় চলিয়া গেল; বহু অনুসন্ধানেও আর তাহার দেখা পাওয়া গেল না। দুর্গাচরণ বাবু যুবকের পরিণাম বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া সে যে পাপ-সঞ্চয় করিয়াছে, তজ্জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সে সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; মুখ দেখাইতে না পারিয়া যাইবার সময় উদ্দেশে তাঁহার চরণে কত প্রণাম করিয়াছে, করযোড়ে কত ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়াছে। উদারহৃদয় দুর্গাচরণ বাবু যুবকের এই প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, অল্পবয়সে পাপে তাহার এত অনাসক্তি দেখিয়া মুগ্ধান্তকরণে পুনরায় তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন কিন্তু যুবকের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। প্রায় পনর বৎসর পরে শুনা গেল—জিতেন—পাপভারাক্রান্ত জিতেন, চোল পাহাড়ের এক নিভৃত নিবাসে কোন জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। প্রবল আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধমূল হইয়া বিমল বিশ্বাসে হৃদয় দৃঢ় করিতে পারিলে মানুষ যে দারুণ পাপে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, এই আখ্যায়িকাই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। গ্রহের ফেরে জিতেন যে পাপ অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিল, উৎকট তপস্যায় তাহার ফের ফিরাইয়া দিল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।

চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দু সমাজ-তত্ত্ব সংগ্রহ।

নিবেদন,—

যেমন দেহতত্ত্বের উপরে সুবিশাল চিকিৎসা-শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ সমাজ-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তদুপরি সকল দেশেরই রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সর্ব্বদা সংস্থিত। এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াই ইদানীং ইয়োরোপ প্রভৃতি সুসভ্য দেশে, সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের দিকে তত্তৎ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এদেশে এখন আমরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চর্চ্চাতে সমধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছি, অথচ রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান উপাদান যে সম-সাময়িক সামাজিক অভিজ্ঞান এবং পূর্ব্বতন সমাজইতিহাস, তদ্বিষয়ক কোন জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগ্রহের দিকে আদৌ আমাদের কিছুমাত্র যত্ন নাই। বিরাট হিন্দুজাতিকে আবার উহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উহার বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণ মূলক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী, উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী কার্য্য-সাধনাক্রম, উহার আকৃতি-প্রকৃতি রীতিনীতি-পদ্ধতি, ভাব

ও অবস্থা—অর্থাৎ এককথাতে, উহার সামাজিক অবস্থাঘটিত প্রাচীন ও আধুনিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগ্রহ কার্য্যে আমাদিগকে এ সময় অতি সাবধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহা বহুশ্রম ও বহু অর্থব্যয়সাধ্য একটি বিরাট কার্য্য সন্দেহ নাই। বহুস্থানের বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ও আন্তরিক সহায়তা ভিন্ন ইহার সংসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। একটী কেন্দ্রস্থান হইতে ইহার কার্য্য-স্রোত চারিদিকে সুপ্রণালীতে প্রবাহিত করিতে না পারিলে এ ব্যাপারে সংসিদ্ধি লাভেরও কোন প্রত্যাশা নাই। এইরূপ একটি কেন্দ্রকার্য্যালয়ের অভাব এতদিন সকলকেই অনুভব করিতে হইতেছিল। সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভারত-ধর্ম্ম-রাজধানী কাশীধামে "অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মহাসভা" সংস্থাপিত হওয়াতে তাহা কতকটা বিদূরিত হইয়াছে। পরন্তু, এই মহাসভার মন্ত্রী শ্রীমান্ রাজা শশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা রায় বাহাদুর স্বয়ং এইরূপ বিরাট একখানি গ্রন্থ সম্পাদনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ মহাসভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধীনে সম্প্রতি চারি জন সহকারী নিযুক্ত থাকিয়া সংগৃহীত তত্ত্ব সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যাহাতে খণ্ড খণ্ড পুস্তকাকারে ক্রমশঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড এই বিরাট গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনের ও প্রকাশের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সুবিধার্থে এক যোগে চারি ভাষাতে যাহাতে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করা যাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। ৮ পেজী ডবল ক্রাউন ১০০০ হাজার ফর্ম্মাতে অর্থাৎ ৮০০০ হাজার পৃষ্ঠাতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে ইহা যে কেবল হিন্দুসমাজ-তত্ত্বের বহুল জটিল প্রশ্নের মীমাংসার সহায়ক একখানি বিরাট কোষরূপে সদা ব্যবহৃত হইতে পারিবে—তাহা নহে, পরন্তু ইহা দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ মধ্যে জাতি ও বর্ণগত সাম্প্রদায়িক উচ্চ নিম্ন মর্য্যাদার দাবী-দাওয়া ঘটিত অন্তর্বিবাদও যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রশমিত হইবে, এরূপও আশা করা যায়। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, হিন্দু সমাজের মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রেই যাহাতে এই কার্য্যে স্ব স্ব শক্তির অনুরূপ সহায়তা করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এস্থলে ইহাও নিবেদন করা আবশ্যক হইতেছে যে—যিনি নিজ সম্প্রদায়ের অথবা নিজ পরিচিত ও পরিজ্ঞাত অপর কোন সম্প্রদায়ের বা জাতির, উপজাতির বা কোন শ্রেণীর বা উপশ্রেণীর বা কোন দল, মেল বা পণ বিশেষের সামাজিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া আমাদের কার্য্যালয়ে তাহা সময়ে সময়ে প্রেরণ করিয়া এই বিরাট পুস্তক প্রকাশ কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিবেন, তাঁহাকে আমরা আনন্দচিত্তে 'সহায়ক' শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত

আছি এবং কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপ তাঁহার সমীপে সাদরে বিনামূল্যে একখণ্ড পুস্তিকা উপহার প্রেরণ করিতে আমরা সংকল্প করিয়াছি। যাঁহাদের এভাবে আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিবার উপযোগী সময় বা সুবিধা নাই, তাঁহারা আর একটি সহজ-সাধ্য উপায়ে আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন। তাহা এই,—হিন্দুসমাজ ঘটিত বা কোন সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক বিবরণঘটিত কোন মুদ্রিত বা অমুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রাদি তাঁহাদের নিকট থাকিলে, তাহা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমাদের কার্য্যালয়ে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা। আরও একটি অতি সহজ উপায়ে আমাদের এ কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিতে প্রায় সকলেরই সামর্থ্য রহিয়াছে। তাহা এই,—সদর মফস্বলে যাঁহাদের সহিত পত্র ব্যবহার দ্বারা ঐ সকল স্থানীয় হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হইতে পারে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় লাভের সুবিধা বিধান। এতদ্ভিন্ন যাহারা পাথের ব্যয় মাত্র লইয়া মফস্বলে নানা দেশ পরিভ্রমণ করতঃ জ্ঞাতব্য তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়া আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন, এমন বিশ্বাসী কর্ম্মপটু ব্যক্তির নাম ধাম লিখিয়া প্রেরণ করিতে পারিলেও আমাদের কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। এই কার্য্যে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি আমাদের পৃষ্ঠপোষক বা সহায়ক হইতে ইচ্ছুক আছেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহা জানাইলে এবং আপাততঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর যতদূর সম্ভব উত্তর সংগ্রহ করিয়া, তাহা কাশী, গোধুলিয়া, অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মহাসভার পুস্তক প্রকাশ বিভাগ কার্য্যালয়ে সত্বর পাঠাইয়া দিলে, আমরা পরম উপকৃত হইব। নিবেদন ইতি—

প্রশ্নাবলী।

(১) এই কাগজে, উত্তরদাতা, যে সমাজের তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাহার নাম অগ্রে লিখিবেন। (যথা—রাঢ়ী ব্রাহ্মণসমাজ, সারস্বত ব্রাহ্মণসমাজ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ইত্যাদি) এবং আপনি স্বয়ং সেই সমাজের অন্তর্ভুত ব্যক্তি অথবা অন্যের নিকট হইতে তাঁহাদের সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছেন, তাহাও এস্থানে কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন।

(২) এই সম্প্রদায় বা শ্রেণী মধ্যে বিবাহে এবং জন্ম মৃত্যুতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার কার্য্য কোন্ সময়ে কি ভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিমূলে অবলম্বিত হয় এবং ঐ সকল ব্যাপারে কিরূপ কুলাচার, স্ত্রী-আচার বা লোকাচার সকল সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? ঐ সকল কার্য্যে সামাজিক ভোজন ও নিমন্ত্রণাদি কোন্ সময়ে কি ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে? নিমন্ত্রণকর্ত্তা ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মধ্যে আশীর্ব্বাদী বা প্রণামী স্বরূপ বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি আদান-প্রদান কার্য্য সাধারণতঃ কি ভাবে সম্পন্ন হয়?

(৩) এই সম্প্রদায় মধ্যে ঐ সকল কার্য্যে সমাগত ব্যক্তিগণ মধ্যে কুলগত মর্য্যাদা

বা সম্মানের কোনরূপ উচ্চ নিম্ন ভাব রক্ষা করিয়া চলিবার প্রথা প্রচলিত আছে কি না? এবং তাহা হইলে, পূর্ব্বকালেই বা কিরূপ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ আছে, আর ইদানীং পূর্ব্বতন প্রথার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না? পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?

(৪) যে সমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে, তাহা দ্বিজ জাতির অন্তর্ভূক্ত হইলে বালকগণের উপনয়ন সংস্কার কি ভাবে কোন্ সময় হইয়া থাকে? দ্বিজাতি ভিন্ন অন্যবর্ণের কথা হইলে বালকগণের চূড়া কর্ণবেধাদি সংস্কার ঐরূপ কোন্ সময় কি ভাবে হইয়া থাকে?

(৫) এই সম্প্রদায় মধ্যে দত্তকপুত্র গ্রহণ এবং উত্তরাধিকার পদ্ধতি কোন্ শাস্ত্র মূলে (যেমন দায়ভাগ, মিতাক্ষরা ইত্যাদি) প্রচলিত আছে?

(৬) এই সম্প্রদায় মধ্যে স্থান বিশেষের জন্য বা শ্রেণী বা উপশ্রেণী বিশেষের জন্য সমাজপতি (কোন কোন স্থানে যাহাকে চৌধুরী, প্রধান ইত্যাদি বলা হয়) বলিয়া কাহাকেও মান্য করিবার প্রথা প্রচলিত আছে কি না? থাকিলে পুরুষানুক্রমিক অধিকার-মূলে কিম্বা সাম্প্রদায়িকগণের নির্ব্বাচনে ঐরূপ পদ লাভ হইয়া থাকে?

(৭) যে সম্প্রদায়ের বিবরণ লেখা হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা সামাজিক মর্য্যাদায় আপনাদিগকে কোন্ বর্ণের উপরে এবং কোন্ শ্রেণীর নিম্নে অধিষ্ঠিত মনে করিয়া থাকেন? (দৃষ্টান্ত স্থলে যেমন বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের নীচে এবং কায়স্থের উপরে বলিয়া মনে করেন।)

(৮) যে সমাজের কথা লেখা হইতেছে, এই সমাজঘটিত কোন অপরাধের জন্য ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সামাজিক শাসন ও দণ্ড বিধানের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কি ভাবে এবং কাহাদের কর্ত্তৃক তাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে? এবং ঐরূপ দণ্ডের পরিণাম ও প্রণালী কিরূপ?

(৯) এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে সামাজিক দলাদলির প্রভাব ও কার্য্য পূর্ব্বের তুলনায় এক্ষণে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে? এবং তাহার ফলাফলে ঐ সমাজ কিরূপ লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন?

(১০) যে সম্প্রদায়ের বিবরণ উপরে লিখিত হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাস বা কোন মুদ্রিত গ্রন্থ বা মাসিকপত্র থাকিলে এবং কোন স্থায়ী সভা সমিতি থাকিলে তাহার নাম ও ডাকে পত্র ব্যবহারের ঠিকানা কি এবং পুস্তক পত্রিকাদি থাকিলে তাহা পাইতে পারিবার উপায় কি?

(একযোগে অধিক বিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত করিলে উত্তর দাতার উত্তর সংগ্রহ কার্য্যের অসুবিধা হইতে পারে আশঙ্কাতে উপরে দশটি বিষয়ের প্রশ্ন করা হইল। ইহার মধ্যে উত্তর দাতা ইচ্ছানুসারে ২।১টী বা সমস্ত বিষয়ের উত্তর দান করিতে পারেন। উত্তর দাতার নিকটে ভবিষ্যতে আর কোন বিষয়ের কোন প্রশ্ন পাঠাইবার আবশ্যকতা উপস্থিত

হইলে ঐরূপ প্রশ্ন নিঃসঙ্কোচে পাঠাইবার অনুমতি পাইবারও প্রার্থনা রহিল।)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা।

সহঃসম্পাদক, ব্রাহ্মণমহাসভা।

।

কি দিয়া তোমার সাজাব সুন্দর!
আমায় বলিয়া দাও,
কোন্ ফুল দিয়ে কি মালা গাঁথিলে
চরণে স্মরণ দাও।
কার সে স্মৃতি জাগে দিবা রাতি
অনুরাগ-প্রীতি রঞ্জিত?
কার ভাষা শুনি উঠিবে চমকি
মম হৃদি করি কম্পিত।
মঞ্জিল শিঞ্জন উঠেছে ধ্বনিয়া
চাও নাই তুমি ফিরিয়া—
কোকিল কুহর পশেছে শ্রবণে
চলে গেছ শ্বাস ফেলিয়া।
কত পায়ে ধরে এনেছি তোমারে
আজি এ প্রান্ত বাসরে।
কত অশ্রু জলে সিক্তিয়া চরণে
আমি পেয়েছি তোমারে॥
সুখের বসন্ত চলিয়া গিয়াছে
অন্ধ পরাণ দলিয়া।
(ওহো!) ছিন্ন ফুলরাশি 'রেখে গেছে শুধু'
ক্ষুদ্র দীনতা ঢালিয়া॥
পরাণের বীণা বাজিছে বেসুরে
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার—
অলস জড়িমা কাতর পরাণে
মেখেছে আঁখি আমার।
সুখ-আশা-বায়ু বহিয়া বহিয়া
এনেছে গভীর নৈরাশে।
শুনিয়া তাহার নাই নাই বুলি
কাঁপিছে অন্তর তরাসে॥
আসিয়াছ প্রভু দয়া ক'রে যদি
ব'স তব হৃদাসনে।
কিছু নাই ফুল যা আছে আমার
ঢালি দিই ও চরণে॥

শ্রীবলাই লাল মুন্সী।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ-রাজবংশের ইতিহাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সুবর্ণগ্রাম ও পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা বাইরাম খাঁর মৃত্যু হইলে ফকির উদ্দিন নামক তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণাবতী ও পশ্চিম বঙ্গের শাসন কর্ত্তা কেদার খাঁ জীবিত থাকিতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি বঙ্গের তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে হস্তগত করিতে প্রয়াসী হইলেন।

সেই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র স্বীয় সহোদর শ্রীমন্তের বীর্য্যবলে ও বুদ্ধি বলে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্য লাভ করিতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, বিবেচনা করিয়া ফকির উদ্দিন গড়ভবানীপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া

কেদার খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ফকির উদ্দিনের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, ফকির উদ্দিন সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব শাসন করিতে আরম্ভ করেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেন। কেদার খাঁ ফকির উদ্দিনের এবম্বিধ আচরণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মহাবীর শ্রীমন্ত কেদার খাঁর সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করেন এবং ফকির উদ্দিনের একদল সেনা সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করে। কেদার খাঁর সৈন্যগণ এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণ শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হয় ও ভয়ে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান শূন্য হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কেদার খাঁ রণকুশল কতকগুলি যোদ্ধার সহিত রাজা শ্রীমন্তকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়, মহাবীর শ্রীমন্ত এক বর্ষার আঘাতে কেদার খাঁকে ধরাশায়ী করেন। কেদার খাঁ এইরূপে নিহত হইলে ফকির উদ্দিন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে লক্ষ্মণাবতী লুণ্ঠন করিবার জন্য ধাবিত হন। রাজা শ্রীমন্তও সসৈন্যে ফকির উদ্দিনের অনুগমন করেন। লক্ষ্মণাবতী নগরীতে প্রবেশ করিয়া বিজয়োল্লাস-মত্ত ফকির উদ্দিনের সৈন্যগণ ধনী হিন্দুগণের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে ও স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। নগরবাসী লোকগণের আর্ত্তনাদে রাজা শ্রীমন্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া ফকির উদ্দিনের সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত করিতে অনুনয় করিলেন; কিন্তু ফকির উদ্দিন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাজা শ্রীমন্ত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে বীরগণ। তোমরা জীবিত থাকিতে আজ তোমাদের সম্মুখে নিরীহ হিন্দু প্রজাগণের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইতেছে, হিন্দুরমণীগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইতেছে, তাহাদের আর্ত্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তোমাদের বাহুবলেই আজ অত্যাচারী যবন সমর বিজয়ী ফকির উদ্দিন বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়া আমার ন্যায্য প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছে। যদি তোমাদের আত্মগৌরব রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র বাসনা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই অত্যাচারী যবনদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া পুরাঙ্গনাগণের সম্মান রক্ষা কর। মহাবীর শ্রীমন্তের মুখ হইতে এই তেজস্বিনী বাণী বহির্গত হইবামাত্র সহস্র হিন্দুবীর নিষ্কোষিত অসি হস্তে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় যবনসৈন্যের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং বহুসংখ্যক সৈন্যের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। যবনসৈন্যগণ তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইল। মহাপ্রাণ রাজা শ্রীমন্ত বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং নগরবাসী জনগণের ভয় বিদূরিত করিলেন। তখন ফকির উদ্দিন মনে মনে বিপদ গণিয়া শ্রীমন্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। রাজা

শ্রীমন্ত বলিলেন—“যদি আপনি আপনার সৈন্য-গণকে এই মুহূর্ত্তেই নগর ত্যাগ করিতে অনুমতি দেন, তবেই আমি যবন বধ পরিত্যাগ করিব, নচেৎ একটী যবনসৈন্যও আজ অনাহত দেহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না। আমার রাজ্যে লোভ নাই, আপনি নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করুন কিন্তু আমার সম্মুখে অবলা রমণীগণের উপর যেন অত্যাচার না হয়; ফকির উদ্দিন রাজার কথায় সম্মত হইয়া সৈন্যগণকে নগর হইতে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, নগর মধ্যে পুনর্ব্বার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ফকিরউদ্দিন বাহ্যিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ রাজাকে বহু ধনরত্নাদি ও হয়-হস্তী উপহার দিলেন। রাজা শ্রীমন্তের দাম্ভিক ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত ও পরাক্রমে ভীত হইয়া ফকির উদ্দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ফকির উদ্দিনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া একদল ছদ্মবেশী রণ-কুশল যোদ্ধা লক্ষণাবতী নগরে পাঠাইয়া দেন। ফকির উদ্দিনকে নিহত করিবার অভিপ্রায়েই রাজা ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজপ্রেরিত যোদ্ধাগণ মুসলমান বেশে ফকির উদ্দিনের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হয়, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবলে উচ্চ কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান রাজের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। তাহারই ষড়যন্ত্রে ফকির উদ্দিন কারারুদ্ধ ও নিহত হয়। ফকির উদ্দিন নিহত হইলে মবারক আলি বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেব নারায়ণ রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন, মবারক আলি এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া গড়ভবানীপুর আক্রমণ করিবার জন্য সদল বলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রাজা শ্রীমন্ত বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান পার হইয়া পেঁড়ুয়ার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে মবারকের সৈন্যগণকে বাধা দেন, সামসু-উদ্দিন নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বীর রাজা শ্রীমন্তের সহ মিলিত হন। মবারক এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন এবং পথি মধ্যে সামসউদ্দিনের দ্বারা নিহত হন। সামসু-উদ্দিন মবারককে নিহত করিয়া বঙ্গের রাজা হইলেন এবং পেঁড়ুয়ার যুদ্ধেই তাহার ভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল বলিয়া, গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পেঁড়ুয়াতেই রাজধানী স্থাপন করিলেন। সামস উদ্দিন কোরাণ স্পর্শ করিয়া রাজা শ্রীমন্তের সহ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়েই পরস্পরের বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। পেড়ুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার স্মৃতিরক্ষা হেতু রাজা শ্রীমন্তও স্বীয় রাজধানীকে পেড়ুয়া নামে অভিহিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের দশ বৎসর পরে সামসুদ্দিন বেহার হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তত্রত্য শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সংবাদ পাইয়া দিল্লীর বাদসাহ ফিরোজসা সামসুদ্দিনকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে অগণিত সৈন্যসহ বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। পেড়ুয়া রক্ষার ভার সামসুদ্দিন রাজা শ্রীমন্ত

ও স্বীয় পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া যান। বাদসাহী সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শ্রীমন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন এবং সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তাহার সৈন্যগণ স্বদেশ অভিমুখে পলায়ন করে ও সম্রাটসৈন্য অবলীলাক্রমে পেড়ুয়া অধিকার করিয়া লয়। তৎপরে সম্রাট ফিরোজ সা কয়েক মাস বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া সামসুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন ও বর্ষাগমে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এক্ষণে সামসুদ্দিন নির্বিঘ্নে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন এবং রাজা শ্রীমন্তের পুত্র রাজা মহেন্দ্রকে একজন সেনা নায়ক নিযুক্ত করিলেন। ক্রমশঃ।

ভট্টাচার্য্য।

চকদিঘী।
১৩২৪।১২ জ্যৈষ্ঠ।
পূজনীয়"আলোচনা"সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রতিবাদ।

সপ্রণাম নিবেদন মিদং—

আপনার প্রকাশিত গত বৈশাখ মাসের "আলোচনা" মাসিক পত্রে "দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাস" প্রবন্ধে বিষ্ণুদাসকে একজন দস্যুভাবে—"ধনীদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণান্তর বাহিরগড়াগ্রামে বাস করিয়াছিলেন" ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঐ সম্বন্ধে আমি সামান্য প্রতিবাদ করিয়া—অত্র পত্রের দ্বারায় জানাইতেছি যে রাজা বিষ্ণুদাস রঘুবংশীয় রাজপুত, তিনি ৺কেশব হাজারীর কনিষ্ঠ পুত্র, তাহার বংশাবলী সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে লিখিলাম, অবগত হইবেন ও ইহাও দেখিবেন যে তিনি দস্যু ছিলেন না বা পরধন লুণ্ঠন করিয়া নিজে ধনী হয়েন নাই:—

কেশব হাজারী রাজা টোডরমল্লের সহিত মোগল বাদসাহের পক্ষ হইয়া পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য একহাজার রাজপুত সৈন্যের সর্দ্দার হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার পদবি হাজারী ছিল ঐ রূপ ৫ জন হাজারী রাজা টোডারমল্লের সহিত আইসেন ঐ ৫জন হাজারীর মধ্যে আমার পূর্ব্বপুরুষ ৺হার সিং হাজারী ১জন ছিলেন। ঐ কেশব হাজারীর ৩ পুত্র জ্যেষ্ঠ ৺ভারামল্ল দ্বিতীয় ৺বরদাপ্রসাদ তৃতীয় ৺বিষ্ণুদাস, ঐ মোগল পাঠানের যুদ্ধে সুবর্ণ রেখার নিকট যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাঠানরা পরাস্ত হইয়া বিতাড়িত হইলে পর মোগল বাদসাহ হইতে জায়গীর ও "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া হুগলী, বর্দ্ধমান, মিদ্‌নাপুর, বাঁকুড়া, নদীয়া ইত্যাদি জেলায় তাহারা বাস করেন। প্রত্যেক হাজারী তাৎকালীন মাপের ১০০ শত বিঘা জমী হিসাবে জায়গীর পাইয়াছিলেন। ঐ এক শত বিঘা জমী মাপে প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমী হইয়াছিল, দশশালা বন্দোবস্তের সময় অতিরিক্ত জমী বাজাপ্ত করিয়া কোম্পানী বাহাদুর লয়েন ও কেবল একশত বিঘা মাত্র ছাড় দেন। ৺কেশব হাজারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারামল্ল কুমার-সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনিই ৺তারকনাথ মহাদেবের উদ্ধার করেন। যৎকালে তিনি তারকেশ্বরে রামনগরের জঙ্গলে থাকিতেন তৎকালে তাঁহাকেই ৺বাবার স্বপ্নে আদেশ হয় এবং সেই আদেশ অনুসারেই ৺বাবার উদ্ধার ও প্রকাশ এবং এখনও ৺বাবার মূল আদি বিষয় "জোৎ শম্ভু" তাঁহাদেরই বংশাবলীর দত্ত সম্পত্তি। রাজা বিষ্ণুদাস বা বিষণ দাস যৎকালে আমাদের এই রাজপুত মণ্ডলীর মধ্যে এক মেল বদ্ধ করিয়া পুংক্তি ভোজন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করেন, তৎকালে তাহার মধ্যম ভ্রাতা ৺বরদা প্রসাদ তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার সহিত পৃথকান্ন হন এবং বাহিরগড়া হইতে উঠিয়া গিয়া আরামবাগের নিকট চেতোবরদায় বাস

করেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল রাজপুত মিলিত হন—তাঁহারাই আমাদের সমাজে "বরদাই রাজপুত" বলিয়া পরিগণিত। রাজা বিষণ মুর্শীদাবাদে নবাব বংশে যৎকালে চাকুরী করিতেন সেই সময়ে নবাব সরকারে একটা গুরুতর চুরী হয়, সেই চুরী উপলক্ষে তথায় যে সমস্ত অন্য রাজপুত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাদের প্রতি ঐ চুরির সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় কিন্তু রাজা বিষণ দাস "রাজপুতরা চোর নহে এবং তাহারা চৌর্য্য বৃত্তি জানেন না" ইহা প্রমাণ করিবার জন্য-জলন্ত লোহার শাবল হাতে উঠাইয়া লইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তদ্দারায় রাজপুতরা যে কখনও চোর নহে—ইহা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রথমে আমাদের রাজপুত সমাজ হইতে তাঁহাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয়, পরে সেই উপাধি মুরশীদাবাদের নবাব বাহাদুর অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করিয়া সনন্দ দেন ও পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি খেলাত দেন—সেই সম্পত্তির অন্তর্গতই ঐ বাহিরগড়া গ্রাম। তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইয়া নবাব সরকারে অবৈতনিক সৈন্যাধ্যক্ষরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন ও আবশ্যকমত আপন রাজপুত দলসংগ্রহ করিয়া নবাব বাহাদুরকে যুদ্ধাদিকালে সাহায্য করিতেন এবং ঐরূপ সাহায্যকালে নবাব বাহাদুরের হুকুমানুসারে সময়ে সময়ে কোন কোন ধনী ব্যক্তির উপর তাহাকে অত্যাচার করিতে হইয়াছে। তিনি যে এদেশের রাজপুতগণের মধ্যে মেলবদ্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই মেলকেই উপস্থিত সময়ে আমরা "বালীগড়া মেলের রাজপুত" বলিয়া প্রকাশ করিয়া থা[কি] এবং তিনি যে ঐ রাজপুতগণের মধ্যে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই পঞ্চা[য়ে]ৎ প্রথা চলিয়া আসিতেছে ও সময়ে সময়ে তাহার বৈঠকও হইয়া থাকে। অতএব শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কি অপরাধে ও কি প্রমাণ পাইয়া রাজা বিষ্ণুদাসকে দস্যুরূপে পরিগণিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না। যদি রাজা বিষ্ণুদাস সম্বন্ধে সঠিক বিষয় জানিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাদের পঞ্চায়েতের দপ্তর ও প্রাচীন কাগজাদি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। এই পঞ্চায়েতের দপ্তর ঘারহাট্টা নিবাসী পঞ্চায়েতের জমাদার মহাশয়ের নিকট ও রহিয়া নিবাসী পঞ্চায়েতের মুনসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ সিংহ রায় মহাশয়ের নিকট আছে—ঐ সকল কাগজ দেখিলেই তাঁহার এই ভ্রম সংশোধিত হইবে। অলমোতি বিস্তারেণ।

শ্রীললিত মোহন সিংহ রায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

যুদ্ধ ঋণ।—ইউরোপীয় দারুণ যুদ্ধে টাকার আবশ্যক হওয়ায় মহামান্য ভারত সম্রাট প্রজাবর্গের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাই "যুদ্ধঋণ" নামে কথিত। রাজার সঙ্কট সময়ে রাজভক্ত প্রজামাত্রেরই রাজাকে প্রাণপণে সাহায্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, না করিলে ধর্ম্মে পতিত ও পাপভাগী হইতে হয়—ইহা হিন্দুশাস্ত্রের অমোঘ আদেশ। "নরাণাঞ্চ নরাধিপ" ইহা আমাদেরই প্রাণপ্রিয় গীতার উপদেশবাণী। প্রত্যেক ভারতবাসী আজ এই উপদেশ বাণীর অনুসরণ করিয়া রাজার ও রাজ্যের মঙ্গল বিধান করে অগ্রসর হউন। অতুল ধনের অধীশ্বর সম্রাটকে ঋণ দান করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া সকলে অগ্রসর হউন। যাহাদের টাকা আছে, যাহারা সুদ গ্রহণ জন্য অপরকে টাকা প্রদান করেন, এ সুযোগ তাহাদের ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নহে। অপর হস্তে টাকা পড়িলে বা ধার দিলে নানাপ্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা কিন্তু খোদ শাসনকর্ত্তার নিকট গচ্ছিত রাখিলে তাহার তুল্য নিরাপদ আর কিছুই নাই, ইহাতে সুদের হারও খুব বেশী; আর সময় নাই—সকলে সত্বর এই শুভ সঙ্কল্পে সহায় হউন।

দোষ কারো নয়

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "আলোচনায়" আমরা "ভারতীয় উন্নতির মূলতত্ব" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। আমরা যে কিরূপ ছিলাম আর কিরূপ হইয়াছি—ইহার মূলে যে দোষ কাহারও নাই, আমরা যে নিজেই স্বখাত সলিলে ডুবে মরিতেছি, কেবল ধর্ম্মহীন, আধ্যাত্মিক বলহীন হইয়া যে অধঃপাতে যাইতেছি—উক্ত প্রবন্ধে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। স্বধর্ম্মনিরত এবং স্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইয়া যে আমরা নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছি, এখন তাহা অনেকেই স্বীকার করেন এবং তাহার জন্য দেশবাসীর মধ্যে একটা সজাগ জাগরণ সূচিত হইতেছে; সকলেই আবার পূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সে চেষ্টা এখনও সাধারণের মধ্যে ঠিক সমভাবে সমাহিত হইতেছে না। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-সভা, ব্রাহ্মণ-সভা হইতেছে—ইহাতে দেশে একটা সাড়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু এখন ঠিকভাবে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। যাহা হইয়াছে—তাহা নাম মাত্র, কিছুই নয় বলিলেই চলে। সকলেই সময়ের আশা করিয়া বসিয়া আছেন—সময় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাও রাখেন, কিন্তু সময় কি আপনি হইবে, না নিজেকে সময় করিয়া লইতে হইবে? নতুবা আজি কালি করিয়া চিরকালই কাটিয়া যাইবে—তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম করা, মনুষ্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যসাধন করা কিছুতেই হইবে না। অনেকে বলেন—পূর্ব্বে দেশে হিন্দু রাজা ছিল—হিন্দু হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম না করিলে রাজার বিষ-নয়নে পড়িতে হইত—এইজন্য বাধ্য হইয়া সকলকেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইত—এখন হিন্দু রাজা নাই.—ইংরাজ এখন দেশের রাজা, তাঁহারা স্বধর্ম্ম নিরত হইবার জন্য হিন্দু প্রজাগণকে কোন প্রকার পীড়ন করেন না, এইজন্য ধর্ম্মমূল শিথিল হইতেছে, কোথাও কোথাও যাহা হইতেছে, তাহাও ব্যভিচারে পূর্ণ; আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজরাজ ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিপালনে প্রজাগণকে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি করেন না বটে, কিন্তু ধর্ম্ম করিলে কোন প্রকার বাধাও ত দেন না; তাঁহাদের জন্যত তোমাদের ধর্ম্ম-কার্য্যে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হয় না, তবে

নিবেদন।—আমরা ক্রমে ক্রমে সকলের নামে ভিঃ পিঃতে "আলোচনা" পাঠাইতেছি। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এই দুঃসময়ে যেন উহা ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই প্রার্থনা।

হিন্দুরাজার পরিবর্ত্তে অপর রাজা থাকিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম হইবে না কেন? ধর্ম্ম-কর্ম্মে যদি তোমার প্রবল ইচ্ছা থাকে—তুমি যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর, তাহা হইলে রাজাত তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন না—বরং নানা-প্রকারে তোমার সহায় হইয়া থাকেন—যাহাতে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইতে না পারে—তাহার চেষ্টা করেন, ইংরাজের রাজ্য-প্রাপ্তির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কি তাহারা তোমাদের ধর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি—পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্বে অত্যাচার, অনাচারের আশঙ্কাপাত হইয়াছিল; মুসলমানগণ এক হস্তে অসি ও অন্য হস্তে কোরাণ ধারণ করিয়া ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতঃ দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ ও গো-ব্রাহ্মণগণকে ভয়ানক অত্যাচারে নিপীড়িত করিয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। এই তখনকার সেই দুর্দ্দিনে, সেই মহাবিপদ্‌কালেও হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম্ম ও নিজেদের আচার-ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন আমাদের দেশে উদারহৃদয় ভক্তপ্রাণ রামানুজ, নানক, কবীর, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি মহা-পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়াছিলেন। তখনও হিন্দুগণ হিন্দুর বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার হইতে বিন্দুমাত্রও স্খলিত হন নাই, দেবদ্বিজে ভক্তিহীন হন নাই, শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হইয়া ঋষি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে বিরত হন নাই। তখনও ভারতীয় আর্য্যগণ অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মের ধ্বজাধারী বলিয়া পরিচয় দেন নাই। হিন্দু মুসলমানের এই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের সময়, হিন্দুধর্ম্মের এই জীবনমরণের দিনেও শাস্ত্রের কঠোর শাসন বিন্দুমাত্রও শিথিলতা প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু অধুনা ভারতে আর সে মুসলমান রাজত্ব নাই; আর হিন্দুধর্ম্মের উপর রাজার কোনরূপ অত্যাচার নাই; এখন রাজা হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার করা দূরে থাকুক, ধার্ম্মিকগণকে বিশিষ্ট সম্মানে সম্মানিত করিতেছেন, বরং দেবমন্দির চূর্ণ করা দূরে থাক্, প্রাচীন স্মৃতি-রক্ষাকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দিরাদির পুনঃ সংস্কার করিয়া দিতেছেন, শাস্ত্র গ্রন্থ ভস্মীভূত করা দূরে থাকুক, প্রাচীন গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এমন সুসময়ে যদি আমরা নিজের আচার-ব্যবহার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করি, তাহার জন্য দায়ী কে? এসময় যদি আমরা আর্য্য সন্তান হইয়া ত্রিকালদর্শী পরার্থে-ত্যক্ত-জীবিত ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী হই—তাহার জন্য আমরাই অপরাধী, আজ যদি প্রাচীনতম সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শিথিলমূল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের অসারতা নিবন্ধনই হইতেছে—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, হিন্দু ধর্ম্মের এই অধঃপতনের কারণ কি? ইহার সহজ উত্তর—সাধনার অভাব। আজকাল দেশে ধর্ম্মের সাধনা নাই, সাধনা আর কেহ করেন না—ধর্ম্ম কেবল মুখের কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অধুনা পণ্ডিত বক্তাগণ ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া চতুর্দ্দিকে বক্তৃতা

করিতেছেন, শ্রোতাগণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া করতালি দ্বারা বক্তার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সাধনবলে লাভ করিতে সচেষ্ট হইতেছেন—এমন লোক কয়জন? আজ কাল প্রায় সকলেই ঋষিগণের সযত্ন-রক্ষিত, অনধিকারীর নিকট অতিশয় গোপনীয় সাবিত্রী বীজ ওঁকার উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু কয়জন এই মোক্ষদ্বারকবাটপাটনকর্ত্রী ওঁকার ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া শক্তিমান্ হইয়াছেন কয়জনই বা তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন! পথে-মাঠে-ঘাটে-হাটে আব্রাহ্মণশূদ্র—বেদান্ত মুখস্থ করিয়া তাহার বক্তৃতা করিতেছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—বক্তাগণের মধ্যেই কয়জন বেদান্তের সার প্রতিপাদ্য "জগন্মিথ্যা ব্রহ্মসত্য" উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তিলমাত্র নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন! তাই বলিতে-ছিলাম—আজকাল ভারতে হিন্দুধর্ম্ম কেবল মুখের কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র তর্কমূলক কিম্বা ব্যবহার-শাস্ত্র নহে যে, তর্কের দ্বারা ইহার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে। ইহা সাধনামূলক শাস্ত্র। সাধনা করিলে তবে সিদ্ধি লাভ হইবে। হে ভারতীয় সাধনজ্ঞানহীন হিন্দুগণ! তোমরা আজ দায়িত্বজ্ঞানহীন কতকগুলি স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট হইতে অপ্রকাশিত সাবিত্রীবীজ অনায়াসে লাভ করিয়া সিদ্ধি-লাভের পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছ একবার নিজের বুকে হাত দিয়া বিচার করিয়া দেখ দেখি, দেখিবে সব শূন্য—দেখিবে তোমার ওম্ কেবল ব্যোম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু যদি শক্তি সমন্বিত হইয়া থাক, যদি যথার্থ ধর্ম্মকর্ম্মে মতিগতি হইয়া থাকে, তবে ঋষি-প্রবর্ত্তিত পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রাণপাত সাধনা কর, সাধন-ভজনে প্রাণপাত পরিশ্রম কর, দেখিবে তোমার কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া তোমাকে মহাশক্তিশালী ত্রিকালদর্শী, জরামরণভয়বর্জ্জিত পরার্থপরায়ণ, সত্যবাক্ ও নির্ভীক করিয়া তুলিবে, জগতীতলে তোমার মহতী কীর্ত্তিধ্বজা চির প্রথিত হইবে। সাবিত্রী-সাধনা অনেক দূরের সাধনা, ত্রিসন্ধ্যা-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যখন এই কষ্টসাধ্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছেন না, তখন অপর জাতি আচার-বিচার-বিহীন, অসংযমী হইয়া কিরূপে ইহার সাধনায় সিদ্ধ হইবে? এ কেবল বামনের চাঁদ ধরিবার আশা; পঙ্গুর পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের উদ্যম; সাবধান যেন পড়িয়া হাড় গোড় চুরমার হইয়া যায় না। ধর্ম্ম কার্য্য করিতে যদি প্রকৃত বাসনা হৃদয়ে জাগিয়া থাকে, সিদ্ধিলাভ করিতে যদি প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে, তবে বংশগত বীজমন্ত্রে কুল-গুরুর নিকট দীক্ষিত হও। কুলগুরু যেমনই হউন, তাহাতে অশ্রদ্ধা করিও না। কারণ তোমার কুলগুরুই তোমার বংশ পরম্পরাগত কুলমন্ত্র অবগত আছেন, অন্য কেহ মহাপুরুষ হইলেও তাহা জানেন না। এই বীজমন্ত্রই ব্রহ্ম—ইহাকে বর্ণমালার কতকগুলি অক্ষর সমাবেশ মনে করিও না। এই বীজমন্ত্র শাস্ত্রকথিত নিয়মানুসারে জপ কর, দেখিবে সকল আপদ-বিপদ বিদূরিত হইয়া তোমরা মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর

হইতেছ; তখন সাধনক্ষম অন্য উপগুরুর সাহায্যে কষ্টসাধ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইতে পারিবে। তখন তোমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে। কিন্তু যদি শাস্ত্রসম্মত সাধনা করিতে অসম্মত হও—তবে দয়া করিয়া যেমন ছিলে তেমনই থাক; যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকে তবে আর মনগড়া আধ্যাত্মিক,যৌগিক, মানসিক, ব্যাখ্যা করিয়া শাস্ত্র-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না। তোমাদের ন্যায় বিড়াল তপস্বীদিগের কষাঘাতভয়ে হিন্দুধর্ম্ম আজ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ লুক্কায়িত হইবার অবসর খুঁজিতেছে। আজকাল এইরূপ ধর্ম্মহীনতার ফলে ঘোর আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়া যে দেশে এত দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্পাদক।

জীবের স্বরূপ অবধারণের উপায়।

এই পরিদৃশ্যমান-জগৎ-প্রপঞ্চ-সৃষ্টির উপাদান কারণ—অবিদ্যা। যথা:—

স সর্জ্জাগ্রেহন্ধ তামিস্র মথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ। ২
ভাগবৎ ৩, ১২ অঃ।

অর্থাৎ আদিকর্ত্তা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ, জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র অন্ধ তামিস্র অর্থাৎ অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ দ্বেষ, ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চায় ক্রমে এই পর্ব্ব বিশিষ্ট সংসার হেতু অবিদ্যার সৃষ্টি করিলেন।

এই অবিদ্যাকে আর্য্য শাস্ত্রে অজ্ঞান, মায়া, এবং অধ্যাস বলিয়া থাকে। অধ্যাস কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন:—

"অধ্যাসো নাম অতস্মিনতদ্বুদ্ধিঃ।"

অর্থাৎ যাহা যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝা। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, স্থাণুতে মনুষ্য ভ্রম, এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম।

আর্য্য ধর্ম্মের মূল মন্ত্র হইল—"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পর"। অর্থাৎ ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্ত জগতই যদি সেই পরম ব্রহ্মেরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে আমরা তো প্রতিনিয়তই ব্রহ্ম দর্শন করিতেছি, তবে আর আমাদের ব্রহ্মদর্শনের জন্য এত চেষ্টা এত প্রয়াস এত শাস্ত্র, এত বিধি-নিষেধ আবশ্যক কি? আর ব্রহ্মই যদি জগৎরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মই ত জগত-রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে, ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন—একথা বলা যায় না, কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন যে"ব্রহ্ম নিরংশ অপরিবর্ত্তনীয়" বেদান্ত ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য এ কথার উত্তর দিতেছেন যথা:—

"অবিদ্যা কল্পিতেন চ নাম রূপভেদেন ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্ব্ব ব্যবহারেস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে পারমার্থিকেন চ রূপেন সর্ব্ব ব্যবহারাতীত মপরিণতমবতিষ্ঠতে"। অর্থাৎ সমস্ত জগতকে নাম এবং রূপ দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এই নাম এবং রূপ উভয়ই অবিদ্যা প্রসূত মাত্র, এ কারণ ইহারা মূল সত্য নহে।

আমরা যে ঐ নাম ও রূপ অবলম্বনে পরম ব্রহ্মের এইরূপ পরিণাম হইয়াছে—এ প্রকার চিন্তা বা ভাষ্য করিতেছি, এরূপ ব্যবহার মায়ারই অন্তর্গত। ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, ইহার অর্থ ব্রহ্মের মায়ারই পরিণাম মাত্র। ব্রহ্ম যেমন তদ্রূপই রহিয়াছেন।

অতএব অবিদ্যা মায়া বা অধ্যাসই সকল অনর্থের মূল। এই অধ্যাসই আমাদিগের সকল প্রকার ব্যবহার মধ্যে বিদ্যমান, অধ্যাস ব্যতীত এই জগত-ব্যাপার কদাচ সম্ভবপর নহে। অনাত্ম বস্তুতে আত্মধর্ম্ম আরোপ, এবং আত্মার ধর্ম্মের অনাত্মাতে আরোপ ইহাই অধ্যাস। যথা :—

পুত্রাদির ধর্ম্ম আত্মাতে, অধ্যাসের ফলে আত্মা সুস্থ এবং দুস্থ হয়। আমাদের স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয় স্বজনের সুখে বা দুঃখে যে আমরা নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করিয়া থাকি, তাহা আমরা স্ত্রী-পুত্রাদি বহির্ব্বস্তুর ধর্ম্মকে আমাদের আত্মাতে আরোপ করিয়াই করি। তাহা না হইলে তাহাদের সুখে বা দুঃখে আমরা আমাদিগকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করিতে পারিতাম না। এইরূপ আমাদের এই দেহ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবহার, তাহা দেহের যে ধর্ম্ম তাহাকে আত্মাতে অধ্যাস করিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন দেহের ধর্ম্ম—আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি গমন করিতেছি, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম—আমি বধির, আমি অন্ধ, আমি মূর্খ—প্রভৃতি, মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প ও কামনাদি, বুদ্ধির ধর্ম্ম—আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা। এই সমস্তই অধ্যাসের ফলে উৎপন্ন। শাস্ত্র বলিতেছেন—আত্মা-ক্ষুৎপিপাসা শূন্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ বিহীন, অভোক্তা, অসংসারী, নিষ্পাপ, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি। তাহা হইলে বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ, এবং আশ্রম,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম সমস্তই অবিদ্যা বা অধ্যাস হইতে জাত। এই বর্ণ ও আশ্রম রূপ যে অধ্যাস তাহা সূক্ষ্মদেহের অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ অনাত্ম বস্তুর যে সকল ধর্ম্ম—তাহার অধ্যাস আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়।

নিরুপাধি ব্রহ্ম-চৈতন্য—অজ্ঞানরূপ উপাধি বশতঃই জীব নামে আখ্যাত হন। এই অজ্ঞান দ্বিবিধ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যষ্টি অজ্ঞানো-পহত যে চৈতন্য তাহাই জীব। জীব জড় অজ্ঞান ও তদুৎপন্ন অন্তঃকরণাদি জড়বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আপনাকে ও যাবৎ জড় পদার্থকে অজ্ঞানোদ্ভূত অন্তঃকরণাদি বৃত্তি সাহায্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব জীব ভাবের মূল কারণই অজ্ঞান, অবিদ্যা বা অধ্যাস। এই অজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে, একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ। ইহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। আবরণের ফলে জীব নিজ ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে এবং বিক্ষেপের ফলে—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান এবং এই চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অজ্ঞান বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে অধিষ্ঠানের স্বরূপকে আবৃত করিয়া নানা প্রকার বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্প-

ভ্রম স্থলে, অধিষ্ঠান বস্তু রজ্জু, এবং আরোপের বিষয় হয় সর্প, সেইরূপ এই জগতের একমাত্র অধিষ্ঠান সেই পরম ব্রহ্ম, জগৎ আরোপিত বস্তু মাত্র। অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, "আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বং ব্রহ্মশ্চরাচর"। ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা "জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।" তবে জীবের এই অজ্ঞান, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম জনিত সুদৃঢ় সংস্কার হইতেই জাত, এবম্বিধ বদ্ধমূল সংস্কার জীবের সহজে বিদূরিত হইবার নহে, ব্রহ্ম ও আত্মা যে অভিন্ন, আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মেরই স্বরূপ, এ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধনার আবশ্যক। সাধনা ভিন্ন কদাচ এ ভ্রম নিবারিত হইবার নহে। মানব চরিত্র অনুশীলন করিলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, প্রত্যেক মানব-জীবনের এক একটী লক্ষ্য আছে। কোন মানবই লক্ষ্যশূন্য নহে। আবার প্রত্যেক মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। এমন কি এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভে জাত পাঁচটী সন্তানের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং মানব-প্রকৃতি কদাচ এক নহে এবং হইতেও পারে না। যাহার যেমন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি তাহার জীবনের লক্ষ্যও তদনুরূপ। মানব জাতির মধ্যে এ পার্থক্যের কারণ কি? আর্য্য শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ।
ধারণা প্রেরণা দুঃখমিচ্ছাহঙ্কার এব চ।
প্রযত্ন আকৃতির্বর্ণ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈতদাত্মজং সর্ব্বমনা দেরাসিমিচ্ছতঃ।
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদি পঞ্চ শরীর বায়ু জ্ঞান, আয়ু সুখ, ধৃতি, ধারণা, প্রেরণা, দুখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার প্রযত্ন, আকার, বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, মঙ্গল, অমঙ্গল, এই সকল পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের কার্য্য।

তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কর্ম্মই মানব-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্যের হেতু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন— তিনি সেইরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, কর্ম্মবীজ লইয়াই যখন জীবের জন্ম, তখন কর্ম্মের হস্ত হইতে এড়াইবার কাহারও সাধ্য নাই—সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ অনাত্মাবিদ্যা লব্ধ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ব্রাহ্মণত্বাদ্যভিমানিনং নরম্ অধিকৃত্য বিধিনিষেধ-শাস্ত্র প্রবর্ত্ততে॥" * অর্থাৎ সেই কারণে যে পুরুষ অনাদি অবিদ্যা প্রভাবে নিজের উপর কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি আরোপ করিয়া থাকে, সেই পুরুষকেই আশ্রয় করিয়া বিধি-নিষেধ শাস্ত্র-প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অনাদি অবিদ্যা বলে জীব, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ উদাসীন হইয়াও আপনাকে কর্ত্তাভোক্তাদি জ্ঞানে যে সংসারে অনর্থ ঘটাইয়াছে, সেই অনর্থ নিবারণের উপায় স্বরূপ বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র-প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র কি? বেদাদি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ ও আশ্রম বিহিত যে কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মই বিধি-

* কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত বেদান্ত দর্শন দেখ।

নিষেধ শাস্ত্র। জগতের একমাত্র অধিষ্ঠান সেই পরম ব্রহ্ম. জীব অধ্যস্ত মাত্র, সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎ লাভ করিতে গেলে কর্ম্মের প্রয়োজন, কর্ম্ম ভিন্ন সে জ্ঞান লাভ করা যায় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"বিবদ যাস্তি যজ্ঞেন"—অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। কর্ম্মানুষ্ঠানই যখন জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তখন জীব যাহাতে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই পরমপুরুষ জীবের জন্য তাই বিহিত কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। জীব ও পরমাত্মার ভেদ-জ্ঞান হেতু উপাস্য এবং উপাসক সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, দেহাদি অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মাই উপাসক আর পরমাত্মাই উপাস্য; সুতরাং উপাসনা কিরূপভাবে করিতে হইবে—বর্ণাশ্রম তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবের অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সতত অভাব পূরণের জন্যই ব্যতিব্যস্ত! জীবের ইন্দ্রিয়বর্গের ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তিকেই আসক্তি বলা যায়। স্বভাবতঃ সংসারে অনিত্য ভোগ্য বস্তুতেই জীবের এই আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; সর্ব্বাভাবহীন, স্বয়ংসিদ্ধ, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের প্রতি জীবের যখন আসক্তি জন্মে, তখনই সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু সহজে বা অকস্মাৎ জীবের এরূপ আসক্তি জন্মে না, সে জন্য বেদাদি বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে চিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য সৎকারাসেবিতঃ দৃঢ়ভূমি"। গীতাঃ, ১ পা ১৪সূ

অর্থাৎ সেই উপাসনাত্মক যে সমাধি, তাহা দীর্ঘকাল ও নিরন্তর সৎকার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে দৃঢ় ভূমি হইয়া থাকে। এস্থলে সৎকার শব্দের অর্থ ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, শ্রদ্ধা ও যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবের চিত্ত নিষ্পাপ হইয়া শুদ্ধি লাভ হয়, এই চিত্ত-শুদ্ধিই জ্ঞানলাভের প্রথম উপায়।

জীবের ইন্দ্রিয়, দেহ, মন প্রভৃতি অধ্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু জীব তাহা ত বুঝিতে পারে না, জীবের এই সমস্ত সত্য বলিয়াই দৃঢ় ধারণা। সুতরাং ভোগ্য বিষয়ে জীবের যে আসক্তি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এবং ভোগ্য বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ না হইলে ত জীবের সংসারাসক্তিও নিবৃত্তি হইতে পারে না। সেই জন্যই আর্য্যশাস্ত্র জীবের দুইটী গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী প্রবৃত্তি মার্গ, অপরটী নিবৃত্তি মার্গ। আর্য্য শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে—প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রবৃত্তিমার্গানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের সাধন কদাচ হইতে পারে না; অতএব প্রবৃত্তি মার্গের অনুসরণ প্রত্যেক জীবের কর্ত্তব্য। আত্মোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রবৃত্তি মার্গের ইহাই লক্ষ্য; এই লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া প্রবৃত্তি-মার্গানুমোদিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ অর্জ্জিত হয়, এবং পরিশেষে মোক্ষ লাভের উপযোগী

হওয়া যায়। এখন মূল কথা এই যে,এ সংসার মিথ্যা, অথবা অধ্যস্ত পদার্থ তাহা সত্য. কিন্তু জীবের সে ভ্রান্তি যতদিন অপনোদিত না হইতেছে, ততদিন সাংসারিক উন্নতি বিষয়ক যাবতীয় কর্ম্ম জীবের করা কর্ত্তব্য, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ যজেত"—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন।" "রাজা রাজসূয়েন যজেত" অর্থাৎ রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, "গৃহস্থ সদৃশী ভার্য্যং বিন্দেৎ" অর্থাৎ গৃহস্থ সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিবে। ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ করিতে হইলে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, রাজাকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে হইলে রাজাকে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। একছত্রী সম্রাট না হইলে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী হয় না, একছত্রী সম্রাট হইতে হইলে কত বল,তেজ, বীর্য্য ও শিক্ষার আবশ্যক। গৃহস্থ-সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিবেন বলায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরই উল্লেখ করা হইল. গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে গেলে অর্থাদির আবশ্যক; সুতরাং অর্থোপার্জ্জনও প্রয়োজনীয়। এই রূপে আর্য্যশাস্ত্র জীবকে একটী রীতিমত সংসার পাতিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি দিলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়া দিলেন যে—জীব! সংসারই তোমার লক্ষ্য নহে. মোক্ষই তোমার লক্ষ্য. অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত বিধান অনুসারেই তোমাকে এই সংসার ধর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ কর্ম্মকাণ্ড আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, যাহারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিশ্বাস করে না. তাহারাই অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের পক্ষে কোন কর্ম্মকাণ্ডই প্রয়োজন নাই। কিন্তু এরূপ জ্ঞানীর সংখ্যা অতি বিরল।

আত্মার কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব জ্ঞানই যখন জীবকে প্রবৃত্তি মার্গে পরিচালিত করিতেছে, তখন আত্মাকে বা জীবকে কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তৃত্ব, এবং ভোক্তা হইয়া উপভোগ করিতে হইবে। কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তা হইয়া ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র গার্হস্থ্যাশ্রম। পাছে জীব কর্ত্তৃত্বের মোহে অহংজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া এবং ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে করিতে ভোগে আসক্ত হইয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য মোক্ষ বা আত্মজ্ঞানকে ভুলিয়া যায়, সেই জন্য আর্য্য-শাস্ত্র সংযমাদি শিক্ষার পরে—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে, গার্হস্থ্যাশ্রম প্রবেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বিহিত কর্ম্মগুলি জীবের আত্মোৎকর্ষ লাভের এতই উপযোগী যে, এই আশ্রমেই অনেকের আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞান নাশ হইয়া যায়, প্রবৃত্তি মার্গে আর প্রবৃত্তি থাকে না, তখন নিবৃত্তি মার্গই তাহার প্রার্থনীয় হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমে আর তাহারা প্রবেশ করিতে চাহে না। একেবারেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করে।

সংসর্গের দ্বারা পদার্থের দোষগুণ সমষ্টিকে স্পর্শ করে, সুতরাং ভোগ্য বিষয়ে যাহার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা. তাহার কিন্তু বৃত্তির গতিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই জন্য ভোগদাতা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া

উপভোগ করিতে পারিলে আর কোন ভোগের অপেক্ষা থাকে না, ভোগ-বৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, বিষয়ের দোষগুণ আর বিষয়ীকে স্পর্শ করিবে না, তখনই জীবের বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে, জীবের এই অবস্থাই পরম ব্রহ্মের অপরোক্ষ্যানুভূতির সময়। তাহার নাম বানপ্রস্থ আশ্রম।

এই জগত সংসার অনাদি অনন্ত, সুতরাং অবিদ্যাও অনাদি অনন্ত এবং জীব চিত্তও অনাদি অনন্তকাল হইতেই এই অবিদ্যা দ্বারা উপলিপ্ত। অনাদি অনন্ত জগতে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মানব-সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রেষ্ঠ মানব-জন্ম লাভ করিয়া মন বুদ্ধি ও চিত্তকে সমাধান দ্বারা পুষ্ট-স্বতন্ত্র করিয়া অবিদ্যা বিনির্মুক্ত করিতে না পারিলে মানব জন্মই বৃথা। বিচার করিয়া দেখ এই স্থূল দেহ যেমন স্থূল পদার্থ—গৃহ গোত্র পুত্রাদি সঞ্চয় করে, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়নিচয় আরও সূক্ষ্ম পদার্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্রমান্বয়ে উচ্চ স্তরে অবস্থিত মন, বুদ্ধি, চিত্তও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পদার্থের সংগ্রহ করিতে পারে। স্থূল পদার্থ যে পরিমাণে ধ্বংসশীল, সূক্ষ্ম পদার্থ সে পরিমাণে ধ্বংসশীল নহে, যদি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, স্থূল কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম কারণ উত্তরোত্তর অধিক কাল স্থায়ী, ব্যাপী ও সুখপ্রদ। সেইজন্য চিত্তকে স্থূল বিষয় হইতে সংস্রব শূন্য করিয়া যত সূক্ষ্ম বিষয়ে নিয়োজিত করা যায়, ততই চিত্তের উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে। কিন্তু জীবের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ স্থূল বিষয়ে ধাবিত হয়, তাই ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তি স্তু মহাফলা॥

অর্থাৎ বৈধ মাংস ভক্ষণে, বৈধ মদ্য পানে, বৈধ মৈথুনে দোষ নাই, ভক্ষণ, পান, মৈথুনাদি বিষয়ে জীবের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি থাকে, পরন্তু এই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি হওয়াই মহা পুণ্যজনক।

স্বভাবতঃ, জীবের স্থূল বিষয়-সম্ভোগের আসক্তিই যখন অধিক, তখন অবৈধভাবে বিষয়াদি সম্ভোগ না করিয়া বৈধভাবে উপভোগ করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বশতঃ জীব নিবৃত্তি মার্গে উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যাহারা চিত্ত নিরোধ দ্বারা শান্তির প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই বর্ণাশ্রমোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কারণ বর্ণাশ্রমই জীবের বৈধ এবং অবৈধ কর্ম্ম-কলাপের বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রও এই কথা বলিয়াছেন যথা :—

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাং॥

ভাগবৎ—১১-১০ অঃ ৪

অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাদের নিষ্কাম নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব বিচারে যখন চিত্ত নিরন্তর নিবিষ্ট থাকিবে, তখন আর

নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক নাই। *

বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানে অভ্যাস গুণে চিত্ত আত্মানাত্ম বিচারে অগ্রসর হয়, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে চিত্ত আর তখন লোলুপ হয় না, যাবতীয় বিষয় বাসনা দূরে সরিয়া যায়, এবং বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই বৈরাগ্যমার্গই স্বরূপ সিদ্ধির সোপান স্বরূপ।

এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই ভারতের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীতায় ভারতবাসী একদিন কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল বিষয়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আজকাল এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অনাদর করিয়া যাহারা পরধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহারা ঘোর ভ্রান্ত। মানব নিজ নিজ অধিকারানুরূপ বর্ণোচিত ধর্ম্ম সম্পাদনে যেরূপ আত্মোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়, অভিমান বশতঃ পরকীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সেরূপ কদাচ হইতে পারে না। পরকীয় বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যিনি যতই নৈপুণ্য প্রকাশ করুন না কেন, কিছুতেই তাহার শ্রেয় লাভের সম্ভাবনা নাই, বরং পরকীয় অনুকরণ প্রিয়তায় পর ও স্ব-সমাজে যে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু ইহাদিগের এরূপ মোহ, এরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াও অনুকরণ প্রবৃত্তির কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। ইহাকেই বলে কালের প্রভাব।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

* শ্রীযোগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ ও আভাষ।

শক্তি-পূজা।

শক্তি প্রধান পুরাণাদিতে কথিত আছে, শক্তি হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট; শক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের প্রসবিত্রী।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ॥

[দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী]

(হে ভগবতি) তুমি আমার (ব্রহ্মার) বিষ্ণুর এবং শিবের শরীর উৎপাদন করিয়াছ! অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম?

বেদের মতে পরমপুরুষ প্রজাপতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মনু বলেন,—নারী ও পুরুষ হইতে সমুদায় উৎপন্ন।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

[মনুসংহিতা]

মনুর মত আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও, সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, মনুসংহিতার এই নারী পুরাণাদির শক্তি একই। মনুসংহিতার এই পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি, জড় ও চেতন, নাম ও রূপ, Matter ও Mind প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে। যে যে নামেই অভিহিত করুক না কেন, সকল শাস্ত্রেরই বক্তব্য প্রায় এক। আবার এই পুরুষ ও প্রকৃতি বা শিব ও শক্তি এই দুইটীও বিভিন্ন নাম নয়, একই,—কেবল বুঝিবার সুবিধার

জন্য ভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অগ্নি বলিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে যেমন উহার দাহিকা শক্তিও বুঝিয়া থাকি, দাহিকা শক্তি ব্যতীত আমরা যেমন অগ্নি কল্পনাও করিতে পারি না, প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষেরও তেমনি কোনও পৃথক সত্তা থাকে না।

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া সা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥

[নারদ পঞ্চরাত্র]

ঈশ্বরের দুই রূপ। এক রূপ স্ত্রী, তিনি বিষ্ণুমায়া বা আদ্যাশক্তি; এবং অপর রূপ পুরুষ, তিনি বিভু স্বয়ং।

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।"

[দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী]

এই পুরুষরূপী বিভু তাঁহার স্ত্রীরূপিনী শক্তির দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করিতেছেন।

কোন্ সময় হইতে যে এই শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে পুরাণাদি পাঠে যতদূর জানা যায়,তাহাতে বোধ হয় সৃষ্টির প্রথম হইতেই শক্তিপূজা চলিয়া আসিতেছে। অধুনা আমরা প্রতিমাদিতে শক্তি পূজা করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সময়ে এই প্রতিমা পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। মনুর সময়ে পৌরাণিক ধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। মনুসংহিতায় শিব ও ভদ্রকালীর নাম দেব সংখ্যার মধ্যে ছিল বটে; কিন্তু তাঁহাদের উপাসনা তত প্রবল ছিল না। পরে পুরাণ ও তন্ত্রে ইহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। সকল পুরাণ শক্ত্যুপাসনা প্রবর্ত্তক নহে। শক্তিমাহাত্ম্যপূর্ণ পুরাণ, উপপুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, নন্দী, মাহেশ্বর, দেবী ভাগবত ও কালিকা সমধিক প্রসিদ্ধ। তন্ত্রগুলি সমস্তই শিবশক্তি প্রধান। এগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে প্রচলিত তন্ত্রগুলির মধ্যে নির্ব্বাণ, কুলাবতী, কালীবিলাস, কামাখ্যা, বিশ্বসার, চূড়ামণি, সারদা তিলক, কুলার্ণব, যোগিনী, রুদ্রযামল ও গৌতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি, মন্বন্তর, পীঠস্থানের বর্ণনা ও আদ্যাশক্তি মাহাত্ম্য বর্ণনা ব্যতীত তন্ত্রে অন্তর্যোগ, শিব ও শক্তি পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্রে কথিত আছে সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে শক্তি পূজা চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি করণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা প্রথমে মহামায়া আদ্যাশক্তির পূজা করেন, পরে তিনি পৃথিবী মনুষ্যাদি সৃজন করিতে সমর্থ হন। ইহার পর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন।

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে॥
মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুর প্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্ব্বাসসা পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈ দেবৈশ্চ মনুমানবৈঃ।
পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা॥

[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ]

সৃষ্টির আদিতে গোলোক এবং বৃন্দাবনে পরমাত্মা কৃষ্ণ কর্তৃক দেবী প্রথমে পূজিতা হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, মধুকৈটভ ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মা দেবীর পূজা করেন। তৃতীয়তঃ, ত্রিপুরারি ও চতুর্থে দুর্ব্বাসা শাপে শ্রীভ্রষ্ট ইন্দ্র কর্তৃক দেবী পূজিতা হন। পরে মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র, দেবগণ ও মনুমানবগণ কর্তৃক সমস্ত পৃথিবীতে দেবী-পূজা প্রচলিত হয়।

কথিত আছে—দুর্দ্দান্ত অসুরগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে, ভক্তগণ অসুরদমনে অক্ষম হইয়া দেবীর আরাধনা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। কখন কখন বা দেবী স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়া অসুর ধ্বংস করেন। তদবধি দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥
পুনশ্চাহ যদাভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয় ষট্‌পদং॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥

[দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী]

দেবী বলিতেছেন,—দুর্গমাখ্য মহাসুরকে বধ করিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হইব। পুনশ্চ হিমাচলে মুনিগণকে রক্ষা করিবার জন্য যখন আমি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া, রাক্ষসগণকে নাশ করিব, মুনিগণ বিনম্রমূর্ত্তিতে তখন আমার স্তব করিবে; এবং সেই ভীমারূপা হেতু আমার নাম ভীমাদেবী হইবে। যখন অরুণাক্ষ্য অসুর ত্রৈলোক্যে মহা উৎপাত করিতে থাকিবে, আমি তখন অসংখ্য ভ্রমর সমন্বিত ভ্রমরময় রূপ ধারণ করিয়া, ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য, সেই মহাসুরকে বধ করিব। এই সময়ে সর্ব্বত্র লোকে আমায় ভ্রামরী নামে স্তব করিতে থাকিবে।

অধুনা বঙ্গদেশে যতগুলি শক্তিপূজার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে 'দুর্গোৎসব, কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজা উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে,—সুরথ রাজা প্রথমে এই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। তারপর রাবণ-বধ কামনায় ভগবান রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। দুর্গা-প্রতিমায় আমাদের সচরাচর যে মূর্ত্তি গঠন করা হয়, তাহা দেবীমাহাত্ম্যান্তর্গত মহিষাসুর বধেরই একটী দৃশ্য। কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজা কোন্ সময়ে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কিছুই জানা যায় না। তবে আমাদের দেশে দেবীর যেরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাতে বোধ হয়, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীই উহার মূল। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া, "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ" ইত্যাদি বাক্যে দেবীর স্তব করিতে থাকেন। পার্ব্বতী তখন সেই হিমালয়-প্রদেশে স্তবাদিযুক্ত দেবতাদিগের সমীপে জাহ্নবীজলে স্নানার্থ আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কাহার স্তব করিতেছ?" এই প্রশ্ন করিবার পরক্ষণেই সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষময়

শরীর হইতে শিবারূপিনী এক দেবীমূর্ত্তি সমুদ্ভূতা হইয়া, প্রত্যুত্তরে বলেন,—"এই সকল দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আমারই স্তব করিতেছে।" পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া অম্বিকার অপর নাম কৌষিকী।

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া॥

[দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী]

শরীরকোষ হইতে কৌষিকী নির্গতা হওয়ায়, হিমালয়াশ্রিতা পার্ব্বতীও কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তিনি কালিকা নামে খ্যাতা হয়েন। চণ্ডীর আর একস্থানে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ড-মুণ্ড পুরোবর্ত্তী চতুরঙ্গ-বল-সমন্বিত দৈত্যগণ দেবীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উদ্যম করিলে দেবী অত্যন্ত কুপিতা হয়েন।

কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা॥
ভ্রুকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্রুতম্।
কালীকরালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥

[দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী]

কোপে তাঁহার বদন রক্তিমাকার ধারণ করে, এবং তাঁহার ভ্রুকুটী সঙ্কুচিত ললাটদেশ হইতে অসি ও পাশাস্ত্রধারিণী ভীষণাননা কালীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। আমাদের দেশে রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী ও শ্মশানকালী প্রভৃতি বিভিন্ন কালীমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও পূজিতা হইয়া থাকেন। কোন্ সময়ে হইতে যে এই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নিশ্চিয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্॥
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে॥

[দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী]

শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য বিনাস করিবার অভিপ্রায়ে, শৈলশিখরে সিংহাসনারূঢ়া হইয়া যে জগন্মোহিনী মূর্ত্তিতে অম্বিকাদেবী দৈত্যগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ দেবীর মূর্ত্তি জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা। এই রক্তবর্ণা জগাদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি জগন্মোহিনী-মূর্ত্তি নহে; উহা রণমূর্ত্তি। চণ্ড-মুণ্ড দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালীন দেবীর বদন মসীবর্ণ হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই এই রক্তবর্ণা জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তির কল্পনা। দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী ব্যতীত আমরা অন্নপূর্ণা, সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি অনেকানেক শক্তিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও পূজা করিয়া থাকি। এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের মূলভিত্তি—পুরাণ।

অধুনা বঙ্গদেশেই শক্তিপূজার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য দেশে যে শক্তিপূজার প্রচলন নাই, এমন কথা আমি বলি না। তবে বঙ্গদেশে মৃণ্ময়ী প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করিয়া যেরূপ আড়ম্বরের সহিত শক্তিপূজার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, অন্যত্র শক্তিপূজার ততটা উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিমাঞ্চলে দেখিতে পাই,—শারদীয়া উৎসবে শক্তিপূজার যত আয়োজন হউক আর না-ই হউক, রামলীলার অনুষ্ঠান অত্যন্ত অধিক। যে বঙ্গদেশ শাক্ত-বিরোধী বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি

স্থান, সেই বঙ্গদেশেই বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অধিক—ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভুল।

(১)

বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হরি,
তুমি যে রয়েছ যুড়ি,
আমার আমিত্ব হেথা নৈশ-স্বপ্ন ভুল ;
তুমি নাথ মহাসিন্ধু,
আমি যে বিন্দুর বিন্দু,
তুমি বিনা আমি ভিন্ন এ যে মহাভুল ;

(২)

অনন্ত তারকাবলি,
ভ্রাম্যমান্ গ্রহগুলি,
তোমারি অচিন্ত্য-কীর্ত্তি ঘোষে অনিবার ;
কি সমুচ্চ হিমগিরি,
লবণ-সিন্ধুর বারি,
অনন্ত মহিমা তব করিছে প্রচার।

(৩)

তোমারি পবিত্র গেহ,
এ বিশাল বিশ্বদেহ,
তাহে বাস করি, কিন্তু না চিনি তোমায় ;
থাকিয়ে তোমারি কোলে,
কি যেন মোহের ভুলে,
খেলার পুতুল নিয়ে দিন কেটে যায়।

(৪)

অনিল-অনল-জল,
অন্ন-বস্ত্র ফুল-ফল,
তোমারি করুণালব্ধ, পুণ্য পারাবার ;
বসতি সাগরকুলে,
তথাপি মনের ভুলে,
মহাসিন্ধুপানে দৃষ্টি নাহি একবার।

(৫)

সুনীল গগন প'রে,
চন্দ্র সূর্য্য আলো ধ'রে,
তোমারি আদেশে করে তমঃ নিবারণ ;
তোমারি মেঘের জলে,
ধরায় অমৃত ফলে,
পান করি সেই সুধা বাঁচে অকিঞ্চন।

(৬)

জননীর বক্ষে হরি,
কত সুধা দিছ ভরি,
মাতৃস্নেহ স্তন্যধারা এ বিশ্বে অতুল ;
তোমারি করুণাধার,
আমার জীবন সার,
তথাপি না লুটি শির ও চরণমূল !
না ভাবি তোমায় নাথ ! কি বিষম ভুল।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

বিরহে

অহো হেরিলাম কিবা চকিতের প্রায়,
কোথা পুনঃ লুকায়ে রহিল।
দামিনী খেলিয়া গেল হৃদয়ে আমার,
প্রাণ মোর পুলকে মাতিল ॥

কত সোহাগের ভরে কত প্রেম আশা
হৃদে রেখে অটুট বন্ধন।
নিয়ে ছল ছল আঁখি প্রাণে প্রাণ দিয়ে
করিলাম গাঢ় আলিঙ্গন ॥
কত গাঢ় সুখ শান্তি ভাষা না যুয়ায়
প্রকাশিব কেমনে বা আমি।
জানে শুধু সেইজন যাঁর তরে প্রাণ
যিনি মোর হৃদয়ের স্বামী ॥
হৃদে মোর হৃদি দিয়ে জড়ায়ে রাখিনু
কভু যেন বিচ্ছেদ না সই।
ক্ষণকাল পরে কিন্তু কোথা চলে গেল
খুঁজে খুঁজে ক্লিষ্ট অতি হই ॥
মাঝে মাঝে পাই দেখা আবার বিচ্ছেদ
এক পলে অযুত বৎসর।
তবু এক শান্তি আছে— সেই গাঢ় সুখ
হৃদে তাঁর জাগে নিরন্তর ॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত মহলানবীশ।

পুনর্মিলন

(গল্প)

১

আজ দোল-পূর্ণিমা; কাঞ্চন গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াগণ মাতোয়ারা প্রাণে হোলি-খেলা খেলিতেছে। শ্যামসুন্দরদেবের মন্দির আজ উৎসবে মুখরিত।

কাঞ্চন গ্রামের জমিদার যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। শ্যামসুন্দরদেব তাঁহাদের কুলদেবতা। এই জমিদার-বংশ অতি পুরাতন বনিয়াদী ঘর; যিনি এই বিস্তৃত জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক শ্যামসুন্দর দেবের এই বিগ্রহ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

শ্যামসুন্দর দর্শনের জন্য আজ মন্দির লোকে লোকারণ্য। প্রাতঃকাল হইতে বহু লোক-সমাগম হইয়াছে। জমিদার মহাশয়ের এক-মাত্র পুত্র অনিলকুমার সহচরগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদের মন্দির সংলগ্ন প্রাসাদ হইতে এই বিশাল জনতা দেখিতেছিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইল দেখিয়া সহচরগণকে স্নানের উদ্যোগ করিতে বলিলেন।

বন্ধুগণ চলিয়া গেলে, অনিলকুমার মন্দির মধ্যস্থ শ্যামসুন্দরের অপরূপ ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তিনি যতই সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় কি এক অভিনব স্বর্গীয় উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল; দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। তিনি গদগদস্বরে ভক্তিপ্লুত-কণ্ঠে বলিলেন—"দেব! আর কেন নরকের পথে লইয়া যাও, সুমতি দাও প্রভু! বুঝিয়াছি, পাপে কখনও শান্তি নাই; বুঝিয়াছি, রূপতৃষা কেবল জ্বালাময়। বুঝিয়াও, জানিয়াও কেন চিত্তসংযম করিতে পারিতেছি না! পাপীর হৃদয়ের তিমির কি কখনও নাশ হইবে না—ধাঁধাঁ কি কখনও ছুটিবে না?" এইরূপে অনিলকুমার দেবচরণে অন্তরের আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, সহসা নাটমন্দিরের মধ্যে একটী অনিন্দ্যসুন্দরী

যুবতী তাঁহার নয়নগোচর হইল। এমন অসীম সুকুমার সৌন্দর্য্য, এমন নয়ন-মনোমুগ্ধকরী স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল মাধুর্য্যময়ী প্রতিমা আর কখনও তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। যুবতী সমস্ত দেহ নীলাভ চিক্কণ বস্ত্রে আবৃত্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অয়স্কান্তমণি যেমন খনিগর্ভ হইতে কিরণ বিকীরণ করে, যুবতীর রূপের প্রভাও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সুন্দরী শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরের সম্মুখীন হইলেন। অনিলকুমার যুবতীর রূপসুধা পান করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন, এক্ষণে সেই পূর্ণোজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি সদৃশ অপরূপ আননের উপমাবিহীন লাবণ্যছটায়, চরণচুম্বিত নিবিড়-কৃষ্ণ কুন্তলদাম শোভায়, স্বর্গীয় সুধাপরিপূরিত সুপক্কবিম্ব-রক্তাধর আভায়, সফরীর ন্যায় নৃত্যশীল চঞ্চল নীলকান্তি তারকাদ্বয় দর্শনে তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল ; চারিচক্ষের মিলনে তাহার হৃদয়ে যেন তড়িৎ প্রবাহিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—মরিতে হয়—মরিব ; পাপে মজিতে হয়—মজিব ; এই দুর্ল্লভা অপ্সরাকে কখনই ছাড়া হইবে না।

যুবতী শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া সঙ্গিনী পরিচারিকার সহিত মন্থরগমনে মন্দির প্রাঙ্গন অতিক্রম করতঃ অনিলকুমারের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন। রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনিল নির্নিমেষ-নয়নে সেই সুন্দরী-প্রতিমা যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে সুন্দরী যখন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল, তখন তিনি একটী গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

ইত্যবসরে সহচরগণ স্নানের নিমিত্ত অনিলকুমারকে ডাকিতে আসিল। অনিল সকলকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, প্রিয়সঙ্গী বসন্তকে সঙ্গে লইয়া একটী নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে উভয়ে প্রফুল্লমনে ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গিগণকে লইয়া হাসিতে হাসিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

২

অদ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা ; মধুর পূর্ণচন্দ্র হাসিতে হাসিতে আকাশের কোলে দেখা দিয়াছে। অসীম সৌন্দর্য্য জগতের গায়ে গায়ে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে জ্যোৎস্না, ধরাতলে জ্যোৎস্না, শ্যামসুন্দরের বিশাল মন্দিরশ্রেণী জ্যোৎস্না-প্রবাহে যেন হাসিতেছে। স্তরে স্তরে ফুল ফুটিয়াছে। পাপিয়া, দোয়েল, কোকিল প্রভৃতি পাখিগণ মধুর ঝঙ্কারে সমস্ত বিশ্বে বসন্তের শুভাগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। বাসন্তী-মিলনে, বসন্ত-উৎসবের মধুর হিল্লোলে আজ মধুর সায়াহ্নে পূর্ণ হোলি উৎসব। গত কল্য বহ্ন্যুৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বহিঃতিমির নাশ করতঃ শ্যামসুন্দর ভক্তের হৃদয়ের তিমিরও নাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তিযুগল আজ দোলমঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন। কলির দোদুল্যমান সন্দেহ নিষ্পীড়ন করতঃ ভক্তকে ভক্তিপথ দেখাইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

কাঞ্চন গ্রামের দেবালয় সমূহে খোল-করতাল, কাঁসর, শঙ্খ ও ঘণ্টারবের সহিত মহা সমারোহে সবেমাত্র আরতি শেষ হইয়াছে।

দলে দলে গ্রামবাসিগণ আরতি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। জমিদারের সমুন্নত প্রাসাদশ্রেণী আলোকমালা ও পত্রপুষ্পদামে সুসজ্জীকৃত হইয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই বালকের দল আসর জমকাইয়া নাট-মন্দিরের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বসিয়াছে। অনেক সুন্দরী নর্ত্তকী বিলাসভঙ্গী করিয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল :—

"ফাগু খেলত নব নাগর রায়।
রাধারঙ্গিনী বহুবিধ গায়॥
হাসি হাসি সুন্দরী মন্মথ রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারিয়ে নাগর অঙ্গে॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহঁ গোরী॥
ফাগু দেওল হরি লোচনে জোর।
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক গুণ করে গান॥"

নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গিতে, সুমধুর স্বরলহরীতে দর্শক মণ্ডলীর প্রাণ বিভোর হইয়া যাইতেছিল। জমিদার যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র সভায় সমাসীন; এবং তৎপার্শ্বে জমিদারবংশের চিরন্তন প্রথা অনুসারে তদীয় পুত্র অনিলকুমারও উপবিষ্ট। কিন্তু আজ যেন তাহার কিছুতেই সোয়াস্তি নাই, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্কে কি মহাচিন্তায় নিমগ্ন। এমন মন-প্রাণ পরিতৃপ্তিকর সংগীত-সোমরস তাহার ভাল লাগিতেছে না। সন্ধ্যা-কুসুম-সুরভি-প্রবাহে আনন্দিত হইয়া জমিদার বাটীর নর-নারীগণ হোলি খেলিতে খেলিতে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন আনন্দে দেব-মণ্ডপ মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। ক্রমে গৃহে, প্রাসাদে, কুঞ্জে, কুটীরে সর্ব্বত্র আবির উৎসবে লালে লাল হইতে লাগিল। মৃদুল পবন সর্ব্বাঙ্গে আবির মাখিয়া আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। জগন্মোহিনী রাইকিশোরীর হৃদয়ে আজ প্রেমের মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া জগৎবাসীকে আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছে। এ আনন্দে কে স্থির থাকিতে পারে? ভক্তগণ শ্যামসুন্দরের বরবপু আবিরে ঢাকিয়া দিল, সেই আবির বাতাসে উড়িয়া শ্যামসোহাগিনীর অঙ্গে পড়িতে লাগিল; শ্যামচাঁদের কাল অঙ্গ আজ রাঙা সাজে বেশ সাজিয়াছে; মনে হয়, যেন নীল আকাশের গায়ে রক্তিম মেঘের উদয় হইয়া স্বর্ণবর্ণ রূপের ছটায় পৃথিবীকে এক অপরূপ শোভায় শোভান্বিত করিয়াছে। এইভাবে রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত হইলে নৃত্য-গীত বন্ধ হইল। জমিদার মহাশয়ের সহিত অনিলকুমার চলিয়া গেলেন।

(৩)

পল্লীর পথ জন-মানব-শূন্য। আম, কাঁঠাল, জাম, বট, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষের মধ্যে আঁকা বাঁকা সংকীর্ণ পথে চন্দ্রদেব আকাশ হইতে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত; এমন সময়ে দুইজন লোক ধীরে ধীরে ভাগীরথীর ঘাটে যাইবার পথ ধরিয়া চলিতেছিল। কিছুদূর যাইবার পর প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"ভাই বসন্ত! তাহাকে দেখিয়া অবধি

আমি পাগলের মত হইয়াছি।”

পশ্চাৎগামী সঙ্গী উত্তর দিল,—ভয় নাই, অনিল! পাখী যখন ফাঁদে পা দিয়াছে, তখন ধরা পড়িবেই।

শ্যামসুন্দর দেবের মন্দিরে অনিল যে সুন্দরীকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিল, যাহাকে পাইবার জন্য অনিলের মন সর্ব্বদা ব্যস্ত, বসন্তের সঙ্গে এক্ষণে তাহারই কথা হইতেছিল।

অনিল। যতই কেন কঠিন হউক না, ভাই তুমি যে এ কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। এখন বল দেখি আমার এ আশা মিটাইবার কি উপায় করিয়াছ। বজরায় গিয়া তাহার দেখা পাইব ত?

অনিলের কথা শুনিয়া বসন্ত একটুক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; কিছুক্ষণ পরে অনিলকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—“অনিল। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সহায়তা করিতেছি; বস্তুতঃ তাহা নহে। আমি তোমাকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেছি। তুমি দিন দিন পাপের পথে—নরকের পথে বেগে প্রধাবিত হইতেছ। সে কথা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে; মনে কর—তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ। কত জনের হৃদয়ের মণি চুরি করিয়াছ, কত জনের শান্তির নিকেতন ছারখার করিয়া শ্মশান-অনল জ্বালিয়া দিয়াছ! মূঢ় আমি, এতদিন জানিয়া বুঝিয়াও তোমায় ছাড়িতে পারি নাই। কেন পারি নাই জানি না; বন্ধুত্বের এত আকর্ষণ পূর্ব্বে জানিতাম না, সকালে যখন তুমি আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া সেই রমণীর কথা বলিলে, এবং তাহার পরিচারিকার নিকট সন্ধান লইতে বলিলে, সত্যই তখন আমার হৃদয় একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তুমি বুঝিবে না। ইহার ভিতর একটা অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিবার আছে, সে সুখের কথা মনে করিলে তাহার কাছে আমার স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ বোধ হয়। সে রমণীর পরিচয় আমি এক্ষণে দিব না। শুন অনিল! তুমি এতদিন তোমার অনন্ত নরকের পথ বেশ প্রশস্ত করিয়াছ; আর অগ্রসর হইও না। প্রতিদিন কত শত নূতন পাপের পথে তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, আমি পাপের নিত্য সহচর হইয়াছি; কিন্তু আজ আমার পূর্ব্ব স্মৃতি, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অনিল! অনিল!! প্রাণের অনিল! আর না, বিদায় দাও ভাই আমি চলিয়া যাই।”—প্রাণের আবেগে বলিতে বলিতে বসন্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বসন্ত আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া বুকে হাত দিয়া সেই সংকীর্ণ পথের ধারে বসিয়া পড়িল।

প্রশান্ত নীলাম্বর তল হইতে হাসিতে হাসিতে পূর্ণিমার চাঁদ গাছের পাতার ভিতর দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। অনিল সেই নীরব অম্বর তলে স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার চক্ষের সামনে দিয়া যেন একটা যুগ চলিয়া যাইতেছিল; বহুক্ষণ পরে সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“তোমার

ভালবাসা, তোমার অপার্থিব প্রেম, জগতে দুর্লভ! আমি বনের পশু, রত্নহারের আদর করিতে শিখি নাই। আমার সংস্পর্শে তোমার পবিত্র চরিত্র নিন্দিত হইয়াছে. চল ভাই, ফিরে চল! আমি আজ হইতে ভাল হইব। পাপপথে আর অগ্রসর হইব না।"

অনিল এতক্ষণ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, অদূরে কাননের কোল হইতে পাপিয়া পিউ-পিউ করিয়া সাড়া দিল।

বসন্ত অনিলকে ডাকিল, অনিল উত্তর দিল "কি।"

বসন্ত। আর মায়া বাড়াইও না; কেন আর এত করিয়া আমায় মায়ার বাঁধনে বাঁধিতে চাও। বহুকষ্টে শিকল কাটিয়াছি, আর না অনিল, আর অনুরোধ করিও না; প্রীত মনে বিদায় দাও ভাই। যেখানে যাই, যেখানেই থাকি,—তুমি আমার।

অনিল। বসন্ত, ক্ষমা কর ভাই; তোমায় আমি প্রাণ ধরিয়া কিছুতেই বিদায় দিতে পারিব না। এস ভাই, আমরা ফিরে যাই।

বসন্ত। না, আর কাঞ্চন গ্রামে যাইব না, ভাই আমায় বিদায় দাও। বড় তাড়াতাড়ি বড় ব্যস্ততার সহিত বিদায় লইতে হইতেছে, ক্ষমা ক'রো। প্রাণের সুহৃদ অনিল! আমার এ বিদায়ে বড় আনন্দ। তোমার পঙ্কিল হৃদয় যে নির্ম্মল হইয়াছে, এ সুখ রাখিবার আমার স্থান নাই। তবে চলিলাম—অনিল! আবার যদি কখনও এ জীবনে দেখা হয়, তাহা হইলে যেন বন্ধু বলে মনে করিও। আর যাইবার সময় বলে যাই, আমার এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা কর—যে পাপীয়সীর হলাহল-মদিরা পানে বিভোর হইয়া স্বর্গীয় প্রতিমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই দানবী মোহিনীকে পরিত্যাগ করতঃ সতী সাধ্বী দেবী মূর্ত্তি বনবালাকে হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিও। সঙ্গীত গাহিতে না পারার সামান্য অপরাধে হৃদয়-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইতে পারে না।

এই বলিয়া বসন্ত আবিল জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনভূমির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, অনিল ততক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, যখন আর দেখা গেল না, তখন একটা হতাশ ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পথের ধারের আম্রবৃক্ষমূলে নীরবে বসিয়া পড়িল। পূর্ব্বকথা, পূর্ব্বেকার খেলা ধুলা, আহার বিহার, সকল কথা একে একে তাহার মনে পাড়তে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতীত হওয়ার পর ভাবিল,—বসন্ত ত চিরদিনের মত আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তবে বৃথা আর এখানে বসিয়া থাকিয়া ফল কি, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, ফিরিয়া যাই, আর কুকর্ম্মে কিছুতেই রত হইব না।

অনিল ধীরে ধীরে কয়েক পদ মাত্র গ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় তাহার সম্মুখ দিয়া সন্ সন্ করিয়া কি একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার চলিয়া গেল। তড়িৎভাবে অনিল পথের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, অমনি সেই মুহূর্ত্তে শিবাগণ উচ্চৈঃস্বরে চারি-দিক হইতে কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে মনে ভাবিল—কাঞ্চনগ্রামে না গিয়া গঙ্গা-মাকে

দর্শন করিয়া আসি, যদি এ জালাময় প্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তি পাই।

বনভূমির সংকীর্ণ পথ ছাড়িয়া অনিল পুণ্য-তোয়ার প্রশস্ত পথ ধরিয়া ঘাটের দিকে চলিল। মাথার উপর পূর্ণ সুধাংশু কনক-কিরণ বিলাইতেছিল, চকোর-চকোরী অমিয়-বিভোর হইয়া গগন-বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল; অদূরে জাহ্নবী-তরঙ্গে সহস্র সহস্র চাঁদিমা ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু প্রকৃতিরাণীর এ সৌন্দর্য্য অনিলের মোটেই ভাল লাগিল না। সে উদাসভাবে ধীরে ধীরে গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। তাহার কি যেন কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে,জগত খুঁজিয়াও আর যেন তাহা পাইতেছে না।

৪

অনিল গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইল। তথায় বজরা দেখিতে পাইল। অমনি তাহার শরীর একটা অজানিত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। দেহে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। অনিল আস্তে আস্তে কম্পিতপদে বজরায় গিয়া উঠিল। মাঝিরা ছাদের উপর উদাস মনে আপনার প্রিয় পরিজনের ভাবনায় বিভোর ছিল; কেহ বা তামাকু পান করিতেছিল, সহসা এক ব্যক্তিকে বজরায় উঠিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল,—"কোন্ হায় রে?"

অনিল চমকিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মাঝি অনিলকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল। অন্যান্য মাঝিগণও তাহার অনুকরণ করিল। একজন ক্ষিপ্রহস্তে বজরার দ্বারের চাবি খুলিয়া দিল।

অনিল বজরার ভিতরের একটী কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, সেই কক্ষের ক্ষুদ্র গবাক্ষ উন্মুক্ত করতঃ ভীতিবিহ্বল চিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আস্তে আস্তে শয্যায় শয়ন করিল। মলয় পবন ঝির ঝির করিয়া বহিতে লাগিল। ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া পূর্ণ সুধাংশু তাহার স্বর্গীয় সুধা ছড়াইতে লাগিল। অনিল শীঘ্রই ঘুমাইয়া

অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, বজরা স্রোতের অনুকূলে বহুদূর ভাসিয়া আসিয়াছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে,এমন সময় অনিলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন—বজরা তর্ তর্ বেগে চলিতেছে। বজরা ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সুন্দরীর কথা অনিলের মনে পড়িল! একটু ইতস্ততঃ করিয়া পার্শ্বের কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিল—সুনির্ম্মল চন্দ্র-কর-রশ্মিতে প্রকোষ্ঠটী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, পালঙ্কোপরি সুন্দরী নিদ্রা যাইতেছেন। জ্যোৎস্না বিধৌত মুখ-খানির উপর চাহিবামাত্র অনিল শিহরিয়া উঠিল। তাহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। সে প্রাণ ভরিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। সহসা সুন্দরীর বিম্বাধর দু'টী ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, আকর্ণ বিস্তৃত নীলোৎপল নয়ন দুটী উন্মীলিত হইল—যুবতী জাগরিত হইলেন। অনিল অপ্রতিভ হইয়া কিংকর্ত্তব্যভাবে পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া রহিল। সুন্দরী তাহার পার্শ্বে এই প্রকার অবস্থায় অনিলকে থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এখানে কিরূপভাবে আসিলে?

অনিল ভীতিবিহ্বলচিত্তে ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"আমার অপরাধের ক্ষমা হইবে কি না জানি না; আমি না বলিয়া তস্করের ন্যায় আপনার বজরায় আসিয়া ভদ্রতার বিরুদ্ধে নিতান্ত অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। দোষ লইবেন না, এই প্রার্থনা।"

সুন্দরী। তোমার হেঁয়ালি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সকল কথা পরিষ্কার করিয়া না বলিলে কি জন্য, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

অনিল। সত্যকথা বলিতেছি, লুকাইব না, আমি আপনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে আজ শ্যামসুন্দর দেবের মন্দিরে দেখা অবধি আমি আত্মহারা, তাই আপনাকে পাইবার আশায়, অন্যের অলক্ষ্যে এই বজরায় আসিয়া পার্শ্বের কক্ষে লুকাইয়া ছিলাম।

সুন্দরী। আমার জন্য কেন তুমি এত কষ্ট করিলে। যদি তুমি একতিলের নিমিত্তও আমাকে শ্রীপদে স্থান প্রদান কর, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয়। সত্যই কি তুমি আবার আমায় ভালবাসিতে পারিয়াছ? ঈশ্বর জানেন যদি তুমি আমায় ভালবেসে থাক—তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। যখন তোমার চক্ষের সহিত আমার চক্ষু মিলিয়াছে, তখন হইতেই তোমার জন্মান্তরীণ আকর্ষণে ভালবাসিয়াছি। কেন বাসিয়াছি, ভালবাসায় কি সুখ আছে, তাহার প্রতিদান পাইলে কি সুখ হয়, আমি তাহা জানি না, বুঝি না, বুঝিতে ইচ্ছাও করি না।

বলিতে বলিতে সুন্দরীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুই বিন্দু প্রতপ্ত অশ্রু তাহার সেই রক্তিম গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া গড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সুন্দরী আবার বলিতে লাগিলেন—ভালবাসা দেখাইবার নয়। যদি দেখাইবার হইত তাহা হইলে দেখাইতাম, হৃদয়ের পরতে পরতে তোমার সুন্দর মূর্ত্তি কিরূপভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

অনিল। প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে ক্ষমা কর, জীবনে মরণে তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আমায় ভালবাস আর আমি তোমায় ভালবাসি না—ইহা কি প্রণয়ের রীতি?

এই বলিয়া অনিল তাহার হেমকান্তি বাহুযুগল দ্বারা সুন্দরীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিল। স্পর্শে উভয়ের শরীরে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল। প্রেম-কারুণ্য-কণ্ঠে, প্রেম-ভাষা-বিজড়িত কথায় প্রেমালস আকুলিত মধুর আলিঙ্গনে উভয়ের প্রাণে প্রেমের তুফান উঠিল। সেই সময় কোথা হইতে একটা অজানা ভাগীরথী-স্পর্শী শীতল বায়ু আসিয়া উভয়কে অভিষিক্ত করিয়া দিল। চন্দ্রকরোজ্জ্বল মধুর পবনে উভয়ের সৌন্দর্য্য-তরঙ্গলীলা উভয়ের চক্ষের উপর খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনিল সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"প্রিয়তমে! এই প্রেমের বাসরে, প্রীতির পাথারে, মধুর উৎসবে আজ একটী গান কর—আমাদের এই প্রেমের বাসর

পূর্ণ হউক। সেই কথা, হায়! আবার সেই পুরাতন কথা। সুন্দরী বীণা কোলে তুলিয়া লইয়া একবার দুইবার তিনবার গাহিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গীতের দুই একটী করিয়া কথা বহু কষ্টে কম্পিত কণ্ঠে বাহির হইল কিন্তু বীণার সঙ্গে কিছুতেই তাহার মিল হইল না।

সরম জড়িত কণ্ঠে সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, পড়িতেছিল আবার ধীরে ধীরে বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছিল; মাঝে মাঝে তালও ভঙ্গ হইতেছিল। সুন্দরী তবু প্রাণপণ যত্নে মরমে মরিয়া প্রিয়তমের প্রীতির জন্য গানটী গাহিতেছিল। শ্রবণ-মধুর না হওয়ায় এক একবার বিরক্ত হইয়া বীণা রাখিয়া দিই মনে করিতেছিল। কিন্তু আবার অনিলের আগ্রহাতিশয় ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া সুন্দরী লজ্জারক্তিম মুখখানি অবনতকরতঃ ধরা গানটী শেষ করিয়া আবার নব উৎসাহে নূতন একটী গান গাহিল—

আকুল করেছে অভাগী পরাণ
নয়ন কোণে ফিরে চাহিতে;
পারি নাকো তাই আশা মিটায়ে
একবার তারে চুমিতে।
বলি বলি করি মরমের কথা
বলিতে সরমে যাইনু মরে—
বলিতে চাহিনা সেত সব বুঝে,
জেনেছি পলকে সে মুখ হেরে।
তবে মোর এত পিয়াসা বা কেন
বাসনার কেন বা তাড়না,—
দেখনু গো আমি, আমিময় সে—
একই হৃদয় অজানা।
অলসে আবেশে ছিনু ঘুম ঘোরে,
কিছু নাহি পারি বুঝিতে।
কামনা জড়িত ভুজ যুগে মোর,
চাহিতাম তারে বাঁধিতে॥

বীণার ঝঙ্কারে কুলু কুলু তরঙ্গে সে মধুর হইতে মধুরতর স্বর-লহরী ভাগীরথীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিগন্তের কোলে মিশাইয়া গেল। সঙ্গীত-সুধা-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া অনিল মন্ত্র-মুগ্ধবৎ হইয়াছিল। এক্ষণে সুন্দরীর চিবুক ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল্লমনে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দরজার অপর দিক হইতে কে অকস্মাৎ বাধা প্রদান করিয়া বলিয়া উঠিল—"ও সব প্রেম ভালবাসার কথা, সুখের দুঃখের কথা একটু পরে হবে গো, একটু চুপ কর দেখি দিদিমণি! আমি বাবুর কাছ থেকে আমার বখসিসটা আদায় করে লই।"

তাহাদের প্রেমালাপের ব্যাঘাত জন্মাইয়া, একটী সুন্দরী রমণী তাহাদের কক্ষে প্রবেশ করিল। অনিল স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিয়া বলিল,—কি বরুণা, তুমি কি জন্য?

বরুণা। বাবু, তেমন কিছু নয়। কাজ সফল করে বখসিস নিতে এসেছি। আমরা দাসী, পরে কি আর আপনাদের পুরাণ কথা মনে থাকবে!

অনিল। বরুণা! তোমার বুদ্ধিতেই আবার এ রত্ন লাভ হয়েছে। তোমার উপকার কখন ভুলিতে পারিব না। ইহার জন্য তোমাকে সুখী করে পারিতোষিক দিব। ভয় কি?

বরুণা। ভয়-ভরসা আপনার হাতে, এখন রত্ন ত পেয়েছেন, আবার বড় আদরের, বড়

কষ্টের জিনিষের কখনও অনাদর ক'র্‌বেন না।

সুন্দরী দুই জনার কথার বিন্দু বিসর্গ কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল; আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—"কি লো, বরুণা তুই কি বল্‌ছিস, তোর কাণ্ডকারখানা দেখে ত আমি অবাক হয়েছি। এ সব যে তোর কীর্ত্তি তা বেশ বুঝেছি! এখন না হয় বখসিসটা আমিই দেবো। সব ব্যাপারটা খুলে বল দেখি কি শুনি।

বরুণা। এখন বলবো না, তা হলে বাবু কিছু দিবেন না। কি জানি যদি মনে না ধরে, রত্নহার ছিড়ে দিয়ে চলে যান। তাহা হইলে ত সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে। আগে বাবু আমায় কি দিবেন দিন, তারপর সব খুলে বল্‌বো।

সুন্দরী। আচ্ছা বরুণা উনি না দেন, আমি তোকে বখসিস দিচ্ছি। দুজনেরই ত সমান লাভ। আমি তোকে সোণার বালা একজোড়া দেবো। তুই বল দেখি ব্যাপারখানা কি? শুন্‌বার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। আর হেয়ালি করিস্ না।

বরুণা। তোমাকে ছাড়িয়া অবধি বাবু কিছুদিন বেশ ছিলেন। তারপর তাঁহার চরিত্র ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। বসন্ত বাবু অনেক বুঝাইয়াও কিছু করিতে পারিলেন না; যৌবনের উদ্দাম ভাবে বিভোর হইয়া বাবু নষ্ট-চরিত্র হইলেন। আদর্শ চরিত্র বসন্ত বাবু বন্ধুর চরিত্রহীনতায় কাতর হইয়া আমায় বলি-লেন,—বরুণা! বনবালার গান শেখা হই-য়াছে কি? এখন সে দেখিতে কেমনটী হই-য়াছে? আমি বলিলাম,—এখন তার রূপের তুলনা হয় না। গানও বেশ শিখিয়াছে। বসন্ত বাবু বলিলেন—এইবার তাঁহাকে দোল দেখাইবার অছিলা করিয়া একবার জমিদার বাটীতে লইয়া এস। দেখি, উভয়ে উভয়কে দেখিয়া চিনিতে পারে কি না? তাঁহারই কথায় আমি তোমায় ছলনা করিয়া শ্যামসুন্দরের মন্দিরে লইয়া আসিলাম, কিন্তু বহুদিনের বিস্মৃত স্মৃতি তোমাদের কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইল না। অনিল চরিত্রহীনতায় পরস্ত্রী ভাবিয়া তোমাকে পাইবার জন্য যখন উদ্বিগ্ন হইলেন, তখন বাবুর বন্ধু বসন্তবাবু উঁহাকে বলিলেন যে, তুমি যাঁহাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছ, তিনি নবদ্বীপের একজন জমীদারের মেয়ে। সংপ্রতি তিনি কাঞ্চনগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। অদ্যই আবার তিনি নবদ্বীপ চলিয়া যাইবেন। গঙ্গার ঘাটে যে বজরা বাঁধা আছে দেখিয়াছ, সেই বজরাই তাঁর। আমি সন্ধান লইয়াছি, তাঁহার সঙ্গে দুই একজন ঝি-চাকর ব্যতীত অন্য কোন লোকজনও নাই। আরও একটা বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে এই যে, শুনিয়াছি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এর নাকি খুব ভালবাসা, তাই তিনি বরুণা ঝিকে সঙ্গে দিয়াছেন। আমি এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। বরুণা ঝিকেও অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া বশ করিয়াছি। তাঁহাদের বজরায় যাইবার পূর্ব্বেই তুমি বজরার পশ্চাৎ দিকে যে কামরা আছে, সেই কামরায় গিয়া লুকাইয়া থাক। বজরা ছাড়িয়া দিলে

তুমি সুন্দরীর সম্মুখে বাহির হইয়া দু'চারটা প্রেমালাপ করিবে, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আর আমিও বরুণার দ্বারা তাঁহার মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি—তিনি এ প্রস্তাবে অনেকটা সম্মত হইয়াছেন।

এখন সেই পরামর্শ মতই সকল কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। আমাদের সংকল্প পূর্ণ হইয়াছে।

তোমাদের বাড়ীতে এসে অবধি তোমার ম্লান মুখখানি দেখে আমার বুক ফেটে যেত। ভাবিতাম—যদি একবার বাবুর সঙ্গে কোন রকমে মিলন করাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কখনও এ মুখখানি ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন না। তুমি যে গান করিতে পারিতে না বলিয়া বাবুর নিকট উপেক্ষিতা হইয়া ছিলে, তাহা আমি জানিতাম। তাই তোমাকে কত কষ্টে জোর করিয়া গান শিখাইয়াছি। এইবার পাখী ধরা পড়িয়াছে। দেখ, যেন আর না পালায়।

অনিলের পার্শ্ব হইতে বনবালা আসিয়া বরুণার গলা ধরিয়া স্নেহ-বিজড়িত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—বরুণা, তুই আমায় এত ভালবাসিস! আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিস? তোর ভালবাসায় আজ আমি যেরূপ সুখী হইলাম, তাহার তুলনায় স্বর্গসুখও অতি তুচ্ছ! তোর এ অপরিশোধনীয় ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও পরিশোধ করিতে পারিব না!

বরুণা। দিদিমণি! আমার কাজ সকল হইয়াছে—আমি চলিলাম। বসন্ত বাবু যেমন বাবুর নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়াছেন, তেমনি আমাকেও তাড়াতাড়ি বিদায় লইতে হইতেছে।

বাবু আমায় দিতে চাহিয়াও কিছু দিতে পারিলে না; তথাপি আমি যাবার সময় পুরাতন বধূকে নূতন বরণ করে যাই। এই বলিয়া বরুণা তাহার প্রাণপ্রিয় দিদিমণির হস্ত দু'খানিতে দু'গাছি হীরক-বলয় পরাইয়া দিয়া বলিল,—"তবে দিদিমণি এখন আমি বিদায় হই।" এই বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, বজরা হইতে তীরে অবতরণ পূর্ব্বক অতি দ্রুত প্রস্থান করিল।

এতক্ষণ অনিল কেবল বসন্ত বলে পরিচিত দেবীপুরের বাল্যবন্ধু সুধাংশুর নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা ও নিজের পাপের কথা—পূর্ব্বের নির্ম্মল চরিত্রের কথা ভাবিতেছিলেন। অনুতাপের শত বৃশ্চিক দংশনে তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তিনি বরুণা ও বনবালার কথা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে বরুণা সত্যসত্যই চলিয়া গেল দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। অনিল তাড়াতাড়ি বজরার বাহিরে আসিয়া বরুণাকে দেখিতে না পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—বরুণা! বরুণা! এমন করিয়া আমাদিগকে ফেলিয়া যাইও না; আমার আঁখি ফুটিয়াছে, আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আমায় ক্ষমা করে যাও।

দূরে অতিদূরে শুনা গেল—"এইবার তোমাদের মিলন সুখের হউক।"

শ্রীমহেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাস। *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেব নারায়ণ রায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজা দেবনারায়ণের রাজত্বকালে বঙ্গের তাৎকালীন রাজন্যবর্গ তাঁহাকে দেবতুল্য সম্মান করিতেন। তিনি শান্তিপ্রিয়, ধার্ম্মিক ও প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। দীনদরিদ্র প্রজাগণের অভিযোগ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিছুক্ষণ প্রাসাদের সম্মুখস্থ এক সুবৃহৎ নাট্য-মন্দিরে উপবেশন করিতেন। প্রজাগণ নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত অভিযোগ, অনুযোগ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিত, এবং রাজাও তাহাদের সমস্ত কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া তাহাদের অভাব দূরীকরণে ও মঙ্গল-বিধানে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। প্রজাগণ তাঁহাকে সর্ব্ব-দুঃখ-বিনাশন মঙ্গলকারণ ভগবান বোধে পূজা করিত, তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিত। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। প্রজাগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতিবিধানে যত্নপর হইয়া রাজা পল্লীতে পল্লীতে উন্নতচেতা, ধার্ম্মিক বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজব্যয়ে বৈদ্যগণ দুঃস্থ প্রজাবর্গের রোগ-শান্তি করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালাদি অতি নীচ জাতিগণকেও নানা সৎশিক্ষা দান করিয়া ধর্ম্ম-পথের পথিক করিতে প্রয়াসী হইতেন। এই সকল সুবিধানে রাজা দেবনারায়ণের রাজ্য ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার কঠোর শাসন না থাকিলেও প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল বা কুপথগামী হইত না। রাজা দেবনারায়ণ শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি স্বীয় ভবনে অষ্টধাতুনির্ম্মিতা জয়দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর শারদীয় মহোৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ নর নারী, অন্ধ, আতুর, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইত। রাজা সমাগত ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায়কালে পট্টবস্ত্র ও পাথেয় দান করিতেন। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় মণিনাথ গোস্বামী নামক এক সন্ন্যাসী রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজা উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া সন্ন্যাসীকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—আমি শ্রীশ্রী৺গোপালজীউর ভোগ ভিন্ন অন্য খাদ্য

* জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর মলিখিত রাজা বিষ্ণুদাসের বিবরণ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি বলি,—ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন—ঘটকদিগের কুল-পঞ্জিকা, প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই আমার ইতিহাস উদ্ধার করা হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। তবে এইরূপ প্রতিবাদ হইলে ক্রমশঃ নির্ভুল হইতে পারে। বালীগড়ি রাজপুতদিগের পঞ্চারের দপ্তর দেখিয়া রাজা বিষ্ণুদাস, সম্বন্ধে আমার যে সকল ভ্রম হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে সংশোধন করিয়া দিব।
লেখক।

গ্রহণ করি না ; অতএব আমাকে নারায়ণের প্রসাদ অন্ন দান কর। রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া সন্ন্যাসী চরণে গললগ্নী কৃতবাসে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! আমি মূঢ়, আমায় ক্ষমা করুন। গোপালজীউর ভোগ-প্রসাদ আপনাকে দিতে পারিলাম না। আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্য গোপালকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করুন এবং অধীনকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়া কৃতার্থ করুন। সন্ন্যাসী রাজার বিনীত বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে রাজা একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখনও গোপালের মন্দির গড়ভবানীপুরে ভগ্নাবস্থায় তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। রাজা-গোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ভোগ সেবা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করেন। গোপাল জিউর পুরোহিত এক্ষণে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া গোপালজীউকে সে স্থান হইতে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে এবং মাতো গ্রামে বাস করিতেছে। কেবল মাত্র মন্দিরটী জীর্ণাবস্থায় এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন মনুষ্যগণকে বুঝাইয়া দিতেছে যে কাল সকলকেই ধ্বংস করে, কাল মহাবলপরাক্রান্ত বীরের পরাক্রম নষ্ট করে, উন্নতমস্তক, দুকপাতশূন্য অহঙ্কারোন্মত্ত ব্যক্তির অহঙ্কারও চূর্ণ করে। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সুন্দরী ললনার মনোহারিনী কান্তি, রাজাধিরাজ মহারাজের আসমুদ্র রাজ্য, কালে সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, আমার এখন কি অবস্থা। এক সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের স্তবপাঠে আমার প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকিত, ধূপধূনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধে ভবন আমোদিত থাকিত, শত শত দীন দরিদ্র উদর পূর্ণ করিয়া দেবপ্রসাদ ভক্ষণ করিত, আমার প্রাঙ্গন সর্ব্বদা সাধু, সজ্জন, ধনী, দরিদ্র, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি সর্ব্ব জাতীয় নর নারীতে পরিপূর্ণ থাকিত ; কিন্তু এক্ষণে সে দিন আর নাই ; আর ব্রাহ্মণগণ এখানে সুললিত-স্বরে ভগবানের স্তুতিগান করে না ; আর প্রাঙ্গণতল কাঁশর-ঘন্টারবে ধ্বনিত হয় না, আর কোন লোক প্রসাদ ভক্ষণ করিবার আশায় এখানে আগমন করে না। এখন এস্থান শৃগাল কুক্কুর ও সর্পের আবাসভূমি হইয়াছে। মানব! কিছুই চিরস্থায়ী নহে—সকলেরই পরিণাম আমার ন্যায়। রাজা দেবনারায়ণ রায় মহাপুরুষ মণিনাথ গোস্বামীকে স্বীয় পুরীতে বাস করিবার জন্য অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বাসনারহিত, শুদ্ধসত্ত্ব, উদাসীন, যোগীশ্রেষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—"বৎস! আমি সন্ন্যাসী, ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিবার জন্যই আমি যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে আসিয়া সময়ে সময়ে উপস্থিত হই। তুমি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, আচারবান ভগবদ্ভক্ত হিন্দু নরপতি ; সেই জন্য তোমার ভবনে আমি এত দিন বাস করিতেছি, অন্য কোথাও আমি এক দিনের অধিক কাল থাকি না।" হিন্দু সমাজ দিন দিন যেরূপ

অধঃপতিত হইতেছে, দেব দ্বিজের প্রতি লোকের ক্রমশঃ যেরূপ অনাস্থা হইয়া উঠিতেছে, হিন্দুর আচারবিচার যেরূপ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে হিন্দুদিগের অশেষ দুর্গতি হইবে; হিন্দুধর্ম্ম নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে"। সেই জন্য লোকালয়ে বাস করিতে আর বাসনা নাই; কারণ ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ করিতে ও সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া প্রকৃত সার পদার্থ কি ধারণা করিতে এখন আর কাহারও ইচ্ছা নাই; সকলেই বালকের ন্যায় ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত। তবে ধর্ম্মের যখন অত্যন্ত গ্লানি হইবে, তখন সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন।" সন্ন্যাসী আরও বলিলেন,—"বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না তোমার যখনই আমাকে আবশ্যক হইবে, তখনি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব। এবং তোমার এই পবিত্র পুরীতে অন্তিমে এই নশ্বর দেহ রক্ষা করিব। এই বলিয়া গোস্বামী ভবানীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে—একদিন রাজপুত্র হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই আকস্মিক বিপদে রাণী শোকে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন, আনন্দপূর্ণ রাজপুরী শোকে নিরানন্দ হইয়া উঠিল, রাজা বক্ষ-তাড়না করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে একান্তমনে যোগীবর, মহাপুরুষ গোস্বামীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান, আপনি বলিয়াছিলেন, দেবনারান! যখনই তোমার আবশ্যক হইবে, তখনই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব; হে অন্তর্যামিন্! আমি আজ যে কি বিপদে নিপতিত, তাহাত আপনি সকলই বুঝিতে পারিতেছেন! আমার প্রাণের প্রাণ সংসারের একমাত্র অবলম্বন নয়নরঞ্জন আত্মজ আজ এ মরলোক ত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছে! এখনও কি আপনার আগমন আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না, তবে কি আমার মহাপ্রস্থানকালে আপনি আসিয়া দাসকে কৃতার্থ করিবেন? আচ্ছা তবে তাহাই হউক—এই বলিয়া রাজা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ বহির্গত হইয়া যেমন দামোদর নদে ঝম্প প্রদান করিবেন, অমনি দেখিতে পাইলেন—দামোদর নীরে পরিবিস্তৃত ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি গোস্বামী ভাসিয়া আসিতেছেন। রাজা গোস্বামীকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তীরদেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইলেন। গোস্বামী তীরে অবতরণ করিয়া রাজার হস্ত ধারণ করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীর করস্পর্শে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যোগীবরের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। গোস্বামী তাঁহাকে অভয় দান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্! তুমি মহাত্মা হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় এরূপ শোকে বিহ্বল হইতেছ কেন? তুমি ত জান মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার পুত্রের এখনও মৃত্যু হয় নাই, এ

সংসারে তাহার এখনও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে, কর্ম্ম শেষ না হইলে কাহার সাধ্য তাহাকে এ সংসার ছাড়াইতে পারে। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মসাধনের জন্যই জীব নরাকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। চল—শীঘ্র যাইয়া রাজকুমারকে অবলোকন করি।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী নৃপতি সমভিব্যাহারে পুরীমধ্যে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এবং তাহার দেহে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—“ভগবন! আমার প্রাণ বালককে অর্পণ করিলাম। ইহাকে পুনরায় সজীব করিয়া দাও।” এই কথা বলিবা মাত্র বালক সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল! রাজা, রাণী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোস্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সমস্ত রাজপুরী আবার আনন্দে জাগিয়া উঠিল। পুরীমধ্যে মহা উৎসব আরম্ভ হইল। রাজা অকাতরে দীন-দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী রাজাকে বলিলেন,—“দেবনারায়ণ! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, আমার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে; রাজপুরীর এক নির্জ্জন স্থানে আমার যোগ-কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দাও; আমি উত্তরায়নে যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইব।” রাজা গোস্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্য অন্তঃপুরের নিকটস্থ এক স্থানে যোগকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন! গোস্বামী কুটীর মধ্যে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া যোগে নিমগ্ন হইলেন। সে সমাধি আর তাঁহার ভাঙ্গিল না। ১৩০৬ শকাব্দে বা ১২৮৫ খৃঃ অব্দে রাজা সেই স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবস্থাপন করেন। ঐ মহাপুরুষের নামানুসারে শিবের নাম “মণি নাথ” রাখা হয় এবং সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের হস্তে রাজা শিবের ভোগ-সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। গড়ভবানীপুরে এখনও মণি-নাথের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও মণি-নাথের মন্দির গাত্রে রাজা দেবনারায়ণের নাম, শকাব্দা ও তারিখ স্পষ্টাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এখনও মহান্ত পরেশ নাথ গিরির তত্ত্বাবধানে মণি-নাথের ভোগোৎসব নির্ব্বাহ হইতেছে। কিন্তু রাজা দেবনারায়ণের ও তাঁহার বংশাবলীর নাম বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

দিল্লীর ৺কালীবাড়ী।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ ৭৬ বৎসর পূর্ব্বে যমুনার উপকূলে বঙ্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ৺কালীমন্দির স্থাপিত হয়। এই মন্দির অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তি অষ্টধাতু নির্ম্মিত ৺দক্ষিণা কালীমূর্ত্তি। ১৮৫৭সালে অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ সময় বিদ্রোহিরা ঐ মন্দির নষ্ট করে। এক্ষণে ঐ স্থলে শ্রীকিষণদাস গুড়ওয়ালা সি, আই, ই, মহোদয়ের ধর্ম্মশালা অবস্থিত। পরে জনৈক বঙ্গীয় ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ৺কালীমাতা স্থানান্তরিত

হইয়া দিল্লী সহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা হন। ঐ গৃহ একটী ভাড়াটিয়া বাড়ী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বঙ্গদেশ হইতে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে বা দেশভ্রমণে বাহির হইয়া ভারতবর্ষের শক্তিমন্ত্র উপাসকগণ উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বাসনা-মুরূপ স্থান বা উপাস্যদেবীকে দেখিতে পান না, এবং এ প্রদেশে গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্যে মূল ও অন্যতম শক্তিদেবীর আরাধনা অতি অল্প। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন যে, কর্ম্ম-কাণ্ডে এ প্রদেশ উদাসীন ও অনভিজ্ঞ হইয়া মূর্ত্তিপূজাকে জড় উপাসনার ন্যায় গণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। মূর্ত্তিপূজাসময়ে বঙ্গের পণ্ডিতগণ যেমন শাস্ত্রমত নিজের ও দেবদেবীর শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করেন, এবং তাঁহারা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে জড়মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া উপাসনা করা হয় না, সাক্ষাৎ চিন্ময়ী ভাবিয়াই পূজা অর্চ্চনা করা হয়, এ প্রদেশের অবস্থা সেরূপ নহে। আরও এই সকল প্রদেশের লোকগণ বঙ্গের সহিত যেন সম্বন্ধহীন হইয়া আছেন। তিনি দেখিলেন যে, বঙ্গের সহিত এ প্রদেশ কর্ম্মকাণ্ডে মিলিত না হইলে এখানকার আধ্যা-ত্মিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় থাকিয়া যায়। তাই তিনি একা নগ্ন ও ভগ্নপদে (কৈবৎ খঞ্জ ছিলেন) সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সকলকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া এই কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া যান।

১৮৫৭ সাল অর্থাৎ আজ ৬০ বৎসর হইল, বিদ্রোহীরা ৺মাতার মন্দির নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি দিল্লীর অধিবাসীবৃন্দ মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমাতার সেই ভাড়াটীয়া গৃহ ছাড়া একটী স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারিল না; কারণ, দিল্লীতে হিন্দুর সংখ্যা অতি অল্পমাত্র, তাই আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা—ভাই ভারতবাসী হিন্দুগণ! আপনারা একটু অবহিত হইয়া দেখুন যে দিল্লী আপনাদের আর্য্যাবর্ত্ত ছাড়া নহে। এই দিল্লীই দ্বাপরের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কৃষ্ণানুগৃহীত পাণ্ডবগণের পবিত্র নিবাস এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং দেবর্ষি, মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের চরণচিহ্নে শোভিত হইয়াছিল। এ হেন স্থানে মহাশক্তির উপাসনা ও সেবাকার্য্য সামান্য "তিলকাঞ্চন" ব্যবস্থায় সম্পাদিত হইতেছে, এটা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নহে কি?

অতএব আসুন আমরা ৺কালীমাতার প্রীত্যর্থে এবং আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণার্থে মাতৃসেবায় পরাঙ্মুখ না হইয়া যথাশক্তি উদ্যম এবং অর্থ সাহায্য দ্বারা সেই পরম মঙ্গলপ্রদ ও পুরুষার্থসাধক কার্য্যে নিযুক্ত হই।

দিল্লীতে ৺মাতা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করায় এবং ঐ বাড়ী অপ্রশস্ত হওয়ায়, আর মাসিক চাঁদার দ্বারা সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ না হও-য়ায় যাত্রীগণকে যথোচিত সৎকার করিতে পারা যায় না। যে সমস্ত বঙ্গবাসী মহাশয়গণ দিল্লীতে আসিয়া পড়েন, তাঁহারা এ প্রদেশীয় হিন্দুস্থানী-গণের হোটেল বা ধর্ম্মশালায় আশ্রয়গ্রহণ করিতে

বাধ্য হয়েন। এখানকার আহার বাঙ্গালী-গণের রুচি বিরুদ্ধ হওয়ায় ও এখানকার ভাষা তাঁহাদিগের অনধিগম্য হওয়ায়, পর্য্যটক বাঙ্গালীগণ প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দেখা স্থগিত রাখিয়া প্রায়ই অতিশীঘ্র দিল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমরা স্বজাতির এই অভাব দূর করিবার জন্য ৺মাতার মন্দির নির্ম্মাণকল্পে "আলোচনার" গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গের নিকট বিনয়পূর্ব্বক যথা সম্ভব অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। কারণ সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এরূপ ব্যয়সাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান রাজধানীর এরূপ অভাব দূরীকরণার্থ অতিথিশালার সহিত ৺মাতার একটী নিজস্ব মন্দিরবাটী নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিয়াছি। উহার আনুমানিক ব্যয় ৪০,০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা।

বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় হেম চন্দ্র সেন ইহার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার সংগৃহীত কিছু অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট গচ্ছিত আছে। তৎপরে আর তাহার চেষ্টা হয় নাই। গত ১৮ই মার্চ্চ ৺কালীবাড়ীতে একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা সার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজা বাহাদুর ৺মাতার নিজ মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া একটী সমিতির সংগঠন করিয়া দেন এবং স্বয়ং তাহার পৃষ্ঠপোষক হয়েন। কার্য্যারম্ভের জন্য তিনি সভাস্থলে ২০০০৲ দান করেন এবং ভবিষ্যতে ভালরূপ আনুকূল্যের আশা দেন। এখানকার ভদ্র মহাশয়গণও আপন আপন অবস্থানুযায়ী সাহায্য করিতেছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা-ধিরাজ বাহাদুর ৫০০৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহিরপুরের পূজ্যপাদ রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরও কার্য্যান্তরে এখানে আসিয়া, ৺দেবী দর্শনান্তে তাঁহার এ বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। (কলিকাতার) পোস্তার শ্রীমান কুমার হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছেন। ইহাদের অর্থসাহায্য শীঘ্র আসিবে। অন্যান্য স্থান হইতে যাহা সাহায্য আসিতেছে তাহা ক্রমশঃ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

সমিতির সদস্যগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি। যাহাতে সাধারণের অর্থ লুণ্ঠিত বা কোনও রূপে অপব্যয়িত না হয়, সে দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। সুতরাং সাহায্যেচ্ছুর এসম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহের কারণ নাই। যিনি দয়া করিয়া যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। "ভাইস প্রেসিডেণ্ট ৺কালীবাড়ী কমিটী, দিল্লী।" এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকিরণ চন্দ্র গুপ্ত—ভাইস প্রেসিডেণ্ট।
শ্রীমাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল-এস-এস সভাপতি।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি-এল—সহঃ সভাপতি।
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বসু বি-এল—সেক্রেটারী।
শ্রীনবীনচন্দ্র চন্দ্র—সম্পাদক।
শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়—সহঃ সম্পাদক।
শ্রীনবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—মাতার সেবক।

পাবনা ব্রাহ্মণ-সভা।

(প্রাপ্ত)

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২১শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পাবনা ব্রাহ্মণ সভার সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১ম দিন অপরাহ্ন ৬॥০টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত অদ্বৈত-বংশাবতংস শ্রীযুক্ত মুরলী মোহন গোস্বামী মহাশয় "চৈতন্যদেব ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের বচন সাহায্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মান্য করিতেন ও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন, তাহারই প্রতিপাদন করেন। ২য় দিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এক ঘণ্টাকাল জগদম্বার লীলা কীর্ত্তন করেন। ইহাতে তাঁহার ভক্ত হৃদয়েরই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। অতঃপর কলিকাতার "উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহাতে তিনি ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে গায়ত্রী জপের অবশ্য করণীয়তা ও যৌক্তিকতা, জীবে প্রেম, ভগবানে ভালবাসা, প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

গায়ত্রী সম্বন্ধে তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণকে দিনে অন্ততঃ তিন বার গায়ত্রী জপ করিতেই হইবে। তা' ছাড়া কর্ম্মকালেও তাঁহাকে স্মরণ করিবে। যে ব্রাহ্মণ এই কার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। উপাসনা না করিয়া মানুষ ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। কেহ ধনৈশ্বর্য্যের উপাসনা করিতেছে, কেহ বিষয়-সম্পত্তির আরাধনা করিতেছে, কেহ বা ভার্য্যার অর্চ্চনা করিতেছে। উপাসনার গতিটা যদি আমরা অনিত্য বস্তু হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিতে পারি, তাহা হইলেই তো সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভ হইল। তখন ভগবান যে সাধকের অদূরবর্ত্তী! ভগবদুপাসনা ভিন্ন কে কবে "তাঁহার" কাছে পৌঁছিতে পারিয়াছে? ভগবানের চরণ-তরণী আশ্রয় কর, ভবসিন্ধুপারের ভাবনা কি?

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রাধা বিনোদ গোস্বামী মহাশয় "শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব" সম্বন্ধে একটী প্রাণস্পর্শী আলোচনা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে সভায় কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপিত ও পরিগৃহীত হয়। তন্মধ্যে এই দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১ম—বরপণ নিবারণ। ২য়—রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ সমীকরণ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত মুরলী মোহন গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ বরপণের কুফল সম্বন্ধে ও নিবারণ কল্পে বক্তৃতা প্রদান করেন। গোস্বামী মহাশয় তেজস্বিতা সহকারে বলিলেন—"আমি আমার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে তাহার শ্বশুরের রক্ত শোষণ করি নাই এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য পুত্রের বিবাহে অমন ঘৃণিত কার্য্য করিবার আশাও রাখি না।" দুঃখের বিষয় তথা কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মুখ হইতে এমন দৃঢ়বাণী উচ্চারিত হইতে শোনা গেল না।

অনন্তর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় জগদম্বার করুণা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রাম দয়াল মজুমদার মহাশয় "ভগবৎ তত্ত্ব" বিষয়ক আড়াই ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ভগবান লাভ যে জীবের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি, তৎ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। অতঃপর দিনাজপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত রায় বিদ্যারত্ন "ব্রাহ্মণের অতীত গৌরব" সম্বন্ধে ভাবগদগদ-কণ্ঠে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে তাঁহার ভাবাবেশ অবস্থা শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাঁহার অঙ্গ হইতে যেন একটা

জ্যোতি বিকীরণ হইতেছিল। ইহার পর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরাধা চরণ দাস,
শালগাড়িয়া সাহিত্য মন্দির,
পাবনা।

কবিতা-সুন্দরী।

(১)

কবিতা লো তুমি,
যেই ভালবেসে—
হেসে হৃদে আস মোর।
আমি তাই পারি,
দিতে প্রাণ ভরি'—
দেবতারে—উপহার তোর॥
তোমার মধুর হাসি
দেয় মোরে রাশি রাশি
সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প
সাজাইয়ে মোর ডালা।
সে সব সুগন্ধ ফুলে
গাঁথি আমি প্রাণ ভুলে;
দেবতার তরে নিত্য
আমার মোহন মালা॥

(২)

কবিতা সুন্দরী!
তুমি যবে মম,
বসেছ হৃদয়ে আসিয়া।
সেই দিন হ'তে
তব কৃপাবলে
দেবাশিষ নি'ছি মাগিয়া॥
তো'রি লো মধুর বাণী
ওগো মম হৃদি-রাণী;
কহিয়া দেবতা কাছে
চাই লো করুণা তাঁ'র।
তুমি মম আছ তাই,
তাঁহারে ডাকিতে পাই,
রহ তুমি মম প্রাণ
করে' সদা অধিকার॥

(৩)

প্রাণের কবিতা,
তব বহুরূপ মোরা,
সদাই হেরিতে পাই।
ক্ষুদ্র মন মাঝে,
কত নব সাজে
বিহারিছ' তুমি সদাই॥
কভু হৃদে আস তুমি;
বসন্তের ফুলরাণী;
কভু বা নয়নে বহে
প্রেম উৎস ধারা।
কভু বা তোমার মাঝে
ক্রোধ-রিপু-কায়া রাজে;
তোমার নিকটে স্বপ্ন
নহে প্রাণ হারা॥

(৪)

কবিতা লো মম
হৃদয়ের নিধি,
ঘন রজনীর আলো।
বড় দুঃখে আমি
কহি তোমা' ধনি—
সদা মোরে রেখ' ভাল॥
আর শুধু এই আশা,
হৃদয়ে লহরে বাসা—
আর কিছু নাহি চাই
অধিক ইহার।
তুমি যেন মোর মাঝে
আসিয়া নবীন সাজে
অহরহঃ করহ বিহার॥

শ্রীনীহার রঞ্জন সিংহ।

শ্রীকৃষ্ণ

দ্বাপরের ইতিহাস পঞ্চমবেদ আখ্যায় অভিহিত মহাভারত আর পরিশিষ্ট হরিবংশ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য দেখিতে পাই। যিনি জীবগণের পাপসমূহ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লন—তিনি কৃষ্ণ। শ্রীধর স্বামী কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন,—

কৃষির্ভূর্বাচক শব্দঃ নশ্চ নির্বৃতিবাচক।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

ঋগ্বেদ সংহিতায় অবশ্য এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি আমাদের উপাস্য শ্রীভগবান্ নন। ঋগ্বেদ সংহিতার কৃষ্ণ বিশ্বকায় ঋষির পিতা।

ছান্দোগ্যে আঙ্গিরস গোত্র সম্ভূত ঘোর নামক ঋষি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—"অর্থে তদ্ধ্যেব আঙ্গিরস কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" এই শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর নন্দন হইলেও বাসুদেবরূপী শ্রীভগবান্ আর ইনি এক নন।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার। ধর্ম্ম সংস্থাপন, সাধুপরিত্রাণ ও দুষ্কৃত বিনাশ উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে লীলাময় শ্রীহরি ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হন। অবতাররূপে মানব জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীভগবান ধরাতলে না নামিলে ভক্তজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না; জীবগণের সহজ উদ্ধার-পথ দেখান হয় না। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা, সহস্রবাহু, সহস্র বক্ত্র, দণ্ডধারী পরমেশ্বরকে তত অন্তরঙ্গ বোধ জন্মে না, সমীপে উপলব্ধি করা যায় না, নির্ভয়ে ঠিক আপনাদের ধারণার আয়ত্তে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা ভৌতিক দেহ লইয়া, সেই পূর্ণানন্দ জ্ঞানময়ের ধারণা করিতে পারি না মর্ত্ত্যে থাকিয়া বৈকুণ্ঠের মধুকৈটভারি শ্রীমধুসূদন স্বরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি না কিন্তু তিনি যখন আমাদের দৃষ্টিতে প্রতীত—ভৌতিক স্থূল দেহ লইয়া আমাদের মত মানুষ হইয়া ধরায় আসেন, আমাদের মধ্যে দেখা দেন তখন তিনি আমাদের আপনার জন হন; তখন তিনি আমাদের খুব অন্তরঙ্গ প্রতীত হন। তখন তাঁর স্বরূপ আর অঙ্গের অচিন্ত্য আমাদের ধারণার অতীত বলিয়া বোধ হয় না।

অবতাররূপে উপাসনা যে সাধারণ নর পক্ষে সহজ, তাহা শ্রীভগবান্ নিজমুখেই জানাইয়া দিয়াছেন:—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

অব্যয়াত্মা অজ হইয়াও, নিখিল প্রাণি-সমূহের ঈশ্বর হইয়াও নিজ অলৌকিকী মায়ার বলে যিনি দ্বাপরে অবতীর্ণ হন, ধরায় অধর্মের বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, যাঁহার উপদিষ্ট অপূর্ব্ব গীতামৃত ধরায় আজিও কোটি কোটি ধর্ম্ম পিপাসুর তৃষ্ণা দূরীভূত করিতেছে, সেই বসুদেবপুত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ। সেই কালিন্দী-বিহারী, গীতার নিষ্কামপুরুষ, অর্জ্জুনসখা রাধিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের শ্রীভগবান। মধুসূদন সরস্বতী—বৈষ্ণব বৈদান্তিক পরমহংস অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণেতা গীতার টীকা রচয়িতার সহিত একসুরে আমরাও বলি,—

ধ্যানাভ্যাস সুনিশ্চল অন্তরে যে যোগী
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম পারেন ভাবিতে,
ভাবুন তাঁহারা তবে ; আমরা কখন
কালিন্দী বিহারী শ্যাম পদ কোকনদ
ভুলিব না, নিরবধি পূজিব হরষে।

কংস বসুদেব ও দেবকীকে রথে চড়াইয়া বিনীত ভৃত্যের মত সেই রথের অশ্ব আপনিই চালাইতেছিলেন, এমন সময় দৈববাণী হইল—"দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে নিধন করিবে।" কংস তাই শুনিয়া তখনই আপনার ভগ্নী দেবকীর প্রাণ সংহারে উদ্যত হইল। বসুদেব বুঝাইলেন—দেবকীর সন্তানগুলিকে নিধন করিলেই যখন কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে তখন ভগ্নীকে নিধন করিবার আর আবশ্যক কি?—এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দেবকীর গর্ভজাত সন্তানমাত্রকেই কংস-হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেইদিন হইতে দেবকী ও বসুদেব কারাগারে রুদ্ধ হইলেন।

বহুদিনের সাধনায়, বহু দিন ধরিয়া শ্রীভগবানকে প্রাণ ভরিয়া না ডাকিলে তিনি আসেন না—তাই কি তাঁহার আসিবার জন্য কঠোর সাধনা ও আকুল প্রার্থনার প্রয়োজন হইয়াছিল ও সেই সাধনা ও প্রার্থনা করিলেন—কারারুদ্ধ বসুদেব ও দেবকী।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাত পাই—দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ক্ষেত্রে। লক্ষ্যভেদের পর যখন সমবেত রাজন্যবর্গের সহিত ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধ বাধিল ; তখন শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামকে কহিলেন,—"আমি যদি কৃষ্ণ হই, তবে এই যে যিনি মহাধনু আকর্ষণ করিতেছেন ইনি অর্জ্জুন হইবেন।"

কৃষ্ণ ও বলরাম তখন কুম্ভকার গৃহে পিতৃস্বসা কুন্তিদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পাঞ্চালী দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবদের বিবাহে কৃষ্ণ যৌতুক প্রেরণ করিয়া আত্মীয়তা রক্ষা করিলেন।

তারপর অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাত হইল প্রভাস তীর্থে। তার পর হইতেই অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইল। যে সখ্যভাবে শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়—সেই সখ্যভাব অর্জ্জুনেই প্রকৃত ছিল। এ সখ্যভাবে প্রগাঢ় প্রেম বর্ত্তমান ছিল। এখন হইতে দুইজনে পাশাপাশি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিলেন।

চক্রী ভগবান ভীমের দ্বারা জরাসন্ধের নিধন করাইয়া শত শত রাজগণের উদ্ধার সাধন করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী করিয়া জগতে অধর্ম্ম-বিনাশ ব্রতের

সূচনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের যশোরাশি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া হিংস্র দুর্যোধনের অন্তর জ্বলিয়া গেল। দুষ্ট শকুনির পরামর্শে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া দুর্য্যোধন পঞ্চ পাণ্ডবকে বনবাসে পাঠাইলেন। রাজবধূ দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করা হইল। তার পর সেই সতী সাধ্বীর সেই অচিন্তনীয় অপমানে অধর্ম্ম ষোলকলা পূর্ণ হইল। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিল। পঞ্চগ্রাম ভিক্ষামাত্র চাহিয়াও চক্রী শ্রীকৃষ্ণ কৌরবপাণ্ডবদের কলহের শান্তি করিতে পারিলেন না। দুর্যোধনের কঠোর প্রতিজ্ঞা—"যুদ্ধ বিনা সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দিব না" কাজেই যুদ্ধ বাধিল।

প্রাণপ্রিয় সখা অর্জ্জুন অভিমান-অহঙ্কারের বশে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নামিয়াছিলেন, তজ্জন্য শোকমোহজ অবিবেক নিমিত্ত দৌর্ব্বল্য দেখা দিল। যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখরূপ অবিবেক-সুলভ ভ্রান্তিও জন্মিল, ভগবান দেখিলেন যে, আমার আমার—এই অহঙ্কারই অর্জ্জুনে প্রবল। উহারা আমার বধ্য, আমি হন্তা, উহারা আমার মিত্র, উহারা আমার শত্রু—ইত্যাকার মনোবৃত্তিতে অর্জ্জুন আচ্ছন্ন। তখন শ্রীভগবান্ দেখাইলেন "এ আমার আমার ভাবই ভ্রান্তিমাত্র, স্বপ্নমাত্র, অবিবেকোত্থ কল্পনা মাত্র। কার্য্য করাই আমি, মানব শুধু নিমিত্ত মাত্র। কেহ কাহার বধ্য নহে। অর্জ্জুন যে ভাব লইয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন, আবার যে ভাব লইয়া যুদ্ধে বিমুখ হইতেছিলেন—দুইই আসল পথ নহে; দুইটি ভাবই ভুল।

প্রভাসে যদু ও বৃষ্ণিকুল বিনষ্ট হইল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় বীরগণের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও অশ্বমেধ যুদ্ধে বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে বাকী রহিল কৃষ্ণের নিজের বংশ ও স্বগণ। তাহারাও সংখ্যায় বহু এবং বলদৃপ্ত। চক্ষুর উপর আপনার পুত্র পৌত্রদিগের শোচনীয় মরণ দেখিয়া আপনি অবিচল রহিলেন। গীতার উপদেশ জীবনে সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। দুঃখ-শোক যে অবিবেকোত্থ ভ্রান্তি মাত্র—তাহা যদি কেহ সম্যক্ বুঝিয়া থাকেন ত সে শ্রীকৃষ্ণ। মানব কার্য্য কর, ফলাফল দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই; কর্ম্মেই মানবের অধিকার, ফলে নহে—ইহা জীবনে যদি কেহ সম্যক্ দেখাইয়া থাকেন ত সে শ্রীকৃষ্ণ। তার পর ধীরে ধীরে বনের মধ্যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন এবং বলরামের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বলরাম যোগাসনে উপবিষ্ট শূন্য মন।—প্রাণোপলক্ষিত জীব অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে, দেহ নির্ব্বাত নিষ্কম্প। মুখ হইতে এক বৃহৎ অজগর সর্প বাহির হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনিও ব্যাধের শরে আপনার লীলাদেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দূতমুখে সংবাদ পাইয়া পরম ভক্ত, প্রাণ-সখা অর্জ্জুন আসিয়া যদুকুল রমণিদের লইয়া গেলেন। সেই গাণ্ডিবধারী অর্জ্জুনের হস্ত হইতে যদুকুল রমণিরা অপহৃতা হইল। এইবার অর্জ্জুন মনে প্রাণে ঠিক বুঝিতে পারিলেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র। মর্ম্মে মর্ম্মে

বুঝিলেন—কৃষ্ণের হাতের তিনি যথার্থই ক্রীড়াপুত্তলি।

গীতার উপদেশে অর্জ্জুন যে ঠিক সম্পূর্ণ আপনাকে গঠিত করিতে পারিতেছিলেন তাহা মনে হয় না। অর্জ্জুন পরম ভক্ত,—তথাপি গীতোক্ত উপদেশ অর্জ্জুনের চিত্তে সকল সময়ে দৃঢ় অঙ্কিত থাকিত না। সুধন্বা ও প্রবীরের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের মোহান্ধকার ঘুচাইবার প্রয়োজন, তাহা হইলে আর অনুভূত হইত না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণই একপ্রকার চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেন। যেমন বিপৎ, অমনি অর্জ্জুন স্মরণ করিলেন কৃষ্ণ, অমনি কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত।

এইবার কৃষ্ণ পৃথিবীর কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লীলাদেহ ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময়েও সখার কার্য্য, বন্ধুর উপকার করিয়া গেলেন, ভক্তকে (আধ্যাত্মিক) রক্ষা করিয়া গেলেন। "অর্জ্জুন তুমি কেহ নহ, তোমার নিজস্ব সত্তা কিছুই নাই! আমি করাই, তুমি কর। তুমি আমার হাতের পুত্তলি, যেমন চালাইব তেমনি চলিবে। তোমার যা কিছু—সবই আমার। আমাকে ছাড়িয়া তোমার কিছু নাই, তুমি সে তুমিই নহ" গীতার এই সার উপদেশ অর্জ্জুনের জীবনে বদ্ধমূল করিবার জন্য যদুকুলরমণিদের অপহরণ ঘটিল। এইবার অর্জ্জুন বুঝিলেন—তিনি কে? কতটুকু তাঁর নিজস্ব! এই জ্ঞান অর্জ্জুনের জন্মিবার পর আর বেশীদিন অর্জ্জুনকে সংসার করিতে হয় নাই। তাঁহার পরম ভক্ত প্রাণপ্রিয় সখা অর্জ্জুন যে সাধারণ লোকের মত অহমিক ও অহঙ্কারের বশেই কার্য্য করিবে—ইহা ভগবান্ চাহিতেন না।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

তোমারে দেখেছি যেন, সে অনেক দিন।
কোন্ সে অজানা দেশে,
অতীত আঁধারে মিশে,
সে স্মৃতি হৃদয়মাঝে জাগে অতি ক্ষীণ ;
তোমারে দেখেছি যেন সে অনেক দিন।
হেট-মুণ্ডে, যোড়-করে,
অন্ধকার কারাগারে,
ছিনু কোথা বাঁধা পড়ে' উপায় বিহীন ;
তোমারে দেখেছি যেন সেই একদিন।
ভীষণ সে কারাগার,
চারিদিকে রুদ্ধদ্বার,
অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি হয়ে ছিল ক্ষীণ ;
তবুও দেখেছি যেন তোমায় সে দিন।
দশ মাস অনাহারে,
বিষম বিপদে পড়ে',
কেঁদেছি কাতরস্বরে হ'য়ে শক্তিহীন ;
তুমি বুঝি এসেছিলে সেই একদিন?
নাভিকুণ্ডে পিয়ে সুধা,
যবে মিটিয়েছি ক্ষুধা,
এখন সে স্মৃতি ক্রমে হইতেছে লীন ;
তোমারে দেখেছি আমি সেই একদিন।
দীর্ঘ কারা-যাতনায়,
প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
নির্গম উপায় ভেবে হতাসে মলিন ;
তোমায় দেখেছি আমি সেই একদিন।

ক্রমে দীর্ঘ দিন পরে,
কারা হ'তে মুক্ত ক'রে,
স্থাপিলে নয়ন-দ্বারে জগত নবীন ;
তোমারে দেখেছি আমি সেই একদিন।
বলে' ছিলে কত করে',
এ নব আলোক হেরে,
আমায় ভুলো না যেন ভুলে একদিন ;
"কৃতঘ্ন" মানব আমি আজ দৃষ্টিহীন।
সংসারের কোলাহলে,
তোমারে ভুলেছি ব'লে,
তুমি ত সন্তানে কভু নহ উদাসীন ;
সম্পদে বিপদে কোলে রেখ' চিরদিন।

শ্রীবেণীমাধব রায়।

ঋণদায়।

(১)

আমি জনৈক কুসীদজীবী ধনবান মহাজন। লোকে বলে আমার ভীমরথী হইয়াছে—আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু সে মিথ্যাকথা, আমার বয়স এখনও ষষ্টীর সীমা অতিক্রম করে নাই। তবে যে সব দুষ্ট লোকে আমাকে বাহাত্তুরে সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া নাসিকা কুঞ্চন করে, আমি তাহাদের সুরুচির সুখ্যাতি করিতে পারি না। যাহা হউক, নিন্দা-ঘৃণা বা প্রশংসায় মহৎ ব্যক্তির ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; আমি চির মহৎ—চির উচ্চ। আমার ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা এবং ললাটে পূজার পবিত্র চন্দনের কোঁটা—গায়ে নামাবলী, হাতে মালার থলী এবং মুখে হরি-হরি বুলী আমাকে দশ জনের নিকট সাধু-সজ্জন মহাজন বলিয়াই পরিচিত করিতেছে। যাহারা বলে, আমি মালার থলীতে হাত দিয়া ইষ্টমন্ত্র জপচ্ছলে সাত পাঁচ চৌদ্দ গণিয়া সুদের হিসাব করিতে চির দিনই খুব সিদ্ধ হস্ত, তাহাদের পিতৃপুরুষের মুখে—রাধাকৃষ্ণ!—

যাউক, বয়স হইয়াছে, একটুকু বেশী কথা বলা আমার অভ্যাস। তা "বাহাত্তুরে" হইলে অনেকেরই এমন দশা হয়, সে জন্য কেহ বিরক্ত হইবেন না মহাজনের ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করিলে ঋণ মিলিবে কেন?

সে অনেক দিনের কথা নয়। অল্পদিন পূর্ব্বে একদিন আমি মালার থলিটী হস্তে লইয়া নষ্ট কর্জ্জপত্রগুলির মিয়াদ রক্ষার উপায় করিতেছি, আর এক একবার আমার কৃষ্ণবর্ণ কুকুরটীর মুখের দিকে ও আমার চতুর্থ পক্ষের পরিণিতা ষোড়শী রূপসী সহধর্ম্মিনীর বদন পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্বর্গের অমৃত পানের সুখানুভব করিতেছি। আমার তরুণী ষোড়শী সুন্দরী যখন অলক্তক রঞ্জিত পদযুগল নাচাইয়া, ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত উন্মুক্ত কেশদাম দোলাইয়া নলক * দুলাইয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া প্রিয় কুকুরটিকে মুড়ী-মুড়কি দিয়া মুকুতানিন্দ সুন্দর দন্তপাঁতি বিকাশ করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছিলেন, তখন গৌরীদানের প্রত্যক্ষ ফল দশম বর্ষীয়া বালিকা আমার বিধবা পৌত্রীটী তাহার একাদশীর দুধের মাত্রা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির মানসে আমার তুষারনিন্দ শুভ্র শ্মশ্রুরাজির প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিতে নীরব আবেদন করিতেছিল। এমত

---

* বৃদ্ধ পল্লীগ্রামবাসী, তাই বুঝি এখনও গৃহিণীর নাকে নলক। ছি!! বেহয়াস।

সময় বহির্দ্বারে কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। আমি বালিকাকে দুগ্ধের কথাটি ভুলাইবার জন্য বলিলাম, দেখ ত কুসী, তোর বাবা আসিয়াছেন নাকি? বালিকা উল্লাসে বহির্ব্বাটি অভিমুখে দৌড়িল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া—নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুসুম বলিল, না ঠাকুর দাদা, এ বাবা নয়, কে একজন ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি, একজন ভদ্রবেশধারী যুবক আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাকে এরূপ অতর্কিতভাবে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার বড় ক্রোধ হইল। ক্রীড়াকৌতুক নিরতা তরুণী ভার্য্যা মুখচন্দ্র ম্লান করিয়া অনিচ্ছায় স্থান ত্যাগ করিলেন। কুসুম একাদশীর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি ষ্টেম্পগুলি গুছাইয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলাম।

এবাটীর কুকুরটা বড় ভয়ঙ্কর উগ্র প্রকৃতির। উহার অত্যাচারে কাহারও সহজে বাটীতে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। মানুষের সাড়া পাইয়াই কুকুরটা সিংহনিনাদে এক লম্ফে আগন্তুকের সম্মুখীন হইয়াই—যেন চিরপরিচিত আকাঙ্ক্ষিত রত্নের দর্শনে আন্তরিক গভীর আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধ শার্দ্দুল শাবকের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ-প্রাণ লইতে ও পা চাটিতে লাগিল! এ ভীষণদর্শন সারমেয় দর্শনে আগন্তুকও কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া বরং সুদীর্ঘ কালের সুপরিচিত আত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় মনের আনন্দে সস্নেহে অস্পৃশ্য কুকুরটার গাত্রস্পর্শ করিতে করিতে আমার নিকট উপনীত হইয়া আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনা অভ্যর্থনায়ই অলিন্দে উপবিষ্ট হইলেন। কুকুরটা তখনও তাহার নিকট নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাঙ্গুলটি দোলাইয়া দোলাইয়া যেন চির বাঞ্ছিত জনের প্রতি আন্তরিক প্রীতি-ভালবাসা জানাইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত কুকুরটার এ নূতন লোকটির প্রতি এরূপ বিসদৃশ প্রেম দর্শনে অন্যে বিস্মিত হইলেও আমি কিন্তু বড় ক্রুদ্ধ হইলাম।

এ আমার অহেতুকী ক্রোধ নহে; ক্রোধের অবশ্যই একটা সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল। কুকুরটা আমার নিজস্ব সম্পদ নহে। প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল কুকুরটা আপনি আসিয়া এ বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই অবধি উহা এক দিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় নাই। উহার গুণে আমি বাড়ীর পাহারাওয়ালাকে বিদায় দিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইয়াছি। এত দিন এ দুর্দ্দান্ত সারমেয় আমার প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী আছে। আগন্তুকের সহিত কুকুরের এ প্রীতির ভাব দর্শনে আমি ভাবিলাম,—হায়! এত দিনে বুঝি আমার প্রিয় কুকুরটাকে হারাইতে হইল। ইনি নিশ্চয় কুকুরের পূর্ব্ব অধিকারী হইবেন, সন্ধান পাইয়া কুকুর লইতে আসিয়াছেন। অন্যথা যে ভীম দর্শন ভীষণ প্রকৃতি শ্বাপদ-ভয়ে বাটীর লোকজন ও প্রতিবাসিগণ পর্য্যন্ত সদা ভয়ত্রস্ত, এ যুবকের সহিত উহার এত স্নেহ-

প্রীতির মধুর ভাব বিনিময় দেখিতেছি কেন? বস্তুতঃ কুকুরটার অভাব কল্পনায় আমার মন বড় চঞ্চল হইল। সুতরাং ভদ্রলোককে আমি প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রতি আমার একটা বৃথা বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল।

কিয়ৎ কাল বিশ্রামান্তে একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া যুবক বিনীতভাবে বলিলেন,—"মহাশয়ের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।" আমি ভাবিলাম, এই হইয়াছে, এবার সে নিশ্চয় কুকুরটার কথা পাড়িবে; হয়ত কুকুরটা নিয়া যাইবার প্রস্তাবই সে করিবে। মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—সচ্ছন্দে বলিতে পারেন।

যুবক।—মহাশয়, হরিপুরের হরিদাস রায়কে জানেন কি?

আমি।—হা—হা জানি বটে; তা আর না জানিব কেন? হতভাগ্যকে খুব ভাল-রূপই জানি। লোকটা আমার পঞ্চাশটা টাকা ধারিত, তা মরিয়া গিয়া আমার টাকা-ফাঁকি দিয়াছে।

যুবক।—তাঁহার নিকট এ পর্য্যন্ত সুদে আসলে কত টাকা প্রাপ্য হইয়াছে, বলিতে পারেন কি?

আমি।—বলিতে আর পারিব না কেন? তা বাপু তোমার এত খবরে দরকার কি? তুমি যে জন্ত আসিয়াছ; এখন সেই কথা বল; তোমার এত বাজে কথার প্রয়োজন কি? বাঃ! আমার কুকুরটাও দেখিতেছি তোমার বড় ভক্ত হইয়া উঠিল! তুমি কোনও "যাদু টাদু"—কোনও তুক্ তাক্ জান না ত?

যুবক।—না মহাশয়, আমি সে সব কিছু জানি না, আমার কথা এই যে, আমি সেই পরলোকগত হরিদাস রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র, আমার ইচ্ছা এখনই তাঁহার ঋণের টাকা-পরিশোধ করিয়া দিই; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আজ পর্য্যন্ত আপনার মোট প্রাপ্য কত?

আমি।—আঃ! তুমি বল কি? সত্যই কি তুমি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আসিয়াছ?—টাকাগুলি এখনই দিতে ইচ্ছা কর কি?

যুবক।—হাঁ, মহাশয়।

আমি।—উত্তম। তুমি বাপু একটু বস, আমি হিসাব দেখিয়া এখনই সব বলিতেছি। ও কু—কুসী!—ও কুসুম! একবার এদিকে আয় ত দিদি, এ বাবুকে আর এক ছিলিম তামাকু দিয়া যা ত। কি বলিব বাপু, চাকরটা বড় দুষ্ট, লক্ষ্মী ছাড়া বেটা এক মুহুর্ত্তও বাড়ী থাকিবে না।

যুবক।—তামাকের প্রয়োজন নাই, আমার ও সব অভ্যাস নাই, আপনি দয়া করিয়া একবার হিসাব খানি দেখুন।

আমি।—আচ্ছা বাপু, তাই ভাল।

এই বলিয়া আমি ষ্ট্যাম্পগুলি খুঁজিয়া হরিদাস প্রদত্ত বহুদিনের একখানি পুরাতন খৎ বাহির করিলাম। অতঃপর ঋণ-পত্রখানির দিকে তাকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, ২৫১৲ দুই শত একান্ন টাকা মাত্র।

যুবক।—মহাশয়! আমরা গরীব লোক, আপনি দয়া করিয়া সুদের হিসাবে কিছু ছাড়িয়া আমার পরলোকগত পিতাকে ঋণদায় হইতে মুক্তি দিলে বড় উপকৃত হইব।

আমি।—না বাপু, তা পারিব না। সুদে আসলে সব বন্ধ—এই সুদের দুই শত এক টাকা অন্যত্র খাটাইলে কত হইত বল দেখি? আমি দয়া করিয়া সেই সুদের সুদটাই ত তোমায় ছাড়িয়া দিতেছি।

যুবক।—তা খতের পৃষ্ঠে ঐ যে কত টাকা যেন ওয়াশীল আছে, দেখা যাইতেছে না?

আমি।—ও কিছু নয়। কাগজের ম্যাদ রক্ষার জন্য আমরা সময় সময় টাকা না পাইয়াই ঐরূপ ওয়াশিল দিয়া থাকি। কি করি বাপু, এ কলিকাল, ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ত এখন আর কেহ টাকা দিতে চাহে না!

যুবক।—তবে দেখিতেছি আপনি কিছুই ছাড়িতেছেন না?

আমি।—না, এক কপর্দ্দকও নয়।

যুবক।—তবে এই লউন, আপনার মোট প্রাপ্য ২৫১৲ দুইশত একান্ন টাকা; এখন বলুন আমার পিতৃদেব আপনার ঋণ-মুক্ত হইলেন ত?

আমি হর্ষোৎফুল্ল মনে গদগদ ভাবে বলিলাম,—হা বাপু, তোমার পিতা ঋণ-মুক্ত হইলেন; তাঁহার নিকট এখন আর আমার কোনরূপ দাবীই থাকিল না।

মুখের কথাটি শেষ হইতে না হইতেই—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আবার সেই সবল সুদৃঢ়কায় অতি তেজস্বী মহা দুর্দ্দান্ত কুকুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা মাটিতে পড়িয়া গেল! যুবক বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে সেই ভূপতিত সারমেয়টার দিকে চাহিয়া থাকিল, তাহার উষ্ণ অশ্রুপাতে সদ্য প্রাণহীন সারমেয়-দেহ সিক্ত হইতে লাগিল!

আমি ভূপতিত কুকুরটার দিকে বিস্ময়-নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। আমার প্রিয় কুকুরটার আকস্মিক মৃত্যুতে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। কি জানি লোকটার উপর আমার বড় ক্রোধ হইল। আমার মনে হইল, এই লোকটাই কুকুরটার অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে। অতি ক্রোধে মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না; দুই চারিটা কর্কশ বাক্যে মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

যুবক বড় অপ্রতিভ হইল। সে অশ্রু মোচন করিতে করিতে অপরাধীর মত বলিল,—হা মহাশয়, আমারও বিশ্বাস আমিই উহার মৃত্যুর কারণ। আমি বড় হতভাগ্য। আমার দুরদৃষ্টের শোচনীয় পরিণামের আমূল বিবরণ শ্রবণ করিলে আমার প্রতি আপনার ক্রোধের পরিবর্ত্তে করুণারই উদ্রেক হইবে—অভি-শাপের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদই বর্ষিত হইবে; আপনি প্রীতি-প্রফুল্ল মনে না হউক, অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্নেহাশীষ বচনে অবশ্যই এ হতভাগ্যকে ক্ষমা করিবেন।

(২)

অতঃপর যুবক বলিতে লাগিল:—

ক্ষুদ্র পল্লী হরিপুর গ্রাম আমার জন্ম স্থান। শৈশবে সূতিকা-গৃহে আমার স্নেহময়ী জননী

সংসারের মায়া কাটাইয়া, তাঁহার স্নেহের শিশুটীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া অকালে সর্ব্বসুখ-নিকেতন অমরধামে প্রয়াণ করেন। আমাকে লালন-পালন করিতে পারেন, সংসারে এমন আপনার জন কেহ না থাকায়, বিপত্নীক পিতা এ হতভাগ্যকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলেন। স্নেহময় জনক স্বহস্তে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া পক্ষিণীর ন্যায় সযত্নে বুকে আবরিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পিতার ক্লেশের অবধি ছিল না। জল তোলা, মসলা বাটা, কুটনো কোটা, এমন কি, আমাকে দুগ্ধ খাওয়ান ও আমার মল-মূত্র পরিষ্কার করা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাকে স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইত! এইরূপে পিতৃস্নেহের মধুর আবরণে আমি সযত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। গৃহে অন্য লোক না থাকায় পিতা আমাকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র যাইতে সমর্থ ছিলেন না। একজন প্রতিবেশী আত্মীয় আমাদের হাট-বাজার করিয়া দিতেন, এ জন্য তাঁহাকেও কিছু কিছু সাহায্য করিতে হইত। নিয়ত গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পিতার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল। নিরুপায় পিতা অতিকষ্টে উভয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কত লোকে কত বলিল, তথাপি আমার ক্লেশ হইবে মনে করিয়া তিনি আর বিবাহ করিলেন না।

দিন যায়, থাকে না। আমাদেরও দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে আমি দশ বৎসরের হইলাম; কিন্তু সংসার আর চলে না। অগত্যা দশজনের মন্ত্রণায় ও কঠোর কর্ত্তব্যের প্রেরণায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। পিতা অশ্রুপ্রবাহে বুক ভাসাইয়া একরূপ প্রৌঢ় বয়সেই আমার বিমাতাকে গৃহে আনিলেন। রায়-গৃহের চির দৈন্য ও পিতার বয়স—আমাদের বংশমর্য্যাদা ও কন্যাদায়ের কঠোরতায় ভাসিয়া গেল।

বিবাহের পর নানাকারণে আরও কিছুকাল পিতৃদেব অর্থার্জ্জনে যত্ন করিতে পারিলেন না। সুতরাং ক্রমে ঋণভার আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। শেষে আর ঋণ মিলে না! প্রাপ্তির-আশা না থাকিলে কে ঋণ দিবে? ক্রমশঃ বাস্তুভিটা বাঁধা পড়িল, গৃহের তৈজসপত্র সব পেটের দায়ে বিক্রয় হইতে লাগিল। অভাবের সংসারের ইহাই শেষ পরিণাম। সংসার যখন একরূপ সম্পূর্ণ অচল হইল, তখন নিরুপায় জনক তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে গৃহের অভিভাবিকা-স্বরূপ রাখিয়া অর্থার্জ্জন অভিলাষে বিদেশে গমন করিলেন।

পিতা সুশিক্ষিত হইলেও তাঁহার লেখাপড়া জানার কোনরূপ মাপকাঠি বা জয়পতাকা ছিল না। বিশেষতঃ নানারূপ ক্লেশে ও বয়সাধিক্য বশতঃ তাঁহার শারীরিক শক্তিরও হ্রাস পাইয়াছিল। সুতরাং কোনরূপ উচ্চপদলাভ বা শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সহরে যাইয়া তিনি মাসিক পনর টাকা বেতনের একটী ক্ষুদ্র কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার স্বল্প আয়ে অতি ক্লেশে আমাদের সংসারযাত্রা একরূপ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল; কিন্তু ঋণশোধ অসম্ভব হইল।

সুদের দায়ে ক্রমশঃ ঋণভার বাড়িতে লাগিল।

এ সময় পিতার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল—তিনি ঋণদায়ে দিশেহারা হইয়া শুধু পাঁচ শত টাকার প্রলোভনে আমায় বিক্রয় করিলেন। একরূপ অপরিণত বয়সেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিক্রয়লব্ধ টাকার বেশীভাগই বিবাহ-উৎসবে ব্যয় হইয়া গেল। যাহা উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাতে মহাজনদের সুদের টানও মানিল না; তা মূলঋণ শোধ হইবে কিরূপে? মানুষ অনেক সময় সুখের আশায় নূতন বিপদ ডাকিয়া আনে। আমাদেরও সেই দশা হইল, পরের মেয়ে আপনার জন হইয়া ঘরে আসিল, সংসারের খরচ বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইল না। ইহারই নাম—বিপদবরণ। আমি বয়স্থ ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিলে, আমার সহধর্ম্মিণী—আমার ভাবী বংশধরের জননীকে সংসারের বোঝা বলিয়া বোধ হইত না।

ক্রমে সুদে সুদে ঋণের বোঝা ভারি হইয়া আমাদের পৈত্রিক বসতবাটীখানি যাইবার উপক্রম হইল। কিছুমাত্র সম্পত্তি না থাকিলেও বাড়ী আছে—মাথা গুঁজিয়া থাকিবার জন্ত অন্ততঃ দু'একখানি পর্ণকুটীর আছে—ইহা একটা গর্ব্ব করিবার বিষয়; আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও ধ্বংসের পথে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দুই একজন বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিবেশীর পরামর্শে পিতা বাড়ীখানি দানপত্র করিয়া বিমাতার নামে লিখিয়া দিলেন।

আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতীর্ণ হইলাম। লোকে বলিতে লাগিল, অল্পবয়সে পরিণয়ের ইহাই পরিণাম। পিতার মুখ ভার হইল। আমি যে একটা উৎকৃষ্ট গর্দ্দভ, বিমাতা লোকদিগকে সে কথাটা ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে ক্রটী করিলেন না। গভীর বেদনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বর্ষার আতটপ্লাবিনী ভরা গঙ্গার ন্যায় আমার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। জীবনের অনন্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিলাম—আশা ভরসা সব ফুরাইল।

আমার পড়াশুনা বন্ধ হইল। অর্থাভাবে বহু যত্ন করিয়াও আর স্কুলে পড়িতে সমর্থ হইলাম না। পিতা রুষ্টভাবে বলিলেন,—"আর ওসব মাথামুণ্ড পড়িয়া কায নাই, এখন আপন পথ দেখ—দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।" বুঝিলাম, ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেও, পিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সুপরামর্শ—তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কায-কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কায আর জুটিল না। অগত্যা স্বগ্রামে জনৈক প্রতিবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা খুলিয়া বসিলাম।

অভাবের সংসার। ক্রমে বিমাতার সহিত তাঁহার পুত্রবধুর বিষম ঝগড়া আরম্ভ হইল। একবার সপ্তাহব্যাপী কলহ চলিতে লাগিল। একদিন বিমাতা মহিষ-মর্দ্দিনীর ন্যায় আঁশ্‌বটী লইয়া তাঁহার পুত্রবধুকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রমাদ গণিলাম। অনুনয় বিনয় করিয়া লোকনিন্দা ও পুলিশের ভয় প্রদর্শন করিয়া সে যাত্রার মত তাঁহাকে একটা মানুষবলির—একটা

স্ত্রীহত্যার পাপ হইতে বিরত করিলাম। মাতা অতি ক্রোধের উত্তেজনায় বৎসহারা বাঘিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। মাতামহী কন্যার পক্ষের ওকালতী লইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাটা ঘায়ে লবণ প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন, লজ্জা, ঘৃণা ও গভীর মর্ম্মবেদনায় আমি জীবন্মৃতবৎ হইয়া রহিলাম।

এ দুর্দ্দিনে সহসা পিতা গৃহে ফিরিলেন। মনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, পিতার ভয়ে মাতা ও মাতামহী অবশ্যই শান্তভাব ধারণ করিবেন; অচিরে গৃহে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু ভাবিলাম এক, হইল আর। মাতামহীর কুমন্ত্রণায়—বিমাতার অশ্রুপ্রবাহে আমরা ভাসিয়া যাইবার পথে পড়িলাম। এক পক্ষের কথা শুনিয়া পিতা আমার ও তাঁহার পুত্রবধুর প্রতি বিষম রুষ্ট হইলেন। তাঁহার অন্যায় অসন্তোষের ফলে আমরা বাটী হইতে বিতাড়িত হইলাম। পিতৃতাড়িত কুলাঙ্গার পুত্র আমি, নিরাশ্রয় হইয়া অগত্যা পত্নীসহ শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। শ্বশুরের অবস্থা ভাল ছিল না, তাঁহার গলগ্রহ হওয়া কাপুরুষতা মনে হইল। পত্নীকে তথায় রাখিয়া আমি অর্থের অন্বেষণে বিদেশে রওনা হইলাম।

(৩)

বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই—তাহার উপর উপযুক্ত কর্ম্মজ্ঞান ও সহায়-সম্পদ কিছুই নাই, আমাকে চাকুরী দিবে কে? বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আসামের সুদূর চা-বাগানে ক্ষুদ্র বেতনে একটা কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলাম।

কর্ম্ম পাইয়াই পিতৃদেবের নিকট এক পত্র লিখিলাম; কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। আবার লিখিলাম, সে পত্রেরও উত্তর আসিল না। ক্রমে অনেকগুলি পত্র লিখিলাম—তাঁহার শ্রীচরণে নিরপরাধ আমি—কত ক্ষমা চাহিলাম, কিন্তু আমার উপর অন্যায় রাগবশতঃ বা অন্য কি কারণে তিনি অথবা বিমাতা কেহই একখানি পত্রেরও উত্তর দিলেন না। জনক-জননীর উদ্দেশে মণিঅর্ডার যোগে দুই চারিবার টাকা পাঠাইলাম, কিন্তু তাহাও ফেরত আসিল। পিতা আর এ হতভাগ্য সন্তানের কোন সংবাদই লইলেন না। হায়! অবশেষে আমাকে বাধ্য হইয়া পিতামাতার উদ্দেশে পত্র লেখা বন্ধ করিতে হইল। পিতা-পুত্রের সাংসারিক সম্বন্ধ ঘুচিল।

আমি আজ সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কাল আসামের নির্জ্জন বনে নির্ব্বাসিত। আমার সহধর্ম্মিণী আমার সুখে-দুঃখে নিত্যসঙ্গিনী হইয়া আজ দশ বৎসর কাল আমার সহিত আসামেই বাস করিতেছেন। আমি বিশ টাকা বেতনের ক্ষুদ্র কেরাণীর পদ হইতে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপায় দুই শত টাকা বেতনের সহকারী ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছি। আমার চাকুরী-জীবন একরূপ সুখেই কাটিয়া যাইতেছে।

এদিকে ঋণদায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বার্দ্ধক্যের জীর্ণ দেহটি লইয়া পিতৃদেব শয্যাশায়ী হইলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি বিধাতার ডাক পড়িল। তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইল। প্রায় বৎসরাধিককাল হইল, তিনি

পরলোক গমন করিয়াছেন! কিন্তু এ হতভাগ্য সন্তান এতদিন তাঁহার কোন সংবাদই পাইতে পারে নাই। পিতা অতি নিঃস্বাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। একমাত্র বসত-বাটী খানি ব্যতীত তিনি আর কোন সম্পদই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মাতা অতি ক্লেশে অবস্থানুযায়ী অতি দীনভাবে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি শ্রাদ্ধ-কার্য্যের জন্যও তাঁহার এ অধম পুত্রকে একটা সংবাদ পর্য্যন্তও প্রদান করেন নাই। জানি না, আমি তাঁহাদের চরণে কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

পিতা ঋণদায়ে পড়িয়া বড় অশান্তিময় জীবনভারই বহন করিয়া গিয়াছেন। যথা-সর্ব্বস্বের বিনিময়েও তিনি ঋণ-মুক্ত হইতে পারেন নাই। ইচ্ছা সত্বেও বাটীখানি বিক্রয় করিয়া তিনি সব ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কারণ উহা তাঁহার নহে, মাতার। তিনি এ ঋণ-দায়ে একটা গভীর দুঃখের বোঝা—একটা অনন্ত অশান্তির গুরুভার হৃদয়ে বহন করিয়া এ স্বার্থপূর্ণ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিমাতা আমার প্রতি বিতরাগতরে যত না হউক, এই বাস্তভিটাটী হস্তচ্যুত হইবার ভয়েই আমাকে পিতৃ-বিয়োগের সংবাদটাও প্রদান করেন নাই। ইহাই যে তাঁহার একমাত্র সম্বল। হায় ঘৃণিত স্বার্থ! আহা! হতভাগিনী জননী নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ স্বার্থনাশের অলীক আশঙ্কায়—বৃথা লোভের কুহকে আমাকে আমার পিতৃবিয়োগের সংবাদটা প্রদান না করিয়া পরলোকগত পতির শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত পণ্ড করিয়াছেন। আহা! কি নিষ্ঠুর নিয়তি।

সুদীর্ঘকাল পরে আমি সস্ত্রীক দেশে আসিয়াছি। আমি নিঃসন্তান। সংসারে ব্যয়-বাহুল্যের কারণ কিছু নাই। দরিদ্র-সন্তান—দীনভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তাই কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছি। মনে বড় সাধ ছিল, একবার পিতৃ-চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া—তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দেখিব, তিনি এই হতভাগ্যকে পদে স্থান দান করেন কিনা। হায়! "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" সেই পিতাই যদি—আমার প্রতি প্রীত না হইলেন, তবে আর আমার মানব-জন্ম ধারণ করিয়া ফল কি? কিন্তু হায়! দেশে পৌঁছিয়াই পিতৃদেবের পরলোকগমন-বার্ত্তা পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমার সকল আশা বিফল হইল। আমার এ সংসারের একমাত্র বান্ধব—একমাত্র মূর্ত্তিমান দেবতা হারা হইয়া আমি উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শোকে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। প্রাণের ব্যাকুলতায় পত্নীকে তাহার পিতৃ-গৃহে রাখিয়া উন্মাদের ন্যায় আমার চিরপ্রিয় জন্মভূমি—পিতৃভবনের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে গতি ক্রমে মন্থর হইতে লাগিল। অনন্ত ভাবনার গুরুভার আমার গতিশক্তি হ্রাস করিয়া দিল। হৃদয়ে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, শুধু কর্ত্তব্যের কঠোর প্রেরণায় চিন্তাক্লিষ্ট মনে ধীর মন্থর চরণে

আমি আমার মহাতীর্থ চিরপবিত্র চিরপ্রিয় জন্মভূমিতে উপনীত হইলাম।

উদাস প্রাণে বাষ্পাকুলিত লোচনে একবার বাসভবনের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, সব শূন্য ; আমার বলিতে সে ভবনে আর কেহই নাই। চতুর্দ্দিক যেন অনন্ত আঁধার—অনন্ত শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাটীর গৃহগুলিও প্রায় সব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে একখানি পতনোন্মুখ ভগ্ন পর্ণকুটীর—একখানি অতি জীর্ণ পত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র চালা ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুটীরের চারিদিকে অনন্ত আবর্জ্জনা-জঞ্জাল অসংখ্য বৃক্ষ-লতা বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র কুটীরের জীর্ণ দেহখানিকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আবরিয়া রহিয়াছে। আমার চিরপরিচিত আম্র, পনস, জম্বুরা, জামীর ও লিচু বৃক্ষগুলি গৃহস্থের দারুণ দৈন্যের পরিচয় স্বরূপ অনেকেই পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও বনলতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবন্মৃতবৎ দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচীন ফলবান্ বৃক্ষগুলির স্থল এখন কণ্টকতরু ও আবর্জ্জনার অধিকৃত হইয়াছে। বাটীখানি দেখিলেই উহা শ্মশানচিত্র বা পিশাচের রঙ্গভূমি বলিয়া ভয়-বিস্ময়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে স্থানে স্নেহময়ী জননীর শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার অমৃতোপম স্তন্য পান করিতে করিতে নিশ্চিন্ত মনে মহাসুখে নিদ্রা গিয়াছি, যে স্থানে বাল্য সহচরগণের সঙ্গে মনোরঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুকে অনন্ত শান্তি উপভোগ করিয়াছি, সে স্থান নির্জ্জন বন—ভূতলে শৃগাল-সজারু এবং বৃক্ষে বন্য-বাদুর ও পেচককুলের প্রিয় বাসভবন। যে পরম সুন্দর স্বচ্ছ শীতল পুষ্করিণীর জলে স্নেহময় পিতার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া স্নান-সুখ ভোগ করিয়াছি, এখন তাহা দাম-দলপূর্ণ বিষধর সর্পাদির প্রিয় নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। এসব হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন ও শৈশব ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

রোদন-ধ্বনি শুনিয়া আমার বিমাতা সেই গৃহ হইতে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। তাঁহার শরীর অতি শীর্ণ—রক্তহীন পাংশুবর্ণ : চক্ষুর্দ্বয় কোঠরাগত, পরিধানে শত ছিন্ন মলিন বসন। বিমাতার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে শোক-দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছুটিয়া সেই ভগ্ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া একটা মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া একটুকু জল ও একখানি অতি জীর্ণ তালপত্রের হাতপাখা আনিয়া তাঁহার চোখে, মুখে ও মস্তকে শীতল জল সেচন করিয়া মাথায় বাতাস দিতে লাগিলাম। একটুকু যত্ন করিতেই তাঁহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মূর্চ্ছান্তে ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া বসিলেন। মাতা-পুত্রের ক্রন্দনে সে স্থানের মৃত্তিকা সিক্ত হইল—অশ্রু-গঙ্গা-প্রবাহে শ্মশানের অনল সিক্ত হইল—চিতা নিবিল।

ক্রন্দনে প্রাণের ভার একটুকু লঘু হইলে ক্রমে সে অশান্তির গৃহেও একটুকু শান্তির

ক্ষীণরেখা দেখা দিল। মাতা-পুত্রে সুখ-দুঃখের কত কথা—কত আলোচনা হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সাঁঝের আঁধারে জগৎ সমাবৃত হইল। আমি সান্ধ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া—জননীর বহুক্লেশ-সঞ্চিত সামান্য দ্রব্য দ্বারা জলযোগান্তে সেই ভগ্ন কুটীরে শয়ন করিলাম।

একজন প্রতিবাসিনী স্বজাতীয়া গ্রাম্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টা বর্ষিয়সী আত্মীয়মহিলা জননীর শুশ্রূষাকারিণী ও নৈশ-সঙ্গিনীরূপে প্রত্যহ মাতৃ-গৃহে শয়ন করিতেন, তিনি মাতৃ-শয্যার প্রায় বার আনা অংশ জুড়িয়া গভীর নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন। আর আমরা মাতা-পুত্রে দীর্ঘকালের সুখ-দুঃখের কাহিনী আলোচনা করিয়া প্রায় বিনিদ্রনয়নেই সে সুদীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। সময় যায়, থাকে না; আমাদের দুঃখের কাহিনীর সহিত সে দুঃখময়ী যামিনীর অবসান হইল।

আমি পিতৃশ্রাদ্ধ-কার্য্যে বঞ্চিত হইয়াছি। অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অভিমতে গয়াধামে যাইয়া পিতৃ-পিণ্ড প্রদান করাই সমীচীন বোধ হইল। মা তীর্থসঙ্গিনী হইতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার রোগ-শীর্ণ ভগ্ন শরীর সুদূর তীর্থ-যাত্রার উপযোগী নহে বলিয়া, জননীর সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে ভরণপোষণোপযোগী উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিয়া আমি সে দিনই গয়া যাত্রা করিলাম।

(৪)

গয়াধামে পৌঁছিয়াই এক মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম। আমি বিনীতভাবে তাঁহার চরণে অভিবাদন করিলাম। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া সস্নেহে স্মিতমুখে বলিলেন,—"বৎস! তুমি বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিতৃ-পিণ্ড প্রদান করিতে যাইতেছ, বেশ কথা; এস, আমি তোমাকে একটী ক্ষুদ্র মন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তুমি এই মন্ত্র-শক্তি-প্রভাবে পিণ্ড প্রদানকালে তোমার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইবে। তুমি সেই ছায়ামূর্ত্তির হস্তে পিণ্ড প্রদান করিও। তাঁহারা বিষ্ণুপদতলে কর পাতিয়া তোমার শ্রদ্ধাদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বৎস, সাবধান, ছায়াহস্ত দর্শন না করিয়া শুধুই বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিয়া গৃহে ফিরিও না। তাহাতে পিতৃগণ সহ তোমার অধঃপতন অনিবার্য্য। যদিও বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলেই পিতৃপুরুষগণ মুক্ত হইয়া থাকেন, বিশ্বময় নারায়ণ; যদিও বিষ্ণু প্রীতিতেই বিশ্বপ্রীতি সম্পাদিত হয়, তথাপি কোনও অতি গূঢ় কারণে এ ক্ষেত্রে তাহা হইবে না, ইহা ভগবৎ অভিপ্রেত, বিশ্ব-বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান।" আমি মহাপুরুষ-দত্ত মন্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমি বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হইলাম। দেবতার কৃপায় ভক্তি-বিশ্বাসে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভক্তিভরে সেই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই এক ছায়া-মূর্ত্তি ছায়াহস্ত প্রসারিত করিয়া আমার প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিস্ময়-উল্লাসে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, আমি সাগ্রহে

সে ছায়াহস্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় একটী সামান্য পিণ্ড প্রদান করিলাম। এইরূপে অনেক গুলি পিণ্ড প্রদত্ত হইল। সেবগুলিই পিতৃপুরুষেরা সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হায়! আমার পিতৃদেবের ছায়ামূর্ত্তি—তাঁহার ছায়াহস্তের ত দর্শন পাইলাম না! তিনি ত এ অধম-প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিলেন না! আমি পিণ্ড হস্তে করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আমি তাঁহাকে দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিয়া বলিলাম, "ঠাকুর, দয়া করিয়া আবার নূতন দ্রব্যে নূতন পিণ্ড প্রস্তুতের অনুষ্ঠান করুন, এ পিণ্ড-পদার্থে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না, আমার ইচ্ছা আমরা উভয়ে পুনঃ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া আবার নূতন দ্রব্যে নূতন পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া অর্পণ করি; আপনার শ্রম বৃথা যাইবে না, আমি আপনাকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদানে সম্মত আছি।" ব্রাহ্মণের রুদ্রমূর্ত্তি শান্ত হইল।

গঙ্গাস্নানান্তে নূতন দ্রব্যে নূতন পিণ্ড প্রস্তুত হইল। কিন্তু হায়! কতবার মন্ত্র পাঠ করিলাম—কত কাঁদিলাম, পিতৃদেবের ছায়ামূর্ত্তি দূরে থাকুক, ছায়া-হস্তেরও দর্শন পাইলাম না, অভাগার হাতের পিণ্ড হাতেই রহিল। ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"ফেল, পিণ্ড ঐ বিষ্ণু-পাদপদ্মে।" আমি বলিলাম, "ঠাকুর, কাহাকে পিণ্ডার্পণ করিব? আমার পিতা ত পিণ্ড গ্রহণ করিতেছেন না?" ব্রাহ্মণ সক্রোধে বলিলেন, "দূর হ বেটা পাগল! আমি এই গয়াপিণ্ড দিতে দিতে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, পিতৃ-পুরুষে আসিয়া স্বহস্তে পিণ্ড গ্রহণ করেন, এ ত কখনও দেখি নাই—এমন প্রলাপোক্তি ত কখনও শুনি নাই! ফেল পিণ্ড ঐ বিষ্ণু-পদতলে, ওখানে পিণ্ডদানেই তোমার পিতৃপুরুষের উদ্ধার হইবে, বিষ্ণুপ্রীতিতেই সর্ব্বজীবের প্রীতি—সর্ব্বজীবের মুক্তি।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া,—অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া আমিও অনিচ্ছায় হাতের পিণ্ড ত্যাগ করিয়া বাসায় প্রতিগমন করিলাম।

বাসায় যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। মনে বড় দুঃখ হইল। হায়! জীবিতাবস্থায় যে পিতাকে এক গ্রাস অন্ন—এক গণ্ডুষ জল দানে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হই নাই, সেই পরলোকগত পিতা এখন তাহার এ অধম সন্তান-প্রদত্ত সামান্য পিণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন? ক্রন্দনে হৃদয়ের গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া সায়ংকৃত্য সম্পাদন করিলাম। অনন্তর দেবানুগ্রহ ও পরলোকগত পিতার প্রসন্নতা-লাভ-মানসে আমি বিষ্ণু-মন্দিরদ্বারে যাইয়া ধন্না দিয়া ভূতলে পড়িয়া থাকিলাম। আমি ভক্তিভরাভ প্রাণে গয়ার জাগ্রত বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু-দেবতার পবিত্র চরণে আমার প্রাণের কথা—হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে লাগিলাম। আমার উষ্ণ অশ্রুপ্রবাহে দেবতার পবিত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ সিক্ত হইল।

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কুক্কুরকুলের উচ্চ চীৎকার, ঝিল্লীরব ও পাহারাওয়ালাগণের নিদ্রালস

সুদৃঢ়কঠোর কণ্ঠধ্বনি ব্যতীত সে নীরব প্রকৃতি কোলে আর কোন সাড়াশব্দই যেন ছিল না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। শিশিরসিক্ত শীতল বায়ুস্পর্শে প্রকৃতিবক্ষ পরম শীতল।

পূর্ব্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছি; আজ সমস্ত দিন-রাত্রি মধ্যে গঙ্গাস্নান ও তর্পণাদি ব্যতীত জলস্পর্শও করি নাই। অনশন-অনিদ্রায় আমার ক্ষীণ শরীর বড় বেশী অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরম শীতল নৈশ বায়ুস্পর্শে—দেবতার পূত নাম জপ ও পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে আমি ঘুমঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম।

আমি বাহ্য জ্ঞানহীন—চৈতন্যশূন্য। সহসা সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মহাপুরুষ আমার শিরোভাগে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"বৎস! ভীত হইও না, দুঃখিত হইও না, বিচলিত হইও না, ধীরভাবে আমার কথা শুন.তোমার পিতা ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী, তাই এখন তাঁহার পরলোকগত আত্মা কুক্কুরদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার উত্তমর্ণের বাটীতে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত আছে। যতদিন তাঁহার ঋণ পরিশোধ না হইবে—নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে ততদিন তাঁহাকে এই ঘৃণিত পাশব দেহেই থাকিতে হইবে। কার সাধ্য বিধাতার অখণ্ড বিধানের খণ্ডন করে? যাও বৎস! তুমি সত্বর দেশে যাইয়া পিতৃঋণ শোধ করিয়া পিতাকে পাশবিক দেহ হইতে মুক্ত কর, তারপর পুনরায় গয়াতে আসিয়া পিণ্ড প্রদান করিলেই তাঁহার ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পাইবে এবং তোমার প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে তিনি মুক্তিলাভে স্বর্গবাসী হইবেন।"

মহাপুরুষের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই আমার সুপ্তিস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চক্ষু-উন্মীলিত করিয়া দেখি, পূর্ব্বদিকে নব সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ স্বর্ণলতার ন্যায় ভূতলস্পর্শ করিয়া সবুজ ঘাসের উপর লুটোপুটি খাইয়া শিশির-বারি অঙ্গে মাখিতেছে। ভাবরূপ চক্ষু মুছিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সন্ন্যাসী তখন আর তথায় নাই! একি স্বপ্ন? না, দেবতার প্রত্যাদেশ? না, দেহস্থ সুপ্ত আত্মার বিবেক-বাণী?

শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধ প্রভাত-বায়ুর-স্পর্শে আমার ক্ষীণদেহে—দুর্ব্বল হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হইল। আমি বিষ্ণুপদে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া পাণ্ডাজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ স্বদেশ-যাত্রা করিলাম। পাণ্ডাজী সহসা আমাকে দেশে প্রতিগমন করিতে দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। দুই একটী প্রশ্ন অন্তে আমার নিকট প্রীতিকর উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন,—আমি উন্মাদ।

আমি বাড়ী পৌঁছিয়া প্রথমেই বিমাতার নিকট পিতার ঋণের অনুসন্ধান লইলাম; তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,পিতা বিষয়-সম্পদ বিক্রয় করিয়া সব ঋণই শোধ করিয়া গিয়াছেন। পিতার সেই জীর্ণ গৃহ খুঁজিয়া গৃহকোণে অতি পুরাতন, অতি মলিন একটী ভগ্ন বাক্সে কতকগুলি কাগজ পত্র দেখিতে পাইলাম, তাহাতে মহাজনের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু ঋণ-পরিশোধের কোনও নিদর্শন নাই।

তখন সেই কাগজে আপনার নাম,ধাম ও ঋণের পরিমাণ পাইয়া আমি অবিলম্বে মহাশয়ের নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি। আপনি আমার পিতাকে ঋণমুক্ত করা মাত্র আমার পিতার আত্মা এই ঘৃণিত কুকুর-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তির পবিত্র বাতাসে দেবদেশে প্রয়াণ করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই কুকুরের আকস্মিক মৃত্যুই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতেই সমাগত জনমণ্ডলী মহাবিস্ময়ে "হরিবোল—হরিবোল" ধ্বনি করিয়া উঠিল। কুকুরের মৃত্যু-জনিত বিষাদভাব দূরে গিয়া আমার প্রাণে একটা নূতন ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইল। ভাবিলাম, ইহকালের পর পরকাল এবং সেই পরকালে ঐহিক কর্ম্ম-ফল ভোগ সুনিশ্চিত। মুহূর্ত্তে আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই সদ্য ওয়াশীল প্রদত্ত ঋণ-পত্রগুলি স্ব-হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। এবং অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া বালবিধবা—দুঃখের শিশু পৌত্রী কুসুমের প্রাত্যহিক দুগ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। এই মাত্র বঞ্চনা করিয়া অতিরিক্ত যে টাকাগুলি রাখিয়াছিলাম, যুবককে তাহা ফিরাইয়া দিবার জন্য বহু যত্ন করিলাম, শত অনুরোধেও তিনি আর সে টাকা ফিরিয়া লইলেন না। অনতিবিলম্বে উহা দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইল। আমি যেন নূতন জগতের নূতন জীব হইতে চলিলাম। যুবক আমাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর যুবক অচিরে শ্রীধাম গয়াক্ষেত্রে যাইয়া পিতৃ-উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিলেন। এবার ধীরে ধীরে তাহার পিতৃ-হস্ত আসিয়া পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিল। যুবকের সাধ পূর্ণ, জীবন ধন্য ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইল। বস্তুতঃ পরকাল সত্য, ইহকালের পর—ঐহিক কর্ম্ম-জীবনের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগও অনিবার্য্য। এবং গঙ্গাস্নান, তীর্থভ্রমণ ও পারলৌকিক আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও পিণ্ড-প্রদান প্রভৃতি সমস্তই সত্য; শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি-বিধান সমূহের একবর্ণও মিথ্যা নহে। দান-ধ্যান, পূজা-পার্ব্বণ এবং মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ সকলই সার্থক; এ সকল শুধুই স্বার্থপর ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতগণের স্বার্থসিদ্ধির কল্পিত বিধান নহে। এ সংসারে কেহ কাহাকেও প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেও ধর্ম্মের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে—বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে পরকালে সকলেই আপনার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবার ও বঞ্চনাকারী বঞ্চনা-লব্ধ বিষয়-সম্পদ সব ফিরিয়া দিবার জন্য অবশ্য দায়ী। আইনের সূক্ষ্ম বিধানে—সাক্ষীর অভাবে বা তামাদি দোষে ঋণ-খৎ পণ্ড হইলেও ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিধানে কেহই মুক্তি লাভে সমর্থ নহে। অপরিশোধ্য ঋণের জন্য অধমর্ণ ধর্ম্মের শাসনে উত্তমর্ণের নিকট চিরঋণী। অতএব;—

হ'লে পরে কার কাছে ঋণী কোন জন,
শোধিবেক সেই-ঋণ করি প্রাণপণ।
ধার না শোধিলে হায়,
কত যে যাতনা তায়,

ইহ-পরকালে ধনী ভুঞ্জে অনুক্ষণ;
দুঃখের অনন্ত বোঝা ধনীর জীবন।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন

শক্তি-পূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দুশাস্ত্রে যাগ-যজ্ঞ পূজাদির যত প্রকার বিধি-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক। অধুনা আমাদের দেশে বৈদিক শক্তি-পূজার প্রচলন নাই বলিলেও চলে। পৌরাণিক শক্তিপূজার মধ্যে দুর্গোৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কালিকা, নন্দী ও দেবী পুরাণেই সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গোৎসবই সমধিক প্রসিদ্ধ।

পৌরাণিক পূজা আবার ত্রিবিধ,—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী।

চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্বিকী, রাজসীচৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥
সাত্বিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্য জপঃপ্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা।
দেবীসুক্তং জপৈশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পণং॥
রাজসী বলীদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনাতু যা॥
বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা।
আখ্যৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ॥

[কালিকা পুরাণ]

জপ, যজ্ঞ, মাহাত্ম্যাদি পাঠ ও নিরামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজার নাম সাত্বিক পূজা। আর জপ-যজ্ঞ ব্যতীত কেবল বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য ও মদ্যাদি দ্বারা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মাহাত্ম্যাদি পাঠ দ্বারা পূজার নাম রাজসী। তামসী পূজা বিনা মন্ত্রেই হইয়া থাকে। অধুনা আমাদের দেশে পৌরাণিক পূজাগুলি সাত্বিক ও রাজসিক বিধানে অনুষ্ঠিত হয়। তামসিক পূজার প্রচলন নাই বলিলেও চলে।

এক সময়ে তান্ত্রিক পূজা এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, যে অধুনা শক্তিপূজা বলিতে আমরা সাধারণতঃ তান্ত্রিক পূজাই বুঝিয়া থাকি। তান্ত্রিক উপাসনা বৈদিক উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; তবে পৌরাণিক উপাসনার সহিত স্থান বিশেষে ইহার কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে মাত্র। বীজ-মন্ত্র তান্ত্রিক উপাসনার প্রধান উপকরণ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ঘটস্থাপন, বলিদান, হোম প্রভৃতি পূজার যাবতীয় কার্য্য বীজ-মন্ত্রে সাধিত হইয়া থাকে। তান্ত্রিক গুরুরা শিষ্যগণকে দীক্ষাকালে ইষ্ট-দেবতার বীজ-মন্ত্র উপদেশ দেন। সকল দেবতার বীজ বিভিন্ন এবং অতীব গোপনীয়।

তান্ত্রিক উপাসনা প্রধানতঃ তিন ভাবে বিভক্ত,—পশুভাব, দিব্যভাব ও বীরভাব। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এই তিন ভাবের যেরূপ বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জানা যায়, পশুভাবাবলম্বী শাক্তগণ পত্র পুষ্প, ফল ও জল স্বয়ং আহরণ করে, শূদ্রাদির মুখদর্শন্ করে না এবং মনেও কখন কোনও স্ত্রীলোককে স্থান দেয় না। দিব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ

দেবতুল্য; ইহাঁরা সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, বাসনারহিত ও ক্ষমাবান্ হইয়া থাকেন। বীরভাবাপন্ন উপাসকেরা মদ্য-মাংসাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পঞ্চ'ম' কার সাধন ইহাঁদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ (১)। প্রায় সকল তন্ত্রেই বীরভাবের সমধিক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ।
বীর-সাধন-কর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে।

[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র]

কলিযুগে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও দুর্ল্লভ, কেবল একমাত্র বীরভাবই কলিতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

তন্ত্রে উক্ত তিন ভাবকে আবার সাত প্রকার আচারে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার (২)।

চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারা দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

[নিত্য তন্ত্র]

বেদাদি প্রথম চারিটী পশুভাবে এবং বামাদি শেষ তিনটী দিব্য ও বীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সপ্ত প্রকার আচারীর মধ্যে বঙ্গদেশে দক্ষিণাচারী, বামাচারী ও কৌলাচারী শক্তিই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিকগণ শান্ত, ধীর ও অহিংসারত, ইহাঁদের আহার ও পানীয় সাত্ত্বিক এবং ইহাঁরা মদ্যমাংসাদি স্পর্শও করেন না, অতিশয় শুদ্ধাচারে থাকেন। বামাচারীদিগকে কতকটা দিব্যভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে; ইহাঁদের জীব-বলি নাই, ইহাঁরা কেবল সাত্ত্বিক কুষ্মাণ্ডাদি বলির দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কৌলাচারীরা সম্পূর্ণ বীরভাবাপন্ন, মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ 'ম' কার সাধনই ইহারা পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করেন।

বলি তান্ত্রিক পূজার প্রধান অঙ্গ, সুতরাং শক্তিপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, বলি সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা বলিতে হয়। পুরাণ ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রেই বলিকে শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বটে কিন্তু জীব-বলি ব্যাপারে তন্ত্রশাস্ত্রের বিলক্ষণ প্রভুত্ব আছে, সন্দেহ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে নরবলিকে অষ্টসিদ্ধি লাভের উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) ইহাতে যে সাত্ত্বিক বলির বিধান নাই, এমন কথা বলা যায় না; কেন না 'সময়াচার' তন্ত্রে কথিত আছে "সাত্ত্বিকো বলি-রাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ"; তবে তন্ত্রোক্ত 'বলি' বলিলেই আমরা সচরাচর রাজসিক জীব বলিই বুঝিয়া থাকি। অধুনা বঙ্গদেশে

(১) বীর সাধন কর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যমুদ্রামৈথুন মেব চ।
এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর।
[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র]

(২) সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমম্ বামম্ বামাৎ সিদ্ধান্ত মুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমম্ কৌলম্ কৌলাৎ পরতরং নহি।
[কুলার্ণব তন্ত্র]

(৩) ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাৎ মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ।
পক্ষিদানে ঋদ্ধিঃ স্যাৎ গোধিকায়াং মহাফলং।
নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা।
[কুমারীতন্ত্র]

বলি সম্বন্ধে নানা মতভেদ ও বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে বটে কিন্তু বলিহীন শক্তিপূজা অতি অল্প অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা জীব বলির বিরোধী অথবা বৈষ্ণব, তাঁহারা সাধারণতঃ সাত্ত্বিক কুষ্মাণ্ডাদি বলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু বলিহীন পূজা করিতে সাহসী হন না। (৪)

অধুনা আমাদের দেশে প্রতিমাদিতে শক্তিপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কোন সময় হইতে এবং কিরূপে এই মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নির্ণয় করা বাস্তবিকই দুরূহ। তবে যতদূর অনুসন্ধান করা সম্ভব, তাহাতে দেখা যায়—পৌরাণিক সময়েই মূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ। পৌরাণিক শক্তিমূর্ত্তির সহিত রামায়ণ ও মহাভারতে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সাহিত্যে বা প্রস্তরলিপিতে শক্তি-মূর্ত্তির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীসদেশীয় দূত মিগাস্থিনীস্ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন সময়ের ভারতের এক অবস্থা লিখিয়া যান। তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শক্তির উপাসনা তখন ভারতে প্রবল ছিল। ষ্ট্রাবো ও আরিয়ন নামক গ্রীক গ্রন্থকারগণ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে দেখা যায় যে, সে সময় ভারতে দেবী-পূজার প্রাধান্য ছিল (৫)। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের সমুদায় আখ্যান মধ্যেই শিব ও শক্তির ভূরি ভূরি প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য খৃষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃচ্ছকটিক-নাটক-রচয়িতা শুদ্রক রাজা কলির ৩২৯০ বৎসর গত হইলে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। অতএব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুদ্রক রাজার বর্ত্তমান থাকা দেখা যাইতেছে। তাঁহার রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে কাপালিক কর্ত্তৃক দেবীপূজা ও দেবীর সম্মুখে নরবলি দিবার কথা লিখিত আছে।

চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএনথ্‌সঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তিনি সে সময় ভারতের স্থানে স্থানে শিবশক্তির উপাসনা দেখিয়া যান। তিনি অযোধ্যা হইতে গঙ্গা দিয়া পূর্ব্ব মুখে আসিতে আসিতে শাক্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাহারা প্রতি বৎসর একটী করিয়া নরবলি দিত। সেবার তাহারা হিউএনথ্‌সঙ্গকে বলি দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সহসা ঝড় উপস্থিত হওয়াতে হিউএনথসঙ্গ নিস্তার পান। (৬)

বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গুলাজ একটী পীঠস্থান; এখানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইয়াছিল। (৭) শৈব ও শাক্ত তীর্থযাত্রীরা

(৪) দুই এক স্থানে বলিহীন শক্তিপূজা দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে উহাকে গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে।

(৫) "Ariana-Antiqua" by H. Wilson.

(৬) "Pilgrimage of Hiuanth Sang" translated by Stanisla Juliot.

(৭) ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ [পীঠমালা]

অদ্যাপি হিঙ্গুলাজ-তীর্থ-দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়া থাকেন। মহম্মদ, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বেলুচিস্থানে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে হিঙ্গুলাজ হিন্দু-তীর্থ হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গজনি অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষে আসিয়া নগরকোটের হিন্দুতীর্থ জ্বালামুখী ও সোমনাথের শিব-মন্দির আক্রমণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রণীত পারসী "আলে-ফলয়লা ওয়ালয়লা" গ্রন্থে গল্পবিশেষে ভারতের যে দেবপূজকদিগের বিষয় লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে ভারতে সেই সময় শক্তি-পূজার আধিক্য ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

জোহান নিস ষ্টোরস নামক একজন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; তদীয় গ্রন্থে শিব-পার্ব্বতীর অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধার রাজ্যমধ্যে এক উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বতগাত্রে ভীমাদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই স্থানে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জনগণ সমবেত হইয়া দেবীর পূজা অর্চ্চনা পূর্ব্বক কৃতার্থ হইত। (৮)

আর্য্য হিন্দুগণের অভ্যুদয় কালে যখন হিন্দু-বাণিজ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল এবং যখন অন্যান্য জাতীয় লোকে ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমন করিত, তখনও ভারতে শক্তিপূজার বিশেষ প্রাবাল্য ছিল। হিন্দুরা যে যে দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন, সেই সেই দেশে আপনাদের পূজাদি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শিব ও শক্তির পূজাই তথাকার প্রচলিত ধর্ম্ম। (৯)

কেহ কেহ অনুমান করেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্যগণ কর্তৃক এ দেশে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যখন এতদ্দেশে বিস্তারলাভ করে, তখন অনেক অনার্য্য ও নীচ জাতীয় হিন্দু দলে দলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে যে সকল জাতি কৌলিক ভূত-প্রেত, জীবজন্তু বৃক্ষলোষ্ট্রাদির পূজা লইয়া বৌদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা যখন বৌদ্ধধর্ম্মের কৃপায় আর্য্যাস্পৃষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখনও তাহারা আপনাদের ঠাকুর দেবতাগুলিকে সঙ্গে করিয়া আনিতে ভুলে নাই। এই সময় অনেক শূদ্রের শূদ্রত্ব ঘুচিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবে পূজার মন্ত্র সংস্কৃত হইয়া উহাদের দেবতাদিগেরও হীনতা ঘুচিয়া যায়। চণ্ডী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত শবর কিরাতাদির দেবতা ছিল। ভবভূতি, বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতি কবিগণ ইহাকে হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরে এই চণ্ডী আর্য্য-দিগের শক্তিমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হয়। (১০)

যাহা হউক, পৌরাণিক যুগে যে এতদ্দেশে শক্তি-পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে

(৮) প্রাচীন-ভারত—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত।

(৯) Crawford's History of the Indian Archipelago, Vol. II.

(১০) বঙ্গদর্শন ১৩০৯।

কোনও সন্দেহ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রগুলি প্রচারের পর এদেশে শক্তিপূজা প্রাধান্য লাভ করে। কোন সময়ে যে তন্ত্রশাস্ত্রগুলি প্রণয়ন করা হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন, মুসলমান-বিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী পরে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (১১) তন্ত্র-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশে বহুবিধ শাক্ত উপাসক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়। এই সকল উপাসকের মধ্যে করালী, কাপালিক, ভৈরবী ও ভৈরব, অঘোর ঘণ্টা প্রভৃতি কয়েকটী ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর উপাসক সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা গেরুয়া-বস্ত্র, নর কপাল যুক্ত যষ্টি এবং সুরা ও মাংস ব্যবহার করিত। পূর্ব্বে ইহারা পথিকদিগকে কৌশলে লইয়া গিয়া অরণ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবীর নিকটে বলি দিত। রত্নাবলী, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়, মৃচ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে কাপালিকদিগের প্রাচীন সময়ে বিদ্যমান থাকার অনেক আভাস পাওয়া যায় (১২)।

অধুনা রাজশাসন ভয়ে সে ভয়ানক উপাসক সম্প্রদায়ও নাই, সে ডাকাতি-কালী করালীর মূর্ত্তিও নাই; এখন আমাদের দেবীর মূর্ত্তি—সৌম্য শান্ত। কালী নামে আর আমাদের প্রবল আতঙ্কের সঞ্চার হয় না; এখন আমরা ভক্তিগদগদ প্রাণে মনের সাধে গাহিয়া থাকি,—

"আমায় দাও মা তারা তফিলদারী,
আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী,
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সুষুম্না-লহরী।

সুন্দর তটিনী চ'লেছ বহিয়ে
মন্থরগমনে সুষুম্নেও।
নির্ম্মল সলিলে তব, ভাসিছে কোকনদ
মুক্তামালা কণ্ঠে যথা শোভেও।
চ'লেছ কি তুমি ভেটিতে হরষে
অনন্ত সাগর সঙ্গমেও।
দেখেছ কি তুমি ভীষণ সমরে
কুরুকুল নাশিছে পাণ্ডবেও।

(১১) All the portions dealing with the worship of Siva or Sakti according to the Sanskrit ritual appear to be productions of centuries subsequent to the Mahommedan Conquest.

[Civilisation in Ancient India.—R. C. Dutta]

(১২) এই সকল সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই বোধ হয় অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন;—So the historians, the Tantra literature represents, not a special phase of Hindu thought, but a diseased form of the human mind, which is possible only when the national life has departed, when all political consciousness has vanished, and the lamp of knowledge is extinct

[Ibid]

কেবল পুরাবিৎ ৺রমেশচন্দ্র নহেন আরও অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রের উপর ভ্রুকুটি করিয়া থাকেন। স্থানাভাবে তাহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম না। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না বা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার বক্তব্যও তাহা নহে। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, এই সকল সম্প্রদায়ের অনাচারের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রকে দায়ী করা উচিত হয় না।

শুনেছ কি শ্রবণে শঙ্খনিনাদন
ভেদিছে শূন্য আকাশেও।
শুনেছ কি তুমি প্রণবের নাদে—
অলিকুল ঝঙ্কার,
বেণুরব সুমধুর,
বীণার মধুর তান,
অথবা ললিতগান,
ঘণ্টার নিঃস্বন কিম্বা মেঘের গর্জ্জন ?
শুনেছ কি পাণ্ডবের শঙ্খের বাদন ?
অনন্তবিজয় বাজে
যুধিষ্ঠির করমাঝে
সাধকে শ্রবণ করে মেঘের গর্জ্জন।
ভীম ল'য়ে পৌণ্ড্র করে
বাজান আনন্দ ভরে
সাধকে শ্রবণ করে ঘণ্টার নিঃস্বন।
দেবদত্ত শঙ্খ বাজে
ধনঞ্জয় করমাঝে
সাধকে শ্রবণ করে বীণার ঝঙ্কার।
নকুলের শঙ্খমণি
করিছে মধুর ধ্বনি
বেণুরব শুনে কাণে সাধক সুজন॥
পুষ্পকে ভরিয়া তান
সহদেব করে গান
সাধক শ্রবণ করে ভৃঙ্গের গুঞ্জন।
শুনেছ কি পাঞ্চজন্য শঙ্খের বাদন ?
শুনেছ, সুধুরে! কভু পাণ্ডবের গান ?
পাণ্ডবেরা পঞ্চতত্ব করিয়া সন্ধান।
পঞ্চশঙ্খে পঞ্চতত্ব করিতেছে গান॥
ক্ষিতি অপ্‌ তেজ হ'তে যে নাদ উত্থিত।
বায়ুতত্বে আছে কিম্বা ব্যোমতত্বে স্থিত॥
চক্র হ'তে চক্রান্তরে ছুটেছে প্রবাহ।
শুনেছ সুধুরে! যাহা একে একে কহ॥
আধারে বা অধিষ্ঠানে কিম্বা মণিপুরে।
অনাহত মাঝে কিম্বা বিশুদ্ধাক্ষশিরে॥
অশ্রুপুলক কম্প অষ্টসিদ্ধিভাব
হ'ল কি উদয় শুনে পাণ্ডবের গান।
তাপিত হৃদয়ে মম
ঢালিয়ে সুধার ধারা
সরস শীতল কর প্রাণ॥
শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ।

নমো নারায়ণায়।

প্রার্থনা :—

কোথা দয়াময়, অনাথ পালক,
দেবদেব জগদীশ।
প্রণমি তোমার, চরণ কমলে,
দাসে দাও শুভাশীষ।
অজ্ঞান নাশন, গুরুরূপে তুমি,
শিক্ষা জ্ঞানদাতা হও।
সবার অন্তরে, চেতনরূপেতে,
ঘটে পটে তুমি রও।
দয়া করি দেব, অজ্ঞান নাশিয়া,
জ্ঞানবহ্নি দাও জেলে।
বুঝি নিরদয় হ'য়েছ হে হরি,
দীনেরে অজ্ঞান বলে।
(যদি) দয়া নাহি কর, পতিত-পাবন,
নামটী বা কোথা রয়।
দিতে হবে দেখা, অনাথ পালক,
কৃপা করি দয়াময়॥

গ্রীষ্ম বসন্তেতে, মেঘেতে আবৃত,
থাকে যেরূপ দিবাকর।
(সেরূপ) অজ্ঞান তিমিরে, আচ্ছাদিত মোর,
রহিয়াছে এ অন্তর ॥
বিপিন-বিহারী, অনাথের নাথ,
দয়া করি কর ত্রাণ।
ভক্তি অর্ঘ এই, দিতেছি চরণে,
দাওহে চরণে স্থান ॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কাব্যনিধি।

গান।

দুঃখের এ নিশি আমার কবে উষা পাবে ?
ওরে ব্যথায় ভরা দিন কি আমার
নয়ন জলে যাবে ?
বেদন-ক্লিষ্ট ব্যর্থ জীবন
গিরি নদীর স্রোতের মতন
আপন মনে এম্নি বয়ে যাবে
ওগো নয়ন জলে যাবে।
উঠ্‌বে না কি সুখের অরুণ
আন্‌বে না তার কিরণ করুণ,
আমার দিনটী না রাঙাবে,
ওসে নয়ন জলে যাবে।
বইবে না কি মলয় সমীর
ফুট্‌বে নাক অংশু শশীর,
দিনকি আমার ফাগুণ নাহি পাবে
ওসে নয়ন জলে যাবে।
এম্নি কি হায় দুরদিনে
যাবে জীবন প্রিয় বিনে,
বিষাদ-ঘন-তিমিরে মিলাবে
ওসে নয়ন জলে যাবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

বিরহিনীর প্রতি।

কে তুমি গো ব্রজবালা
ভাবিছ সাঁঝের বেলা
বসিয়া আঙিনা পরে
গালে হাত দিয়া,

কি ঘটেছে বল বালা
বল মোরে এই বেলা
থাকে যদি কোন পথ
সঁপিব এ হিয়া।

মরমে জড়িত তুই
মরমে মরিয়া তাই,
বিষাদ-বিরহ তোর
এত প্রাণ ভরা ?

অনন্ত মহান্ সে যে
মিছে আশা তাঁর তরে
মিছে প্রেম তাঁর সাথে
বিনিময় করা।

স্মরিছ কি ব্রজলীলা
জিজ্ঞাসি ও ব্রজবালা
তাই কাঁপে হৃদি তন্ত্রী
এবে থর থর ?

কি দশা হয়েছে তোর
ছিন্ন যবে সাথী-ডোর
নির্বাক নিস্পন্দ থাকি
মুছ আঁখি লোর ?

অহো !
আর কি দেখিতে পাবি
তোর সে ব্রজের রবি
আর কি উদিত হবে
ব্রজভূমে কদা ?

লক্ষ্যহীন হেতু তোর
অশ্রুমাত্র হলো সার
খেলিয়া খেলার ঘরে
ধূলা মাখা সদা।

শ্রীবলাই লাল দুবে।

কুমার দামোদর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাণী ময়ণামতী।

রাজা মাণিকচাঁদ অতি সন্তর্পণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। একটি কক্ষে রাণী ময়নামতী বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন, রাজার পদশব্দে ফিরিয়া বলিলেন,—"রাজন্, পুত্রের খবর কি?" রাজা উত্তর করিলেন,—গোপীচাঁদ বীরপুরুষ—আত্মরক্ষা শিখেছে, তার জন্য ভাবিবার কি আছে? তাহার নিরাপদে পৌছানর সংবাদ পেয়েছি। সাভায়ের রাজা তাঁহার অলোকসামান্যা অপূর্ব্ব রূপবতী দুই কন্যা তাহাকে অর্পণ করবেন। তাই এক জন রাজদূত তথা হ'তে এসেছে। তোমার মত জানতেই আমি অন্তঃপুরে এসেছি। জান ত তোমার অভিমত ব্যতীত আমি কোন কার্য্যই করি না।" রাণী একটু মুচকে হাসিলেন। রাজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—"আমরা অবলা, আমাদের আবার বুদ্ধি কি? তবে যে দয়া ক'রে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন, সে আমাদের সৌভাগ্য। তোমার মন্ত্রী আছে—তোমার সভাসদ্ আছে—তারাই সব করবে—আমরা রাজ-কার্য্যে আর কি করবো? যা' হ'ক কুমারের সৌভাগ্য মন্দ নয়, দুটি পৃথিবীর অসামান্যা সুন্দরী তাহাকে বরণ করবে, রাজপুত্রের উপযুক্তই বটে! কিন্তু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি? দুটি সুন্দরী কেন? একটা গ্রহণ করলে হয় না?" রাজা দেখিলেন—রাণী বিদ্রুপের স্বরে কথা বলিতেছেন, তিনি উত্তর করিলেন,—"রাজা দুই কন্যা এক জনের হস্তেই দিতে চান। রাজারা কত বিয়ে করে, এ দুটি ত সামান্য।" রাণী ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন,—"রাজাদের যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের রাজারও সে বিষয়ে সাধ যেতে পারে।" এবার রাজা সুযোগ পাইলেন, হাসিয়া বলিলেন,—"এ দেশের রাজা যে ভারতের উৎকৃষ্ট রত্ন ধারণ করেছেন, তাই অন্য রত্নে স্পৃহা নাই।" রাণী বলিলেন,—"রেখে দাও তোমার খোসামোদ, ফাঁক পেলে কেউ ছাড়েন না। সুযোগ হচ্ছে না তাই বল।" রাজা আর এ বিষয়ে উত্তর করিলেন না। রাণী বলিলেন,—"তবে সত্য সত্যই কুমার দুই বৌ নিয়ে ঘরে আসছে। তোমার মত দিয়েছ?" রাজা উত্তর করিলেন,—"না তা কি হয়? তোমার মত না জেনে আমি কি মত দিতে পারি?" রাণী কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন,—"মত দাও, কুমার বোধ হয়—এই শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারবে না। কবে বিবাহের দিন স্থির হল?" রাজা বলিলেন,—"এখনও দিন স্থির হয় নাই। রাজদূত আমাদের মত নিয়ে ফিরে গেলে দিন স্থির হবে।" রাণী বলিলেন,—"তবে যাও, রাজদূতকে বিদায় দাও, আমাদের অমত নাই। বেশী বিলম্বে যেন কুমারকে না পাঠায়।" রাজা সহজে রাণীর মত হইল দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। রাণী অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"রাজ্য আমার, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, ততদিন কাহাকেও শাসন-সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করতে দিব

না। রাজাই হন বা কুমারই হন—সকলকেই আমার মুষ্টির ভিতর থাকতে হবে। এরা সিংহাসনে পুত্তলিকাবৎ বসে থাক্‌বে, আমি রাজ্য চালাবো। স্ত্রীলোক অসাড়! স্ত্রীলোক অযোগ্য! একবার জগৎকে দেখাবো স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও ক্ষমতা কি? মা কালী আমার সহায় হ'ন। রাজা ত কাষ্ঠমূর্ত্তি, কুমারও তাই, কেবল আমোদ প্রমোদে থাক্‌তে চায়। সে দুটি সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে সব ভুলে থাক্‌বে, আমি রাজত্ব কর্‌বো। দেখি কত দূর কি হয়।" রাণীর মুখ রক্তবর্ণ হইল, তিনি বাতায়নে দাঁড়াইয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরস্বতীর দৌত্য।

বংশাই নদীর ধারে নিবীড় বন—বড় বড় শালবৃক্ষ মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিম্নদেশ ছোট ছোট ঝোঁপগুলিতে আবৃত। কোন কোন স্থানে বৃক্ষের শাখা একেবারে নদীর মধ্যে পতিত হইয়াছে এবং স্রোতবেগে তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতেছে। দুই এক স্থানে বকফুল ফুটিয়া দৃশ্যটিকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। এই নদীরধারে বৃহৎ শালবৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া সরস্বতী একটি যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছে। "সরস্বতি, তুমি আমার জন্ত এতদূর কষ্ট করে এলে কেন? বিশেষ কি গোপনীয় কথা আছে বল দেখি?" যুবক এই কথা বলিলে, সরস্বতী মৃত্তিকার দিকে নয়নদুটি নিক্ষেপ করিল, তারপর অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি কি ইহাতে বিরক্ত হ'য়েছেন? বিশেষ কাজ না থাকলে আপনাকে কষ্ট দিতেম না, এবং অত্যন্ত গোপনীয় কথা না হ'লে এতদূর নির্জ্জন স্থানে আস্‌তে বল্‌তেম না।" যুবক বলিল,—"যা হ'ক, এখন বল দেখি কি কথা। আমি সামান্য লোক, আমার সম্বন্ধে আবার এমন কি কথা উপস্থিত হবে?" সরস্বতী প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিল, চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিল, তার পর নিম্নস্বরে বলিল, "আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। গোপনীয় খবর জানেন কি?" যুবক চমকিয়া উঠিলেন, সরস্বতী বালিকা—সে এত খবর রাখে কেমন করে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব খুলে বল দেখি।" সরস্বতী বলিল,—"আপনার সৌভাগ্যে অনেকেই ঈর্ষান্বিত। রাজা আপনাকে ভালবাসেন, আপনাকে ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন—তাই সকলের চক্ষুশূল হয়েছে। রাজ্যের অনেক বড় বড় লোক এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আপনি যাহাতে রাজ্য না পান, নব জামতা উত্তরাধিকারী হন—এই সকলের চেষ্টা। তবে জামাতার দোষ নাই। তিনি ইহাতে মত দেন নাই। তিনি বলেন—তাঁহার পৈতৃক রাজ্যই যথেষ্ট। কতকগুলি স্বার্থপর লোকের এই কাণ্ড। তাহাদের উদ্দেশ্য যে জামাতাকে নামমাত্র রাজা করে' তারাই রাজ্য ভোগ করে।" এই সব কথা শুনিয়া কুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি সরস্বতীর বুদ্ধির তীক্ষতা—সরস্বতীর তাঁহার প্রতি স্নেহ—এই সব কথা ভাবিলেন। তার পর বলিলেন,—"সরস্বতি,

তুমি আমাকে পূর্ব্বে সাবধান ক'রে দিয়ে প্রকৃতই বন্ধুর কার্য্য করলে, এ কথা আমি কখনও ভুলবো না। একদিন আসবে যখন তোমার প্রত্যুপকার করতে পারবো। এখন আমি গিয়ে আমার মাকে সব কথা গোপনে বলি। ভয়ের কারণ বটে! কে কে ইহাতে লিপ্ত, আমি বুঝেছি। কিন্তু সরস্বতি তুমি ভগ্নীর কাষা করেছ, তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারবো না। তুমি একাকিনী যেতে পারবে না, চল তোমাকে রেখে আসি।" সরস্বতীর তখন আর এক ভাব, সে উগ্রভাবে বলিল,—"আমাকে রাখতে যেতে হবে না, আমি পথ-ঘাট ভাল চিনি।" এই বলিয়া সে একটি গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইল, কুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিয়তির চিত্ত।

রাণী ময়ণামতী বিবন্ন বদনে একখানি কম্বলের আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে হরিদাস বাবাজী অপর একখানি আসনে বসিয়া আছেন। রাণী বলিলেন,—"বাবা, আমার এক মাত্র পুত্র,উপায় কি আছে বলুন?" হরিদাস বাবা হাসিয়া বলিলেন—"মা, তুমি আমি কি করিতে পারি, ভবিতব্যতা কে খণ্ডায়? আমি বহুকাল জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্মেছি, এক্ষণে গণনা ক'রে দেখলাম তোমার অদৃষ্ট শুভ নহে। তুমি রাজরাণী, কখনও কষ্ট ভোগ কর নাই, এইবার কষ্টে পতিত হবে। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তোমার পুত্রের অশুভ দেখা যায়—এমন কি জীবন সংশয়। ইহার এক মাত্র প্রতিকার আছে, তাহা তুমি অবলম্বন করবে না, আমিও বলতে চাই না। তোমার স্বামীর মঙ্গল দেখা যায় না। ভগবানের যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। তিনি কাহাকে কখন কি ভাবে রাখেন জানি না। আমরা সামান্য মনুষ্য, তাঁহার লীলা আমরা কি ক'রে বুঝবো?" রাণী সন্ন্যাসীর পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা, কিসে এসব অশুভ লক্ষণ যাবে? আপনি আমাদের দেবতা, আপনি আমাদের গুরু, আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমরা আপনার শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত আছি! বাবা, এ সন্তানকে কষ্ট দিও না। তুমি ইচ্ছা করলে সব করতে পার। তোমার অপার ক্ষমতা—তোমার অপার দয়া; সে দয়ার কণা কি একটুকুও এদাসী পাবে না?" সন্ন্যাসী ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, তারপর উত্তর দিলেন,—"মা, যদি পুত্রকে ত্যাগ করতে পার, তবে তার প্রাণ রক্ষা হবে। সংসারে থাকলে পর জীবন রক্ষার উপায় নাই।" রাণী বলিলেন,—"বাবা, অন্য কোন উপায় কি নাই?" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা মা, আর কোন প্রতিকার নাই। সংসার ত্যাগই এক মাত্র প্রতিকার। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে যদি সে সংসার ত্যাগ করতে পারে তবে আর তার জীবনে কোন সন্দেহ নাই।" রাণী ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। হরিদাস বাবার উপর তাঁহার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। কি যে করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। নয়ন-কোণে অশ্রু দেখা গেল। রাণী ময়নামতী

সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় নহেন।* তাঁহার অসীম ক্ষমতা—অসীম সহ্যশক্তি—পুরুষের ন্যায় সহিষ্ণু—যুদ্ধস্থলে যাইতেও ভীত নহেন। অতএব চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"এখনও তাহার সময় আছে, আমি বিবেচনা ক'রে দেখি। যদি নিতান্তই অন্য উপায় না থাকে, তবে আপনার শিষ্য হবে—ইহা ত সুখের বিষয়। আপনি শ্রীচরণে স্থান দিলেই যথেষ্ট। আমার স্বামীর বিষয় কি?" এবার হরিদাস বাবা ঠিক উত্তর করিতে পারিলেন না, মুখ নত করিয়া বলিলেন,—"অশুভ দেখা যায়।" রাণী বলিলেন,—"প্রতিকার কিছু আছে?" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"প্রতিকারের কর্ত্তা ভগবান, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিছু দেখ্‌ছি না।" রাণী আবার প্রশ্ন করিলেন,—"বাবা, রাজার কোন অনিষ্ট হবে না ত?" সাধু কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"মা, যুদ্ধের ফলাফল বলার উপায় নাই। শীঘ্রই একটি যুদ্ধ হবে। ভগবানকে স্মরণ কর, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, আমি কি কর্‌তে পারি?" রাণী একটু চিন্তিত হইলেন, তিনি সাধুর চরণ ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা, যদি কোন উপায় থাকে, তবে কর্‌বেন।" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা, তোমাদের মায়ায় আমি বদ্ধ। সংসার ত্যাগ করেছি বটে, তথাপি সংসারী। তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি যতদূর পারি তোমাদের মঙ্গল চিন্তা কর্‌বো।" রাণী—বুদ্ধিমতী, সব বুঝিলেন। তারপর কম্পিত কণ্ঠস্বরে বলিলেন,—"বাবা, আমার কোন চিন্তা নাই। নিয়তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি জানি, নিয়তির হস্তে কাহারও রক্ষা নাই। আপনিই বা কে? আমিই বা কে? সকলেই নিয়তির অধীন। দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার হাত এড়াতে পারেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অনেক ভুগেছেন। যাউক, আপনি দয়াময়, দৃষ্টি রাখ্‌বেন। শেষকালে ফেলে পালাবেন না। আপনি ত সব জান্‌তে পাচ্ছেন।" সন্ন্যাসী সব শুনিলেন, মনে মনে রাণীকে ধন্যবাদ দিলেন, বুঝিলেন, এ সামান্য নারী নহে—সহজে কাতরা হইবেন না। রাণীকে বলিলেন,—"মা, আমি তবে এখন যাই। তোমার ছেলের বিবাহ শীঘ্র হবে, কিছু দিন আমোদে প্রমোদে কাটাও, তারপর সংসারের বিষম পরীক্ষায় পতিত হবে। এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হইতে পার, তবে ভগবানের চরণ পাবে। তোমার মত স্ত্রীলোক বিরল, যে দিন ভারতে তোমার মত স্ত্রীলোক বহুল পরিমাণে জন্মিবে, সে দিন ভারতের অন্যরূপ ব্যবস্থা হবে। ধন্য নারী তুমি! এক দিন তোমার নাম বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে বিরাজ কর্‌বে। শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের নাম ভুলো না। দয়াময়ীর চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো। আমি চল্‌লেম, আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ জগতে আমার অনেক ছেলে মেয়ে, সকলকেই দেখতে হবেত।" সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিলেন, রাণী পদধূলী গ্রহণ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরু ও শিষ্য!

মাধবের মন্দির মধ্যে বসিয়া গুরু ও শিষ্য। গুরু বলিতেছেন,—"বাবা, এই বিষ্ণুমূর্ত্তি সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান না। জগন্নাথ দেব যে দারুতে নির্ম্মিত, ইনিও তাহাতে নির্ম্মিত। এক সময়ে বিশ্বকর্ম্মা এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎপর ইনি অদর্শন হন, রাজা যশোপাল পুনপ্রাপ্ত হইয়া এইস্থানে ইঁহাকে স্থাপন করেন। এখনও অনেকে এ বিষয় অবগত নহেন। ধরাধামে ধর্ম্ম স্থাপনার্থ ইঁহার আগমন। উড়িষ্যা দেশে জগন্নাথ, পূর্ব্ববঙ্গে এই মাধব উদ্ধারের কর্ত্তা, কলিযুগে ইহার অদ্ভুদ প্রভাব। তুমি ভক্তিভরে এই বিষ্ণু মূর্ত্তিকে প্রণাম কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" শিষ্য ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। গুরুদেব মাধবের পাদপদ্ম বিরাজিত একটি শ্বেত পুষ্প আনিয়া শিষ্যের মস্তকে প্রদান করিলেন। শিষ্য বলিলেন,—"বাবা, আমার দিন কি এই ভাবেই যাবে?" গুরু বলিলেন,—"বাবা তোমার মনের ভাব আমি জানি, শীঘ্রই তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে। যে ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকে, ভগবান তাকে দেখেন ও তাহার ভার গ্রহণ করেন। দয়াময়ের অপূর্ব্ব লীলা, সে লীলা কে বুঝ্‌তে পারে? তুমি সেই নাম স্মরণ কর্‌তে ভুলো না, তিনিই শ্রীচরণে সময়ে স্থান দিবেন। তোমার কোন বিষয় ভাব্‌তে হবে না, তিনিই তোমার বিষয় ভাব্‌ছেন। তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষাস্থল, সেই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হইতে পার, তবেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।" শিষ্য বলিলেন,—"আপনি যার গুরু, তাহার আবার ভাবনা কি? আপনি যে ভাবে চালাবেন, আমি সেইভাবে চল্‌বো। আমার প্রার্থনা এই যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। আপনার কৃপায় ভগবচ্চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—আমি যেন সেই শ্রীচরণ লাভ কর্‌তে পারি।" গুরুদেব বলিলেন,—"বৎস! তোমার চিরকাল ধর্ম্মে মতি গতি, আমি আর কি উপদেশ দিব! যে বীজ তোমার হৃদয়ে রোপিত হ'য়েছে, সেই বৃক্ষে অদ্ভুত ফল ফল্‌বে ও তাহাতে জগজ্জন স্তম্ভিত হবে। তোমার নাম চিরস্মরণীয় হবে, লোকে মুখে মুখে তোমার গুণ কীর্ত্তন কর্‌বে।" শিষ্য প্রণাম করিলেন। গুরুদেব বলিলেন,—"তোমার মাতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছে, এরূপ স্ত্রীলোক ভারতে বিরল কিন্তু—উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশী, সে স্রোতের সম্মুখে যাহাই পতিত হ'ক,—ভাসিয়া যাইবে। তুমি সাবধানে চল্‌বে, তোমার মায়ের বিপক্ষতাচরণ করো না। অতি সাবধান। তিনি বড় বুদ্ধিমতী—এজন্য তুমি তাঁহার কাছে দাঁড়াতে পার্‌বে না। সম্মুখে তোমার শুভ পরিণয়, বিবাহের পরই তোমার বিপদ, অতঃপর অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে; তাহলেই বিপদ হতে উদ্ধার পাবে, নতুবা তোমার জীবন সংশয়। আজ এই পর্য্যন্ত, এখন বিদায় হও।

তোমার মায়ের সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ হবে, সাবধানে কথাবার্ত্তা বল্‌বে।" সহসা সে স্থান অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইল, শুভ্র-বসনা এক দেবীমূর্ত্তি তথায় আবির্ভূতা হইলেন। গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন,শিষ্য চমকিত হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। আসিয়াই তিনি বলিলেন,—"বা, বা বেশ ত, গুরু শিষ্যে আলাপ হচ্ছে। আমি বুঝি প্রতিবন্ধক হলেম।" তার পর শিষ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বাবা, সব ভাল ত, তোমার মা ভাল আছেন? তিনি আমার বহুকালের পরিচিতা। রাণী ময়নামতীর মত স্ত্রীলোক ভারতে নাই। আমি তাঁকে মেয়ের মত দেখি।" কুমার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মা, আপনি ত সকলেরই মা, আপনার আবার ছেলেই বা কে, মেয়েই বা কে? এতদিন চরণ দর্শন পাই নাই, এক্ষণে আমার আশা পূর্ণ হ'ল। এতদিন মায়ের নিকট আপনার নাম শুনেছিলেম মাত্র। বাবা বলেন—অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আমাকে গ্রহণ কর্‌বেন। সে দিনের বেশী দিন আর বাকী নাই। যদি তাহাই হয়—তাহ'লে এ বিবাহের প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি সংসারে থাকৃতে পারবে না, যার জীবন সঙ্কটাপন্ন, তার আবার বিবাহ কেন? তবে গুরুদেবের আদেশ, কে লঙ্ঘন করবে। মা, আপনি অনুমতি করুন আমি যেন ভগবচ্চরণ পাই। মায়ায় মুগ্ধ এ সংসার, এ সংসার কবে ত্যাগ করবো, কবে সেই ঈশ্বর চিন্তায় দিন কাটাবো, তাহাই সর্ব্বদা মনে হচ্ছে। মাধব আমার উপাস্য দেবতা, বাবা আমার গুরু, মায়ের চরণ আমার ভরসা, এরূপ স্থলে আমাপেক্ষা সুখী কে?" মা তখন ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, আহা! যেন গণেশজননী গণেশকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। হরিদাস বাবা এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"হরিবোল, হরিবোল। মায়ের মায়া কে বুঝে? কভু মা—কভু মেয়ে। কখন পিতা—কখন পুত্র। কভু প্রভু—কভু ভৃত্য। কখনও অসিধারী—কখনও বংশীধারী। কখন রক্ষক—কখনও ভক্ষক। মা, আমি বিদায় হই। তুমি সকলের মা, আমারও মা। তুমি মায়া, তুমি স্নেহ, তুমি মোহ, তুমি মুক্তি। তুমি এইরূপেই সংসারের জীবকে নিয়ে খেলাও, তোমার মহিমা কে বুঝে?" হরিদাস বাবা বিদায় হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

কবি চিত্তরঞ্জন দাশ।

(১)

যোগীন্দ্র, মুণীন্দ্র যথা দুস্তর ভূধরে,
সুকঠোর মহাতপে থাকেন মগন;
তেমতি তুমি কি দেব, সাধনা-মন্দিরে,
ছিলে বহুদিন ধরি' পাতি যোগাসন?

(২)

আর্ত্তের করুণ ডাকে দ্রবিল হৃদয়,
ঘুচাতে ব্যাথীর ব্যথা, দুঃখ পতিতের,
ছুটে এলে দয়াকরি তুমি দয়াময়;
সিদ্ধিলাভ অন্তে যথা কপিল কুমার।

(৩)

সততার প্রতিমূর্ত্তি, করুণার খনি,
নির্ভীক আদর্শশ্রেষ্ঠ হে চিত্তরঞ্জন,
আত্মসুখ কর্ত্তব্যের পদে বলিদানি,
সকলের চিত্ত তুমি করিছ রঞ্জন।

(৪)
রক্ষিতে বিপন্নে তুমি সদা অগ্রসর,
বিদ্যাহীনে বিদ্যাদান করিছ নিয়ত,
অন্নহীনে অন্নদানে হও না কাতর,
নমি তোমা ভক্তিভরে জ্ঞান পরব্রত।

(৫)
সভামাঝে বাক্-বলে লভি' করতালি,
ফিরিয়া নিজের গৃহে কর্ত্তব্য আপন,
নিদ্রাঘোরে তুমি দেব, যাওনাকো ভুলি,
ব্যক্তিগত স্বার্থে নাহি হও বিস্মরণ।

(৬)
ধরণীর শ্যামবক্ষে যথা দিবাকর,
বিতরেণ সমভাবে পবিত্র কিরণ ;
না ভাবিয়া উচ্চ, নীচ আর আত্মপর,
পীড়িত দরিদ্রজনে করিছ পালন।

(৭)
চাহ নাকো বিনিময় কিম্বা প্রতিদান,
ঘন ঘন করতালি তুচ্ছ যশোরব,
চাহ নাকো শুনিবারে প্রশংসার গান,
কর নাকো কোনদিন অনিত্য গৌরব।

(৮)
বঙ্গদেশে কর্ম্মপথে করিছ প্রচার,
নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের তত্ত্ব তুমি অবিরত।
শোক-দুঃখ পরিপূর্ণ ভারতে আবার,
"নারায়ণে" পূজা তুমি করিছ নিয়ত।

(৯)
রচিয়া, খচিয়া শান্ত সুকোমল ভাষা,
মায়ের চরণপ্রান্তে দিছ উপহার ;
আঁধারে আনিয়া দিছ ভাব, হর্ষ, আশা,
অমরার সুপবিত্র মন্দাকিনী ধার।

(১০)
পরাজিয়া ধনেশ্বরে যথা পার্থরথী,
ধনঞ্জয় নামে খ্যাত এ মহীমণ্ডলে ;
ধনলোভ পরাজিয়া তুমি মহামতি
স্বর্গীয় আদেশ দেব দেখালে অখিলে।

(১১)
পিতৃসত্য পালি যথা ত্রেতায় রাঘব,
দেখালেন পিতৃভক্তি বিশাল অখিলে ;
ঋণমুক্ত করি তুমি পিতৃদেবে তব,
শিখায়েছ পিতৃভক্তি মানব সকলে।

(১২)
হে ত্যাগী তপস্বী বীর সাধক প্রধান,
কিছু নাই তব পায় দিতে উপহার ;
দরিদ্র ভিখারী আমি পতিত অজ্ঞান,
দয়া করি লহ দেব, এই তুচ্ছ হার।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

স্বপন কি জাগরণ দাও দাও বলিয়া !

"A slumber did my spirit seal"
— *Wordsworth.*

মোহিনী নিশার ছলে,
পড়ি' যেন মহীতলে,
জ্ঞানহীন, মোহবলে,
গিয়াছিনু ঘুমিয়া।

বুঝি কোন মায়াপতি,—
একি তার রঙ্গে মাতি !—
স্থূল তনু চারু অতি,
রেখেছিল ঢাকিয়া।

হেন কালে, নাহি জানি,
পরি' সেই তনুখানি,
তাহারে আমার মানি'
চলিনু গো ছুটিয়া।

দেখিনু যেন বা কত,
ছুটিতেছে অবিরত,
আঁধারে, আমার মত,
দেহ-বাস পরিয়া।

কত যে প্রফুল্ল মনে,
মিলিয়া তাদের সনে,
কত মধু আলাপনে,
চলিনু গো খেলিয়া।

কেহ বা সাজিল মাতা,
কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা,
কেহ দারা, কেহ সুতা,
খেলাঘর রচিয়া।

সুখ—তার স্নিগ্ধ হাসি,
দুঃখ—তার কালি রাশি,
কখন, কখন, আসি',
দিত দেহে ঢালিয়া।
রোগ, শোক, মৃত্যু, জরা,
হাহাকারে পূরি' ধরা,
দিত ভয় বুক-ভরা,
যাইতাম পালিয়া।

কিন্তু যেন আশা-রাণী,
মধুর অভয় বাণী—
"অজর, অমর", আমি
যেত মোরে কহিয়া।

অমনি, আমার মরি!
সাহসে হৃদয় ভরি'
পুনঃ মোর পথ ধরি'
যাইতাম ছুটিয়া।

শেষে, নিশি অবসানে,
আসি' যেন দূর স্থানে,
ক্লান্ত দেহ শূন্য প্রাণে,
পড়িল গো লুটিয়া।

এ যেন, এখন, ভোর!
বুঝি গেছে ঘুম ঘোর!
কোথা সেই দেহ মোর?
নাহি পাই খুঁজিয়া।

সজিদল গেল কোথা?
কোথা বা সে চঞ্চলতা?
যেথা ছিনু, আছি সেথা,
স্থির, ধীর, হইয়া।

রোগ, শোক, মৃত্যু যারা,
কোথায়, কোথায়, তারা?
কোথা ধ্বনি হা হা ভরা?
বুঝি গেছে নিভিয়া!

সুখ, দুঃখ দুজনার,
কই পাই দেখা আর?
আমি ত রে নির্বিকার,
যুগ যুগ ধরিয়া।

স্বপ্ন ত গো শুধু ছায়া!
কিন্তু সে যে স্পষ্ট কায়া!
হেরিনু কি তবে মায়া—
ছ'ব আমি জাগিয়া?

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ, বি, এল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কিরূপে রোগী দেখিতে হয়।—হোমিওপ্যাথিক মতে "কিরূপে রোগী দেখিতে হয়" Dr. Nash's How to take the case and to find the Similimum নামক ইংরাজী পুস্তকের সরল বঙ্গানুবাদ—লণ্ডন কেমিকেল সোসাইটীর সভ্য কৃত শ্রীযুক্ত জি, রায়। মূল্য ॥০ আনা; প্রকাশক—শ্রীনীহার রায়, পান-বাজার, গোহাটী, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। সরল ও সহজ ভাবে রোগী দেখিবার এরূপ পন্থা আর কোন অনুবাদক এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। রায় মহাশয়ের পরিশ্রম সফল হইয়াছে। ইহা গৃহস্থ ও ডাক্তার সকলেরই সমান উপযোগী হইয়াছে। এরূপ পুস্তকের প্রকাশে দেশের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, যত প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হউন।

মতিমহল।—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস, মূল্য ১॥০ টাকা, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে হরিসাধন বাবু সিদ্ধহস্ত; প্রবীনত্বের স্রোতে গ্রন্থকারের মুন্সীয়ানা যে আরও বাড়িয়াছে, তাহা তাঁহার পুস্তকের কাটতি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মতিমহলের চরিত্র চিত্রন, ঘটনা পারিপাট্য অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছে; পাঠ করিতে করিতে এত আগ্রহ হয় যে পুস্তক শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতীব পরিপাটী।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৪ সাল।

স্বপ্নের সত্যতা

অতি মনীষী ব্যক্তির মন হইতে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তির মনও চিন্তাপূর্ণ। মানবমাত্রেই ভাবনাশূন্য নহে। তবে জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্নতি-হেতু কাহার মন উচ্চ বিষয়ের চিন্তাপূর্ণ, আর যাহার তদ্রূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্নত নহে, তাহার মন সামান্য ও হীনবিষয় সম্বন্ধে ভাবনাযুক্ত। কোন সময়েই মানব-মন নিষ্ক্রিয় নহে। নিরন্তর চিন্তার আন্দোলনে আন্দোলিত ও ক্রিয়াশীল। প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—চতুষ্পদাদি জীবের মনও নিষ্ক্রিয় নহে।

যে সময় মানব নিদ্রিত হয়—তাহার ইন্দ্রিয়-সমূহ বাহ্য-জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া নিদ্রাবেশে অবসন্ন ও শিথিলীকৃত এবং নিষ্ক্রিয়-ভাবে অবস্থিতি করে, তখন তাহার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিদ্রিতাবস্থায় কার্য্যবিহীন হইয়া অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়। যদিও সে বাহ্য-জগতের জ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রাবেশে অজ্ঞানভাবে অবস্থান করে, তথাপি তাহার মন নিষ্ক্রিয় থাকে না। তখনও সে সক্রিয়। তখনও তাহার মন চিন্তাশূন্য বা ভাবনাশূন্য নহে। জাগ্রত অবস্থায় মানব স্বীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য-জগতের যে সকল জ্ঞান লাভ করে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া দ্বারা তাহা মনে নীত হয় এবং তথায় তাহা সঞ্চিত থাকে। স্মৃতি মনের এক শক্তি। এই স্মৃতি-শক্তির দ্বারা মনে সেই লব্ধ ও সঞ্চিত জ্ঞানের বিষয় আলোচিত ও অনুশীলিত হইয়া পরে মানব সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মানব নিদ্রাবেশে ক্রিয়াশূন্য। কিন্তু তথাপি উহার মন নিষ্ক্রিয় নহে। তাহা ভাবনাশূন্য নহে। মানব জাগ্রতাবস্থায় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করে, তাহা তাহার মনে সঞ্চিত থাকে। উপরে উক্ত হইয়াছে, ইহার সেই সঞ্চিত জ্ঞান হইতে চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইয়া মন নিজে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, এবং সেই চিন্তাতরঙ্গের ঘাত ও প্রতিঘাতে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় মানবের চিন্তা-তরঙ্গ স্বপ্ন বলিয়া খ্যাত। চিন্তা-তরঙ্গে মন ও মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল হইয়া স্বপ্নের উৎপত্তি-সাধন করে। নিদ্রিতাবস্থায় মানব জাগ্রত সময়ের স্বীয় স্বপ্নে কত কার্য্য

করিয়া থাকে,—কত বিষয় অবলোকন করে এবং অপূর্ব্ব সৌরভ আঘ্রাণ ও সুমধুর স্বর শ্রবণ করিয়া থাকে, কত উপাদেয় ভোজ্যবস্তু রসনায় আস্বাদ করে। কত যে ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করে ও সেই সব মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ও ত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠে। কত লোকের সহিত মারামারি ও গালাগালি করে। হয়ত এমন ভয়ানক ও ভীষণ স্থানে উপনীত হয় যে, তথাকার ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া ত্রাসিত অন্তঃকরণে তথা হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু পলায়নের সামর্থ্যহীন হইয়া পতিত হয়। শোণিত, বিষ্ঠা ইত্যাদি কত বস্তু অবলোকন করে। শিবিকা, নৌকা, অশ্ব, হস্তী, মহিষ আদিতে আরূঢ় অবস্থায়ও আপনাকে অবলোকন করিয়া থাকে। ভয়ে ত্রাসে কখনও ক্রন্দন করিয়া উঠে বা আমোদে আহ্লাদে হাস্য করিতে থাকে। স্বপ্নে এই সকল করিয়া বা দেখিয়া নিদ্রিত মানব ভাবিয়া থাকে, সে যেন জাগ্রত অবস্থায় সেই সব কার্য্য করিতেছে। যতক্ষণ সে নিদ্রিত অবস্থায় সেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, ততক্ষণ সে তাহা প্রকৃত ও বাস্তবিক ঘটনা ভাবিয়া থাকে। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহার সে ভ্রম আর থাকে না। জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারে, সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। ভয়ের বিষয় দেখিতে দেখিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, জাগ্রত হইয়া তাহার মন কিয়ৎক্ষণ ভয়বিহ্বল থাকে, আর আনন্দের ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে জাগ্রত হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মন প্রসন্ন থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ক্রমে ক্রমে স্বপ্নের অনেক বিষয় বিস্মৃত হয়। পরে সে ক্রমে ক্রমে সে স্বপ্ন প্রায় সব ভুলিয়া যায়। রাত্রিতে নিদ্রাগত হইলে, আবার নূতন স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। স্বপ্ন শূন্য হইয়া মানব এক রাত্রিও নিদ্রা যাইতে পারে না। স্বপ্ন মানসিক ক্রিয়া মাত্র। ইহা পূর্ব্বার্জ্জিত ও সঞ্চিত জ্ঞানের ফল স্বরূপ। জাগ্রত অবস্থায় মানবের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগতের পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়াও জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা মনে প্রেরণ করে। তখন মন সে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার সঞ্চয় জন্য অনবরত ক্রিয়াশীল হয়। তখন সে এই ইন্দ্রিয়-অর্জ্জিত জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য সর্ব্বদা তৎপর হয়। তখন সে নিজ সঞ্চিত জ্ঞান দ্বারা কোন ক্রিয়া করিবার অবসর পায় না। মানব নিদ্রিত হইলে মানবেন্দ্রিয় সমূহ বাহ্য জগতের সহিত অসংযুক্ত হয়। তজ্জন্য তখন তাহারা অন্য কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না বা নব জ্ঞান লাভ করিয়া মনে উহা প্রেরণ করিতেও সক্ষম হয় না। সে সময় মানব-মন পূর্ব্বার্জ্জিত ও সঞ্চিত জ্ঞান দ্বারা কার্য্য করিবার অবকাশ পায়। কারণ উহা ক্রিয়াহীন হইয়া কখন থাকিতে পারে না। মানব যখন নিদ্রাবেশে অলস ও অবসন্ন হয়, তখন সে সংজ্ঞাশূন্য হয়। তাহার ইন্দ্রিয় ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিলীকৃত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে এবং তাহার মনও তখন বিশেষ আয়ত্ত ও বশতাপন্ন থাকে না। তজ্জন্য মানব-মন মানবশক্তির অধীন ও বশতাপন্ন না হইয়া ইহা অনিয়মিতভাবে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা ক্রিয়া করিতে থাকে। পূর্ব্বে

মন যে জ্ঞান অর্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিল সেই জ্ঞান দ্বারা অনিয়মিতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া মস্তিষ্কে ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা তাহা আন্দোলন করে, এবং তদ্দ্বারা অদ্ভুত ঘটনা উদ্ভাবন করিয়া মানবকে প্রদর্শন করাইয়া থাকে।

স্বপ্ন তজ্জন্য অলীক চিন্তা মাত্র। ইহা প্রকৃত নহে ও ইহাতে কিছুমাত্র সত্যতা নাই এবং উহা অলীককল্পনাময়। ইহা বস্তুগত নহে, কেবল বিষয়ীভূত। আবার সে বিষয় অসম্ভব ও অপ্রকৃত।

উপরে স্বপ্ন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইল, যদি স্বপ্ন সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন কিছুই নহে, কেবল মনের ক্রিয়াশীলতা প্রযুক্ত মানবের নিদ্রাবেশে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থার মানসিক কার্য্য। তাহা কোন প্রকৃত ঘটনার বিষয়ীভূত কার্য্য নহে। ইহা মনের অনর্থক ও সম্পূর্ণ অলীক ভাবনা। মন আপন পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান হইতে চিন্তা বা ভাবনা উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে আপনি ক্রিয়াশীল করিয়া থাকে। এই ক্রিয়াশীলতা ইহার নিজের ক্রিয়াশীলতা। কারণ মন তখন মানবের বশতাপন্ন নহে। মানব সে সময় নিদ্রাবেশে অজ্ঞান থাকায় মনকে শাসন করিতে অক্ষম। তজ্জন্য মনের এই কার্য্য অনিয়মিত ও অশৃঙ্খলিতভাবে সম্পাদিত। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত একবারে প্রকৃত বা সত্য বলিয়া তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা যায় না। কারণ অনেক স্থলে স্বপ্নকে সত্য হইতেও দেখা গিয়াছে। স্বপ্ন যে অনেক স্থলে সত্য হয়, ইহা বহুত মাত্রে পরিজ্ঞাত ও মনীষী দার্শনিকবৃন্দ দ্বারা স্বীকৃত। পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণ স্বপ্ন যে অনেক স্থানে সত্য হয়, তাহা স্বীকার করিয়া ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারেন নাই। প্রাচ্য বা ভারতীয় দার্শনিক অনেক স্বপ্ন ইহা প্রকৃত ও সত্য হয় দেখিয়া ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া যামিনীর কোন সময়ে কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে তাহা সত্য ও প্রকৃত হয়, তাহা কেবল বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন। এবং কি কি বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিলে অশুভ ও শুভ ফল প্রদান করে, সে সবও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সে সব উদ্ধৃত হইল,—

(১)

"স্বপ্নেষু প্রথম যামে সংবৎসরাৎ বিপাকভাক্।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্ম্মাসৈস্ত্রিযামৈস্ত্রিমাসকৈঃ॥
গোবিসর্জ্জন বেলায়াং সদ্যঃ ফলমবাপ্নুতে॥"

(২)

"খরোষ্ট্র মহিষ ব্যাঘ্রান্ স্বপ্নে যস্ত্বধিরোহতি।
ষন্মাসাভ্যন্তরে তস্য মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥"

(৩)

"অথ শুভাস্বপ্নাঃ গজোরোহণং, প্রাসাদারোহণং, রোদনং মরণং অগম্যাগমনং ছত্র, চামর, সমুদ্র ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা, শঙ্খ, সুবর্ণ সন্দর্শনাদয়শ্চ॥"

(৪)

"আরোহণং গো বৃষ কুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈল বনস্পতীনাম্,
বিষ্ঠানুলেপণ রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নে ষ্ব
　　　　[illegible] গম্যাগমনঞ্চ ধন্যম॥"

(৫)

অশুভ ফলক।—মহিষারোহণং খরারোহণং কণ্টক বৃক্ষারোহণং ভস্ম কার্পাস ধূম্র ব্যাঘ্র সর্প বরাহ বানরাদি সন্দর্শনম্।"

(১) প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখিলে সম্বৎসরের মধ্যে তাহার ফল হয়, দ্বিতীয় প্রহরে আট মাস মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে স্বপ্ন দেখিলে তিন মাস মধ্যে আর প্রভাতকালে অর্থাৎ যে সময় গরু ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেই সময়ে স্বপ্ন দেখিলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।

(২) যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ ও ব্যাঘ্র দর্শন করে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

(৩) যে ব্যক্তি হস্তী, প্রাসাদ-আরোহণ, রোদন, মরণ, অগম্যাগমন, চামর,সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা, শঙ্খ ও সুবর্ণ স্বপ্নে দর্শন করে, সে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়।

(৪) যে ব্যক্তি গো পর্ব্বত ও বনস্পতির উপর আরোহণ, বিষ্ঠালেপন, রোদন, মরণ, অগম্যাগমন স্বপ্নে এই সকল দর্শন করে, সে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়।

(৫) যে ব্যক্তি মহিষ, খর, কণ্টক-বৃক্ষ, আরোহণ, ভস্ম, কার্পাস, ধূম, ব্যাঘ্র, বরাহ, বানরাদি স্বপ্নে দর্শন করে, সে অশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কতকগুলি বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিলে শুভ ফল, আর কতকগুলি দৃষ্ট হইলে অশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপরোক্ত উদ্ধৃত শ্লোক পাঠ করিলে ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু কি কারণে তাহা হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দও স্বপ্নের সত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কি নিমিত্ত তাহা সত্য হয়, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে দেখা যায় যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের এক মত। উক্ত উভয় দেশীয় দার্শনিকগণ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা কেহ ইহার কারণ স্থির করিতে সক্ষম হয়েন নাই। দার্শনিক সমাজে ইহা কূট প্রশ্ন। এখনও ইহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। তবে অধুনাতন কয়েকজন দার্শনিক এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা নিম্নভাগে লিখিত হইল।

আর্য্য দার্শনিকগণ মন ও আত্মায় প্রভেদ আছে—বলেন। তাঁহারা বলেন যে মন ও আত্মা একরূপ পদার্থ নহে। আধ্যাত্মা পদার্থ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহা অশরীরী ও স্থূলতা হীন এবং ইহা নিত্য পদার্থ। ইহার ধ্বংস নাই। মানবের দেহনাশেও ইহার বিনাশ নাই। মানব-দেহ মৃত্যুতে বিনষ্ট হইলে, ইহা লোকান্তরিত বা পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মন সেরূপ নহে। ইহা স্থূল পদার্থ, অনিত্য এবং ইহার লয় আছে। তবে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। সূক্ষ্ম ভূতে ইহা নির্ম্মিত। মানবের শরীরস্থ মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয়, স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদি হইতে ইহার উৎপত্তি। মানবের দেহ-বিনাশে, ইহার বিনাশ হয়। তবে যত দিন মানব জীবিত থাকে, তত দিন ইহার কার্য্য বিস্ময় ও আশ্চর্য্যজনক। আত্মা যেরূপ স্বচ্ছ, ইহা তদ্রূপ না হউক,

অনেক পরিমাণে ইহাও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম আত্মা যতদিন মানবদেহে অবস্থিত, ততদিন জীবাত্মা ইহার দ্বারা কর্ম্মশীল। মানব মন বা চিত্ত সূক্ষ্ম জীবাত্মার ও স্থূল জড় জগতের মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রিয়, স্থূল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা মানবগণ বাহ্য জগতের যে জ্ঞান লাভ করে, সূক্ষ্ম মন দ্বারা জীবাত্মা সেই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে। মন জীবাত্মার ইন্দ্রিয় স্বরূপ। মানব চেষ্টার দ্বারা অদ্ভুতরূপে এই মনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। যখন মানবের মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন সে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয় এবং মানবের অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়। এই অন্তর্মুখী দৃষ্টি দ্বারা মানব ক্রমে ক্রমে আত্মদর্শন লাভ করে। যে মানবের মনের শক্তি অধিকতরভাবে বৰ্দ্ধিত হয়, তিনি উপরোক্তরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন। যিনি বিশেষ চেষ্টা করেন, তিনিই এইরূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মানব তাহা করে না। তজ্জন্য অধিকাংশ লোকই মনের সে শক্তি প্রাপ্ত হয় না। মন স্থির ও অবিক্ষিপ্ত হইলে মানবের এই শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। অবিক্ষিপ্ত ও স্থির মনই জীবাত্মার ইন্দ্রিয় স্বরূপ। আত্মার প্রধান গুণ দুটি। একটী সর্ব্বশক্তিমানত্ব, অপরটী সর্ব্বজ্ঞত্ব। স্থির ও অবিক্ষিপ্ত মন দ্বারা জীবাত্মার এই দুই গুণ বহির্জগতে প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য সাধকগণ অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়েন। যাহাদের মন অস্থির ও বিক্ষিপ্ত, তাহারা সেরূপ কার্য্য করিতে পারে না। তবে নিদ্রিতাবস্থায় কখন কখন অস্থির ও বিক্ষিপ্ত-মনা ব্যক্তিদিগের মন কতক পরিমাণে স্থির ও অবিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যদিও সাধারণ লোক প্রায় মনের স্থিরতাহেতু অচেষ্টিত, তথাপি নিদ্রিতাবস্থায় কখন কখন তাহাদের মন স্থিরতালাভ করিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় যাহার মন স্থিরতা ও অবিক্ষিপ্ততালাভ করিয়া থাকে, সে যে স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা সত্য হইয়া থাকে। কারণ—অবিক্ষিপ্ত, অচঞ্চল, ও স্থির মনের সহিত জীবাত্মার যোগ হইয়া থাকে। আত্মার সহিত সংযোগ লাভ করিয়া মনের ক্রিয়াশীলতা অনর্থক, মিথ্যা, অপ্রাকৃত ও বৃথা হয় না। সাধারণতঃ, জন-সাধারণ প্রতি রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় যে স্বপ্ন অবলোকন করিয়া থাকে, তাহা মনের নিজ সত্ত্বা হইতে উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ মনের নিজের ক্রিয়াশীলতা হেতু ইহা সংঘটিত হয়। মনের সে ক্রীয়াশীলতা জীবাত্মার সহিত সংযোগে সম্পাদিত হয় না। সচরাচর সাধারণ লোকের মন স্থির, অবিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলতাহীন নহে। তাহা প্রগাঢ় ভাব বা চিন্তাশূন্য, তরলতা ও চপলতাময়, ও গুরুত্ববিহীন। তাহাতে সারত্ব একেবারে নাই। ইহা কেবল মানসিক ক্রিয়া মাত্র। মনের এই ক্রিয়াজন্য মানব যে স্বপ্ন অবলোকন করিয়া থাকে, সে স্বপ্ন সত্য নহে। তাহা মনের মিথ্যা ও অলীক ভাবনা মাত্র। এইরূপ স্বপ্ন অধিকাংশ ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া থাকে; সে স্বপ্ন ফলশূন্য ও অলীক। স্থিরচিত্তে প্রগাঢ়ভাব, আত্মবাক্তিময় ও ঐকান্তিকতা উদ্ভূত হয়। মনের

সেই আগ্রহাতিশয় ও ঐকান্তিকতা এবং প্রগাঢ়-ভাবাপন্নতার ইহা জীবাত্মার ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া তৎসহিত তাহার সংযোগ হয়। মানবের নিদ্রিতাবস্থায় জীবাত্মার সহিত মনের সংযোগে যে স্বপ্ন পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সত্য হয়। তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সফল ও সত্য স্বপ্ন সম্বন্ধে বিবরণ যাহা বিশ্বস্ত সূত্রে ও নিজ অভিজ্ঞতায় অবগত হইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

আমার এক আত্মীয়ের পুত্র কলিকাতার উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। বি-এ পরীক্ষা দিয়া একবার বাটীতে আসেন। তিনি আমার সমবয়স্ক ও বিশেষ বন্ধু বলিয়া আমার বাটীতে আসিতেন, আমার বৈঠকখানায় বসিতেন এবং সদাসর্ব্বদা আমার নিকট থাকিতে ভালবাসিতেন। তাহার পিতা এক জন ধর্ম্মিষ্ঠ ও উচ্চমনা ব্যক্তি ছিলেন ও আমার সহিত তাহার নিকট-সম্পর্ক ছিল। তাহার বাটী আমার বাটী-সংলগ্ন ছিল। আমার বন্ধু বাটী আসিলে আমরা এক সঙ্গে দুই জনে স্নান ও ভ্রমণ করিতাম। প্রতিদিন অপরাহ্নে ময়দানে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। পরীক্ষার ফল কি হইবে—এই ভাবনায় আমার বন্ধুটী উদ্বিগ্ন ছিলেন।

তাহার বাড়ী আসার দুই পক্ষ পরে একদা প্রাতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, গত রজনীতে এক শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি স্বপ্ন? তিনি বলিলেন —যেন আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং কলিকাতা গেজেটে আমার নাম প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি। আমি তাহা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলাম—ভগবান তোমার স্বপ্ন সত্য করুন। তৎপর দিন কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল যে আমার বন্ধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আমি নিজে কোন পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিয়াছিলাম। পরীক্ষার পর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ গত হইল, ফল বাহির হইল না। আমি উদ্বিগ্নচিত্তে বাটীতে কালযাপন করিতেছিলাম। একদা রজনীতে পরীক্ষার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি শেষে কেহ যেন আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, তুমি কি নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছ—তোমার উদ্বিগ্নতার কারণ নাই। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হও নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ। এই বাক্য শ্রুত হইবামাত্র আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্নে যাহা প্রকৃত ভাবিতেছিলাম, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহা স্বপ্ন বুঝিলাম। মন অপ্রসন্ন হইল। কিন্তু পরদিন অপরাহ্নে সংবাদ পাইলাম—আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছি।

আমার এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মাতৃবিয়োগ ও তাহার

এক পরমাত্মীয়ের মৃত্যু হইবে। ঠিক ষষ্ঠ মাস মধ্যে তাহার মাতৃবিয়োগ ও তাহার সেই আত্মীয়ের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল।

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য দর্শন গ্রন্থে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। অনেক স্বপ্ন যে সত্য হয়, সে বিষয়ে একটুও সংশয় ও সন্দেহ নাই। কি করিলে যে স্বপ্নের সাফল্য হয়, তাহার কারণ এখনও কেহ স্থির বা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বে যাহা স্থির বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তত সন্তোষজনক নহে। ইহার যে কারণ উল্লিখিত হইল, তাহা অল্পদিন হইল নির্দ্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত। তাহাতে যুক্তির সঙ্গতি আছে। অনেক স্বপ্ন যে সত্য হয়, তৎসম্বন্ধে আর সংশয় নাই। ইহা যুক্তিমূলক। ইহা সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহাদিগের গবেষণা, অনুসন্ধান ও অনুশীলন আছে, তাহারা সহজে ও অনায়াসে ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আর যাহারা আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে বিমুখ ও কখন তদ্বিষয়ে অনুশীলন করেন নাই, তাহারা সহজে ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন কি না তাহা বলিতে পারি না। তবে মানব-চেষ্টায় অনেক কঠিন বিষয় আয়ত্ত হয়। চেষ্টা করিলে মানব তাহা যে বুঝিতে পারিবে না, ইহা বোধ হয় না।

এই স্থলে আর একটী সত্য স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কতিপয় বৎসর গত হইল আমি একদা রাত্রিতে সর্প-দংশনের ও মহামারীর (Plague) কি কোনও ঔষধ নাই চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলাম। ঘোর রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক মহাপুরুষ আসিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিতেছেন যে, সর্প-দংশন ও মহামারী (Plague) মানবের পক্ষে সাক্ষাৎ যমদূত। তবে এই পরম শত্রুদ্বয়কে নিরসন ও বিনাশ করিবার ঔষধ যে নাই, ভাবিও না। এই দুই মহা রোগের যে ঔষধ আছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে, অনেক সময় অনেক মানব দ্বারা সেই দুই ব্যাধির ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই বলিয়া, সে আবিষ্কারে বিশেষ কোন ফল বা উপকার হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আইস। আমি তোমাকে মানবের সেই দুই ব্যাধির ঔষধ প্রদর্শন করাইতেছি। এই বলিয়া তিনি অগ্রগামী হইলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলাম। তিনি এক জলাভূমির নিকট যাইয়া দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে দুইটী গাছ দেখাইয়া দিলেন। আমি অতি সতর্কিত ভাবে সেই গাছ ও গাছের পাতা এবং ডাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে একটী মহামারীর ও অন্যটী সর্প-দংশনের ঔষধি। যে গাছের পত্র দীর্ঘ ও বৃহৎ, তাহা সর্প-দংশনের ঔষধি ও দ্বিতীয়টী মহামারীর ঔষধি। তিনি আরও আমাকে বলিলেন যে, সর্প-দংশনের রোগীকে এই গাছের পত্রের সহিত মরিচ দিয়া বাটিয়া সেবন করাইবে। এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। আমি যেমন স্বপ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম,

অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি জাগ্রত হইয়া স্বপ্ন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া সেই দুই গাছ প্রচুর পরিমাণে আহরণ ও সংগ্রহ করিলাম। এই দুইটী ঔষধ প্রাপ্ত হইবার পরে দশটী সর্পদংষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে সংবাদ পাইয়াছিলাম। তাহাদিগকে ঐ ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাহারা সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। আর যে সময়ে আমি মহামারীর ঔষধ পাইলাম, তখন বঙ্গদেশে Plagueএর প্রাদুর্ভাব ছিল না। *

শ্রীকানাই লাল নাগ।

আকাঙ্ক্ষা।

বিভো!

ওই শুভ্র শুভ্র শেফালিকা মত
করিয়া রাখ আমারে,
পারি যেন সদা ঝরিয়া পড়িতে
তোমারি চরণ 'পরে।

বিভো!

উত্তাল-তরঙ্গ-জলধির মত
করিয়া রাখ আমারে,
আকুল পরাণে টানে-টানে-টানে
খুঁজিতে সদা তোমারে।

বিভো!

ঊষার রক্তিম রাগ সমুজ্জল
করিয়া রাখ আমারে,
গোলোকে, ভূলোকে কিংবা ভুবর্লোকে
খুঁজিতে সদা তোমারে।

বিভো!

কর হে আমায় প্রসূন-রেণুকা
উড়ি যেন বায়ু ভরে,
পাইতে তোমায় ওহে কাল-তনু!
ফিরি দেশ-দেশান্তরে।

আজি,

রাখ গো করিয়া আমারে প্রাণেশ!
বনজাত নীল ফুল,
হৃদি-সিংহাসনে বসায়ে তোমায়,
পূজিব ও পদ-মূল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যনিধি।

সাগর পারে।

দাঁড়ায়েছি এসে 'সাগর পারে'
সঙ্গী নাই মোর কেহ;
সূর্য্য অস্ত প্রায়—তিমিরে পূরিল
আতঙ্কে শিহরে দেহ।
ভেবেছিলাম যারা হইবেক সঙ্গী,
আসিবে এগিয়ে দিতে,
চাহে নাই তাদের কেহই মম
সাগর পারে সঙ্গে যেতে।
আজি, ডাকৃছি তোমায় হে কাণ্ডারি!
'পার করে দাও' বলে;
দেখ, ডুবায়োনা ঢেউএর মাঝে
অতল সাগর জলে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

* লেখক মহাশয় প্রবন্ধোল্লিখিত ঔষধ দুইটী সাধারণে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকার হইত। লিপিবদ্ধ না করিলে এইরূপ আবিষ্কার লোপ পাইবার সম্ভাবনা। তাহা তাঁহার নিজ প্রবন্ধেই প্রকাশ। সহঃ সম্পাদক।

শক্তি-পূজা।

(দিল্লী)

আজ দিল্লীতে ৺ কালীমাতার মন্দির স্থাপন কল্পে যে আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে সকলের সমবেত চেষ্টা, সাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন (১) এ বিষয় কিছু বলিবার পূর্ব্বে দিল্লীর প্রাচীন শক্তি-পূজার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক।

দিল্লী ভারতের প্রাচীনতম রাজধানী। ইহার ইতিহাস আদ্যন্ত নানা রসে আপ্লুত। ইহা একদিকে যেমন পূর্ব্বতন বহুবিধ রাজগণের অসীম জঘন্য পাপ-কালিমায় কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, অপর দিকেও সেইরূপ পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞাদিতে,—কেবল তাহাই নহে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলস্পর্শে, পবিত্র পুণ্য তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র এখানে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া এই স্থানের অপর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ (২)। অতি পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন নামক নরপতি এই স্থানে এক সুবৃহৎ নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে খাণ্ডবপুরী নামে অভিহিত করেন। দেবরাজ ইন্দ্র সুদর্শনের বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া কাশীর অধিপতি বিজয়কে তদ্বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন; এবং বিজয়ের সহিত যুদ্ধে সুদর্শন নিহত হইলে, পুনরায় এস্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হয় (৩)। খাণ্ডবপুরীর নামানুসারেই এই ভীষণ অরণ্যের নাম খাণ্ডববন।

তারপর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক কিরূপে এই ইন্দ্রপ্রস্থ সহর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা মহাভারত-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। শক্তির উদ্বোধনে এই নগর স্থাপিত, শক্তির আরাধনায় ইহা অনুপ্রাণিত এবং শক্ত্যুপাসনার শিথিলতায় ইহা যবনাধীকৃত। এই শক্ত্যুপাসনার পূজক ইন্দ্রনন্দন পার্থ, তদগ্রজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রতী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং উদ্যোগী দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব ভীম, নকুল ও সহদেব। কুরুক্ষেত্র সমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ভগবান বাসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহাবীর ধনঞ্জয় আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনা করিলে, দেবী আকাশ পথে আবির্ভূতা হইয়া পার্থকে বিজয়বর প্রদান করেন (৪)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই দিল্লী সহরে শক্তির আরাধনা করা হয় নাই, দেবী এখানে স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের পর তৎবংশীয় ত্রিশ জন এবং তাহার পর পৃথক্ পৃথক্ তিনটী বংশ-সম্ভূত প্রায় ৭০জন নরপতি দিল্লীতে রাজত্ব করেন (৫),

(১) গত ১৩২৪ আষাঢ় সংখ্যায় 'আলোচনা'র এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) পদ্মপুরাণ।

(৩) কালিকাপুরাণ।

(৪) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

(৫) রাজস্থান। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে পাণ্ডব বংশের মোট ৩০জন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। যথা,—পরীক্ষিত, জন্মেজয়, শতানীক, সহস্রানীক, অশ্বমেধজ, অসীম কৃষ্ণ, নেমিচক্র, উষ্ণ, চিত্ররথ, শুচিরথ,

কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। তবে দিল্লীর অদূরবর্ত্তী ওকলা নামক স্থানের কালিকা দেবীর ও, বর্ত্তমান কুতবমিনারের পার্শ্বস্থ যোগমায়া দেবীর লিঙ্গমূর্ত্তি সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়—তাহাতে দেখা যায়, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থ সহর প্রতিষ্ঠাকালে যে শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি দিল্লীতে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য সন্দেহ হইতে পারে যে, দিল্লী নগরী প্রায় পাঁচ শত বৎসর যাবৎ হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, তথায় অবিচ্ছিন্নভাবে শক্ত্যুপাসনা হওয়া কিরূপে সম্ভব। এসম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণই নির্দ্দেশ করেন, ওকলার কালিকা মূর্ত্তি (৬) এখন যে স্থানে অবস্থিত, উহা পূর্ব্বে এরূপ পর্ব্বত সমাকীর্ণ ছিল যে, তথায় অতি অল্প লোক যাতায়াত করিত ; এবং এই কারণেই এই দেবীমূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণের হস্ত হইতে রক্ষা পান। মুসলমান-প্রতাপ অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহ-আলমের রাজত্বকালে এই দেবীর মন্দির লাল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয় (১৭৬৪ খৃঃ অঃ) ; এবং ইহার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় আকবর সাহার রাজত্বকালে কেদার রায় নামক তদীয় জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী ১৮১৬ খৃঃ অব্দে এই মন্দির সম্পূর্ণ সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করেন (৭)।

ওকলার কালিকা মূর্ত্তির ন্যায় যোগমায়ার লিঙ্গ মূর্ত্তিও অতি প্রাচীন। বিষম আবর্ত্তে নিপতিত ভারত-তরণীকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভূতলে অবতীর্ণ হন, তখন তাহাকে যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (৮)। কথিত আছে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি কামনায় এই যোগমায়ার মূর্ত্তি যমুনা নদী তীরে কুন্তীদেবীর শিবমন্দিরের পার্শ্বে স্থাপনা করেন। এসম্বন্ধে মহাভারতে কোনও উল্লেখ নাই ; কাজেই, ইহার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই যোগমায়ার মূর্ত্তি বহুকাল যাবৎ দিল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বরে অবস্থান করেন এবং সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হয়। পরে ১৮২৭ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় আকবর সাহার রাজত্বকালে তদীয় জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী ইহাকে বর্ত্তমান কুতবমিনারের পার্শ্বে আনয়ন করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন (৯)। ইহা এখন এই স্থানেই অবস্থান করিতেছে।

হুমায়ুনের কবরস্তম্ভ হইতে তোগলকাবাদে যাইবার পথে এক ক্ষুদ্র কালী-মন্দির দৃষ্ট হয়। এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ সংগ্রহ

বুদ্ধিমান, সুবেন, মহীপতি, সুনীথ, সুচক্ষু, সুখীবল, পরিপ্লব, সুনয়, মেধাবী, নৃপঞ্জয়, দুর্ব্ব, তিমি, বৃহদ্রথ, সুদাস, শতানীক, দুর্দ্দমন, মহীনর, দণ্ডপাণি, নিমি এবং ক্ষেমক।

(৬) এতদ্দেশে 'কালকা জী' নামে খ্যাত।

(৭) 'আসার-উস্-সানাদিদ্' নামক উর্দ্দু ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৮) শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ।

(৯) আসার উস-সানাদিদ্।

করিতে পারা যায় নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, উহা খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, দিল্লীতে প্রাচীন শক্তি-মূর্ত্তির সকল গুলিরই একটী করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ হইয়া গেল; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমাতার মন্দিরের অদ্যাবধি কোনও বন্দোবস্ত হইল না। তত্রস্থ প্রবাসী বঙ্গবাসিগণই এতাবৎ দেবীপূজার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী মাত্র, এবং ইঁহাদের সামান্য শক্তি দেবীর মন্দির নির্ম্মাণের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। সুতরাং এক্ষেত্রে একটা সমবেত বিশিষ্ট শক্তির প্রয়োজন, সকলের আন্তরিক চেষ্টা একান্ত আবশ্যক, সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

মানুষ নিজে কিছু করিতে পারে না, প্রকৃতি-শক্তিকে সে যখন নিজ প্রয়োজনে আনিতে চেষ্টা করে, তখন প্রকৃতি স্বীয় পালনী-শক্তি-গুণে মানুষের আয়ত্তীভূত হইয়া অশেষ উপায়ে তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। ইতিপূর্ব্বে একবার এই ৺কালীমাতার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তখন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই; কেন না আমরা প্রকৃতি-শক্তিকে তখন নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করি নাই।

দেবীমাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, পুরাকালে দেবগণ একশত অব্দ ধরিয়া মহিষাসুরকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না; মহিষাসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু তারপর যখন দেবগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি একীভূত করিয়া সেই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইলেন, তখন এই মহিষাসুরের বিনাশ সাধন হইল। ব্যষ্টি শক্তি সকল সময় সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে না। কিন্তু ব্যষ্টি শক্তি সমষ্টি শক্তিতে পরিণত হইলে, আজ দিল্লীতে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করা কি ছার, জগতে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায় না।

জগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই পূজা করা হয় না। জগতে যদি কিছু সৎ ও নিত্য পদার্থ থাকে, তাহা সর্ব্বশক্তিমান, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির সমষ্টি-মূলতত্ত্ব, বেদান্তের মায়াশ্রিত একমেবাদ্বিতীয়ং। সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই শক্তির বিকাশমাত্র, যাহা কিছু উন্নতি দেখা যায়, সকলই শক্তি-সাধনার প্রভাব সুতরাং দিল্লীর ৺কালীমাতার মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যেও সকলের সমবেত শক্তি নিয়োজিত করা একান্ত প্রয়োজন।

কেহ যেন মনে না করেন, আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ৪০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে কি সাহায্য করিতে পারি। "সংহতিঃ কার্য্য-সাধিকা" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্রিত হইলেই মহাশক্তিতে পরিণত হয়। মহিষাসুরের তুলনায় দেবগণের শক্তি ক্ষুদ্র ছিল; কিন্তু দেবগণের শক্তি একত্রিত হইয়া অসুরবিনাশোপযোগী মহাশক্তির উদ্ভব হইয়াছিল।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রপ্রস্থের ন্যায় পুণ্যতীর্থে

কালিকাদেবীর পূজা করাটা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। এই সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাকুক, দেবী আজ প্রায় ৬০ বৎসর যাবৎ ভাড়াটিয়া বাটীতে অতি দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন, আর আমরা সকলে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি। এ সম্বন্ধে কিছু বিহিত করাটা কেবলমাত্র যে দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীগণের নিজস্ব কার্য্য তাহা নহে, ইহা বঙ্গবাসীমাত্রেরই,—কেবল বঙ্গবাসীই বা বলি কেন, হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতএব আইস ভাই! আজ আমরা সকলে একমন, একপ্রাণ হইয়া, সেই মহাশক্তির পূজা করি; আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্রিত করিয়া মহামায়া আদ্যাশক্তিরই পূজার অর্ঘ সংগ্রহ করিতে যত্নবান হই এবং ভক্তিগদগদ-চিত্তে স্তব করি,—

"ধর্ম্মাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মাণ্যত্যাদৃতঃ
প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদাল্লোক-
ত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥(১)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কান্তকবির স্মৃতি।

'বাণী' ও 'কল্যাণী'র রচয়িতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয় একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত ও গীতি কবিতার সহিত পরিচিত নহেন—এমন বাঙ্গালী অতি অল্পই আছেন। কবি-প্রতিভায় কান্ত যশস্বী ছিলেন। যে কোন প্রদেশের লোক তাঁহাকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে পাইলে গৌরব অনুভব করিতেন। পাবনা জেলা এ হেন কবির জন্মভূমি। পাবনা-জননী তাঁহার ন্যায় রত্নকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধন্যা হইয়াছেন। কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে অবস্থান করিলেও পাবনার প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে পাবনা সহরে স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে এক সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহাতে রজনীকান্ত সময়ে সময়ে যোগদানপূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করিতেন। কি উপায়ে মাতৃজাতির প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাহাই ছিল কান্তের ধ্যান ও চিন্তা।

কান্ত স্বরচিত 'কল্যাণী' পাবনা 'ইন্‌ষ্টিটিউসনে'র প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী বি, এ, মহাশয়ের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া যুগপৎ পাবনাভক্তি ও গুরুভক্তি উভয়েরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র অনেক কবিতা তিনি পাবনা-জননীর ক্রোড়ে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি রাজসাহী প্রবাসী হইয়াও পাবনার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন।

পাবনার এ হেন কবি; বাঙ্গালার এ হেন রবি আজ ৮ বৎসর হইল (২৮শে ভাদ্র, ১৩১৭) অস্তমিত হইয়াছেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহার কোনরূপ স্থায়ী

---

(১) দিল্লির কালী-মন্দির স্থাপনের সাহায্যার্থ যিনি যাহা পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা শ্রীমাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ৺কালীবাড়ী সমিতি, দিল্লী—ঠিকানায় পাঠাইবেন, যথাসময়ে সংবাদপত্রে তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার প্রকাশিত হইবে। মহারাজা কাশ্মীরবাহাদুর ২০০৲ টাকা দিয়াছেন।
সম্পাদক।

স্মৃতি রক্ষা করেন নাই, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের কথা।

কান্তের লোকান্তরের পর, ১৩২০ সালে যখন পাবনায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন সম্মিলনের সভাপতি মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের আদেশে 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন,—" * * তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে এই প্রস্তাব একবার অন্তত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাই ভয় হয়, এবারেও বা প্রস্তাব, প্রস্তাবমাত্র করিয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য শেষ হয়। রজনীকান্ত পাবনার লোক, আমিও বহুকাল পাবনায় কাটাইয়াছি। এবার পাবনায় তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব হইতেছে। সুতরাং তাহার সাফল্যের প্রতি একেবারে অনাস্থা করিতে পারি না। আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে স্মৃতি-ভাণ্ডার তহবিলে পাঁচটী টাকা প্রদান করিতেছি।"

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হইলে জষ্টিস স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ অধিকারী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের সম্পাদকতায় "রজনীকান্ত-স্মৃতি-সমিতি" গঠিত হয়। কলিকাতা ও পাবনার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। জলধর বাবু প্রভৃতি রজনীকান্তের কতিপয় অনুরাগী ভক্ত 'সম্মিলন' ক্ষেত্রে উক্ত সমিতির ধন-ভাণ্ডারে নগদ ২৬৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কলিকাতার "যমুনা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ পাল বি, এ, মহাশয় ২৫৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহাশয় ২৫৲ টাকার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে জানা যায় যে, উপরি উক্ত ভদ্রলোকদ্বয় অদ্যাপি স্বীয় স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। ফণী বাবুর কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট শুনিলাম, এ পর্য্যন্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয় নাই, অথবা টাকার জন্য কোন পত্র লেখা হয় নাই বলিয়া তিনি অদ্যাপি অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করেন নাই। তাঁহার নিকট চাহিলেই নাকি তিনি টাকা দিতে সম্মত আছেন।

চারি বৎসর অতীত হইল "রজনীকান্ত-স্মৃতি-ভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। তৎসম্বন্ধে কোনরূপ উদ্যম আয়োজনও পরিলক্ষিত হয় না। বলিতে দুঃখ হয়—লজ্জাও করে, পাবনার কোন প্রকাশ্য স্থানে কবির একখানা ছায়াচিত্রও রক্ষিত হয় নাই। কবির মৃত্যু দিনে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি সভারও অনুষ্ঠান হয় না। ইহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয়, ইহারা নিজেও কিছু করিতে পারিতেছেন না, অপরকেও করিতে দিতেছেন না। সম্প্রতি পাবনার কিশোরী মোহন ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ কবির স্মৃতি-রক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সংগৃহীত অর্থ চাহিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "আপ-

যারা কবির স্মৃতি-রক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে, আপনাদের প্রার্থনা পূরণে বাধা হইবে না।" বলা বাহুল্য ইহাতে লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত হইতে পারেন নাই। কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া আর একটী স্মৃতি-ভাণ্ডার খুলিতে হয়। এ কারণ কেবল বাদানুবাদই সার হইল, আসল কাজের কিছুই হইল না। ভবিষ্যতে হইবার কোন আশা করা যায় না।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রতিভাবান পুরুষগণের স্মৃতি-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। কেবল পাবনাই এ রীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যে দেশ তাঁহার ন্যায় গৌরবান্বিত ব্যক্তির পবিত্র স্মৃতির সম্মান ও পূজা না করে, সে দেশ সভ্য জগতের নিকট আপনার ক্ষুদ্রত্বই প্রতিপন্ন করে।

রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই সমসাময়িক স্বদেশ প্রেমিক কবি। উভয়েরই স্বদেশ-সঙ্গীতগুলি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে। গীতি-কবিতা ও হাসির গান রচনায় উভয়েই তুল্য ছিলেন। কবি হিসাবে রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল ৪ বৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। এই অল্প কালের মধ্যে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মা দেশবাসীর পূজা পাইতেছেন। প্রতি বৎসর কলিকাতায় তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হইতেছে, এতদ্ব্যতীত ইতোমধ্যেই তাঁহার দুইখানা সুবিস্তৃত জীবন-চরিতও বাহির হইয়াছে। আর বাঙ্গালার নব্য রামপ্রসাদ রজনীকান্তের কোন স্মৃতিসভার কথা শুনা যায় না, কোন জীবনচরিতও দেখা যায় না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায় ?

অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কান্তের জীবন-চরিত প্রকাশ করিতেছেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনক্ষেত্রে নলিনী বাবু এই লেখককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উক্ত গ্রন্থ শীঘ্র বাহির হইবে ;—'যন্ত্রস্থ'। তাহার পর বহু পত্রিকার বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠায় ঐ কথারই প্রতিধ্বনি দেখা গিয়াছে—'যন্ত্রস্থ'। এ কিরূপ মুদ্রাযন্ত্র যে তিন বৎসরে একখানা পুস্তক 'প্রসব' করিতে পারে না ? আমরা এ দিকে রজনীকান্তের গুণমুগ্ধ কৃতবিদ্য ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এই কাজের ভার গ্রহণ করিলে আশা করা যায়, শীঘ্রই রজনীকান্তের জীবন-চরিত জনসাধারণের গোচরীভূত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, রজনীকান্ত শুধু পাবনার নন্, তিনি সমগ্র বাঙ্গালার গৌরব। সুতরাং বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্য দায়ী। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের পীঠস্থান, তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যেই অগ্রসর ; কলিকাতাতে প্রায় প্রত্যহই স্বর্গীয় মহানুভবগণের স্মৃতি-পূজা হইয়া থাকে। আশা করি, বঙ্গের রাজধানী কলিকাতাস্থিত কবির গুণগ্রাহী, উদারহৃদয়, ভক্তমণ্ডলী জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এবার হইতে রজনীকান্তের স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

মাননীয় "আলোচনা" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "আলোচনায়" আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন রায় বাহাদুর ললিত মোহন সিংহ রায়ের যে "প্রতিবাদ" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমপ্রমাদরহিত হয় নাই বিবেচনায় সত্য-সংরক্ষণকল্পে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া নিম্নলিখিত কতিপয় সংশয়-গর্ভ বিষয়ের প্রতিবাদ করিলাম। আপনার পত্রিকায় ইহার স্থান দিয়া চরিতার্থ করিবেন।

১। সম্রাট আকবর শাহ কর্ত্তৃক রাজা টোডরমল্ল ১৫৮০ খৃঃ অব্দে প্রথমে বঙ্গদেশে শাসকরূপে প্রেরিত হন এবং ১৫৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য পরিচালন করেন। তাঁহার সহিত কেশব হাজারীর এদেশে আগমন অযৌক্তিক, যেহেতু—

(ক) বঙ্গের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৭০৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বঙ্গের শাসনাসন ঢাকায় ছিল। ১৭০৪খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ "মুখ্‌সুদাবাদ" নামক এক ক্ষুদ্র নগরীকে নিজনামানুযায়ী—'মুর্শিদাবাদ' নামে অভিহিত করিয়া ঐ স্থানে শাসন-কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করেন। যদি রাজা বিষণ দাস মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে জায়গীর পান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ঘটনা ১৭০৪খৃঃ অব্দের (মুর্শিদাবাদ প্রতিষ্ঠা তারিখের) পর সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব নিঃসন্দেহচিত্তে আমরা বলিতে পারি যে, রাজা বিষণ সিংহের পিতা কেশব হাজারী ১৭০৪ খৃঃ অব্দে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা টোডরমল্লের সহিত কেশব হাজারীর আগমন স্বীকার করিতে হইলে পিতা পুত্রের মধ্যে ১২৪ বৎসর ব্যবধান স্বীকার করিতে হয়। ইহা কল্পনারও অতীত।

(খ) ১৭৭৯—১৭৮১ খৃঃ অব্দে রেনেল্ (Rennell) কৃত মানচিত্রে তারকেশ্বর মঠের নামোল্লেখ নাই, তবে ১৮৩০—১৮৪৫খৃঃ অব্দে সার্ভে মানচিত্রে "তারকেশ্বর" নাম দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ১৭৮১খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর জীউর শৈশবাবস্থা সুতরাং তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য সুপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় রেনেল্ কৃত মানচিত্রে উক্ত মঠের স্থান-নির্দ্দেশ করা নাই। এরূপক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম মন্দির-প্রতিষ্ঠা রেনেল্ মানচিত্র রচনায় (অর্থাৎ ১৭৮১ খৃঃ অব্দের) কত বৎসর পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব? ৬০।৬৫ বৎসরের অধিক নহে। অতএব আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, উক্ত দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রায় ভারামল্ল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে বাস করিতেন এবং আরও বলিতে পারি যে, তাহার পিতা কেশব হাজারী ১৫৮০ খৃঃ অব্দে রাজা টোডরমল্লের সহিত কখনও আসেন নাই।

(গ) সুবর্ণরেখার প্রথম যুদ্ধ ১৫৯২খৃঃ অব্দে ও দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৬১১খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়। তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গের শাসক। (District

Gazetteer, Midnapur, ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) রাজা টোডরমল্ল নহেন। অতএব রাজা টোডরমল্লের সহিত কেশব হাজারীর আগমন ও সুবর্ণরেখার যুদ্ধে জয়লাভ একটী বড় অসঙ্গত কথা।

(ঘ) "আইন-ই-আকবরী"তে মুন্সবদারের তালিকায় কেশব হাজারীর নাম দৃষ্ট হয় না সুতরাং তিনি আকবর শাহের রাজত্বের সময় 'হাজারী' ছিলেন না।

২। বঙ্গদেশে হারসিংনামা জনৈক হাজারীর আসার কথা সম্পূর্ণ সন্দেহ-মূলক যেহেতু—

(ক) রাজা টোডরমল্লের অধীনে ৫জন হাজারীর আগমন অসম্ভব, কারণ, প্রথমতঃ "রিয়াজু-সুলতান" ও "আইন-ই-আকবরী"তে দেখা যায় যে, রাজা টোডরমল্ল নিজে "চার-হাজারী" ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনভাবে আসিলে প্রত্যেক হাজারীর বাসস্থান ও কার্য্য-কলাপাদি-সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জনশ্রুতি থাকিত কিন্তু এক কেশব হাজারী ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে কিছুমাত্র জনশ্রুতি এদেশের কুত্রাপি নাই।

(খ) হারসিং হাজারী ও কেশবসিং হাজারী যদি সমবলসম্পন্ন ও সমসম্মানে সম্মানিত হইতেন তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই রাজপুত-স্বভাব-সুলভ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিত এবং হারসিং হাজারী বা তাহার অনুচরবর্গ কখনই কেশব হাজারীর পুত্র রাজা বিষণসিংহের রচিত যে "বালিগড়ি" সমাজ, তাহার মধ্যে আসিতে ইচ্ছা করিতেন না।

(গ) আমাদিগের প্রাচীন পঞ্চায়েৎ-দপ্তরে হারসিং হাজারীর বিন্দুমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(ঘ) রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ একজন হার সিং ছিলেন বটে কিন্তু তিনি "হাজারী" ছিলেন না। কেশব হাজারীর অনুচরবর্গের মধ্যে জনৈক পদস্থ রাজপুত ছিলেন মাত্র।

৩। সুবিখ্যাত রিজলি-কৃত "The Tribes and Castes of Bengal Vol. II., P. 121" গ্রন্থে দেখা যায় যে বর্দ্ধমান বিভাগে তিন শ্রেণীর রাজপুত আছেন। তাহাদিগের নাম—"বালিগড়ি", "বরদহি" ও "মুক্তি"। "মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা কে বলিতে পারা যায় না; "বালি-গড়ি"র বিষণ সিং এবং "বরদহি"এর বরদা-প্রসাদ নহেন শোভা সিং। তাহার কারণ—

(ক) আমাদিগের কুলজিনামার মতে কেশব হাজারীর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ তারামল্ল ও কনিষ্ঠ বিষণ সিং। বরদাপ্রসাদ নামে তাঁহার অন্য কোনও পুত্র ছিল না।

(খ) আমাদিগের বহুদিন প্রচলিত সামাজিক প্রবাদ-মুখে অবগত হওয়া যায় যে, মেদিনীপুরের এক শোভাসিং "দল" বিবরণ "বালিগড়ি" মেলের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় একটী পৃথক্ মেলের সৃষ্টি করেন। তাহারই নাম হয় "বর্দাই"।

বঙ্গের ইতিহাসে ১৬৯৫—১৬৯৬ খৃঃ অব্দে যে শোভা সিংহের বিদ্রোহের কথা জানা যায়, সেই শোভাসিংহই "বর্দাই" মেলের শোভা-সিংহ। ইহার সম্বন্ধে এখনও একটী শ্লোক আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকেরই মুখে শুনা যায়। তাহা এই "ধন্ত রাজা শোভাও

* * * * সিংহ মালা পিঁধিয়া কাজী সুলতানকো॥ District Gazetteer, Midnapur, ২৮পৃষ্ঠায় বলেন যে ইনি চিতুয়া ও বরদা পরগণার রাজা ছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইনি চিতুয়া বরদার তালুকদার ছিলেন। ("নবাবী আমল" ২১ পৃষ্ঠা)

(গ) বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের নাম হইতে নহে, পরগণা বা স্থানের নাম হইতে "মেলের" নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং "বরদা" পরগণা হইতে "বরদাহি" নামের উৎপত্তি, বরদা-প্রসাদ হইতে নহে। "আইন-ই-আক্‌বরী"তে দেখা যায় যে, "মান্দারণ" সরকারের অধীনে ১৬টী পরগণা থাকে। চিতুয়া, বরদা, ও বালিগড়ি সেই ১৬টীর মধ্যে ৩টী।

৪। রাজা বিষণ সিং কখনও নবাবের বেতনভোগী বা অবৈতনিক কর্ম্মচারী ছিলেন না। আমাদিগের বংশপরম্পরাগত কিংবদন্তী ও "District Gazetteer Hooghly, P. 328.", Hunter's "Statistical Account of Bengal Vol. III", Crawford's "History of the Hughli District" এবং "List of the Ancient Monuments in the Burdwan Division, 1896" প্রভৃতি পুস্তকে যেরূপ প্রকাশ তাহাতে বিষণ সিংহের "সাবল-পরীক্ষার" ঘটনা অবিদিত। বর্ত্তমান গড়ের ভিতরে "মালি রাজার" এক গড় ছিল। সেই মালিরাজাকে রাজা বিষণসিং পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বাহিরে এক গড় নির্ম্মাণ করান। সেই অবধি এই নূতন গড়ের নাম হইল "বাহিরগড়"। এই সময়ে চতুঃপার্শ্বস্থ জনসমূহ রাজা বিষণসিং ও তাঁহার অনুচর-বর্গকে ভীষণ-দর্শন দেখিয়া অজ্ঞাতনামদের দস্যুদলজ্ঞানে নবাবসমীপে সংবাদ পাঠান। তাহাতে নবাব গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করিলে বিষণসিং স্বেচ্ছায় নবাব-দরবারে উপস্থিত হন এবং "সাবল-পরীক্ষার" দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের রাজপুতাভিজাত্য ও নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন।

শ্রীরঞ্জনলাল সিংহ বর্ম্মণঃ।

চিন্তা।

(১)

ফুল ফোটে কত ঝরিয়া যায়,
হৃদয় বেদনা নীরবে সয়,
কত আসে কত চলিয়া যায়,
কেবা খোঁজ রাখে তার!
(আমি) বৃথা কি এসেছি বৃথাই যাইব
বহিয়া দুঃখের ভার?

(২)

লুব্ধ মানব আশার আশে
কতই বাসনা হৃদয়ে পোষে
কোনই বাসনা পুরে সে আসে
অনিত্য চির অসার।
মরণ লইলে তাঁহারি পাশে
নাশিবে হৃদয় ভার।

(৩)

তরুণ তপন, হেরিয়া কাহার
হৃদয় হয় না তৃপ্ত?

চাঁদের জ্যোছনা, কাহার হৃদয়
বেদনা করেনা লুপ্ত ?
প্রকৃতির শোভা এই মনোলোভা
যেদিকে ফিরাও নেত্র।
সুদূরে তাকায়ে দেখিবারে পাও
শস্ত শ্যামল ক্ষেত্র।
প্রভাতে উঠিলে পীক-কলরব
শুনিবারে পাও নিত্য।
বিভুগুণগান করে যে তাহারা
তাঁহারি নামেতে মত্ত ॥
হৃদয় বেদনা নিবেদ তাঁহারে
শেখহে করিতে ভক্তি।
শোক তাপ যত, দূরে চলে যাবে
(আর) অন্তে পাইবে মুক্তি ॥

শ্রীরহিমদাদ খাঁ।

স্নেহের বন্ধন।

(গল্প)

গ্রীষ্মের ছুটী হইবার পরে দুইদিনের মধ্যেও যখন সরোজনাথ বাড়ী আসিল না, হরি সর্দ্দার প্রত্যেক ট্রেণের সময় অপেক্ষা করিয়া যখন "বাবু এ গাড়ীতেও আসেন নাই" বলিয়া ষ্টেসন হইতে বাড়ীতে আসিয়া সংবাদ দিতে লাগিল, তখন বাড়ীর আর কেহ তাহার জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না বটে, কিন্তু হলপ করিয়া বলিতে পারি যে, সরোজের মাতৃস্থানীয়া ভ্রাতৃজায়ার মুখখানি এতটুকু হইয়া গিয়াছিল ; অশোকবনে অবস্থিতা সীতাদেবীও স্নেহভাজন দেবর লক্ষ্মণের জন্ত এরূপ উৎকণ্ঠিতা হওয়ার কোন প্রমাণ আমরা রামায়ণের কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই।

বৌদিদি প্রথম দিন ভাবিলেন,—হয়ত বা ট্রেণ ফেল হইয়াছে, আচ্ছা, একবার বাড়ী আসুক, এক হাত লওয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনও সরোজনাথ না আসাতে বৌদিদির রাগ ত কোথায় উড়িয়া গেল ; পরন্তু, তাহার মনে হইতে লাগিল, ভালয় ভালয় ঘরে ফিরিলে হয়। এ ভাবনার অংশ গ্রহণ করিবার কেহ নাই, থাকৃত আজ সরোজের মা বেঁচে, তাহা হইলে দু'জনে মিলিয়া আজ এক মহা অনর্থ করিয়া তুলিত।

অবশেষে তৃতীয় দিন বেলা ৫টার গাড়ীতে সরোজনাথ বাটী আসিয়া পৌছিল ; হরি সর্দ্দার আহ্লাদে গদগদ হইয়া বৌদিদিকে খবর দিতে ছুটিল। বৌদিদি হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। সরোজের দাদা কুমুদবাবু তখন সদরে বসিয়া আমলাদের সহিত হিসাব-পত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন ; সরোজ দাদাকে প্রণাম করিলে, দাদা একবার চোখ হইতে চশমাখানা কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"সরোজ এসেছ, আচ্ছা, বাড়ীর ভিতর যাও।" সরোজ অন্দরের দিকে চলিল।

অন্দরের বাহিরের দরজায় বৌদিদি সরোজনাথের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, সরোজ প্রণাম করিতে না করিতেই বৌদিদি বলিলেন, "এস ভাই এস, ভাল আছ ত', এত দেরী হ'ল কেন ?"

সরোজ বলিল,—"হাঁ, বৌদিদি, সব ভাল। দেরী,——দেরী আর কি ? এই তিন দিন

ছুটী হয়েছে বইত' নয়, এই গুছিয়ে আস্তে দু'দিন কেটে গেল।" প্রত্যুত্তরে বৌদিদি কিছু বলিলেন না, দেবরকে লইয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপ সমস্ত দিন যেন জগৎকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যা-আগমনে জীবকুল যেন পুনরায় সজীবতা প্রাপ্ত হইতেছিল। সান্ধ্য-বায়ু মৃদুমন্দ-হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া জীবের কষ্ট অপনোদন করিতে যত্নবান হইয়াছে; বিহঙ্গমকুল মধুর কলরবে পল্লিভূমি মুখরিত করিয়া অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছে। প্রবাস-বাস-ক্লিষ্ট সরোজ-নাথ প্রস্তর-কঙ্করময় নগরী হইতে শ্যাম-শীতল পল্লিভূমির মধুর অঙ্কে স্থানলাভ করিয়া যেন স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।—এমন মধুর অবসর, এ বিমল আনন্দ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কর্ম্মকঠোর জীবনের কর্ত্তব্য নিগড়ের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রজীবনের এই অব-সরের আনন্দ অতি মধুর বলিয়া মনে হয়।

সরোজনাথ একখানি ইজি-চেয়ার লইয়া দক্ষিণের বারাণ্ডায় সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতেছে, আর প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদি উপযুক্ত অব-সর বুঝিয়া সরোজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"ঠাকুরপো, দেশে কি আস্তে ইচ্ছা হয় না?"

সরোজ। কেন হবে না? এইত এসেছি।

বৌদিদি। এ কি আর আসা। ছুটী হয়ে গেল, সকলে এসে পড়ল, আর তোমার কি না তখনও সব গুছান হয় নাই। আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন মজা?—

সরোজ। কি বৌদিদি, কিসের ভয় দেখাচ্ছ?

বৌদিদি। ভয় কিছুই নয়। বলি কি, এমন একদিন আস্বে, যখন ছুটীর তিন দিন পূর্ব্বেও তোমাকে এখানে আসতে হ'বে। ভাবছি, সেই দিনটা কবে হ'বে; তা' হ'লে আমার ভাবনা চোকে। তোমাদের মত মানোয়ারী জাহাজকে বেঁধে রাখবার জন্ত একটা শক্ত কাছির দরকার।

সরোজনাথ হাসিয়া বলিল,—"বৌদিদির বুঝি আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়া হচ্ছে।"

এইরূপ নানাপ্রকার ঠাট্টা-তামাসায়, গল্প-গুজবে উভয়ে সেদিনকার সন্ধ্যাটা কাটাইয়া দিলেন।

(২)

পাঠক হয়ত' বলিতে পারেন, এ কি রকম গল্প বাপু, কোথাকার কে, তার পরিচয় দেওয়া নাই, আর বৌদিদি ঠাকুরপোর কথা এনে ফেল্লে। আচ্ছা, পরিচয়টাই দেওয়া যাক।

যদুপুরের রায়বংশ অতি প্রাচীন বনিয়াদি বংশ। ইহারাই গ্রামের জমিদার। জ্যেষ্ঠ কুমুদনাথ এবং কনিষ্ঠ সরোজনাথ এখন এই জমিদারীর মালিক। তাহাদের পিতা অনেক দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাহিরের কর্ত্তা ও ভ্রাতৃজায়া অন্দরের গৃহিণীরূপে সংসার চালাইয়া থাকেন; সরো-জের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু হইতেও বড় একটা দেরী নাই, পার্ব্বতীপুরের মল্লিকদের

বাড়ী তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে, শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখে বিবাহ হইবে।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের ছুটী কাটিয়া গেল, বৌদিদির বড় সাধের শ্রাবণ মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। বৌদিদির মনে আহ্লাদ আর ধরে না; তাহার উৎসাহ যেন শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। বৌদিদির যেন কোন কষ্টই নাই; যে যাহা বলিতেছে, তিনি তাহাই শুনিতেছেন, যে যাহা চাহিতেছে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিতেছেন। শরীরে অবসাদ নাই, কার্য্যে আলস্য নাই, ব্যস্ততায় কিছুমাত্র বিরক্তি নাই; অবিচলিত-চিত্তে, সানন্দ মনে বৌদিদি অনবরত খাটিতে-ছেন। খুব সুশৃঙ্খলায় বিবাহ-ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল। যথাসময়ে সরোজনাথ কনেবৌ লইয়া বাড়ীতে আসিল। সেই ব্রীড়াবনতমুখী কনেবৌকে বৌদিদি যখন কোলে করিয়া চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়াছিল, তখন কি জানি কেন, বৌদিদির চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছিল। তাহা আনন্দাশ্রু কি তাহার মৃতা শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর-স্মৃতিজনিত দুঃখের প্রবাহ-চিহ্ন, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে এমনও হইতে পারে যে, উভয়ের সংমিশ্রণ-জনিত গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পূত সলিলের ন্যায় ইহাও এক পবিত্র প্রবাহ।

ফুলশয্যার দিন বৌদিদি নিজহস্তে কনে-বৌকে সাজাইতে লাগিলেন। প্রথমে মাথা বাঁধিয়া দিলেন,—পছন্দ হইল না: খুলিয়া ফেলিয়া আবার বাঁধিয়া দিলেন, আবার খুলি-লেন, আবার বাঁধিলেন—এইরূপে তৃতীয় বারে নিজের মাথার চিরুণী দিয়া যখন কনেবৌএর মাথা বাঁধা হইল, তখন যেন বৌদিদির পছন্দ হইল; কনেবৌএর কণ্ঠে যে সোণার হার ছিল, তাহাও বৌদিদির পছন্দ হইল না; সে হার খুলিয়া লইয়া নিজের গলার হার কনে-বৌএর গলায় পরাইয়া দিলেন। এইরূপে কনে-বৌকে সাজাইয়া দিয়া বৌদিদি কনেবৌএর কানে কানে বলিলেন,—"দেখো ভাই, কাছিত শক্ত করিয়া দিলাম, এখন ভাল করিয়া জাহাজ-টাকে বাঁধিতে পারিলে হয়।" কনেবৌএর আরক্তিম গণ্ড আরও রক্তিমাভা ধারণ করিল, লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না।

(৩)

তারপর;—তারপর চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরোজনাথ এম্-এ, বি-এল্ পাস করিয়া বাঁকীপুরে ওকালতী করিতে গিয়াছেন, সঙ্গে স্ত্রীও আছে। ওকালতীতে সরোজনাথের বেশ পসার জমিয়াছে।

সরোজনাথ দেখিল, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার এজ-মালীতে বিষয় সম্পত্তি রাখিলে তাহার বিশেষ কিছু লাভ নাই, বরং তাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। জমিদারীর অংশের আয় এবং ওকালতীর আয়ে তাহার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইবে। অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপেক্ষা সে অনেক বেশী বড়লোক হইতে পারিবে। হায় ধনস্পৃহা! তুমি মানবকে দানবে পরিণত করিতে পার, পরমাত্মীয়কে ঘোরতর শত্রু করিতে পার, জগতের অনেক

স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধার বাঁধন ছিঁড়িয়া ছারখার করিয়া দিতে পারে।

সরোজনাথ দাদাকে পত্র লিখিল,—তাহার মর্ম্ম এই—"দাদা, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সমস্ত কাজ করা ভাল, আমাদের মধ্যে এখন কোন মনোমালিন্য নাই। কিন্তু কে বলিতে পারে, দু'দিন পরে না হউক, আমাদের জীবনে না হউক, আমাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যেও জ্ঞাতি-বিরোধের উদ্রেক হইতে পারে; এমন কি, মামলা মকদ্দমা হইয়া বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি যত শীঘ্র পারেন ইহার যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিবেন, ইত্যাদি।"

কুমুদনাথ পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; সরোজের মনে এরূপ ভাবের কেন উদয় হইল? তবে কি সরোজ সব ভাগ করিয়া লইতে চায়? মনে মনে সন্দেহ করিলেন, হয় ত বা ছোট বৌএর যুক্তি পরামর্শে সরোজের মতি গতি অন্য রকম হইয়াছে, তাহা না হইলে সরোজ ত এরূপ চরিত্রের লোক নয়। হায় হিন্দু-ললনা! হিন্দুর সামাজিক জীবনের অনেক দুর্ঘটনার কারণ অন্যায়পূর্ব্বক তোমাদের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া থাকে। পুরুষের দোষেও যে এরূপ হইয়া থাকে, তাহা অনেকে ভলাইয়া বোঝেন না। কূটবুদ্ধি সরোজনাথ আইন আদালতের সংস্পর্শে আসিয়া যে পুরা মাত্রায় বিষয়ী লোকের মত হইয়া পড়িয়াছে তাহা মনুষ্য-চরিত্রানুশীলনানভিজ্ঞ কুমুদনাথ বুঝিতে পারিল না।

কুমুদনাথ পত্রখানি লইয়া তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইলেন। বৌদিদি ঠাকুরপোর হাতের চিঠি দেখিয়া আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। বৌদিদির মুখ স্থির ও গম্ভীর, কোন বৈলক্ষণ্য নাই, যেন স্থির সরসীর চাঞ্চল্যহীন বক্ষ। পত্র-পাঠ শেষ করিয়া বৌদিদি বলিলেন,—"ইহাতে আর কি? ঠাকুরপো ত ভাল কথাই বলেছে। ইহাতে সে সুখী হ'বে মনে করেছে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ত আছেই; তবে মিল থাকৃতে থাকৃতে যে যার বুঝে নাও না।"

(৪)

তাহাই হইল। ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন, মানুষ যখন আমার জমী, আমার জমী বলিয়া অহঙ্কার করে, ধরিত্রী তখন হাসিয়া থাকেন, আবার যখন সেই জমী লইয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদ, লাঠালাঠি, মারামারি করে, কিম্বা দড়ি ফেলিয়া মাপ করিয়া লইয়া এইটী আমার রহিল, আর ঐটী তোমার অংশে রহিল বলিয়া ভাগ করে, তখনও ধরিত্রী হাসিয়া থাকেন। সাধক ধরিত্রীর হাসি বুঝিতে পারেন; আমরা সাধারণ লোক, আমরা ধরিত্রীর হাসি বুঝিতে না পারিলেও ইহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যখন সরোজনাথ ও কুমুদনাথ বাস্তভিটা, ঘরবাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, জমিদারী প্রভৃতি যাহা কিছু একমালি সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইল, পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া যখন দুই খণ্ড হইয়া চিরবিচ্ছেদের নিদর্শন স্বরূপ একখানি পূর্ব্বমুখো ও একখানি পশ্চিমমুখো হইল, তখন ঈর্ষাপরতন্ত্র গ্রামবাসিগণের মধ্যে বেশ একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়াছিল।

উত তরু কীটদষ্ট হইলে লোকের এত আনন্দ হয় কেন?

সরোজনাথ পূজার ছুটীর মধ্যে আসিয়া নিজ অংশের বাড়ী ঘর সমস্ত ঠিক করিয়া মেরামত করিয়া লইলেন। বাগান মধ্যে তাহার অংশে যে জমী পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার বেশ সঙ্কুলান হইয়া গেল; কিন্তু সরোজের সখ হইল যে, সে একটী নূতন বড় হল ঘর প্রস্তুত করিবে ও তাহা সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিবে। তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে আর খানিকটা জায়গার প্রয়োজন; কিন্তু তাহার দাদা কি তাহা ছাড়িতে রাজী হইবেন? সরোজ তাহার দাদার কাছে কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন কথায় কথায় সরোজ বৌদিদির কাছে তাহার অভিপ্রায় জানাইল এবং ঐ জায়গার দামও দিতে চাহিল। বৌদিদি শুনিয়া রাগভরে বলিতে লাগিলেন "ঠাকুরপো ওকালতী করে চোখের পর্দ্দা কি তোমার একবারে নাই। তুমি হল ঘর করবে, জায়গার দরকার, তা আমরা দেব, তার আবার দাম কি? বল্‌তে লজ্জাও কর্‌ল না তোমার?"

যথাসময়ে কথা কুমুদের কানে উঠিল। কুমুদ সরোজকে ডাকিয়া বলিল—'জায়গা চাই, একথা আমায় বল না কেন? চল, কতখানি জায়গা চাই, আমি নিজে দেখাইয়া দিতেছি" বলিয়া কুমুদ নিজ হস্তে আপনার অংশের জায়গা হইতে সরোজের জন্ত আবশ্যকীয় জমী ঠিক করিয়া দিলেন। সরোজ হৃষ্টচিত্তে তাহাতে হলঘর প্রস্তুত করিলেন।

নিজ অংশের জমিদারীর জন্ত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাটীতে দূর সম্পর্কীয় এক শ্যালক ও শ্যালক পত্নীকে রাখিয়া ছুটী ফুরাইতেই সরোজনাথ সস্ত্রীক কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

(৫)

বাগানের যে অংশ কুমুদের দিকে পড়িয়াছে কুমুদ তাহাতে কিছু ফসল দিবার মনস্থ করিয়া বেড়া দিতে লাগিলেন। কুমুদের অংশের জমীর পাশেই সরোজের জমী; ঠিক দুই সীমানার মাথায় একটী বড় আম গাছ আছে। কুমুদ বেড়া দিবার সময় বেড়ার খ্যাখারী ঐ আম গাছে বেষ্টন করিয়া দিলেন, তবে গাছের সংলগ্ন দুই ধারের বেড়া যে প্রকারে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, গাছটী দুই সীমানার মধ্যে পড়িয়াছে।

সরোজের এক কর্ম্মচারী তাহার নিকট এই সংবাদ পাঠাইল; সরোজ প্রথমে ভাবিল,সামান্ত বিষয়, দাদার কাছে যাইলেই মিটিয়া যাইবে। কিন্তু যখন তাহার শ্যালক নানাপ্রকার মিথ্যা কথায় অতিরঞ্জিতভাবে পত্রের উপর পত্র দিতে লাগিল, তখন সরোজের মনে হইতে লাগিল, দাদার ত ভারি অন্যায়, আচ্ছা বড়দিনের ছুটীতে যাইয়া ইহার বিহিত করা যাইবে। শ্যালককেও সেইভাবে পত্রের উত্তর দিল।

বড়দিনের ছুটীতে বাড়ীতে আসিয়া সরোজ লোকের দ্বারা তাহার দাদাকে আম গাছের কথা বলিয়া পাঠাইল। কুমুদের মনে অভিমান আসিয়া আঘাত করিল, সরোজ নিজে আসিল না, লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইল। কুমুদ উত্তর দিলেন, "কোন অন্যায় হয় নাই, বেড়া যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে।" বৌদিদি কথাটা

শুনিয়া সরোজকে ক্ষমা করিবার জন্য স্বামীকে বলিল। কিন্তু কুমুদ স্থির-প্রতিজ্ঞ। ধূমায়িত ইন্ধন বহ্নিমান হইয়া উঠিল।

সরোজ একদিন লোকজন যোগাড় করিয়া যেন এক বিষম দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া গাছ কাটিবার হুকুম দিল।

ঠক্ ঠক্ করিয়া গাছ কাটার শব্দ হইতেছে, তাহা শুনিয়া কুমুদের দেহ রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পাইক হরি সর্দ্দার বলিতে লাগিল, "বাবু, একবার হুকুম দিন, আমরা একবার দেখি; হরি সর্দ্দার বেঁচে থাকতে আপনার অপমান হবে, এ আমার সহ্য হয় না। বাবু, একবার হুকুম দিন।"

ওদিকে বাগানে একটা খুব গোলমাল শুনা গেল। অনতিবিলম্বে দেখা গেল, কুমুদেরই কতকগুলি প্রজা সরোজকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে বলিল,—"বাবু, আপনার অপমান আমাদের সহ্য হইল না, এই নিন্ অপরাধীকে আমরা ধরিয়া আনিয়াছি যাহা করিতে হয় করুন।" কুমুদ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যেন থ হইয়া গেলেন; একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই বলিল, "ওটা বাঁদর হয়ে গেছে, ওটাকে ছেড়ে দে।" বলিতেই সকলে সরোজকে ছাড়িয়া দিল।

রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও অপমানে সরোজনাথ আত্মহারা হইয়া পড়িল। যে সময়ে কুমুদের প্রজারা সরোজের লোকজনকে তাড়া করিয়াছিল, সেই সময় একজন কাঠুরিয়া পড়িয়া গিয়া বাঁশের দ্বারা কপালে আঘাত প্রাপ্ত হয়, ও তাহাতে তাহার কপাল কাটিয়া গিয়া রক্তপাত হয়। সরোজ উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে লইয়া পুলীশে ডাইরী করিয়া আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে দারোগাকে লইয়া আসিল। দারোগা বাবু, কি জানি কেন, সরোজের বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিলেন, সেইদিনই দারোগা বাবু ছয়জন আসামীকে চালান দিলেন; এই ছয়জনের মধ্যে, কুমুদও রহিল।

বৌদিদি শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হায়! হায়! যে ঠাকুরপোকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন সেই ঠাকুরপোই আজ তার এই সর্ব্বনাশ করিল। শোকে দুঃখে বৌদিদি যেন পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। আসামীগণকে ছাড়াইবার জন্য মহকুমায় লোক ছুটিল। রাত্রে বৌদিদির জ্বর আসিয়া দেখা দিল, বিকারগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার ভুল বকিতে লাগিলেন।

পরদিনও আসামীগণ কেহ ফিরিল না। বৌদিদির অবস্থা ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হইতে লাগিল। বিপদের উপর বিপদ আসিয়া দেখা দেয়; ওদিকে বড় বাবু হাজতে, এদিকে বৌদিদি কঠিন পীড়াগ্রস্ত, কেবল বিকারের ঝোঁকে বকিতেছেন,—"ঠাকুরপো, এসেছ, কি চাই ভাই, আমায় বল না।"

তাহার পরদিনও ঐরূপ অবস্থা। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মোকদ্দমা গুরুতর বিবেচনা করিয়া কুমুদের ২০০৲ টাকা জামিনের আদেশ দিয়াছেন। জামিন যোগাড় করিতে দেরী হইতেছে। বৌদিদির অবস্থা বড়ই খারাপ, কেবল মধ্যে মধ্যে সেই কথা—"ঠাকুর-

গো, এসেছ, কি চাই ভাই, আবার বল না।"

তৃতীয় দিবসে কুমুদনাথ হাজত হইতে বাহির হইয়াই একখানি দলিল লেখাপড়া করিয়া রেজিষ্টারি করিয়া ফেলিল। দলীলের রসীদখানি লইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিলেন। আসিয়াই স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া কুমুদ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হায়, কি হলো, এ আবার কি হলো।"

কুমুদের স্ত্রী একবার চোখ চাহিয়া বলিল—"এসেছ, ঠাকুরপো কোথায়?"

কুমুদনাথ রোগীর অবস্থা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় "এই যে বৌদিদি অধম আমি, পিশাচ আমি,—এই যে আমি এসেছি" বলিয়া সরোজ কোথা হইতে আসিয়া বৌদিদির পা জড়াইয়া ধরিল। দাদার তিন দিন হাজত-বাসের কষ্ট, আর বৌদিদির বিকার অবস্থায় প্রলাপকথন তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সে আর থাকিতে না পারিয়া বৌদিদির পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার দাদার পায়ে মাথা লুটাইতে লাগিল। কুমুদ-নাথ সরোজকে ধরিয়া তুলিয়া আলিঙ্গন করিল। পকেট হইতে দলীলের রসীদখানি বাহির করিয়া বলিলেন—"এই নাও ভাই, আমি আমার সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তোমাকে দানপত্র করিয়া দিয়াছি, তোমার সুখেই আমাদের সুখ; তুমি যে আমার ছোট ভাই, আর আমি যে তোমার দাদা।" বলিতে বলিতে কুমুদের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সরোজ রসীদখানি লইয়া প্রদীপের আলোর পুড়াইয়া ফেলিল। তারপর সেতজানু হইয়া জোড়হস্তে বলিতে লাগিল,—"বলুন দাদা, আমায় ক্ষমা করলেন, আমি মহাপাতকী, আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই; স্বার্থান্ধ আমি, না বুঝিয়া মহা সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা করলেন। জন্ম-জন্মান্তরে যেন আপনার ন্যায় দাদা ও বৌদিদির ন্যায় বৌদিদি প্রাপ্ত হই। আপনা-দের ন্যায় দেব-দেবীর নিকট হইতে পৃথক হইয়া আমি পিশাচ হইয়াছি। দাদা, আমায় ক্ষমা ———" বলিতে বলিতে সরোজের কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল। অবিরলধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কুমুদ সরোজকে সান্ত্বনা করিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন।

সরোজের সেবা-শুশ্রূষায় বৌদিদিও ক্রমে ক্রমে সারিয়া উঠিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম।

কণা।

তুমি কণা। এই বিশাল সৃষ্টির মাঝে তুমিই ক্ষুদ্রতম। সীমাবিহীন ব্রহ্মাণ্ডে তোমার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না। তুমি তুচ্ছ, নীচ এ প্রকার সামান্ত বস্তু চিন্তার বিষয়ীভূত হইবার অযোগ্য; অতএব তুমি বিশ্বজনের পদদলিত হইয়া থাকিবে এবং আপনার স্বরূপ প্রকাশে বৃথা প্রয়াস পাইবে না।

যাহা হউক, স্বীকার করিয়া লইলাম তুমি যথার্থ-ই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছাদপিতুচ্ছ কিন্তু তুমি কি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র, না সেই অসীম,

অব্যক্ত ও অপ্রকাশেরই সামান্য অংশ-বিশেষ? তুমি কি তুচ্ছ, না বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিসহায়-স্বরূপ আদি ও প্রধান উপাদান, অনন্তশায়ীর বিরাট হৃদয়ের অন্তস্তলে তোমার রূপেই প্রথম ইচ্ছা প্রকটিত হইয়াছিল এবং 'একোঽহং-বহুস্যাম:' ইহার ভাব উন্মেষিত করিয়া তাঁহাকে বিভোর করিয়াছিল? এই নিখিল ভূমণ্ডলে যাবৎ বস্তু তোমার রূপেই উদ্ভূত হয় ও ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করে।

ওই দেখ, পথিক, তুমি কেমন নির্ব্বিকার-চিত্তে ধূলিকণাগুলিকে পদদলিত করিতেছ, কিন্তু এখনও উহা আপনার স্বরূপ সম্যক প্রকাশিত করে নাই; আবার পরক্ষণেই দেখ, ঘোররবে প্রবল প্রভঞ্জন গগনমার্গে উত্থিত হইল ও তৎসঙ্গে ধূলিকণা সমূহও সেই পথ প্রশস্ত জ্ঞান করিয়া অবলম্বন করিল। তৎপরে ইহার ভীষণ তাণ্ডব নর্ত্তন অবলোকন কর, না আর অধিকক্ষণ করিতে হইবে না, ওই যে তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, আর অধিকক্ষণ এ ভাব স্থিত করিলে তোমাকে শবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। ইহা ক্ষুদ্র বস্তুর চরম অবস্থা।

আবার যখন ওই ধূলিকণা বারিসংস্পর্শে কর্দ্দমে রূপান্তরিত হয়, তখন, হে পথিক, উহার উপর পদস্থাপন করিতে তোমার মন কি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, মনে সামান্য ভয়ের সঞ্চার হয় না? তাহা যদি না হইত, তবে তুমি অত সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছ কেন, পাদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছ না কেন? যখন বৃষ্টিপাতের সহিত পথে কর্দ্দমের সঞ্চার হয়, তখন কি তুমি তোমার পর্ণকুটীরকে একমাত্র সম্বল বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হও?

বালুকণা কত ছোট। উহা যখন তোমার ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহপ্রাচীরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে, তখন তুমি উহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই কোনরূপ বিপদ প্রত্যাশা কর না। আবার যখন উহা পানীয় বিশুদ্ধ করিতে সহায়তা করে, তখন উহাকে পরম মিত্র বলিয়া বিবেচনা কর। কিন্তু উহার আর একটী রূপ দেখ। যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড স্বীয় ভীষণ ময়ূখমালা মরুপ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে থাকে, তখন সেই স্থানে বালুকণার কি বীভৎস রূপ পরিলক্ষিত হয়! তখন উহা 'ভানুতেজে রেণু যথা কৃশানুসমান' এই কবিবাক্য স্মরণপথে উদিত করে এবং উহার যথার্থ পরিচয়ও প্রদান করে। তখন উহাকে কৃতান্তের সহচর বলিয়া ভ্রম হয়, তখন উহার ফুৎকার একবার মাত্র গাত্র-স্পর্শ করিলে জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তখন কি উহাকে সামান্য বালুকণা বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায়?

যাহাকে আমরা এক্ষণে জগৎ বলিয়া জানি সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা জলময় ছিল। ঐ অনন্ত বারিরাশির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা সংমিশ্রিত ছিল। সেই সমস্ত বালুকণাই উত্তরকালে পুঞ্জীভূত হইয়া পরিদৃশ্যমান বিস্তৃত ভূ-ভাগ গঠিত করে। এই ভূ-ভাগ দেখিলে কি মনে হয় যে, উহা বালুকণা হইতে গঠিত?

বটবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া বায়স সৌধ-প্রাচীর উপরি পুরীষ ত্যাগ করিয়া গেল। ঐ ফলমধ্যে অসংখ্য বীজ বর্ত্তমান ছিল; উহারই একটী সামান্য বীজ পরিপাক না হওয়ায় পুরীষের সহিত প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন হইল। তাহাতে শিকড়ের সঞ্চার হইয়া প্রাচীরমধ্যে প্রবেশ করিল। ইহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার; ইহার উল্লেখ না করিলেই হইত, এইরূপ মনে হইতেছে। হাঁ, ইহা অতি সত্য কথা কিন্তু ইহা হইতে কি ধারণা করা যায় যে, উহা একদিবস সমগ্র সৌধটীকে ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ হইবে? ইহা তুচ্ছের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক।

অর্ণবযান অবাধ গতিতে সমুদ্রবক্ষ প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত করিয়া অগ্রসর হইতেছে। পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গমালাকে শাসন করিবার নিমিত্তই যেন প্রধাবিত হইতেছে,—বিপদ-আশঙ্কা করিবার কোন বিশেষ কারণও তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অকস্মাৎ উহার তলদেশে একটী সামান্য ছিদ্র পরিলক্ষিত হইল। একটী সামান্য ছিদ্র ওরূপ সুবৃহৎ অর্ণবযানের কোন ক্ষতি করিবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই ঘটনার গভীরতা লক্ষ্য না করিলে এইরূপ মনে হওয়া সঙ্গত, ইহাতে এমন কি বিচিত্রতা আছে? কিন্তু এ বিষয়ে যদি প্রচুর যত্ন না লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ মদদৃপ্ত অর্ণবযানকে তরঙ্গতলেই আশ্রয় লইতে হইবে।

পবনসদৃশ বলশালী ও সুস্থকায় ব্যক্তিকে যদি বিন্দুমাত্র বিষ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে তাহাই তাহার ভীমবপুকে নিশ্চেষ্ট করিতে পারে। পরিমাণের তুলনায় মনে হয় বিন্দুমাত্র দ্রব্য কোন অনর্থ সাধিতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র পরিমাণ দেখিলেই ত হইবে না, তৎসঙ্গে দ্রব্যের কার্য্যকারিতার বিষয়ও সবিশেষ দেখিতে হইবে।

পর্ব্বত-গাত্র হইতে যখন বিন্দু বিন্দু বারি নিঃসরণ হইতে থাকে, তখন কে উহা পর্য্যবেক্ষণ করে? কিন্তু ঐ বারিবিন্দুসমূহের যখন একত্র সমাবেশ হয়, তখন উহা পর্ব্বত বহিয়া নিম্নগামী হয়; মধ্যপথে হয়ত বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহারা এইস্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তখন তাহারা আর দুরারোহ পর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন করিতে বিরত হয় না। কালক্রমে স্রোতস্বতী-রূপে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় ও সমুদ্রের তরঙ্গে আপনার তরঙ্গ মিশাইয়া সমুদ্রকে আরও ভীষণ ও ভয়াবহ করিয়া তুলে। এই অতল সমুদ্রে তখন বারিবিন্দুর সন্ধান কয়জন রাখে ও কয়জনের মনে উহা অতি অল্পমাত্র স্থানও অধিকার করিতে পারে?

বনস্পতিসমূহ বায়ুপথে মস্তক উন্নত করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান আছে। তাহারা, মনে হয় যেন, ভাবিয়াছিল ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ স্পর্শ করিবে কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া আপনাদের নগ্ন কটিদেশ দেখিয়া আপনারা লজ্জিত হইল ও পাছে ইহা সূর্য্যদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এই ভয়ে মস্তকস্থিত পত্রাবলিকে আরও ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া দিল।

বাস্তবিকই তাহাদের দীর্ঘ আকার দেখিলে তাহারা যে আকাশস্পর্শ করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল এইরূপ ভাব স্বতঃই মনে হয়; কিন্তু তাহারা যে কণাসম বীজ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহা ত একবারও মনে হয় না, আবার মনে হইলেও প্রত্যয় হয় না।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, সমুদ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল নামে এক প্রকার কীট জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাদের অনেকের একত্র সমাবেশে সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। তাহাদের ক্ষুদ্র শরীর হইতে কি বৃহৎ দ্রব্য উদ্ভূত হয়! ইহা হইতে বোধ হয় যে, তাহাদের সামান্য আত্মবলিদান দধিচী মুনির আত্মদান অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সামান্য কীটে যদি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে কাষ্ঠবিড়াল যে রামচন্দ্রের জানকী উদ্ধারেরর সময় সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা কি একেবারে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়? এরূপ অবস্থায়ও পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি হয়ত যৎকিঞ্চিৎ নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া 'অন্ধ বিশ্বাস' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন, কারণ সমস্ত দ্রব্যই তিনি তাহার বিদেশীয় শিক্ষার মাপকাটীতে মাপিয়া লইতে প্রস্তুত। যাহা হউক, কথায় কথায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন মূল দ্রব্যের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

আমরা যে শরীর ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতেছি ও যাহার নিমিত্ত অন্ততঃ মনে মনেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে গর্ব্বিত, তাহা কণামাত্র দ্রব্য হইতে উদ্ভূত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু দেহের এ প্রকার অবস্থা তখন 'অন্য পরে কা কথা।' পরম মঙ্গলময় জগদীশ আমাদের মধ্যে তাহার যে সামান্য মাত্র সত্তা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিরাটত্বের নিকট, সমুদ্রের নিকট বারিবিন্দুর ন্যায়।

পৃথিবীর যাবতীয় মহদনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমরা সকলকেই অত্যন্ত সামান্য অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রাচীন রোমক রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু কি হীন অবস্থায় ইহার ভিত্তি প্রোথিত হয়? কতকগুলি রাজদণ্ডে দণ্ডিত তস্কর, লুণ্ঠনকারী ও নরহন্তা মিলিয়া রোমের পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে ও তথায় একপ্রকার শাসনের সৃষ্টি করে। এইরূপে রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। যে রোম এক দিবস সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে পদানত করিয়াছিল এবং এসিয়া মহাদেশকেও সেইপ্রকার অবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল তাহার পত্তন কি সামান্য ভাবেই হইয়াছিল? অনেকেই জলযানের সাহায্যে সমুদ্রের উপর দিয়া গমনাগমন ও বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কলম্বসও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন, কিন্তু কে জানিত যে তাঁহার নৌ-যাত্রা আমেরিকার আবিষ্কারে পর্য্যবসিত হইবে? ইংরাজদিগের ভারত-বিজয়ও এইরূপ তুচ্ছ ব্যাপার। অনেক বিদেশীয় জাতিই বাণিজ্য করিতে

আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি জানিতেন, এমন কি ইংরাজেরা নিজেই কি জানিতেন যে, উত্তরকালে তাঁহারাই ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইবেন? সকল মহৎ কার্য্যের মূলেই এইরূপ সামান্য ভাব নিহিত থাকে। কিন্তু তুচ্ছ, সামান্য, ঘৃণ্য কণাপরিমাণ বস্তু যে সুমহান্ কিছু সম্পন্ন করিতে সমর্থ তাহা আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যতিরেকে আমরা অবগত হইতে পারি না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কণা ও অণুপরিমাণ দ্রব্য সেই বিরাট ও মহানেরই তুচ্ছ অংশবিশেষ।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজ বংশের ইতিহাস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র।

এদিকে রাজা শ্রীমন্তের পুত্র মহেন্দ্র বঙ্গাধীপ সেকন্দরের একজন সুপ্রসিদ্ধ সেনা-নায়ক হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র স্বীয় চরিত্রগুণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত সৈন্যগণেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত। বঙ্গদেশে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল।

বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সার দুই প্রধান রাণী ছিলেন। প্রথমা রাণীর গর্ভে তাঁহার সপ্তদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়া রাণীর কেবল একটী মাত্র পুত্র ছিল। দ্বিতীয়া রাণীর গর্ভজাত এই পুত্রটী সকল পুত্র অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ চরিত্রবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। সেকন্দর সা সেই জন্য এই পুত্রটীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন এবং ভবিষ্যতে তাহাকে সিংহাসন দান করিবেন এইরূপ অভিলাষ জ্ঞাপন করেন, ইহাতে প্রথমা রাণী ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্রগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। মহেন্দ্র এই বিষয় অবগত হইয়া সেকন্দর সা ও তাঁহার দ্বিতীয়া রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে সতর্ক করিয়া দেন। প্রথমা রাণী সেকন্দর সার মন হইতে এই সন্দেহ বিদূরিত করিবার মানসে আর এক নূতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। দ্বিতীয়া রাণী মহেন্দ্রের এই উপকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বহুমূল্য রত্নাদি সহ এক বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে তাঁহার বাটীতে প্রেরণ করেন। প্রথমা রাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, মহেন্দ্রের সহিত দ্বিতীয়া রাণীর অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হইয়াছে তাহারা উভয়ে রাজাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সন্দেহ সেকন্দরের মনে অতি সুকৌশলে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। সেকেন্দর দ্বিতীয়া রাণীকে কারারুদ্ধ করিলেন। মহেন্দ্র ও রাজপুত্র প্রাণভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু সেকন্দর সাহের রোষবহ্নি ইহাতে দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি মহেন্দ্রকে ধরিবার জন্য বহু-সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ৶

এদিকে মহেন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া নিজ-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নবাবের

সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে শুনিয়া তিনিও বহুসংখ্যক অশ্বারোহী-সৈন্য-সমভিব্যাহারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে মুসলমান সৈন্যগণকে রজনীযোগে আক্রমণ করিলেন। নবাবসৈন্যগণ সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় ছিল, তাহারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না; অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হইল এবং অবশিষ্ট অতিকষ্টে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। নবাব-পুত্র মহেন্দ্রের এই সমস্ত সৈন্য এবং আরও কয়েক সহস্র মুসলমানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী পেড়ুয়া আক্রমন করিলেন। সেকেন্দর সাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পিতা-পুত্রে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। এই যুদ্ধে সেকেন্দর সা নিহত হইলেন। তৎপরে সেকেন্দর সার বিজয়ী-পুত্র গিয়াসুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া বঙ্গসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া স্বীয় মাতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের চক্ষুরুৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। গিয়াসুদ্দিন মহেন্দ্রকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া তাহারই পরামর্শ অনুসারে কয়েক বৎসর অতি ন্যায়পরতার সহিত রাজ্য-শাসন করেন।

১৩৭৩ খৃঃ অব্দে গিয়াসুদ্দিন মানবলীলা সংবরণ করেন। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সইফুদ্দিন ও তৎপরে পৌত্র দ্বিতীয় সামসুদ্দিন অত্যন্ত অত্যাচারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি তাহার ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায়। সামান্য অপরাধে তিনি হিন্দুদিগের প্রাণবধের আজ্ঞা দিতেন, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, মন্দির প্রাঙ্গনে গো-হত্যা করিয়া গোরক্তে প্রতিমা রঞ্জিত করিতেন, ধনিদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইতেন এবং সুন্দরী স্ত্রীলোকের সন্ধান পাইলেই ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগকে হস্তগত করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরচারিণী করিতেন। বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তাহার ভয়ে সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিত। এমন কি, তিনি সেনাপতি মহেন্দ্রকে পর্য্যন্ত ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু মহেন্দ্র এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহাতে সামসুদ্দিন তাহার প্রতি রোষপরবশ হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করেন।

মহেন্দ্র বঙ্গবাসিগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে রাজার উপর পূর্ব্ব হইতেই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালী নারীগণের আর্ত্তনাদে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ধর্ম্মবিগর্হিত বোধে এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে নিজের ধর্ম্ম ও জীবন-নাশের সম্ভাবনা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বীর্য্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে সামসুদ্দিনের গো, ব্রাহ্মণ ও রমণীগণের উপর উৎপীড়ন ইন্ধন স্বরূপ হইল। তিনি নরপিশাচ সামসুদ্দিনকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে এক প্রবল পরাক্রান্ত ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন,

ইনি রাজা গণেশ নামে বিখ্যাত।* ইহার শাসনাধীনে প্রজাবর্গ ইহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত, এবং ইনিও প্রকৃতিবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণপণ যত্ন করিতেন। যখন বঙ্গদেশের হিন্দুনরনারী সামসুদ্দিনের ভীষণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ব্যাধবিতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তাহারা এই বিধর্ম্মী, নরপিশাচ মুসলমান নরপতির উৎপীড়নে নিজেদের জাতি, ধর্ম্ম, ধন, মান, সম্ভ্রম কিছুই রক্ষা করিতে না পারিয়া পিতৃমাতৃহীন শিশুর ন্যায় নিতান্ত অশরণ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে রাজা গণেশ স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের করুণ আর্ত্তনাদে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া কি উপায়ে তিনি তাহাদিগকে এই ভীষণ অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন দিবারাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরম কারুণিক, দীনবৎসল, বিপত্তিনাশন মধুসূদন নিজ ঐশীশক্তিতে রাজা গণেশকে অনুপ্রাণিত করিলেন। রাজা গণেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত সমস্ত জনপদের সকল প্রজাগণকে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী করিতে লাগিলেন। তিনি সকল লোককে তেজস্বিনী ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রজাগণ, তোমরা শৃগাল-কুকুরভোজ্য মাংসপিণ্ডদেহভার বৃথা বহন করিতেছ। অত্যাচারী সামসুদ্দিন তোমাদের উপর কি অত্যাচারই না করিতেছে? তোমাদের মাতা, ভগিনী, কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেছে, লোকের ধন-রত্ন অপহরণ করিতেছে, দেবদেবীর মন্দির অপবিত্র করিতেছে, বলপ্রয়োগে ধর্ম্মনাশ করিয়া তোমাদিগের অনেককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। এ সকল অত্যাচার কেন তোমরা নীরবে সহ্য করিতেছ? তোমরা হিন্দু, ধর্ম্মই তোমাদের প্রাণ; সেই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য তোমরা কি কোন চেষ্টাই করিবে না? সামসুদ্দিনের অত্যাচারে হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহা কি তোমরা দেখিয়াও দেখিবে না? বিশুদ্ধ আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হও। মহাসত্ব রাজা গণেশের এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর-বঙ্গের হিন্দু অধিবাসিগণের চৈতন্যোদয় হইল, তাহারা সকলে একতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু পরম অত্যাচারী সামসুদ্দিনের বিনাশসাধনে কৃতনিশ্চয় হইল। মহেন্দ্রও এই সংবাদ পাইয়া রাজা গণেশের সহিত মিলিত হইলেন। রাজা গণেশ মহেন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। উৎসাহে ও আশায় তাহার হৃদয় স্ফীত হইল। তিনি মহেন্দ্রকে সসম্মানে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া সামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামে মহেন্দ্র সামসুদ্দিনকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। মহা অত্যাচারী যবনকে বিদূরিত করিয়া ন্যায়পরায়ণ, মহাধার্ম্মিক রাজা গণেশকে পৌণ্ড্রুয়ার সিংহাসনে বসাইলেন। বঙ্গদেশে আবার শান্তি বিরাজিত হইল। ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

রবি বাবুর গোরা।

সমালোচনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাদা, ওখানা কি বই প'ড়চ ?

এ একখানা বাঙ্গালা উপন্যাস।

কি নাম ?

গোরা।

কার লেখা ?

রবি বাবুর লেখা।

গল্পটা কি ?

বড় চমৎকার গল্প। তবে বলি শোন।

আখ্যায়িকা।

ইংরাজী ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। সেই সময়ে বিস্তর ইংরেজ যুদ্ধে মারা যায়; আবার অনেকে প্রাণ নিয়ে পালায়, কোন ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধে হত হন; তাঁর পত্নী প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে এক ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেন। সেই রাত্রে সেই ঘরেই তিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। সেই ব্রাহ্মণের নাম কৃষ্ণদয়াল বাবু; তাঁর স্ত্রীর নাম শ্রীমতী আনন্দময়ী। এরা স্ত্রীপুরুষে পিতৃমাতৃহীন শিশুটীকে প্রতি-পালন করেন। সেই পালিত পুত্রের নাম গোরা। গোরা যে ইংরেজের ছেলে এ কথা গোরা আদৌ জান্‌ত না, এ কথা তাকে জানা-নও হয় নি গোরা জান্‌ত সে বাঙ্গালীর ছেলে, জাতিতে ব্রাহ্মণ। যথাকালে গোরার পৈতে হ'ল। গোরা স্কুলে যায়, লেখা পড়া করে। স্কুলের পাঠ শেষ হ'লে গোরা কলেজে ভর্তি হয়। নিজের যত্নে ও অধ্যবসায় গুণে গোরা একে একে এন্‌ট্রান্স, এল-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করিল। লিখ্‌তে, পড়্‌তে, বল্‌তে, কইতে গোরা খুব বাহাদুর। শিক্ষিত দলের মধ্যে গোরা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব'লে গোরা বেশ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিল। ব্রাহ্মণ-কুমার ব'লে গোরা একটু স্পর্দ্ধাও করিত। হিন্দুধর্ম্মে গোরার ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। গোরা যেমন নিষ্ঠাবান তেমনি আচারবান্ ছিল। পণ্ডিতের কাছে কিছুকাল গোরা হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়েছিল. হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে গোরা ঘোর অদ্বৈতবাদী হ'য়ে পড়ল। দেবতা, ব্রাহ্মণে গোরার খুব ভক্তি। গোরা গঙ্গাস্নান করে, ফোঁটা কাটে, পট্টবস্ত্র পরে, আবার ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরপূজোও করে। গোরার মনটা উদার, প্রাণটা দয়াতে মাখান। গোরা পরের সুখে সুখী, পরের দুঃখে দুঃখী—স্বজাতি-প্রেমের, স্বদেশ-বাৎস-ল্যের অনন্ত দৃষ্টান্ত। আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করে গোরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়; বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসে—কার কি অভাব; আর স্বকর্ণে শুনে আসে—গরী-বের দুঃখের কাহিনী। কিসে দেশের গরীব লোকের উপকার হবে, গোরার এই চেষ্টা কিসে দেশের অবস্থার উন্নতি হবে, গোরার এই চিন্তা। কোন একদিন ঘোষপুর নামক কোন পল্লীতে গিয়ে গোরা দেখিল,—নীলকর জমিদার গরীব প্রজাদের উপর বড়ই জুলুম অত্যাচার করিতেছে। এই সমস্ত গরীব প্রজা-

বর পেটে অন্ন নাই, কোমরে বস্ত্র নাই, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। তারা অস্থি-চর্ম্ম-সার হয়েছে। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখে সে গোরা সেখানকার ম্যেজেষ্টার ব্রাউন্‌লো সাহেবের কাছারীতে গিয়ে সাহেবকে কুঠিয়ালাদের অত্যাচার ও পীড়নের কথা সব বল্লে। সাহেব গোরার কথায় বিশ্বাস না ক'রে গোয়েন্দার রিপোর্টে তাকে জেলে দিলেন। দু'তিন মাস জেল খেটে গোরা খালাস হয়ে ঘরে ফিরে এল। একদিন তার মনে হল, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে; জেলের ভিতরে অনেক অনাচার ঘটেচে, অনেক প্রকার পাপ আমায় স্পর্শ করেচে; অতএব আমার একটা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক, নচেৎ আমি শুদ্ধ ও শুচি হ'তে পারুচিনে। গোরার ভক্তিপরায়ণ সঙ্ঘ তার এই প্রস্তাব শুনে উহার অনুমোদন করিল।

বাড়ী থেকে একটু দূরে এক প্রশস্ত মাঠে চাঁদোয়া বেঁধে সেই মত প্রায়শ্চিত্তের একটা ঘাট আয়োজন করা হইল। সব প্রস্তুত, এমন সময়ে সভাক্ষেত্রে সংবাদ আসিল,—তোমার পিতা রামদয়াল বাবুর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠচে। এই কথা শুনিবামাত্র গোরা তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এল, আর প্রায়শ্চিত্ত করা হ'ল না। মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখে রামদয়াল বাবু বলিলেন,—"গোরা! আমার নিদানকাল উপস্থিত; আমি এ সংসার ছেড়ে চল্লুম। এ পর্য্যন্ত আমি একটা কথা তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম, আজ সেই কথাটা তোমাকে ব'লে যাই। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার শ্রাদ্ধ করতে পারবে না; শ্রাদ্ধ করবার তোমার অধিকার নাই। তার কারণ তোমাকে বলি শোন—তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র নহ; তুমি একজন আয়র্লণ্ড-নিবাসী সৈনিক পুরুষের সন্তান। তোমার মাতা আমাদের গোয়ালঘরে তোমাকে প্রসব করে মারা যান। আমার স্ত্রী তোমাকে প্রতিপালন করেচেন। তুমি আমাদের পালিত পুত্র।" গোরা রামদয়াল বাবুর কথাগুলি সব শুনিল। শুনে কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হয়ে রইল। এই ঘটনার পরে গোরার মনের সংশয়-মেঘ কেটে গেল। গোরা এখন বুঝিল—এতদিনে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হলাম। ইতিপূর্ব্বে যে যে বিঘ্ন ছিল, সে সব বাধা-বিঘ্ন এখন দূর হ'ল। এইখানে আখ্যায়িকা শেষ হইল। কেমন, এটা নূতন ধরণের গল্প নয়? ইংরেজের ছেলে হিন্দু-পরিবারের মধ্যে থেকে হিন্দু হ'য়ে গেল।

হাঁ, নূতন বটে। তারপর গোরার কি হ'ল?

তারপর যে কি হ'ল, সে কথা রবিবাবু এ গ্রন্থে লেখেন নি। পরেশবাবু ব্রাহ্ম। সুচরিতা নামে তার এক পালিতা কন্যা ছিল। সুচরিতার সঙ্গে গোরার বিয়ে দিয়ে রবিবাবু গ্রন্থ শেষ করে ফেল্লেন।

গোরা কেমন করে ঘরকন্না করিল, সে কথা জানবার জন্য মনে ঔৎসুক্য হয়েছিল, কিন্তু সে কৌতূহল অতৃপ্ত রয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ।

তোরা সামান্য হীনবল হইয়া কোন সাহসে আমার সম্মুখীন হইয়াছিস্ ।

(তাপস-কুমার—৭৬ পৃষ্ঠা)

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৪

আমাদের বিলাসিতা

দিন দিন আমাদের জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, তথাপি আমাদের বিলাসিতা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। আমরা যে বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি! বাহ্য চাকচিক্য যে আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতীচ্যের 'ফ্যাসান' মোহে অন্ধ হইয়া আমরা প্রাচ্যের যা' কিছু সবই বর্ব্বরোচিত মনে করিতেছি। হায়! জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা কে আমাদের এই মোহান্ধকার ঘুচাইবে?

কোন্ বিষয়ে না আমরা বিলাসী হইয়াছি? কি আহার-বিহার, কি পোষাক-পরিচ্ছদ, কি পূজা-পার্ব্বণ, কি লোকলৌকিকতা, সকল বিষয়েই আমরা অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। মিহি কাপড় না হইলে আমাদের (কি স্ত্রী, কি পুরুষ) লজ্জা নিবারণ হয় না! আমরা মুখেই কেবল বলিতে শিখিয়াছি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!" কার্য্যতঃ, নিজের বেলায় একথার বিপরীত আচরণই করিয়া থাকি। আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। আমাদের motto—'আমরা যা' বলি তাই কর, আমরা যা' করি, তা' করিও না।' আমরা মুখে খুব দড়। বক্তৃতা দিবার সময় অপরকে বলি, 'দেশী কাপড় পর, বিদেশী বস্ত্র খরিদ করিও না, করিলে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠাগুলি টিকিবে কি করিয়া, ইত্যাদি আরও কত কি বলিয়া থাকি। কিন্তু সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে আমরা বিদেশী বস্ত্র কিনিতে ছাড়ি না! অধুনা এ দেশের নানাস্থানে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পাবনার উইভিং স্কুলে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জামার ছিট, গামছা ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে তাহার মূল্যও সুলভ। কিন্তু দেশের লোক তাহার যথোচিত আদর করিতেছে কি? সেগুলি নাকি এত কর্কশ যে তাহাতে আমাদের কোমল অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়! তাই আমরা তাহা পরিহার পূর্ব্বক বৈদেশিক স্ত্রী-জনোচিত পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে, কাপড়ের জামা পরিয়া দেহ আচ্ছাদন করি। সেদিন একজন বাঙ্গালী বাবুর গায়ে একটা পঞ্জাবি দেখিলাম উহার পৃষ্ঠদেশে বড় অক্ষরে লেখা আছে 'Manufactured in U. S. of America.' জামাটি এত পাতলা যে দূর হইতে বোধ হইতেছিল বাবুটী নগ্নগাত্র। নিকটে আসিলে ভ্রম দূর হইল। দেশীয় গামছাগুলির 'ছিলা' অনেকস্থলে তেমন 'ফ্যাসান'-যুক্ত নয়,

এই কারণে আমরা তৎপরিবর্ত্তে বিদেশী 'তোয়ালে' ব্যবহার করি। তবুও মুখে মুখে আমরা এক একজন মস্ত মস্ত 'স্বদেশভক্ত'।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের রকমারি পারিপাট্য ও বাহুল্য কত। সার্ট, কোট, ওয়েষ্ট কোট, গেঞ্জী, পঞ্জাবি, একটু বেশী সভ্য হইলে হ্যাট, কোট, প্যাণ্টালুন, নেকটাই, চাই। এই সমস্ত জামাজোড়া যেমন-তেমন ভাবে তৈয়ারি হইলে চলিবে না। ছাঁট ভাল হওয়া চাই এবং ময়লা হইতে না হইতে সেগুলি রজকালয়ে প্রেরণ, অতঃপর তাহার চরণে তৈল-সেক! বিলাতী ডসন, জ্যাকসন বা অন্য কোন নামজাদা মুচীর জুতা না হইলে আমাদের শ্রীচরণযুগলের অবমাননা হয়। দেশের মথুর, সুজন, গোবর্দ্ধন মুচীর ভাত নাই। (যদিও তাহারা উৎকৃষ্ট মজবুত জুতা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে) কারণ তাহারা তাহাদের প্রস্তুত জুতার অঙ্গে সোণালী কালীতে ছাপা বিজ্ঞাপন আঁটিয়া 'First quality' ইত্যাদি ছাপ মারিয়া কাগজের বাক্সে পুরিয়া, আলমারিতে রাখিয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক মাসিকপত্রাদিতে প্রাণ মন-হরণ-কারী ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে জানে না। আমরা চাকচিক্য ও 'ফ্যাসানের' এমনই দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন জিনিষের স্থায়িত্বের দিকে দৃক্‌পাত করি না। জিনিষটী চক্‌ চকে, ঝক্‌ ঝকে হইলেই হইল। আর কিছু দেখিবার যেন দরকার নাই। আমরা এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন জিনিষই আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যশোহরে অতি উৎকৃষ্ট অথচ মজবুত চিরুণী তৈয়ারি হইতেছে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ফেলিয়া দেশবাসী বৈদেশিক চিরুণী কিনিতে তৎপর। কারণ কি জানেন? ঐ 'ফ্যাসান।' যশোরে চিরুণী চারি বৎসর ব্যবহারে দেখা গিয়াছে—উহার একটী 'খিল'ও নষ্ট হয় না। কিন্তু জার্ম্মেণী ও জাপানী চিরুণী উহার তুলনায় কিছুই নয়, ছ'মাসেই নষ্ট হইয়া যায়, অথচ দাম দ্বিগুণ, ত্রিগুণ। মহিষ-শিঙ্গের একখানা দেশী খোঁপার চিরুণী এখনো দশ পয়সায় পাওয়া যায়; উহা খুব মজবুতও বটে। জার্ম্মণীর প্রস্তুত উক্ত চিরুণীর মূল্য এখন পাঁচ আনা। আমাদের মেয়েরা একটু 'ফ্যাসানের' লোভে ঘরের মজবুত সুলভ জিনিষ ফেলিয়া শেষোক্ত প্রকারের চিরুণীই ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশীয় চিরুণীগুলি অপেক্ষাকৃত কম মসৃণ ও চাকচিক্যবিহীন; তাই আধুনিক রুচিবিকার-গ্রস্তা বঙ্গরমণীদের পছন্দ হয় না। পছন্দ না হইবার আর একটী গৌণ কারণ তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন;—দেশীয় চিরুণীর উপর 'পতি পরম গুরু' এই কথাটী লেখা থাকে না। এটা একটা অছিলা মাত্র বলিয়া মনে হয়। আসল কারণ ঐ মসৃণতার অভাব। মেয়েদের স্থায়িত্বের দিকে মোটেই নজর নাই। যাহা হউক, দেশীয় চিরুণী নির্ম্মাতা-গণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখন হইতে তাঁহারা যেন মেয়েদের চিরুণীর উপর 'পতি পরম গুরু' এই কথাটা লিখিয়া দেন।

পূর্ব্বে যখন আমাদের জীবন সংগ্রাম এত কঠোর ভাব ধারণ করে নাই, তখন আমাদের দেশে রৌপ্যের গহনাই সমধিক প্রচলিত ছিল। তখন প্রধানতঃ রাজা-জমিদার-গৃহিণীরাই স্বর্ণালঙ্কার সমধিক ব্যবহার করিতেন। মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের বধূরা আজিকালিকার ন্যায় এত সোণা-দানা পরিতে পাইতেন না। সে কালে এক-পুরুষে গহনা প্রস্তুত করাইলে সাত-পুরুষে ব্যবহার করিত। এখন আর সে দিন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্য, পরিধেয় ও অপরাপর আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের বঙ্গরমণীদের বিলাসের মাত্রা কমিবে, না দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহিণীদের অসঙ্গত অলঙ্কার-প্রিয়তার কথা লিখিতে লজ্জা হয়। সর্ব্বদা স্বীয় স্বীয় বরাঙ্গ স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার একটা প্রবল প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। স্বামীর আয়-ব্যয়ের দিকে ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। স্বামী জীবন-সংগ্রামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কোথা হইতে ললনাগণের বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করিবেন, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা চিন্তা করা প্রয়োজন বোধ করেন না। গহনা দিতেই হইবে, নহিলে অন্ন-জল বন্ধ। মধ্যবিত্ত 'পতিদেবতাকে' এ আব্দার রক্ষার জন্য ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হয় না কি?

কষ্টে-সৃষ্টে একবার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াই হতভাগ্য স্বামিগণের নিস্তার নাই। সম্প্রতি আবার এক নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। নিত্য নূতন ধরণ বা 'ফ্যাসান' বাহির হইতেছে, কাল স্যাকরার দোকান হইতে যে 'নূতন ফ্যাসানের' গহনা প্রস্তুত করান হইয়াছে, আজ তাহা 'পুরাতন ফ্যাসান' হইয়া গিয়াছে। আজ পুনরায় সে সকল গহনা ভাঙ্গিয়া 'নূতন ফ্যাসান' অনুযায়ী অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত স্যাকরার বাড়ী দৌড়াইতে হইবে। নতুবা পরিত্রাণ নাই। কলিকাতা এই 'ফ্যাসানের' রাজধানী। মফঃস্বলের অধি-বাসিগণ লাভ-ক্ষতি বিচার না করিয়া কলি-কাতার অন্ধ অনুকরণে দিন দিন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে এবং অপর দশজন নিরীহ গরীব বেচারাকে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পথ প্রদর্শন করি-তেছে। আর ফ্যাসানের এমনতর বাড়াবাড়ি বা দৌরাত্ম্যের জ্বালায় গরীবের পক্ষে 'মনোদুঃখে বন গমন ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ৮০০।১০০০৲ টাকার স্বর্ণালঙ্কার যৌতুক স্বরূপ দিতে না পারিলে এ উৎকট সভ্যতার যুগে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পান না। নিম্নশ্রেণীর নিতান্ত দরিদ্রের পক্ষে অন্ততঃ কুড়ি ভরি সোণার গহনা ব্যতীত একটী কন্যা 'পার' করা দুষ্কর। এখন সহরের পান-বিড়িওয়ালীর কাণেও সোণার দুল, গলায় নেক্‌লেস, হাতে অনন্ত ও বালা, সোণার চুড়ী ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। আরও মজার কথা, এক শ্রেণীর ধনি-নন্দনগণের মধ্যে এই রমণীসুলভ স্বর্ণা-ভরণ ব্যবহারের প্রবৃত্তি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

শ্রীরাধাচরণ দাস।

চিন্তা।

হে চিন্তা! হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
দেবী তুমি, পুনঃ কিন্তু তুমিই দানবী॥
তুমিই নন্দন-বন,
তুমি প্রেম-প্রস্রবণ,
তুমিই মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী।
আবার তুমিই সেই অশান্তিরূপিনী॥
তুমি স্বরগের রথ,
তুমিই মুক্তির পথ,
তুমি হৃদি-মরুভূমে শান্তি-প্রস্রবণ।
আবার তুমিই সেই অশান্তি-অনল॥
তুমি ভয়ঙ্করী 'চিন্তা',
তব কাছে তুচ্ছ চিতা,
পলে পলে দহে নাক তোমার মতন।
ভস্ম করে মুহূর্ত্তেকে চিতার অনল॥
তুমি শান্তিময়ী দেবী,
'চিন্তা', কে বলে দানবী?
সত্য, তুমি পাপ-চিত্তে অশান্তিরূপিণী।
কিন্তু, সাধু-চিত্তে দেবী, শান্তি-প্রদায়িনী॥
শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কাব্যনিধি।

কুটিল সরল।

(সংস্কৃত হইতে)

কুটিল সরলে জমাটি পিরীতি
বাঁধে কভু তাই কি রে।
যুগল মিলন হয় কি কখনো
বাঁকা ধনুকে ও তীরে?
শ্রীমনীষীমোহন রায়।

আহেরিয়া।

আহেরিয়াগণ শিকারী ও তস্কর। মধ্য-দোয়াবে ইহাদিগের বাসস্থান। সার, এইচ, এম, ইলিয়ট (Sir H. M. Elliot) বলেন যে, ইহারা ধানুক জাতির এক শাখা মাত্র। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহারা ধানুকদিগের ন্যায় মৃত জীবদেহ ভক্ষণ করে না। গোরক্ষপুরে আহেরিয়া নামে এক জাতি বাস করে; তাহারা কহে যে, তাহারা ধানুকবংশীয়। পঞ্জাবের আহেরী জাতি অনেকটা আহেরিয়া জাতির ন্যায়। তাহারা কহে যে, তাহাদিগের আদি বাসস্থান রাজপুতনা। যোধপুর ও বিকানীর মরুস্থলে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিত। ইহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। যে কোন গ্রামে কার্য্য পাইতে পারে—এইরূপ স্থানে বাস করে না। ইহারা সকল প্রকার বন্য পশু ধৃত ও ভক্ষণ করে। নলখাগড়া ও ঘাসের দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। কেহ কেহ শস্য-ক্ষেত্রে কার্য্য করে এবং ফসল কাটিবার সময়ে কার্য্য করিবার জন্য অনেকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে কাষ্ঠ ছেদন, ঘাস বিক্রয়, রাস্তা বাঁধার কার্য্য ও মাটী কাটার কার্য্য করিয়া থাকে। মিষ্টার ফেগান (Mr. Fagan) বলেন যে, হিসার জেলায় ইহারা ঝুড়ি ও কুলা প্রস্তুত ও পসমের কার্য্য করে। ফেগান সাহেবের মতে, যোধপুরীয়াগণ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি; সম্ভবতঃ ইহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল। অন্ত

আহেরিয়াগণ নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যোধপুরীয়াগণের সহিত ইহাদিগের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আহেরিয়াগণ ভীল বা আহেলিয়া হইবে। আহেলিয়াগণও শিকারী এবং পক্ষী ধৃত করিয়া থাকে।

আলিগড়ের আহেরিয়াগণ কহে যে, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প হওয়ায় তাহারা অন্য জাতীয় স্ত্রীলোক আনয়নপূর্ব্বক আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা এই প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছে। ক্রুক সাহেব (Mr W. Crooke B. A. BSc) বলেন যে,ইহা হইতে এইরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদিগের মধ্যে শিশু-কন্যা হত্যা প্রচলিত ছিল। (১) ইহাদিগের প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত, দুস্থ ও অসন্তুষ্ট। আলিগড়ে ইহাদিগের নাম আহেরিয়া, ভীল ও বাধরোল। আহেরিয়াগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার অবতারণা করে:—

"রাজা প্রিয়ব্রত ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। সূর্য্য-কিরণে কেবল পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আলোকিত হয় বলিয়া রাজা প্রিয়ব্রত অসন্তুষ্ট হন এবং স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। নিশাকে দিবায় পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন কিন্তু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আপন অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। তাঁহার রথচক্রের চিহ্ন হইতে সপ্ত সাগর ও সপ্ত মহাদেশ উৎপন্ন হইয়াছে। (২)

ঐ সৌর বীরের পুত্র (নাম অজ্ঞাত) মৃগয়ার নিমিত্ত চিত্রকূট (বান্দা জেলায়) পর্ব্বতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। এই হেতু তিনি 'আহেরিয়া' বা শিকারী নাম প্রাপ্ত হন। এই মৃগয়া ব্যসনাসক্ত বীর পুরুষ আহেরিয়াগণের পূর্ব্ব পুরুষ। আহেরিয়াগণ চিত্রকূট হইতে অযোধ্যায় আগমন করে। অযোধ্যার অবনতি হইলে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রায় সাত শত বৎসর গত হইল আহেরিয়াগণ কাণপুর হইতে আলিগড় আইসে। এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রবাদে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সময় সময় চিত্রকূট ও অযোধ্যায় তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে।

পঞ্চায়েৎ।—নির্ব্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তিবর্গ লইয়া ইহাদিগের পঞ্চায়েৎ বা জাতীয় সভা। পঞ্চায়েৎ জাতীয় সকল বিষয়ে মীমাংসা করে। পঞ্চায়েতের প্রধানগণ ব্যক্তিগত নহে—বংশগত। যদি কর্ত্তার (মীর প.) মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র নাবালক থাকে তাহা হইলে যতদিন সে নাবালক না থা[কে] ততদিন পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি সাধারণের প্রতি-

(১) The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh Vol. I.

(২) তিনি অন্ধকার দূর করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রথচক্রের দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন; তিনি সিন্ধুগর্ভে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংস্থান করিয়াছেন।

[শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়]

নিধি স্বরূপ 'শীর পঞ্চে'র কার্য্য করে। কর্ত্তার নাম 'সরপঞ্চ' (শীর পঞ্চ ?)। যদি নূতন 'সরপঞ্চ' অকর্ম্মণ্য হয় তবে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার পদে অপর একজন 'সরপঞ্চ' নিযুক্ত করে। 'সরপঞ্চ' পদের জন্য অনেকে উমেদার হয় বটে কিন্তু যাহার পক্ষে অধিক লোকের মত থাকে সেই 'সরপঞ্চ' মনোনীত হয়।

বিবাহ।—যে পরিবার হইতে একবার কোন বধূ আসিয়াছে, সে পরিবারে বিবাহ করিবে না। তবে যদি এই ঘটনা স্মরণাতীত হয়, তবে বিবাহ হইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে বিবাহ বন্ধ হয় না, তবে মুসলমান বা খৃষ্টান না হইলেই হইল। এক এক জনের চারি পত্নী পর্য্যন্ত দেখা যায়। এক সঙ্গে দুই ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে। বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহের পর বর-কন্যাকে পুষ্করিণী-তীরে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় বধূ, বরকে বাংলার কোমল পল্লব দ্বারা আঘাত করে। তৎপরে বর ও বধূ গৃহে আগমন করে। বরের আত্মীয় স্বজনেরা বধূকে উপহার প্রদান করে; ইহার নাম 'মুখ দেখাই'। প্রথমা পত্নী গৃহকর্ত্রী ও অপর পত্নীগণ কর্ত্রীর আদেশানুবর্ত্তিনী। সকল পত্নীর মধ্যে বেশ সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সপত্নীর প্রতি দ্বেষ বা ঈর্ষার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। কদাচ পত্নীগণের স্বতন্ত্র গৃহ থাকে। বিবাহের বয়স ৭ হইতে ২০ বৎসর। বর বা কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণের ইচ্ছানুসারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু পঞ্চায়েতের সম্মতি চাই। ব্রাহ্মণ ও নাপিতের সহায়তায় আত্মীয় দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। বর-কন্যা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে উভয়ের অভিপ্রায় বিবেচিত হইয়া থাকে কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাত্র বা পাত্রীসম্বন্ধে তাহাদিগের অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়া থাকে। বিবাহে রীতিমত কন্যাপণ নাই। কন্যার পিতা অক্ষম হইলে বরের আত্মীয়গণ কন্যাকর্ত্তাকে বিবাহ-ভোজে সাহায্য করিয়া থাকে। অনাথা কন্যার পিতা বিবাহে বরকে যৌতুক প্রদান করে। ইহার নাম 'জাহেজ'। এই যৌতুকের অধিকারী সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই; তবে 'মুখদেখাই' বধূর নিজস্ব। বিবাহের পর বুদ্ধিহীনতা, অক্ষমতা ও কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পাইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার বেশ কারণ উপস্থিত হয়, নতুবা শারীরিক কোন দোষ (অঙ্গহীনতা) বিবাহের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও সম্বন্ধ ভঙ্গ হয় না। পঞ্চায়তের নিকট রমণীর ব্যভিচার-দোষ প্রমাণিত হইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী 'করাত' প্রথায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম আছে বটে কিন্তু একবার পরিত্যক্তা নারী কদাচ জাতি-মধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সক্ষম হয়। যে শিশুর পিতা কিম্বা মাতা অন্য জাতীয়, তাহাকে 'লেণ্ডু' কহে। এই শিশু জাতীয় শিশুর ন্যায় সমাজে কোন অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

বিধবা-বিবাহ।—কোন ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এক সুট বস্ত্র, এক সেট চুড়ী ও এক

জোড়া আঙ্গুঠা (বিছুয়া) প্রদান করিবে। পঞ্চায়েৎ বিধবাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এ বিবাহে তাহার সম্মতি আছে কিনা? বিধবা আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ব্রাহ্মণ শুভদিন দেখিয়া দেন এবং নব-পতি বিধবাকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া আপন গৃহে লইয়া যায়। পরে জ্ঞাতিগণকে একটি 'ভোজ' দেয়। এই প্রকার বিবাহের নাম 'করাত' বা 'ধরেজা'। এই বিবাহে শোভাযাত্রা (বরাত) বা অগ্নি প্রদক্ষিণ (ভঁওরা) নাই। যদি স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দেবর) অবিবাহিত থাকে ও বিবাহোপলক্ষে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করে অন্যথা বিধবা পুরুষান্তরের সহিত বিবাহিত হয়। বিধবা অপর পুরুষকে বিবাহ করিলে মৃত স্বামীর বিষয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণের অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত হয়।

জন্ম।—গর্ভ হইয়াছে জানিতে পারিলে জাতীয় লোকসকল একত্রিত হয়। গুড়ের সহিত গম ও ছোলা পাক করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। গর্ভিনী পদদ্বয় গঙ্গার অভিমুখে রাখিয়া প্রসব করে। মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ধাত্রী নিযুক্তা হয়। প্রসবের পর নাপিতপত্নী প্রসূতির সেবা করে। সন্তান প্রসূত হইলে বন্ধুগণের মধ্যে গুড় বিতরিত হয়। রমণীগণ থালা (থালি) বাজাইয়া গান করে। ছয় দিনে ষষ্ঠীর (ছঠী) পূজা হয় এবং অগ্নিতে ধূনা ও ২।১ টুকরা রুটী নিক্ষেপ করিয়া 'ছঠীর' সম্মান রক্ষা করে। দ্বাদশ দিনে মাতা স্নান করে। ব্রাহ্মণ অঙ্গনে আটা (গোধূম চূর্ণ) চতুষ্কোণাকৃতি (চৌক) স্থান অঙ্কিত করেন, প্রসূতি তাহার উপর উপবেশন করে। তৎপরে ব্রাহ্মণ সন্তানের 'নামকরণ' করেন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ জল-সিঞ্চন করিয়া অশৌচান্ত করেন। জাতীয় ভোজ হয়; নারীগণ নৃত্য করে এবং গান গায়। ইহার নাম 'দস্তাউন'। যদি শিশু মূলা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে 'দস্তাউন' ১৯ কিম্বা ২১ দিনে সম্পন্ন হয়। ২১টী গাছের পাতা (আম, জাম, নেবু, নিম ইত্যাদি) সংগ্রহ করিয়া ২১ কূপ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক এবং ২১ খানি গ্রাম হইতে চূণা পাথর (ঘুটিম) লইয়া আনিয়া একটি জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলস পূর্ণ করে; সেই কলসস্থ জলে মাতা স্নান করে। শস্য ও দক্ষিণা ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। যদি যমজ সন্তান জন্মে, তাহা হইলে 'দস্তাউন' দিনে পিতা ও মাতা উভয়কেই পূর্ব্বোক্ত 'চৌকে' বসাইয়া ব্রাহ্মণ সূত্র দ্বারা উভয়ের হস্তে রক্ষাবন্ধন (রাখী) করিয়া দেন; ইহাদ্বারা দুর্ভাগ্য নিবারিত হয়।

দত্তকপুত্র-গ্রহণ।—পণ্ডিত ভাল দিন দেখিয়া দিলে পুত্রের জনক দত্তক-গ্রহীতাকে পুত্র প্রদান করে। দত্তক-গ্রাহক বালককে নব-বস্ত্র পরিধান করাইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দেয়। তৎপরে জাতীয় ভোজ হয়। নিয়মানুসারে বালকের বয়স দশ বৎসরের অনধিক হইবে।

বিবাহ-সংস্কার।—বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বরকন্যার পাত্রীর আলয় হইতে পান

আময়নপূর্ব্বক পাত্রকে খাইতে দেয়; পাত্র পান খাইলে সম্বন্ধ দৃঢ় (পাকা) হইল বুঝিতে হইবে। তৎপরে লগ্ন—পাত্রীর পিতা কিছু নগদ টাকা, কাপড়, একটি নারিকেল, মিষ্টান্ন ও বিবাহের দিন স্থির করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করে; পত্রমধ্যে কিছু 'দুব' (দূর্ব্বা) থাকে। পাত্র অঙ্গনস্থ পবিত্র চৌকে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য পাত্রকে প্রদান করেন; এদিকে রমণীগণ ঢোলক বাজাইয়া গীত গাহিতে আরম্ভ করে। গীত ও বাদ্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হয়। ইহার নাম 'রাত জাগ্না'। পরে 'উব্টান' অর্থাৎ পাত্র ও পাত্রীকে হরিদ্রা মাখান হইয়া থাকে। এই সময়, পাছে 'নজর' লাগে বা উপদেবতার দৃষ্টি সঞ্চার হয়, এই জন্য পাত্র ও পাত্রীকে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিতে দেওয়া হয় না। লগনের (লগ্নের') দিন ধার্য্য হইলে পাত্রীর কোন আত্মীয় অথবা পুরোহিত অঙ্গনের মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া তাহাতে আমের পাতা, হলুদ ও দুইটি পয়সা বাঁধিয়া দেয়। পুরোহিতকে টাকা, কাপড় ও কিছু আহার প্রদত্ত হয়। ইহার নাম 'মেণ'। তৎপরে 'মারহোয়া' অর্থাৎ আত্মীয় ও স্বজনদিগকে খাদ্য প্রদান; এই খাদ্য ঘৃতসংস্পর্শযুক্ত। বরের পোষাক হরিদ্রা রঙের অঙ্গরক্ষা ও মস্তকে মুকুট (মউর)। এই মুকুট বা 'মউর' খেজুর পাতায় নির্ম্মিত। বরযাত্রগণ বর লইয়া পাত্রীর গ্রামে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে আবাহন করিয়া একখানি খড়ের ঘরে বসিতে দেওয়া হয়। এই ঘরের নাম 'জনবাস'। এই প্রদেশের সকল গ্রামেই এইরূপ এক এক খানি গৃহ থাকে। গ্রামের যে কোন লোকের বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে বা 'গাওনা' উপলক্ষে বর আসিলে এই গৃহেই প্রথমে অভ্যর্থিত হয়। বরকর্ত্তা কোন আত্মীয়ের দ্বারা (মান) কন্যার নিকট সরবৎ প্রেরণ করে এবং তৎপরিবর্ত্তে পাত্রার বাটী হইতে খাদ্য সামগ্রী আসিয়া থাকে। এই প্রথার নাম 'রারৌনিয়া'। তৎপরে বর বধূর বাটীতে আগমন করিলে বর-বধূ উভয়ে মিলিত হইয়া সাতবার অঙ্গনস্থ পবিত্র অগ্নি প্রদক্ষিণ করে। অনন্তর কন্যাদান। বর ও বধূকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক উভয়কে এক সঙ্গে ভাত ও মিষ্টান্ন খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ একত্র ভোজনের নাম 'সহকউর'। একখানি খিনামা বস্ত্রাবৃত করিয়া রক্ষা করে এবং সমবেত রমণীগণ, স্থানীয় দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বরকে অনুরোধ করে; বর তাহাদের কথামত বস্ত্রাবৃত পাদুকাকে পূজা করিলে নারীগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে এবং অতিশয় অপ্রতিভ হয়। বর-কন্যা বস্ত্র-গ্রন্থী ও বরের শীরোভূষণ মোচন করিলে বর 'জনবাসে' প্রত্যাগমন করে। বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত হয় না; কেবল অঙ্গনে অগ্নি জালিয়া বর-বধূকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে। কন্যাকে চুরি করিয়া বা প্রতারণা করিয়া অথবা প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া আসিয়া বিবাহ করার নাম 'ঢোলা' প্রথা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সন্ততিপরা লোকে মৃত-দেহ দাহ করে; দরিদ্রগণ মৃত্তে সমাহিত, নচুবা

নদী-স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। প্রেতাত্মা ফিরিয়া আসিবার ভয়ে শব প্রোথিত করিবার সময় শবের সম্মুখভাগ ভূমির উপর এবং পশ্চাদ্ভাগ উপরিভাগে রাখে। শবের পদদ্বয় উত্তর দিকে থাকে। কেহ কেহ অনাবৃত শব সমাহিত করিয়া থাকে। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই রীতি, কিন্তু অনেক শবের চিতাভস্ম চিতাতেই পড়িয়া থাকে। শবদাহের অগ্নি মেথরে লইয়া আইসে; তজ্জন্য মেথর শবদাহের বাঁশ ও কিছু পয়সা প্রাপ্ত হয়। সৎকার শেষ হইলে দাহকারিগণ স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে কুশ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে পথে শব বাহিত হইয়াছিল, সেই পথে নিক্ষেপ করে। তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড চিতাভিমুখে নিক্ষেপ করে। ইহার কারণ এই যে, মৃতের সহিত প্রণয় এই স্থানেই শেষ হইল ('ছুট যাওই')। তৃতীয় কিম্বা সপ্তম দিবসে মুখাগ্নিপ্রদানকারী ক্ষৌর-কর্ম্ম সমাধা করিয়া একটি বড় পিণ্ড (টিকিয়া) পলাশ (ঢাক) পত্রে স্থাপন করিয়া প্রেতাত্মার আহারের নিমিত্ত যবের ক্ষেত্রে রাখিয়া দেয়। ত্রয়োদশ দিনে জ্ঞাতি-ভোজ হয়। ১৩টা সুপারী ও ১৩টা পয়সা ১৩টা পাত্রে রাখিয়া তৎসহ কিয়ৎপরিমাণে শস্য দিয়া ১৩ জন ব্রাহ্মণকে প্রদান করে। তৎপরে হোম হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত শ্রাদ্ধ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পিতৃপক্ষের পঞ্চদশ দিবস তর্পণ করিয়া থাকে। বায়সকে প্রেতের আত্মা জানে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে।

অশৌচ।—মৃতাশৌচ ১৩ দিন, জন্মাশৌচ ১০ দিন এবং রমণীগণ ঋতুমতী হইলে ৩ দিন অশৌচ হয়। পূর্ব্ব দুই অশৌচে রীতি-মত শুদ্ধ হইতে হয়। রজঃস্বলাশৌচে বস্ত্রাদি ধৌত ও মস্তকের কেশ মার্জ্জিত করিয়া শুদ্ধ হয়।

ধর্ম্ম।—দেবী বিশেষ উপাস্য। মৈষাসুর (মহিষাসুর?) জাতীয় দেবতা। মৈষাসুর সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। মৈষাসুরের মন্দির আৎরৌলী তহশিলের গাঙ্গেরী গ্রামে আছে। বৈশাখ মাসের অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মিষ্টান্ন ও কখনও কখনও ছাগ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। একজন আহীর পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। জাহির পীর বিখ্যাত "গোগা"। পূজার দিন, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথি। পূজার উপকরণ—বস্ত্র, লবঙ্গ, ঘৃত ও কিঞ্চিৎ নগদ। এক জন মুসলমান খাদিম এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে। মুরদাবাদ জেলার আমরোহায় ফকির মিঞা সাহেবের পূজার জন্য পাঁচটি পয়সা, লবঙ্গ, ধূনা ও রুটি লইয়া গমন করে। মিঞা সাহেবের কবরস্থ ফকিরগণ (মুজাউইর) ঐ সকল পূজার উপহার গ্রহণ করে। ছাগ বলি দিয়া আপনারাই তাহার মাংস ভক্ষণ করে। ইহার নাম 'কন্দোরি'। যখিরার চতুষ্কোণ বেদী ইগ্লাস তহশিলের কারাস নামক গ্রামে এক মেথরের দ্বারদেশে অবস্থিত। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে পূজা প্রদত্ত হয়। এই পূজায় দুইটি পয়সা, কতক-গুলি পান ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদান করে এবং মেথর এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে। কখনও

কখনও শূকর বলি দিয়া তাহার রক্ত লইয়া মেথর বালক বালিকাগণের ললাটে লাগাইয়া দেয়। ইহার দ্বারা সন্তান দুষ্ট প্রেতাত্মা হইতে নিরাপদ হয়। বারাই সাধারণ গ্রাম্য দেবতা। ইহার কোন মূর্ত্তি নাই; কেবল কয়েকখানা প্রস্তর গাছতলায় পড়িয়া আছে। ইহার পাণ্ডা ব্রাহ্মণ। পূজায় ছক্কা (ছয় কৌড়ি), কতকগুলি পান ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইলে পাণ্ডা গ্রহণ করে। এই দেবতা স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তানগণকে রক্ষা করেন। আশ্বিন ও চৈত্র মাসের শুক্ল সপ্তমীতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। "চামারে"র স্থান বৃক্ষমূলে। প্রতি মাসের প্রথম সোমবারে রুটি দিয়া পূজা করে। এবং বিপদে আপদে মেষবলি প্রদান করিয়া থাকে। পূজাদাতাগণ বলি প্রদত্ত মাংসে আপনাদিগের উদর পূর্ণ করে। পশুগণের মধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে কিংবা গাভী দুগ্ধ প্রদান না করিলে সেই স্থানের উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। মাতা (বসন্ত রোগের দেবী) ও মশানী (শ্মশান-দেবী) বৃক্ষমূলে কতকগুলি প্রস্তর সংগ্রহ মাত্র। বারাই দেবীর ন্যায় বালক বালিকার হিতের জন্য স্ত্রীলোকগণ ইহার পূজা প্রদান করে। একজন ব্রাহ্মণ পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বুঢ়া বাবার স্থান, খৈইর তহশিলের চন্দোসি নামক স্থানে। বৈশাখ মাসের সিতপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে বস্ত্র, পান ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা প্রদান করে। এক জন ব্রাহ্মণ ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হন। শা জামাল পাঁচপীরের অন্যতম। আলিগড় সহরের নিকট ইহার স্থান। এই স্থানে প্রদত্ত দ্রব্যাদি এক জন মুসলমান ফকির লাভ করে।

বাল্মিকী।—আহেরিয়াগণ কহে যে, বাল্মিকী এক জন বিখ্যাত শিকারী ও দস্যু ছিলেন। তিনি অনেক জীব-হত্যা করিয়াছিলেন। একদা অরণ্যে নারদ মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বভাবানুসারে ধনুকে তীর যোজনা পূর্ব্বক ঋষির প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইলে, নারদ তাঁহাকে কহিলেন যে, তিনি কি জ্ঞাত আছেন যে, তিনি কি মহাপাপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যাহা হউক, তাঁহার প্রতি নারদ ঋষির দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাঁহাকে 'রামা, রামা' উচ্চারণ করিতে কহিলেন। তিনি বহুকাল 'রামা, রামা' উচ্চারণের পরিবর্ত্তে 'মারা, মারা' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নারদের কৃপায় ভক্তির উদয় হইলে কৃতকার্য্য হন। ইনি অবশেষে মহাজ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হন। এই বাল্মিকী আহেরিয়াগণের রক্ষাকর্ত্তা যোগী।

আহেরিয়াগণের আলয়ে একটী পৃথক গৃহে মৈষাসুরের পূজা হয়। এই পূজায় কেবল বিবাহিতা রমণীগণের অধিকার। কুমারী বা 'করাও' প্রথায় বিবাহিতা নারীগণ এই অধিকারে বঞ্চিতা। পরিবারস্থ লোকেই পূজা করে, পূজার জন্য পুরোহিত আহূত হন না।

মিঞা সাহেব ও বখিয়ার সম্মুখে বলির পশুর প্রাণ হনন করা হয় না, কেবলমাত্র পশুর কর্ণমাত্র কর্ত্তন করিয়া পশুকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্য দেবতার পূজায় পশু-বলি দিয়া

সেই পশু-মাংস আপনারাই ভক্ষণ করে। অন্যান্য পর্ব্ব হিন্দুদিগের ন্যায়। শকট চৌথ পর্ব্বে চাউল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা এক নরাকৃতি পুত্তলিকা প্রস্তুত করে এবং নিশাকালে সেই পুত্তলিকাকে কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করে। ক্রুক সাহেব বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, ইহারা পূর্ব্বে নরবলি প্রদান করিত। (১) আহেরিয়াগণ অশ্বত্থ বৃক্ষকে ভক্তি করে ও আমলকী বৃক্ষকে পূজা করে। ফাল্গুন মাসের শুক্ল একাদশীতে আমলকী বৃক্ষের পূজা হয়; স্ত্রীলোকেরা দিবা দ্বিপ্রহরে আটখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুরী (আটার লুচী) ও একটু জল দিয়া বৃক্ষকে নমস্কার করে। নাগপঞ্চমীতে গৃহ-ভিত্তিতে সর্প অঙ্কিত করিয়া তদুপরি দুগ্ধ ঢালিয়া দেয় এবং পুরুষেরা জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া সর্প-বিবর অনুসন্ধান করে; দৃষ্টিপথে পতিত হইলে সেই বিবর মধ্যে দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়।

উল্কী।—ইহাদিগের সাধারণ উল্কীর নাম 'সীতা কি রসুই' (সীতাদেবীর রন্ধন গৃহ) অদ্যাবধি চিত্রকূট পর্ব্বতে এই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

শপথ।—গঙ্গার নামে শপথ করে। যদি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা অশ্বত্থ-পত্র হস্তে লইয়া শপথ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য অথবা কদাচ শপথের অন্যথা করিবে না।

(১) The Tribes and Castes N. W. P. & Oudh Vol I.

ইহারা অন্য জাতির সহিত পান ও ভোজন করে না। কচ্চি (দাল ভাত ও রুটী) আহারীয় দ্রব্য; বারহাই (সূত্রধর), জাঠ, কাহারের হস্তে খাইবে না; পাক্কী (লুচি, মিঠাই ইত্যাদি) নাই (নাপিত) প্রস্তুত করিয়া দিলে অনায়াসে ভক্ষণ করিবে কিন্তু সজাতীয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলে ভোজন করিবে না।

ইহারা মুষাহরদিগের ন্যায় 'পাতল' পলাশ-পাতা জুড়িয়া পদ্ম-পত্রের ন্যায় গোলাকৃতি করে ও ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে এবং পলাশ বৃক্ষের নির্য্যাস ও মধু সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করে। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান কার্য্য দস্যুবৃত্তি। দস্যুবৃত্তিতে ইহারা সবিশেষ পরিপক্ব।

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

ভবিতব্যের জয়।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

প্রভা হরিহর বাবুর বড় আদরের কন্যা। একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর অনেকদিন আর কোন সন্তানাদি না হইয়া প্রভার জন্ম হইল। পুত্রের জন্মের বহুদিন পরে কন্যামুখ দেখিয়া সপত্নী হরিহর বাবু বড়ই আনন্দিত হইলেন; কন্যা সুন্দরী হওয়ায় তিনি আদর করিয়া নাম রাখিলেন—"প্রভা।" কন্যাকে এত ভালবাসিবার আর একটি কারণ ছিল। হরিহর বাবু একটি সদাগরী আফিসে কুড়িটী টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু প্রভা ভূমিষ্ঠ হইবার পর

হইতে বেতন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইয়া এখন চল্লিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পিতা মাতার ধারণা কন্যার পয়ে তাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। সে জন্য তাঁহারা প্রভাকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রভাও বড় গুণবতী ছিল। অল্প বয়সেই সংসারের কার্য্য সে অনেক শিখিয়াছিল, তা' ছাড়া মাতার নিকট হইতে সূচের ও বুননের কার্য্যও অনেক আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাতেই সে ক্ষান্ত হয় নাই। লেখাপড়ায় তার যথেষ্ট অনুরাগ থাকায় হরিহর বাবু আফিস হইতে আসিয়া যখন পুত্রকে পড়াইতে বসিতেন, প্রভাও তখন আপন পুস্তক লইয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। এইরূপে বালিকা একে একে অনেকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে সর্ব্বগুণে গুণবতী হইতে দেখিয়া পিতামাতার আনন্দের আর সীমা ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাবিতেন—"এরূপ গুণবতী কন্যার বিবাহে তাঁহাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। যে কেহ কন্যার গুণের কথা শুনিবে সেই আদর করিয়া তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবে।" সরল স্বভাব সংসারানভিজ্ঞ দম্পতি একথা একবারও চিন্তা করেন নাই যে, এই হৃদয়হীনের দেশে, এই পুত্র-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতার বাজারে গুণের আদর নাই, রূপেরও যে বড় আদর আছে—তাহাও নয়, আদর কেবল অর্থের। যে যত অধিক অর্থ ঢালিতে পারিবে, তাহার কন্যা তত অধিক রূপসী ও গুণবতী প্রতিপন্ন হইবে, হইলেই বা সে কুরূপা ও নিরক্ষরা। অর্থে যখন জাতি হয় তখন রূপ গুণ হইবে এ আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক প্রভার জনক-জননী কিন্তু সে কথা একবারও চিন্তা করেন নাই; তাঁহারা কন্যার ভবিষ্যৎ কাল্পনিক সুখেই বিভোর হইয়াছিলেন, তাহার বিবাহের জন্য এ কাল পর্য্যন্ত কিছুই সঞ্চয় করেন নাই।

সময় কা'রও হাত ধরা নয়। যতই দিন যাইতে লাগিল, প্রভার বয়সও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার প্রতিবেসিনী সঙ্গিনীগণের একে একে বিবাহ হইয়া গেল, বাকী কেবল সে। হরিহর বাবুর ইচ্ছা কন্যাকে একটি সৎপাত্রে অর্পণ করেন; কোন্ পিতা-মাতারই বা সেরূপ ইচ্ছা না হয়? কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পাত্র আজকাল পাওয়া দুরূহ। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেরূপ একটি পাত্রও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ধনী হয় ত বিদ্যাহীন—বর্ণবোধশূন্য, বিদ্বান হয় ত বাস-ভবন পর্য্যন্ত নাই; আর যদি উভয়েরই সমাবেশ থাকে, তবে সে পাত্রের দাম ঢের, অন্ততঃ চারি সহস্র টাকার ন্যূন নহে। এতদিনে হরিহর বাবুর চক্ষু ফুটিল, বুঝিলেন তিনি মনোমধ্যে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছিলেন, কেবল লেখাপড়া, বুনন বা গৃহ-কার্য্যে এদেশে কন্যার বিবাহ হয় না, রুধিরহীন বাঙ্গালীর ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, প্রচুর রুধির ঢালিয়া দিতে হইবে। হরিহর বাবু মনে মনে বঙ্গ-সমাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

গালিই দিন আর যাহাই করুন, কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আর বিবাহ না দিলে চলে না। হরিহর বাবু ও

তাঁহার পত্নী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল। একদিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন,—"দেখ, আর ভেবে কি হবে, রতনপুরের ছেলেটীর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে ফেল; যা বরাতে আছে হবে।" হরিহর বাবু একথায় কোন উত্তর দিলেন না। গৃহিণী আবার বলিলেন,—"কথা কইছ না যে? তার চেয়ে কমে আর কোথায় পাবে, দেখা ত ঢের হয়েছে? আগে ত একথা ভাবনি, যা উপায় ক'রেছ, সবই খরচ ক'রেছ, সুতরাং এখন তার ফলভোগ ক'রতেই হবে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিহর বাবু বলিলেন,—"ফলভোগ করিতে হয় আমাদেরই করা উচিত, কন্যা ত সে দোষের জন্য দায়ী নয়। একটা মেয়ে, জেনে শুনে একটা বিশ্ববখাট ছেলের হাতে দিই কি ব'লে? মেয়ে ত আজীবন জ্বলবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও জ্বলে পুড়ে খাক্ হতে হবে। শোন গিন্নি! আমি যে মতলব ঠাউরেছি। তোমায় সাহস ক'রে এতদিন বল্‌তে পারিনি, কিন্তু আর না বল্‌লে চলে না। মেয়ে ত ডাগর হ'য়ে উঠেছে, আমি বলি কি—এদিকে যখন এত চেষ্টাতেও পাত্র মিল্‌লো না—এইবার বরং একটা ভাল দেখে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র সন্ধান করা যাক্, ইতিমধ্যে কোথাও জুটে উঠে ভালই।"

গৃহিণী। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র কি খারাপ হয় না?

হরিহর। হয় না একথা ব'ল্‌তে পারি না, তবে খুব কমের ভাগ। কারণ যে একবার সংসারে ঢুকেছে সে তার হাড়হদ্দ বুঝে নিয়েছে; তাকে আর বড় একটা পথ ভুল্‌তে হয় না।

গৃহিণী। তুমি যা ভাল বুঝ কর; আমি মেয়ে মানুষ অতশত বুঝি না। তবে আমার সাধ—যেমন একটা মেয়ে—একটি ছেলে মানুষ জামাই হয়—দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল পাঁচজনের সাম্‌নে দাঁড় করান যায়, তবেই সুখ। তা' বিধাতার ভবিতব্য—যা বরাতে আছে হবে।" এই বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। হরিহর বাবুও কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

(২)

আরও ছয় মাস গত হইল; হরিহর বাবু এ সময়ের মধ্যেও কন্যার বিবাহের জন্য কোন পাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সম্মুখে চৈত্র মাস, এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে বিবাহ না দিলে সে বৎসরও কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিবেন, তিনি দরিদ্র; দরিদ্রের কন্যাদায় অপেক্ষা গুরুতর দায় আর নাই। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধও গঙ্গাতীরে স্বল্প খরচে হইতে প্যারে, কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজের বিধানানুসারে একটা জীবন্ত ব্যক্তিকে কন্যাদান করিতে হইলে, অভাব পক্ষে পাঁচশত টাকা চাই-ই, শালগ্রাম ও আতপ তণ্ডুল ত সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেই হইবে। যাহা হউক, হরিহর বাবু কিন্তু পূর্ব্বে যতটা উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এখন আর ততটা নাই; তিনি কতকটা ঈশ্বরের তথা ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছেন।

ছয় মাস পূর্ব্বে পত্নীর সহিত যখন তাঁহার ঐ সম্বন্ধে কথাবর্ত্তা হয় প্রভা অন্তরালে থাকিয়া সকল কথা শুনিয়াছিল। বালিকা স্বভাবতঃ বড়ই সুশীলা ছিল এবং পিতার অবস্থাও সম্যক উপলব্ধি করিয়া লইয়াছিল। সে ভাবিল,—"একটা অপরিণত বয়স্ক বর্ণ-জ্ঞানহীন যাতালের সহিত বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চরিত্রবান্ দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। ভাবিল তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হবে। চরিত্রবান্ প্রৌঢ় স্বামী বরং ভাল, তথাপি তাহার সই অনীলার ন্যায় যুবক স্বামীতে প্রয়োজন নাই। অনীলার পিতার ত পয়সার অভাব নাই এবং কন্যার বিবাহে ব্যয়-সঙ্কোচ করেন নাই, তথাপি অনীলার অদৃষ্টে একি হইল? তাহার চোখের জল ত থামিল না? এই সব চিন্তা করিয়া প্রভা নিজের মনকে এক প্রকার দৃঢ় করিয়া লইয়াছিল।

ফাল্গুন মাসও কাটিয়া যায়—আর আট দিন মাত্র অবশিষ্ট, হরিহর বাবু হঠাৎ একদিন এক বন্ধুর মুখে সংবাদ পাইলেন যে অনীলার শ্বশুর বাড়ী দেবদীঘি গ্রামে একটি দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র আছে। প্রথম পক্ষের ৩।৪টি পুত্র-কন্যা থাকিলেও বয়স অধিক নহে, অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। পাত্রটী সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত। পাত্রের পৈত্রিক লাখরাজ জমিজমা কিছু আছে এবং সে নিজেও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী করে। সংসারে দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক না থাকায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে, নতুবা শিশু পুত্রকন্যাগণকে দেখাশুনা করে কে? মোটের উপর যোগাড় করিতে পারিলে কন্যা ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাইবে না। সংবাদ-দাতা অনীলার স্বামী বীরেন।

সংবাদ পাইয়াই হরিহর বাবু পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন—পাত্রের চরিত্রে কোন দোষ নাই; তিনি যেমনটী খুঁজিতেছিলেন, ঈশ্বর ঠিক তেমনটীই জুটাইয়া দিয়াছেন। তবে প্রথম পক্ষের ৩।৪টী পুত্র-কন্যা আছে, তা কি করিবেন, সকল বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ মিলে কই? তিনি আর কোন দ্বিধা না করিয়া সেই পাত্রেই কন্যাদান করিতে মনস্থ করিলেন এবং সেই দিনই কথা-বার্ত্তা একপ্রকার মীমাংসা করতঃ বাটী আসিয়া গৃহিণীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রথম পক্ষের সন্তান আছে শুনিয়া গৃহিণী প্রথমে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু পাত্রের অবস্থা, বিদ্যা ও চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আর কোন আপত্তি করিলেন না। প্রভাও সে কথা শুনিল, শুনিয়া একজন সঙ্গিনীর নিকট বলিল—"দেবদীঘির লোক সইএর বরের মতন না হয়?" হরিহর বাবুর কর্ণে সে কথা পৌছিলে তিনি যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, পাত্রের দেহে কোন দোষ নাই দেখিয়াই তিনি এই পাত্রই স্থির করিয়াছেন, তখন তাহার আর ক্ষোভ রহিল না; পিতা-মাতার আনন্দে সে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তারপর বৈশাখ মাসের একদিন একটা শুভলগ্নে সেই দ্বিতীয় পক্ষের বরের সহিত প্রভার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। ভবিতব্যেরই জয় হইল। হরিহর বাবু শত চেষ্টা করিয়াও

তার বিরুদ্ধে অন্য পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল, জামতা মদ্যপ বা চরিত্রহীন হইল না। প্রভাও বোধ হয় নিতান্ত অসুখী হয় নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন।

ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত।

হে বিরাট! হে ভূমা! হে অনন্ত! তুমি কি চিরদিনই মানবের নিকট অব্যক্ত থাকিবে? যে মনুজ-কুল-তিলকের নিকট আপনাকে ব্যক্ত করিবে অর্থাৎ যাহাকে আপনার স্বরূপ অবগত করাইয়া মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহের চরম অভীষ্ট প্রদান করিবে, তাহাকে স্বীয় অপূর্ব্বভাবে এরূপ অভিভূত করিবে যে, তাহার বর্ণনাশক্তি একেবারে অপহৃত হইবে, কারণ, তখন সে আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিবে না। সে সচ্চিদানন্দময় হইবে। যে তোমার বর্ণনা করিবে, সে যে তখন তোমাময় হইবে! তোমার এই যে পরিদৃশ্যমান সৃষ্ট জগত--অবশ্য যাহা কেবলমাত্র আমাদের চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হয়—তাহাও মাত্র দৃশ্যে পর্য্যবসিত হইবে,—তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপভাব কি আমাদের কোনরূপ বোধগম্য হইবে না? তাহা কি অনন্তকাল ধরিয়া অপরিজ্ঞাত থাকিবে? আমরা কি কেবল বিমোহিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিব?

তোমার দিবা ও রাত্রি কি অপরূপ সৃষ্টি! দিবার পর রাত্রি আসে, আবার রাত্রির পর দিবা আসে। ধীরে, অতি ধীরে, আরও ধীরে কেমন অন্ধকার অপসৃত হয় ও আলোক আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে; আবার সেইরূপভাবেই আলোককে নিঃসারিত করিয়া অন্ধকার আসিয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসে। সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ ব্যাপারই অবিকৃত থাকিবে, প্রলয়েই বোধ হয় এই চিরন্তন প্রথার বিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে। এই যে দিবা ও রাত্রি, আলোক ও অন্ধকারের বিভাগ, ইহাতে প্রভূত পরিমাণে সুবিচারের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। একের অপেক্ষা অপরকে অধিক পরিমাণে অধিকার ভোগের সময় প্রদান করা হয় নাই, দুয়েরই প্রভাব সমান কাল স্থায়ী।

আবার, প্রাতঃকালে যখন প্রাচী-ললাট প্রচুর রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হন, তখন কত মহিমাই না তাহাতে প্রকাশ পায়! আমরা আপনহারা হইয়া চাহিয়া থাকি। মধ্যাহ্নে যখন ময়ূখমালী প্রখর কিরণমালা বিস্তার করিয়া বিশ্বদহন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন আবার তাঁহার কি রুদ্রভাবেরই প্রকট হইয়া থাকে। সায়াহ্নে সেই তপনদেব রশ্মিজালের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করিয়া ও স্বীয় রুদ্রভাব সম্বরণ করিয়া কি বিচিত্রভাবে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হন। সে মুহূর্ত্ত কি পবিত্র মুহূর্ত্ত! একদিকে দিনের আলো দিগন্তে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, অপরদিক হইতে অন্ধকার ধীরপদবিক্ষেপে আসিয়া আলোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন তাহাকে অবস্থান করিবার নিমিত্ত

ক্রত সাধ্য-সাধনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। আলো কিন্তু অবস্থান করাত দূরের কথা, বরং আরও দ্রুতগতিতে পৃথিবী ও আকাশ যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইতেছে; অন্ধকার ইত্যবসরে সমগ্র জগতকে পরিব্যাপ্ত করিতেছে। এই দিবা ও রাত্রির সংমিশ্রণকালে হৃদয়ে যুগপৎ অতুলনীয় আনন্দ ও ভক্তির উদ্রেক হয়—প্রাণ যেন স্বতঃই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার-চরণে ঢলিয়া পড়িতে চায়।

দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে জগৎপাতার মহিমা যেন অধিকতররূপে উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হয়। এই কোলাহলময় বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র এক গম্ভীর নীরব ভাব অবলম্বন করে। সন্ত-সন্তাপ-হারিণী, বিমল শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রাদেবী আসিয়া প্রায় যাবতীয় জীবকুলকেই আশ্রয় করেন; তিনি আপন কার্য্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন না, সকলকে আপনার অযাচিত দান মুক্তহস্তে প্রদান করেন—অতিমাত্র ঘৃণ্য, সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সকল প্রকার স্নেহ হইতে একান্ত বঞ্চিত যে, সেও তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও নিজ প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হয়; মূর্ত্তিমান রিপুগণ স্বরূপ মনুর বংশধরেরাও অল্পকালের নিমিত্ত স্ব স্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যায়। জীবের হিতার্থে নিদ্রা যাঁহার দান, তাঁহার অদেয় আর কি থাকিতে পারে? এ সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা কত অক্ষম।

রজনীতে আকাশে যে মনোলোভা শোভার আবির্ভাব হয়, তাহা কবি-জন-সুলভ মানসকে সহজেই আকৃষ্ট করে; কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কয়জন সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া চর্ম্ম-চক্ষু ধারণের সার্থকতা লাভ করে? নিশাকর যখন নক্ষত্রনিকর পরিবেষ্টিত হইয়া নিরভ্র গগন হইতে স্নিগ্ধ অথচ শুভ্র রশ্মিজাল পাতিত করিয়া ভূলোকে রজতময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া প্রাণিরাজ্যে বিষম বিভ্রম উপস্থাপিত করে তখন সেই জ্যোৎস্নার সহিত বিগলিত হইয়া তাহার স্বরূপ অবগত হইবার অভিলাষ কি অনেক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না? ইহা ত একটী ভাবের অভিব্যঞ্জনা; পুনশ্চ যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে স্বীয় অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় এবং যখন তান্ত্রিক সাধকপ্রবর আপন অভীষ্টলাভের অবসর বুঝিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে মহাশ্মশানে শব সাধনে ব্যাপৃত হন তখন যে কি ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তাহা কে বলিবে? নিশায় প্রকৃতির এই পক্ষ ক্রমে স্নিগ্ধ ও ভীষণ ভাব অবলোকন করিলে পাছে সাধারণ জনসমূহ সৃষ্টির গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হয়, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় বিশ্বস্রষ্টা জীবকুলকে নিদ্রাঘোরে অচেতন করিয়া রাখেন। সে সময়ে স্বভাবের বিপুল সম্পদ দর্শন করিলে অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ও পুলকে শিহরিয়া উঠে, এবং প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়।

দিবা ও রাত্রির কথা ত্যাগ করিয়া এইবারে ষড়ঋতুর বিষয় আলোচনা করা যাউক। কালের অবিরাম গতি নিরূপণ সৌকর্য্যার্থে মনুষ্য তাহাকে মাস, বৎসর প্রভৃতিতে বিভাগ

করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু, মনে হয়, সৃষ্টি-কর্ত্তা যে ষড়ঋতুর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতেই বৎসর গণনার সূচনা হইয়াছে। কালের কঠোর শাসনে পার্থিব সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল; এখানকার কোন বস্তুই চিরদিন সমভাবেই অবস্থান করিতে পারে না। সেই নিমিত্তই ষড়ঋতুর প্রচলন। গ্রীষ্ম পৃথিবীকে দগ্ধ করিবার প্রয়াস পায়; বর্ষার বারিধারা আসিয়া তাহাকে সিক্ত করতঃ তাহার উত্তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া দেয়; শরৎ আসিয়া তাহাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করে। তৎপরে হেমন্ত আসিয়া শীতের প্রকোপের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলে। শীত আসিয়া তাহাকে বলে তুমি কিছুদিন অবিচলিত হইয়া আমার প্রভাব সহ্য কর, কারণ চিরমধুর বসন্ত আসিয়া তোমাকে নব-জীবন দান করিবে ও প্রভূত সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিবে। বসন্তের মলয় মারুতে, তাহার পুষ্পসম্ভারে ও মনোন্মাদ কর-দৃশ্যে কে না মোহিত হয় ও আপনভোলা হইয়া চাহিয়া থাকে? জগতে যদি কেবলমাত্র একটী ঋতু বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রাচীনত্ব সকলের বোধগম্য হইত; কিন্তু বিভিন্ন ঋতুর প্রবর্ত্তন থাকায় এই প্রাচীনত্বের মধ্যে নবীনত্বের সঞ্চার হইয়াছে; সেই জন্য মানব বুঝিতে পারে না যে, সে বয়োবৃদ্ধ হইতেছে, যত সময় অতিবাহিত হইতেছে—ততই এ সংসারে তাহার অবধারিত দিনগুলি নিঃশেষিত হইতেছে; সেইজন্য সে পূর্ণ উদ্যমে তাহার ধরাধামে অবস্থান আরও ঘনীভূত করিতেছে; এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতেছে না যে, এ নিত্য নূতনের মধ্যে তাহার জীবনের প্রবাহ মহাকালের উদ্দেশে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই ত সৃষ্টি-কৌশল, এই নিমিত্তই ত আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি এবং প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে অবসর পাই না।

স্বভাবতঃ শান্তিময়ী প্রকৃতি-দেবীর শান্তি-ভঙ্গকর কোন ঘটনা দর্শন করিলে আমরা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়ি। প্রকৃতি-দেবীর ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ সদৃশ ঐ নীলাকাশ শোভা পাইতেছে। কিন্তু ঐ আকাশ হইতে যখন অশনিসম্পাত হয়, তখন উহার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয়! তখন ভীম ভীমসেন সম বলী মানবেরও অন্তরাত্মা ভয়ে শিহরিয়া উঠে। সে সময়ে কি বুঝিতে পারা যায় না যে, আমাদের বল, আমাদের দর্প, আমাদের অহঙ্কার কি তুচ্ছ বস্তু? আমরা এই সমস্ত অসার বস্তু লইয়াই উন্মত্ত, সার বস্তুর সত্তা বুঝিতে আমরা ভুলিয়াছি।

আমরা সর্ব্বদা অনন্ত বায়ু-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি; ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার প্রবাহের অভাব ঘটিলে এই সতত সঞ্চরণশীল দেহ স্পন্দ-হীন হইবে, জীবনীশক্তি ইহার নিকট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে কিন্তু এই জীবন-সুহৃদের আবার জীবন নাশকারী রূপ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই বায়ুই তখন প্রবল বাত্যা-রূপে প্রবাহিত হইয়া উচ্চশির বনস্পতিগণকে নতশির ও ভগ্নশির করে, সুরম্য সৌধাবলিকে ভূমিসাৎ করে এবং প্রাণিগণের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে। কি সৃষ্টি-বৈচিত্র্য! কি

মহান্ ভাব !!

দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবী নীরবে সকল সহ্য করেন। তাহার উপর দিয়া যতই ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া যাউক না কেন, যতই লোমহর্ষণকর পাপের নাটক অভিনীত হউক না কেন, তিনি ধীর, প্রশান্ত, নিশ্চল। এই নিমিত্তই তাঁহাকে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী এই আখ্যা প্রদান করা হয়। কিন্তু তাঁহারও ধৈর্য্যের একটী সীমা আছে। সেই জন্য তিনি মাঝে মাঝে কম্পান্বিত হন। তাঁহার এ অবস্থা অত্যল্পকাল স্থায়ী হইলেও নিমেষ মধ্যে যে কত সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়, কত নিগূঢ় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ সে সকল বিষয় বুঝিয়াও অজ্ঞ।

কোন কোন প্রদেশে পর্ব্বত-শিখরে গহ্বর-মুখ হইতে প্রচুর অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মনুষ্য ভয়ে ও বিস্ময়ে পলায়নপর হয় এবং দূরস্থ প্রদেশে গিয়া স্থির-নেত্রে চাহিয়া থাকে। কত শোভনদর্শন নগর দগ্ধীভূত হইয়া গলিত ধাতুর দ্বারা প্রোথিত হইয়া যায়, কত তৃণসমাচ্ছাদিত ক্ষেত্র মরু-ভূমিতে পরিণত হয়। এ ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি দর্শনে সকলে 'ত্রাহি ত্রাহি' ও 'সম্বর সম্বর' রবে চীৎকার করিতে থাকে। ইহার দ্বারা সেই অচিন্ত্য অব্যক্তের আত্মরূপ কত পরিমাণে প্রকাশ পায়, মানব তাহা বুঝিতে পারে না।

মরুভূমি দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোথায় শস্য-শ্যামল, কমকান্তি প্রদেশসমূহ আর কোথায় মরুপ্রদেশ—কি অভাবনীয় পার্থক্য। জ্বলন্ত হুতাশনসম মরুর রূপ দেখিলে মনে হয় ধ্বংসই বুঝি প্রাকৃতিক নিয়ম, সংহারের নিমিত্তই বুঝি জগতের সৃষ্টি। এই স্থানে সামান্য বালুকণার কি প্রতিপত্তি—ইহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে অতীব শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিও ইতস্ততঃ করে ও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। দুস্তর জলধি উত্তীর্ণ হইতে মানব যেমন অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই মরু-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতেও সেই পরম কারুণ্য-নিদান পরমেশ্বর সেইরূপ উষ্ট্ররূপ পোত সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদ্রে দ্বীপের ন্যায় এই স্থানেও মরুদ্বীপের সৃষ্টি করিয়া নিরাশার মধ্যে আশার বিধান করিয়াছেন। যাহার দর্শনে এ বিপুল বিশ্বে বুঝি জল নাই—এইরূপ মনে হয়,তাহাতেই তিনি আবার মধ্যে মধ্যে জলাধারসমূহের সন্ধান দান করিয়াছেন। এরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দ্রব্যের একত্র সমন্বয় কেবল তাঁহারই সৃষ্টিতে সম্ভবপর হয়। মানবগণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা অনেক অসাধ্য-সাধন করি-য়াছে সত্য, কিন্তু এরূপ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের এক স্থানে অবস্থিতি কোথাও সম্ভব করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

হিম-প্রধান দেশ সমূহে শীত-ঋতুর আগমনে তুষার-সম্পাত হইয়া থাকে। প্রজ্বলিতাগ্নি রুদ্ধদ্বার গবাক্ষ সমন্বিত গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কাচের মধ্য দিয়া বহিঃপ্রকৃতির তুষারপাতরূপ ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষ সহ্য করা তত ক্লেশদায়ক নহে বরং কতক পরিমাণে আনন্দদায়ক। কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত বক্ষে বিচরণশীল প্রাণি-নিচয়ের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ে যথার্থই ক্লেশ

অনুভূত হয়। চিরতুষারের আগার মেরু-প্রদেশে আবার এই সময়ে নদী, সমুদ্র প্রভৃতির জল বরফরূপ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তাহার উপর দিয়া তখন অবলীলাক্রমে গমনাগমন করা যায়। স্থানে স্থানে ঐ সমস্ত বরফরাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করে এবং জলপথে বাহির হইয়া বহিঃসমুদ্রে গিয়া পড়ে। তখন উহা পোতসমূহের পক্ষে কালসম হয়; কোন প্রকারে একবার পোতের সংস্পর্শে আসিলে, পোতের নাশ অবশ্যম্ভাবী। মানবের বিদ্যা-বুদ্ধির দর্প, তাহার সমুদ্রের উপর প্রভুত্বের অহঙ্কার নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়। সৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণে তখন মানব অপারগ।

সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আমরা স্রষ্টার বিরাট ভাবের সন্ধান পাই, কিন্তু সমুদ্র ও আকাশ এ বিষয়ে আমাদের যত অধিক পরিমাণে পরিচয় দিয়া থাকে, বোধ হয় অপর কোন বস্তু সেরূপ পারে না। উপরে অনন্ত আকাশ শোভা পাইতেছে, নিম্নে মহাসিন্ধু তাণ্ডব-নর্ত্তন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। কি অপূর্ব্ব শোভা! আবার যেখানে সমুদ্র ও আকাশ মিলিয়াছে, যেখানে অনন্তের সহিত অনন্তের আলিঙ্গন হইয়াছে, সে স্থানের শোভার, সে স্থানের মাধুর্য্যের ধারণা করিতে মানব-বক্তির অক্ষম। সেই ধারণা যেদিন করিতে পারিবে সেদিন সকল বন্ধন ছিন্ন হইবে, সেদিন আর ভিন্নভাবে অবস্থান করিতে হইবে না, সে দিন ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। যত বড়ই সংসারক্লিষ্ট জন হউক না কেন, একবার যদি সমুদ্রের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হয় ও তাহার কল্লোলস্বর শ্রবণ করে, একবার যদি দিগন্তবিস্তারী আকাশের প্রতি চাহিয়া ঐ মহাশূন্যের সহিত আপনার হৃদয়কে ক্ষণেকের জন্য মিশ্রিত করিতে পারে, তাহা হইলে সে সমস্ত বিস্মৃত হইবে, তাহার আপন অবস্থিতি অবধি সে অনুভব করিতে পারিবে না। দ্বিপ্রহর রজনীতে সুনীল নভো-মণ্ডলের দিকে কর্ণ স্থির করিয়া পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিলে, বোধ হয় যেন কাহার অতি অস্ফুট অথচ গম্ভীরস্বর প্রাণের মধ্যে শুনা যায়। সে স্বরের ভাষা সম্পূর্ণ বোধগম্য হইলে, সৃষ্ট বিষয়ে বহু সন্ধান লাভ হইত এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানও অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইত। সাগরতীরে উপস্থিত হইলে যেন কাহার কাতর আহ্বান আমাদিগকে দুস্তর ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলে। সে কাতর আহ্বান যাহার সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীকে ঝঙ্কারের দ্বারা জাগাইয়া দেয় সেই ধন্য হয়, কারণ তাহার পরম বন্ধুর সাক্ষাৎকার লাভ হইতে আর অধিক বিলম্ব থাকে না। আকাশ ও সাগরের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই পরম পুরুষের সন্ধান লাভ সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

ধরাপৃষ্ঠে পর্ব্বতরাজি যে কতকাল ধরিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। হিমাচল শীর্ষে সামুদ্রিক শম্বুকাদি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে উহা এককালে সমুদ্রগর্ভে লীন ছিল অথবা উহার অগ্রভাগ সমুদ্র বক্ষ হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত ছিল; কতকাল ধরিয়া যে উহা বর্ত্তমান অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যাইতে

পারে। যাহা হউক সে সম্বন্ধে আমাদের বিচারের প্রয়োজন নাই। পর্ব্বতসমূহের সহিত যে প্রাচীনত্ব, মহত্ব এবং বিরাটত্বের ভাব বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তাহা হইতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের বিরাট রূপের সামান্ত পরিমাণে পরিকল্পনা করিবার নিমিত্তই এত অবান্তর কথার অবতারণা। পর্ব্বতপাদমূলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে আপনাকে কত ক্ষুদ্র মনে হয় এবং আমার আমিত্ব কোথায় বিদূরিত হয়। মহাজনগণ পর্ব্বতের বন্ধুর উপলখণ্ড রোপিত এবং কণ্টকাকীর্ণ পথের সহিত ধর্ম্মপথের উপমা দিয়াছেন। সে পথ এরূপভাবে অবস্থিত যে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের সম্ভাবনা। সেইজন্ত ধর্ম্মপথে সতর্কতা সহকারে আরোহণ করিতে হয়। সে যাহাই হউক, পর্ব্বত কঠিন পদার্থে গঠিত; তাহার মধ্য হইতে জল নিঃসরণ করা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু জগন্নির্ম্মাতা কেবলমাত্র এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করেন নাই, পরন্তু তিনি পর্ব্বতের অন্তর হইতেই যাবতীয় নির্ঝর উদ্ভূত করিয়াছেন। এত অচিন্ত্যনীয় কার্য্যাবলী হইতেও আমরা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারি না।

উদ্ভিদ ধরাকে সুশীতল রাখিয়াছে। আমরা নিজ দোষে পীড়া আনয়ন করি। দয়ার বিধান পরম কারণ তজ্জন্ত উদ্ভিদ সকলকে ও কোন কোন খনিজ দ্রব্যকে পীড়া নাশকারিণী শক্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অনেক উদ্ভিদের ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি অধিকন্তু ইহাদিগকে জীবগণের ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন; অবশ্য এ নিয়ম সকল প্রাণীর পক্ষে নহে। কিন্তু তিনিই যে ইহাদিগকে এরূপ করিয়াছেন, অথবা প্রাণিগণ ক্ষুধার উত্তেজনায় ইহাদিগকে খাদ্যের মধ্যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবহমানকাল এরূপ চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক আমরা দেখিতে পাই যে উদ্ভিদ হইতেই প্রাণিগণের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে।

পশুদিগের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, এমন কি অনেক পশু-জনক-জননী স্বীয় সন্তানকেও উদরসাৎ করে। ইহার মধ্যেও সৃষ্টির গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। আমরা যদি মোহান্ধ না হইতাম তাহা হইলে ইহা হইতে অনায়াসেই বহু সত্য আবিষ্কার করিতে পারিতাম। জগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যাহাদিগকে আমাদের চর্ম্ম চক্ষের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তাহাদেরও আবশ্যকতা আছে, কারণ সকল বস্তুই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট এবং পশুকে নিকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক বিষয়ে পশুকে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তিনি পশুকে তীক্ষ্ণ অনুভূতির ক্ষমতা দান করিয়াছেন। আমরা যাহাকে পশুবুদ্ধি নামে অভিহিত করি, তাহার কার্য্যাবলী অবলোকন করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। কোন কোন স্থলে ঐ সমস্ত কার্য্যাবলী মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা বুঝিয়াও বুঝি না,

অথবা অনেক ক্ষেত্রে আদৌ বুঝিতে চেষ্টা করি না যে, জগদীশ্বরের মহিমা তাঁহার পশু-জগত-সৃষ্টিতে কতটুকু প্রকাশ পায়।

হিতাহিত বিবেচনা আছে বলিয়া মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। জগৎপিতা মনুষ্যের মধ্যে আপন সত্ত্বা দান করিয়াছেন। তাঁহার মনোমধ্যে ক্রীড়া করিবার এবং আপনাকে আরও বিশেষভাবে দর্শন করিবার অভিলাষ হইল; তিনি আপন অংশের কতক ভাগ দ্বারা মনুষ্য দেহ গঠিত করিলেন, কিন্তু তাহাকে মায়া-পাশে আবদ্ধ করিলেন। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে কেহ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে। কেহ সুখসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, কাহারও হৃদয় প্রিয়জনবিয়োগজনিত শোকে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে; কেহ বা জরাজীর্ণ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; কেহ গর্ব্বস্ফীত হইয়া আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করিতেছে; কেহ পয়ঃপ্রণালী হইতে অন্ন কুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে; কেহ মুক্তহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেছে, কেহ রাজা হইয়াছে, কেহ তাহার প্রজারূপে বাস করিতেছে; কেহ পিতা সাজিয়াছে, কেহ তাহার পুত্র হইয়াছে; কেহ উত্তমর্ণরূপে অধমর্ণের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; কেহ বিকলাঙ্গ হইয়া দর্শকের মনে ঘৃণা আনয়ন করিতেছে, কেহ কন্দর্পকে বিজিত করিয়া রূপের স্নিগ্ধ দীপ্তিতে নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে ও দ্রষ্টার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিতেছে, এ সমস্তই মায়ার লীলা, মায়াই জগতকে মোহান্ধ করিয়াছে। সেইজন্য জাগতিক জীব এত অভিভূত ও আপন আপন স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম। তাহাকে তাহার আপন মুখ দেখিবার অবসর দেওয়া হয় নাই; নিজ মুখ ভিন্ন সে সমস্ত দ্রব্য দেখিবার অধিকারী। সে কেবল পরের সাহায্যেই উহা দেখিতে সমর্থ। যখন এই সামান্য সত্য আমরা বুঝিতে পারি না—তখন অন্য বিষয় ত অতি জটিল। আমরা বুঝিতে পারি না কোথা হইতে আসিয়াছি, কি উদ্দেশ্যেই বা আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পর কোন স্থানে অবস্থান করিব। অনেকে অনেক প্রকারে এ প্রশ্নত্রয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যেদিন আমরা যথার্থ ইহার সমাধান করিতে পারিব, সেইদিনই অব্যক্তকে ব্যক্তভাবে দেখিয়া জীবন সার্থক করিব।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিদায়।

[একদা বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আমি ঘাটশীলা গিয়াছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে সুবর্ণরেখাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।]

যাও বহে' কল্লোলিনী সাগরের পানে,
তোমার তরঙ্গ হার, দিতে প্রেম-উপহার,
অনন্ত প্রেমের নিধি বারিধি চরণে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥
নাচিবে সহস্র রবি তোমার জীবনে,
কোটি রম্য শশধর, কাঁপিবে উরস 'পর,
তরঙ্গের শিরে শিরে—চঞ্চল পবনে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

অগণ্য তারকা-বালা বসিয়া বিমানে,
হেরিবে তোমার জলে, মুখ ফুল্ল শতদলে,
যুবতী বদন হেরে যেমতি দর্পণে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

প্রভাতে মাখিয়া অঙ্গে অরুণ কিরণে,
ধরিয়ে মোহনশোভা, জগজন মনোলোভা,
মুগ্ধনেত্রে রবে চেয়ে আকাশের পানে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

হেমোজ্জ্বল মেঘ ভাসে সন্ধ্যার গগনে,
তোমার নির্ম্মল জলে, তার প্রতিচ্ছবি দুলে,
তরঙ্গের তালে তালে—মৃদুল কম্পনে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

প্রাবৃটে আবার তুমি উদ্দাম যৌবনে,
ভাসাইয়া দুই কুল, প্রক্ষালিয়া শৈলমূল,
বহে' যাবে কত রঙ্গে চঞ্চল চরণে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

সুগন্ধ সুস্নিগ্ধ মন্দ মলয় পবনে,
অধীর আবেগে চুমি', শিহরি' উঠিবে তুমি,
মূর্চ্ছিয়া পড়িবে তার স্নিগ্ধ-আলিঙ্গনে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

থাক শু'য়ে রত্নগর্ভা পাষাণ-শয়নে,
তোমার মধুর জলে, পালে জীব ফল ফুলে,
জননীর সম স্নেহ বারি ধারা দানে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

চলিল মা! এ অভাগা—পরে কতদিনে
পাবে কি না দরশন, তব পুণ্য ও চরণ,
এ জীবনে পাবে কি না কেবা তাহা জানে।
আর না ভ্রমিব আমি তোমার পুলিনে॥

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়।

'পতি-দেবতা।'

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে 'পতি-দেবতা' নামে এক বিকট চিত্র বাহির হইয়াছে—উদ্দেশ্য হিন্দু-সমাজকে বিদ্রূপ করা। এমন ভয়াবহ ছবি ইতঃপূর্ব্বে কোন মাসিকের অঙ্কে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। এক বিরাটাকার লম্পট পতি রক্তচক্ষু, মুখে সিগারেট, বাম হস্তে মদের বোতল, দক্ষিণ করে সুরাপূর্ণ গেলাস লইয়া ভার্য্যাকে তাহা পান করিতে বলিতেছে, তাহাতে সেই রমণী অসম্মত হওয়ায় স্বামী তাহার মস্তকে সবুট পদাঘাত করিয়াছে, আঘাতের ফলে হতভাগিনীর শিরোদেশ হইতে দরবিগলিত ধারায় রক্ত পতিত হইয়া ভূমি ও সেই চর্ম্ম-পাদুকা সিক্ত করিতেছে! নিরপরাধা পতি-ব্রতা সাধ্বী পত্নী তদবস্থায় স্বামীর চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িয়াছে। এই ত ছবি! হিন্দু-সমাজে আমরা এরূপ ঘটনা দেখি নাই বা শুনিও নাই। স্বামীর মাতলামী গৃহের বাহিরেই সাধারণতঃ দেখা যায়। আর গৃহের ভিতর করিলেও স্ত্রীর সম্মুখে সুরা-পাত্র ধারণ ও তাহা পানের নিমিত্ত প্রহার ও রক্ত-কাণ্ড অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। হিন্দু-সমাজের এমন ঘোর অধঃপতন এখনও হয় নাই! সেজন্য চিত্রকর মহাশয়ের মস্তিষ্ক-আলোড়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মস্তক হীনের শিরঃ-পীড়া দেখিয়া হাস্য-সম্বরণ করা দুষ্কর।

আর এরূপ ঘটনা যদিও কদাচিৎ

কোথাও এক আধটা হইয়াও থাকে, তাহা হইলে সে জন্য "হিন্দু-সমাজকে" গালি দেওয়া সঙ্গত কি? চিত্রকর যেন এই প্রহৃত ও লাঞ্ছিত রমণীকে পতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই অন্যায়ের প্রতিবিধান (পত্যন্তর গ্রহণ?) করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দু-রমণীর কর্ত্তব্য কি? সে কি তথাকথিত স্বধর্ম্মত্যাগী বা পাশ্চাত্য মহিলার মত পতির বিরুদ্ধে মাথা তুলিবে?—অন্য পতি নির্ব্বাচন করিবে?

ইহাই কি হিন্দু-রমণীর আদর্শ? ইহাই কি হিন্দুর দাম্পত্য চিত্র? আমরা জোর গলায় বলিব—কখনই না। এরূপ স্থলে হিন্দুনারীর অধোমুখিনী ও নির্ব্বাক হওয়াই উচিত। কারণ, সতী হিন্দুনারীর পতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। হাঁ, পতি কুক্রিয়াসক্ত হইলেও হিন্দু-রমণীর কাছে সে দেবতা। ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। পতি যে পায়ে পদাঘাত করে, সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে তাহাই জড়াইয়া ধরে। পতি রমণীর কোন অবস্থাতেই অশ্রদ্ধার পাত্র নহে। অনেক রমণী স্বকীয়া সতীত্ব প্রভাবে পাপাসক্ত পতিকে কুপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

দোষে গুণে মানুষ, দোষ গুণ সব সমাজেই আছে। তাহার সংশোধন হওয়া আবশ্যক আমরা অস্বীকার করি না।

হিন্দুর অর্থে পুষ্ট হইয়া হিন্দুকে গালি দিয়া "প্রবাসী" যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

রবি বাবুর "গোরা"।

সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দাদা! রবিবাবু এই গ্রন্থে কোন্ কোন্ তত্ত্বের আলোচনা করেছেন?

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ভ্রাতৃ-প্রীতি, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম প্রভৃতি এই সকল বিষয়েরই আলোচনা করেছেন। কোন্ বিষয়ে তাঁর কি মত, একটী একটী করে বলনা, শুনি।

বলি শোন।

১। রাজনীতি সম্বন্ধে রবি বাবু এই কথা বলেছেন। "প্রজার প্রতি অবিচারে রাজার অধর্ম্ম ঘটে। প্রত্যেক ইংরেজটিই রাজা" ইত্যাদি। উপন্যাসের ২১৫ থেকে ২১৮র পাত আবার ২৪৪, ২৪৫শের পাতা পড়ে দেখো।

২। সমাজনীতি সম্বন্ধে এই কথা লেখা আছে,—আমাদের সমাজ একটা সিঁড়ি। এর একটা উদ্দেশ্য হচ্চে নীচে থেকে উঁচুতে উঠিয়ে দেওয়া। সমাজকে আমরা ছোট করে ও তুচ্ছ করে দেখি বলেই আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। সমাজকে আঘাত করিলে তার বেদনা অনেক দূর গিয়ে পৌঁছায়। জাতি-ভেদের ফলটা অবস্থার ফল। শুধু জাতি-ভেদের নয়। নড়া দাঁত দিয়ে চিবুতে গেলে বাথা লাগে, সেটা দাঁতের অপরাধ, না নড়া দাঁতের অপরাধ। জাতিভেদের কথায় রবিবাবু বলেছেন,—"একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে

ভাত খেলে, কোন দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন ঘৃণা! এটা অধর্ম্ম ভিন্ন আর কি? যে জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা ও অবজ্ঞা সে জাতি পৃথিবীতে কখন বড় হতে পারে না। সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নাই, ঘৃণাও নাই। সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের অতীত। এদেশে সাম্য থাকিলেও নীচ জাতিকে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রে সেই সাম্য না থাকে তা' হলে শাস্ত্রমধ্যে সে সাম্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি?"

রবিবাবু ব্রাহ্ম সুতরাং জাতিভেদ মানেন না। হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ আছে তার নিন্দা করেচেন। আবার ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরেও যে যে দোষ আছে জনসাধারণে তাহাও প্রকাশ করেচেন। ইহা উদারতা।

৩। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে রবিবাবুর কি মত তাহা নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পড়িলেই বেশ বোঝা যায়।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে যাবে, তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না—সেটা কি ভাল? ব্রাহ্মণকে যদি যথার্থ ভাবে ব্রাহ্মণ করে গড়ে তুলতে পারা যায় তা হ'লে কি সমাজের সামান্য লাভ? আমরা চাই নর-দেবতা ব্রাহ্মণ—যার ভয় নাই, লোভ নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই। যার পরম ব্রহ্মণি-নিয়োজিতচিত্ত; যে অটল, শান্ত, মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়। ধর্ম্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা—এই দুটো অঙ্গকেই ভারত পূর্ণভাবে স্বীকার করিতে চায় বলে, তারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না; তারা স্থূলই নেয়। যিনি রূপেতে সত্য, অরূপেতে সত্য, স্থূলে সত্য, সূক্ষ্মে সত্য, ধ্যানেও সত্য, প্রত্যক্ষেও সত্য, তাকে ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেচে। আমি ঈশ্বরের কাছে সদা প্রার্থনা করি যে, ব্রাহ্মণদের সভাতেই হোক আর হিন্দুদের চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন নতশিরে তাঁকে প্রণাম করিতে পারি। ঈশ্বর- দূরের জিনিষকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাট করে দিয়েচেন। হিন্দুরা যে ধর্ম্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে সে লোকের কার্য্য নয়। হিন্দু-শাস্ত্র বড় গভীর জিনিষ। হিন্দু-সমাজের সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই ত এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি। রবিবাবু উদারভাবে ভেবেচেন। প্রাচীনের অমর্য্যাদা না করে, নবীনের গৌরব বাড়াইয়াছেন।

৪। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম এই উপন্যাসে কেমন সুন্দর ফুটেছে দেখ। মা আনন্দময়ীর মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমার স্বরূপ হউক। আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক। পূর্ণ স্বরূপ ভারতবর্ষ—ধনে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে পূর্ণ। সাধে আমি ভারতের সত্য-পূর্ণ মূর্ত্তি তুলতে পারি না? আমরা ভারতকে আধখানা দেখি। আমাদের স্বদেশ-প্রেমের একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা। দেশকে ভালবাস যদি, তবে দেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে এক হতে

পার না। ছোট বড় সকলকে বল দেখি 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার।" আমার এইখানকার কম্পাসটী দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে, সেইখানে আমার ভারতবর্ষ।'

৫। বিবাহ সম্বন্ধে রবিবাবুর মত—"বিবাহই নারী-জীবনে সাধনার পথ, গৃহ-ধর্ম্মই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। এই বিবাহ ইচ্ছা পূরণের জন্য নহে, কল্যাণ সাধনের জন্য। সুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, একমনে সংসারকে বরণ করিয়া, সতী-সাধ্বী রমণী পবিত্র হইয়া ধর্ম্মকেই গৃহের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিবেন, এই তাঁদের ব্রত।"

৬। বিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—"জীবনের এ কি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! বিনয় যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থটীকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে, তা' কি সকলে পায়? ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? এমনটি যদি সচরাচর ঘটিত, তবে বসন্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে, যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি আছে,তাহা স্বভাবতঃই নানাবর্ণে, নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিবার উপায়—এই প্রেম। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল।"

৭। গুরুভক্তি লইয়া রবিবাবু এইকথা বলিয়াছেন—এর মধ্যে একটু শ্লেষ আছে। "আমার গুরু অত্যুচ্চ ভাব-লোকেই বিহার করেন; এ সমস্ত পৃথিবীর কথা কিছুই বোঝেন না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী নারদের মত বীণা বাজাইয়া, বিষ্ণুকে বিগলিত করিয়া গঙ্গার সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু সেই গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে প্রবাহিত করিয়া সগর-সন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত করিবার কাজ পৃথিবীতে ভগীরথের; সে কাজ স্বর্গের লোকের কর্ম্ম নয়।"

৮। রবিবাবুর Cosmopolitanism—"আমি আজ ভারতবর্ষীয়, আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নাই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাদা! গোরা উপন্যাসে রবিবাবু স্ত্রী-চরিত্রই বা কেমন এঁকেচেন, আর পুরুষ-চরিত্রই বা কেমন এঁকেচেন? চিত্রগুলি বেশ ফুটেচে ত?

চরিত্র অঙ্কনে রবিবাবু সিদ্ধহস্ত বলিলেই হয়। তাঁর প্রায় সকল ছবিই বেশ ফুটেচে। পদ্মফুল শুধু সুন্দর নয়, সৌগন্ধযুক্তও বটে। রবিবাবুর চিত্রগুলি এক একটী পদ্মফুল—চিত্রে সুষমাও আছে, আবার সৌরভও আছে।

গোরা উপন্যাসে প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলি এই—গোরা ও বিনয়, কৃষ্ণদয়ালবাবু ও পরেশ বাবু, মহিম ও হারাণ (পানুবাবু), মাধব চাটুয্যে ও বরদা, সতীশ ও সুরেশ।

উপন্যাসের স্ত্রী-চরিত্রগুলি এই—আনন্দময়ী,

বরদাসুন্দরী ও হরিমোহিনী, লাবণ্য ও লীলা, সুচরিতা (রাধারাণী) ও ললিতা।

পুরুষচরিত্র।

গোরা।

গোরার চরিত্রই প্রধান; নাটক হইলে বলিতাম—গোরা প্রধান নায়ক। হরিমোহিনী গোরার রূপে মোহিত হয়ে, গোরাকে শচী-নন্দন গৌরাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবি-বাবু খুঁটিয়ে দেখে গোরার রূপ এইভাবে বর্ণনা করেছেন। গোরা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, তার কপালখানা খুব চওড়া, নাকটা খাঁড়ার মত, রংটা কটা,হাত-পা লম্বা লম্বা, গায়ে বেশ জোর আছে। গোরা খট্‌মট্ করে চলে, তার পদ-ভরে মেদিনী কাঁপতে থাকে; তার গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর, কথা কহিলে আকাশ কাঁপে। গোরা শিক্ষিত যুবক, এম-এ পাশ করেচে, সে ঘোর তার্কিক, সকল জটীল বিষয়ের এক একটা সুন্দর মীমাংসা করে রেখেচে, নিজে যা' বোঝে পরকেও ঠিক বোঝাতে পারে। গোরা স্বদেশানুরাগী ও স্বদেশ-হিতৈষী; দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার হইতেছে দেখিলে বরদাস্ত করিতে পারে না.তদ্দণ্ডে অগ্নি-শর্ম্মা ও একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে; বড় নির্ভীক হৃদয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই. এম-এ পাশ করেও গোরা হিন্দু. সুলেখক. সুবক্তা; আবার স্পষ্টবক্তা, মনের ভিতর কোরকাপ নেই। গরীব-দুঃখীর মা-বাপ; অসভ্য চাষা-ভুষোদের দলে মেশে, ঠৈকার-অহঙ্কার নেই। মাতৃভক্ত ও স্বদেশভক্ত। দেশের জন্ত প্রাণ-পাত করিতে প্রস্তুত। কিছু উদ্ধত স্বভাব, উদ্যমশীল যুবাপুরুষ। আপন কর্ম্মবিপাকে গোরা জেলে গিয়াছিল। হেসে প্রারব্ধ ভোগ করে জেল থেকে খালাস হয়ে এসে গোরা হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে স্থির করিল। তাহাতে বিঘ্ন ঘটায় প্রায়শ্চিত্ত করা ঘটিল না। কৃষ্ণদয়াল বাবু মৃত্যুকালে গোরার সম্বন্ধে একটী গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। গোরা এতদিন পরে জানিতে পারিল সে হিন্দুর ছেলে নয়, ইংরে-জের ছেলে। তখন হইতে গোরার জীবনের স্রোত আর একদিকে ফিরিয়া গেল। এ বড় সোজা পরিবর্ত্তন নয়। শেষকালে সুচরিতার সঙ্গে গোরার বিবাহ হয়েছিল। গোরার অসা-ধারণ স্বদেশানুরাগের কথা পড়িলে প্রাণ আনন্দে পরিপ্লুত হয়। গোরা বলিতেছে--"আমার মা আছেন। আমাকে সকলের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন বলিয়া তিনি আমাকে ডাকি-তেছেন। এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। তাহার আসমুদ্র বিস্তৃত নদী, পর্ব্বত, লোকালয় গোরার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। অনন্তের দিক্ হইতে একটী মুক্ত নির্ম্মল আলোক আসিয়া এই ভারতকে সর্ব্বত্র যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দেখাইল। গোরার বক্ষ ভরিয়া উঠিল; তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল; তাহার মনের কোথাও লেশমাত্র নৈরাশ্য রহিল না। সে মনে মনে বার বার বলিতে লাগিল—মা আমাকে ডাকিতেছেন। যেখানে অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী বসিয়া আছেন, আমি সেথায় চলিলাম।" আর একস্থলে আছে. গোরার অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির কথা—গোরা

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন। গোরা আসিয়াই তাঁর দুই পা টানিয়া লইল এবং তার উপরে আপনার মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। গোরা কহিল—মা! তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নাই, বিচার নাই, ঘৃণা নাই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমি আমার ভারতবর্ষ।"

আর একস্থলে গোরা বলিতেছে—"আমি যখন আমার মাকে দেখচি, মাকে জেনেছি, তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখচি ও জেনেচি।"

গোরার বীর চরিত্র গোরার কথায় প্রকাশ পাইত। গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং—সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে; তাহা বিশ্বাসের বলে ও স্বদেশ-প্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা ত মত নয়, তাহা সম্পূর্ণ মানুষ এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নয়।"

দাদা! গোরার চরিত্রে রবিবাবুর নিজের চরিত্রের ছায়া পড়েনি কি?

সম্পূর্ণ ছায়া পড়েনি, তবে স্থানে স্থানে আব ছায়া পড়েচে বটে।

বিনয়।

বিনয় গোরার পরম বন্ধু। ইনিও এম, এ পাশ, কৃতবিদ্য, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, নম্র, বিনয়-সম্পন্ন, মিষ্টভাষী। বিনয় গোরাকে ভক্তি করে, আবার ভয় করেও চলে। শুধু গোরাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সময়ে সময়ে নিজের মতের বিরুদ্ধেও কাজ করে। বিনয় গোরার মাকে মা বলে ডাকে, খাওয়া দাওয়ার বিচার করে না, তাহার কারণ বিনয় কুসংস্কারাপন্ন নহে। সকলকে খুসী রাখব, কাহারও অপ্রীতিভাজন হব না, বিনয়ের জীবনের এই মূলমন্ত্র। পরের উপকার করা তার জীবনের একটী ব্রত। পরেশ বাবুর কন্যা ললিতার বিবাহ হয়,—সে বিবাহ ব্রাহ্মমতে নয়, হিন্দুমতে। ললিতা ব্রাহ্মিকা, বিনয় হিন্দু, তবে গোঁড়া হিন্দু নয়। বিনয়ের হৃদয় পবিত্র প্রেমের আধার। সেই স্বর্গীয় প্রেমের কথা রবিবাবু বর্ণনা করিতেছেন "বিনয় যে অনির্বচনীয় পদার্থ টীকে হৃদয়ে পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে—একি সকলে পায়? ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? এমন যদি সচরাচর ঘটিতে পারিত তবে বসন্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি আছে, স্বভাবতঃই নানা বর্ণে, নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত।"

বিনয়ের সঙ্গে গোরার মতভেদ হয়েচে। ঘন্টা দুই উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হল, পরে বিনয় আপনার বাসায় চলিয়া গেল। তখন গোরার মনের অবস্থাটা কেমন তাই গ্রন্থকার বর্ণনা করিতেছেন—

"বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের

দিনে গোরার হৃদয়ের পরে কে যেন একটী অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। বিনয় চলিয়া গেল কিন্তু সে সঙ্গীত কোনমতেই থামিতে চাহিল না। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল।"

দাদা, বিনয়ের চরিত্রটী কি ঠিক আঁকা হয়েছে?

যার মতের ঠিক নাই, যার কোন principle নাই সে আবার মানুষ? সংসারে বৈচিত্র্য আছে ত। তাই মনে কর না কেন? এই কথা মনে করিলেও সংশয় কেটে যাবে, বিরোধভাব আসবে না।

পরেশবাবু।

পরেশবাবু ব্রাহ্ম, প্রবীণ, ধীর, বিবেচক, মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, শিক্ষিত, ক্ষমাশীল, দয়ামায়ায় ভূষিত; শরীরে রাগের লেশমাত্র নাই, সমদর্শী, ঈশ্বরপরায়ণ; তাঁর মন বড় উচুদরের উদারভাবে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্ম হলেও হিন্দুর প্রতি বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ নাই। এক কথায় যাকে মাটির মানুষ বলে পরেশবাবু তাই—নির্লিপ্তভাবে সংসারে আছেন, যেন জনক ঋষিটী হারাণবাবু পরেশবাবুকে দোষ দিয়ে বলেন উনি বড় দুর্ব্বলমতি। পরেশবাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী। তাঁর তিনটি কন্যা— লাবণ্য, ললিতা ও লীলা। সুচরিতা নামে তাঁহার একটী পালিতা কন্যা ছিল। গোরার সহিত সুচরিতার বিবাহ হয় আর ললিতার সহিত বিনয়ের বিবাহ হয়।

কৃষ্ণদয়ালবাবু।

ইতিপূর্ব্বে যখন কমিসেরিয়েটের গোমস্তা ছিলেন, তখন হিন্দুর আচার-বিচার কিছুই মানিতেন না। পরে ইনি গোড়া-হিন্দু হন। তপ, জপ, পূজা, আহ্নিকে দিন কাটান। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই বাড়ীতে ডেকে এনে সেবা নিতেন। বাড়ীর একধারের একটী ঘরে আলাহিদা বাস করিতেন; স্বপাকে আহার করিতেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস ছিল। বাড়ীতে পণ্ডিত রেখে শাস্ত্রপাঠ করিতেন। আচারভ্রষ্ট লোককে বড় ঘৃণা করিতেন। এঁর স্ত্রীর নাম আনন্দময়ী। আনন্দময়ী গোরাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। গোরা এঁদের দুই জনকে পিতামাতা বলেই জানিত। বহুকাল গোরার জন্মকথা গোপন ছিল। কৃষ্ণদয়ালবাবু মৃত্যু সময়ে গোরাকে বলে যান যে, সে তার ঔরসজাত পুত্র নয়, তার পালিত পুত্র।

মহিম।

মহিম কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র! আনন্দময়ী তার সৎমা। মহিম কলিকাতায় একটী আফিসে কায করে। মুখে সর্ব্বদাই পান চিবুচ্চে আর তামাক টানছে। মহিম বড় স্বার্থপর লোক— নিজের কথা একবারও ভোলে না। মহিমের বড় সাধ বিনয়কে তার জামাই করে। এই বিবাহের জন্য মহিম আনন্দময়ী ও গোরার কতই খোসামোদ করেচে। শশিমুখীর বিবাহ বিনয়ের সঙ্গে হ'ল না, হ'ল অন্য বরের সঙ্গে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ।

সাকার মূর্ত্তি পূজা।

আবার সম্বৎসর পরে এই শুভ দিনে, সাধের শরৎ সমাগমে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দময়ী বিশ্বজননী সর্ব্বশক্তিশ্বরী শ্রীশ্রীদুর্গার সাকার-মূর্ত্তির পূজা হইবে; সে আনন্দের দিনের আর বেশী বাকী নাই বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার আয়োজন করিতেছে। বাঙ্গালায় এই মূর্ত্তিপূজা যেরূপে এবং যতপ্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, ভারতের আর কোনও দেশে তেমন হয় না। আধুনিক সভ্য সমাজ এরূপ ভাবে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করার পক্ষপাতী নহেন, বিশেষতঃ যাঁহারা নানা প্রকার সম্প্রদায়ে যোগদান করেন—তাঁহারা ত আদৌ ইহাতে মত প্রদান করিতে স্বীকৃত নহেন। যাহা হউক, আমরা এই মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে, ইহার ভাল মন্দ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্যই অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক, মূর্ত্তিপূজা কি এবং কতদিন ইহা চলিতেছে। ধ্যান-ধারণ করিয়া বহু কষ্টে মনকে স্থির করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হইলেই কোনপ্রকার একটা মূর্ত্তির আবশ্যক, নতুবা সদা-বিচঞ্চল মন কাহাকে দেখিয়া স্থির হইবে—কাহার উপর সে আপনার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিয়া আপনার চঞ্চলত্ব হারাইবে? সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা হইল মন, সে ইচ্ছা না করিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্যাক্ষম হয় না। রাজা অনুমতি করিলেই যেমন প্রজাগণ তাহার অভীষ্ট পূরণে যত্নবান হয়—সেইরূপ মন ইঙ্গিত করিবামাত্র সকল ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে থাকে। মন সুন্দর বস্তু দেখিবার নিমিত্ত চক্ষুকে হুকুম করিলে—সে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। মন ইঙ্গিত না করিলে চক্ষু কেবল চাহিয়া থাকে মাত্র, দেখিবার যে একটা সাফল্য তাহা সে প্রাপ্ত হয় না। কেবল ফেল্ ফেল্ করিয়া এক দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। মনের সহিত দেখিলে তাহার দেখা সার্থক হয়। আবার দেখিবার ইচ্ছা হইলে, যা তা জিনিস দেখিয়া কি মনের তৃপ্তি হয়? দর্শন সাধ মিটাইতে হইলে ভাল জিনিস দেখিলেই তবে তৃপ্তি হয়, দেখিবার সাধ মিটে। এইজন্যই মনের তৃপ্তি-সাধন ও স্থিরতা-সম্পাদন-অভিপ্রায়ে সাজান-গুছান একটী সাকারমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ধরিতে হয়। এখন দেখা যাক্—মূর্ত্তিপূজা কতদিনের,

ও তাহার অস্তিত্ব কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ধ্যান-মন্ত্র হইতেই মূর্ত্তি-কল্পনা হইয়া থাকে; নতুবা হিন্দু যা তা একটা মূর্ত্তি গড়ে না, তাহার পূজাও করে না। এই ধ্যান-মন্ত্র আমরা বেদ হইতেই পাইয়া থাকি। দেবদেবীর ধ্যান-মন্ত্র বেদ-গর্ভ-সম্ভূত—অতএব শাশ্বত সনাতন, মানবের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় নাই। বেদে যখন ধ্যান-মন্ত্র পাওয়া যায়, তখন মূর্ত্তি-কল্পনা বেদ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৈদিক যুগেও মূর্ত্তি-কল্পনা ছিল—তবে তখনকার মানুষ আমাদের মত ধর্ম্মহীন, সাধনাক্ষম ছিলেন না। তাঁহারা ধ্যান-মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা রাখিতেন বলিয়া এখনকার মত কাট, মাটি, খড়, দড়ি দিয়া মূর্ত্তি গড়িবার আবশ্যক হইত না। ধ্যান করিলেই সাধন-বলে, প্রভূত ধর্ম্মতেজে তাঁহারা সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে খাড়া করিয়া মনোময়-পুষ্পে, ভক্তি-চন্দন মাখাইয়া পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এখন আমরা পারি না বলিয়া খড়, মাটি, কাট, দড়ির আবশ্যক হয়। চণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই—ব্যষ্টি-শক্তির একত্র সমন্বয়ে ভগবতী দুর্গার উদ্ভব হইয়াছিল, সকল দেবতার সমষ্টি-শক্তিতে এই দুর্গামূর্ত্তি, এই তেজময়ী মূর্ত্তি উদ্ভূত হইয়াছিলেন—কিন্তু আজগুবী হইলেন না। দেবতাগণ ঐ দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার ধ্যানেই ঐ শক্তি সমন্বয় করিয়াছিলেন বলিয়া অভীষ্ট-ফলদায়িনী মা আমার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে, তাঁহাদের নিকট মনোময়-রূপে, ধ্যানানুষ্ঠিত মূর্ত্তির অনুরূপে আবির্ভূতা হইয়া দানব সংহার করিয়াছিলেন। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগের কথা—তখন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পরিমিত ছিল। মানুষ তখন ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিত না—তাই তাহাদের ধ্যান করিবার শক্তি প্রদান করিলেই মা মূর্ত্তিময়ী হইয়া আপনি উদয় হইতেন। স্বারোচিস মন্বন্তরে—সত্যযুগে রাজা সুরথ ধ্যান-প্রভাব-বিশিষ্ট হইয়া, মনোময়ী মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াও সাকার-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, অসংখ্য বলি প্রদান করতঃ সকামভাবে দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তারপর যখন যখন ক্রমশঃ ধর্ম্ম কম হইতে লাগিল, আমাদের মস্তিষ্কও তখন বিগড়াইয়া গেল—মনের চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্ম্মের দৃঢ়তা থাকিলে মন চঞ্চল হইতে পারে না—সে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় চিরস্থির ধীর-ভাবাপন্ন থাকে। যখন আমাদের এ ভাব নষ্ট হইল—ধর্ম্ম যখন একপাদ কমিয়া গেল, ঠিক সেই ত্রেতাযুগ হইতে এই মূর্ত্তিপূজা ভিন্ন প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ভগবান রামচন্দ্র তাই সে সময় রাবণ-বধের জন্য বিভীষণের পরামর্শে ঘটস্থাপন করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তার পর ধর্ম্মভাব আরও কমিয়া যাইলে, পট এবং খড়, মাটী, কাট, দড়ী লইয়া মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাকে নয়ন-মনোহর করিয়া সাজাইয়া পূজার ব্যবস্থা হইল। বাস্তবিক ইহা ছিল—বেদে ইহার ধ্যান-ধারণ ছিল—একণে তাহা নানাবিধ পদার্থের সাহায্যে মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে।

এই মূর্ত্তি-পূজাই বা প্রচলিত করিল কাহারা? সাধকই সাধকের সাধনা-পথ সহজ-সাধ্য করিবার জন্য ইহার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নস্তরের সাধক ইষ্টদেবীর ধ্যান করিয়া জপে নিবিষ্টচিত্ত হইলে ক্রমশঃ হৃদয় মধ্যে কতকগুলি তেজ বা আলোক বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। সাধক গভীর তন্ময়তা-সহকারে যখন ক্রমে ক্রমে ঐ সকল তেজ এক-ত্রিত করিতে পারেন—তখন ঐ তেজের বা আলোর মধ্যে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি আপনি ফুটিয়া উঠে; তখন তাহার আর অন্য ইচ্ছা বা কামনা কিছু থাকে না; মন সমাধীস্থ হইয়া অনন্যশরণ হইয়া ঐ মূর্ত্তির পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে। যোগ-বিশারদ যোগীর এ সমাধি বহুদিন থাকে—তাঁহারা ইহাকে ধারণা করিয়া বহুদিন রাখিতে পারেন। গৃহী বা অল্পশিক্ষিত সাধক তাহা বেশীক্ষণ পারে না বলিয়া সমাধিভঙ্গেই মনমরা, দিশেহারা হইয়া পড়ে। তাহাদের এই মনমরা অভাবের অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য হৃদয়স্থিত মূর্ত্তি বাহিরে প্রস্তুত করিয়া পূজা করে—ইহা কল্পিত মূর্ত্তি নহে। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া—স্বরূপের সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া তবে তাহারা খড়-মাটী দিয়া ঠিক ধ্যান-মন্ত্রের অনুরূপ রূপ গড়িয়া, মূর্ত্তি-পূজা করে; পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ হইলে আবার হৃদয়ের মূর্ত্তি—হৃদয়-সমুদ্রে ভক্তির অতল-জলে ডুবাইয়া রাখে--ইহাই বিসর্জ্জন। যাঁহারা স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছে, তাঁহাদের দ্বারাই এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদের ঠিক ঠিক মন্ত্র অনুসারেই ইহা নির্দ্দিষ্ট। অতএব বাঙ্গালীর এ মূর্ত্তি-পূজার দোষ কি? এই মূর্ত্তি-পূজাই ত বাঙ্গালীর বিশেষত্ব; আর ইহার জন্যই ত তাহারা জগতীতলে ধন্য ও বরেণ্য। মানুষ যখন বালক থাকে, জ্ঞান-বুদ্ধি যতক্ষণ তাহার সম্যক্ পরিস্ফুট না হয়, ততক্ষণ সে মা বই আর কিছু জানে না, মা ছাড়া থাকে না—তাহার মাকে অন্য কেহ মা বলিলে, তাহার কোলে বসিলে, তাহার সহ্য হয় না—মায়ের অংশ কাহাকেও দিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাহার মা আর কাহার মা হইবে—এ ভাব তাহার প্রাণে সহ্য হয় না—ইহাই সাধকের প্রারম্ভাবস্থা কিন্তু যখন সে এই পার্থিব মাকে জগতের মা বিশ্বেশ্বরী বলিয়া ভাবিতে শিখে, যখন সে সমস্ত দ্রব্য মা-ময় দেখিয়া তাহার মাকে অণু হইতে অণু এবং মহৎ হইতেও মহান্‌ভাবে ভাবিতে পারে—তখন আর তাহার সে সঙ্কীর্ণতা, সে দুর্ব্বলতা, সে পক্ষপাতিতা থাকে না, তখন সে একার ক্ষীণকণ্ঠে আর মাতৃআহ্বান শুনিতে ভালবাসে না—সে শ্রবণ-বিস্ময়কর, ক্ষীণ অস্ফুটধ্বনী যেন তাহার কর্ণে আর প্রবেশ করে না—তখন সে কোটীকণ্ঠে মাতৃনামধ্বনী শুনিতে ভালবাসে, সেই বিশ্ববিকম্পনকারী ধ্বনী যেন তখন তাহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করে, হৃদয়-তন্ত্রী যেন তাহার গুরুগম্ভীর শব্দে সঘনে বাজিয়া উঠে; এই সিদ্ধ অবস্থাতেই সাধক তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকান মাতৃমূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া তাহার ধ্যান-ধারণা অনুসারে সকলে মিলিয়া পূজা করিতে থাকে, সকলেই মিলিয়া সেই ভবারাধ্য চরণে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলী প্রদান

করে। ইহাই সাধকের সাধকত্বের পূর্ণ পরিচায়ক—এ সময় আর লুকোচুরী নাই; নানা বিঘ্ন ঘটিবার ভয়ে এখন আর তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু করিতে হয় না—তখন বিঘ্ন-বিনাশিনী মায়ের কৃপাবলে সে সকল বাধাবিঘ্ন এড়াইয়াছে। তাই সে হৃদয়ের গুপ্তধন বাহির করিয়া সকলকে দুই হাত তুলিয়া বিলাইয়া দেয়—আপনি পবিত্র হয়—সকলকে পবিত্র করে—ইহাই হিন্দুর সাকার মূর্ত্তির কল্পনা। যে মাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে—সম্যক্‌ভাবে তাহার হইতে পারিয়াছে, সেই এই সাকার-মূর্ত্তির কল্পনাকারক—অন্যে নহে; অন্যে বা অজানা লোকে করিলে—ইহা কি আবহমানকাল এরূপ দৃঢ়তার সহিত জগতে প্রচলিত থাকিত। এই জন্য বলি—এই মূর্ত্তি কল্পনাই বাঙ্গালী সার সত্য, ইহাতেই তাহাদের মহত্ত্ব। কাষ্ঠের মধ্যে যেন প্রচ্ছন্নভাবে অগ্নি নিহিত থাকে—এই মূর্ত্তির ভিতরও মা আমার তেমনিভাবে বিরাজিত, শক্তিবলে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলেই তাহাতে যেমন অগ্নির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—শক্তি থাকিলে এই মূর্ত্তির মধ্যেও ঠিক তেমনিভাবে তুমি মাকে পাইতে পার, তাহার অমিয়মধুর করুণারাশি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পার। মনের সহিত মন্ত্রের ভাব উপলব্ধি করিয়া তুমি মূর্ত্তিতে নিজ প্রাণ-সংযোগ কর দেখি—তোমার প্রাণ দিয়া মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে এই মূর্ত্তি তোমার অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তুমি নিজে যখন প্রাণহীন হইয়া পূজা কর, তখন মূর্ত্তি প্রাণময়ী হইবে কিসে? তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কর্ত্তা ত তুমি, তুমি কোথায়—আর তোমার শক্তি কোথায়? তবে কেমন করিয়া তোমার শক্তি জাগিবে? মা তোমার সহিত কথা কহিবে? মা নির্গুণ বা নিরাকারা নহেন—তাহার রূপগুণ নাই—ইহা অসম্ভব, যাহা তাঁহার নাই—জগত তাহা পাইল কোথা হইতে; তিনি সমস্ত রূপ এবং গুণের আধার—তাহার এত রূপগুণ যে আমাদের সামান্য মস্তিষ্কে তাহা ধারণা হয় না—তাই অর্জ্জুন হেন সাধক ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি দর্শনে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রূপগুণ ভিন্ন পূজা-উপাসনা হয় না। জন্ম জন্ম ধরিয়া এইরূপ রূপ-গুণের উপাসনা, সাকার ও সগুণ-মূর্ত্তির সাধনা, সকামভাবে বিশ্বকর্ত্রীর নিকট তোমার আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বস্তুর প্রার্থনা কর। দিবার কর্ত্তা তিনি, প্রার্থিত বস্তুদানে তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার কর্ত্তা তিনি, সময় হইলে আবার নিবৃত্তি দানও তিনি করিবেন। বৃক্ষস্থিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সময় হইলেই আপনাপনি তোমার মনোবৃক্ষ হইতে সকাম-সাকার প্রবৃত্তি আপনি ঝরিয়া পড়িবে—তখন টানিয়া বুনিয়া কোন কাজ করিতে হইবে না—কোন প্রতিমা গড়িতে হইবে না। মন স্থির হইলেই বেদোক্ত মন্ত্র-মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে আপনিই প্রতিফলিত হইবে। যতদিন না তাহা পারিতেছ,যতদিন না তোমাদের সেই পূর্ব্ব শক্তি আবার ফিরিয়া পাইতেছ—ততদিন সাধকের এই নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া ধন্য হও। সম্মুখে শুভ কার্ত্তিকের সপ্তমী তিথি, বিশ্বজননীর আগমন সূচিত করিয়া তোমাকে কহিতেছে—বাঙ্গালি! মায়ের নামে প্রাণের প্রত্যেক পরতে পরতে—

ভক্তি-অর্ঘ্য স্থাপনা কর, মঙ্গলময়ীর মঙ্গল আবাহন-গীতি গাহিয়া হৃদয়-মন পবিত্র কর. দাও বাঙ্গালি! অঙ্গনে আলিপনা, বিশ্বধাত্রী, বিশ্বকর্ত্রী মা তোমার ত্রিতাপতপ্ত মন-প্রাণ সুশীতল করিবেন বলিয়া মর্ত্ত্যে আসিতেছেন। হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট খুলো, মন-প্রাণ মা-ময় করিয়া মায়ের চরণতলে অগ্রসর হইয়া বল:—

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

মা! সর্ব্বস্বরূপে তোমার সর্ব্বস্বার্থী হরণের জন্য আসিয়াছেন। ত্রিভুবনের আরাধ্যা দেবী আজ তোমার পর্ণ-কুটীরে আসিয়া স্বর্গের মণি-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন,ঢাল বাঙ্গালি! ভক্তি-গঙ্গাজল,নয়নাশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে বল:—

"গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

বাঙ্গালি! তোমার অদৃষ্টের কি আর তুলনা আছে? এইরূপ শুভাদৃষ্ট লাভ করিয়াই যে তুমি চারিযুগ অমর হইয়া রহিয়াছ।

সম্পাদক।

আত্মজ্ঞানের উপায়।

এই অসার অপার দুস্তর সাগর-স্রোতে ভাসমান ও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক নামক তাপত্রয়ে নিরন্তর প্রপীড়িত হইয়াও দেখিতে পাওয়া যায়, জীবের সংসারাসক্তির কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। পশু-গণ শস্যক্ষেত্রে যাইয়া শস্য ভক্ষণ করিলে ক্ষেত্র-স্বামী কর্ত্তৃক প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াও যেমন আবার সেই শস্যক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়, শস্য ভক্ষণের লোভ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না. মানব প্রকৃতিও ঠিক তদনুরূপ। প্রতি মুহূর্ত্তে লোক তাপের তীব্র যন্ত্রণায় দহ্যমান হইয়াও নশ্বর পুত্র মিত্রাদি ও নিজের দেহের প্রতি মমতার কিছুমাত্র হ্রাস করিতে পারে না বরং উত্তরোত্তর মমতা বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও অর্থাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্বাপহরণেও পরাঙ্মুখ নহে। ভোগ-বিলাসের বিষময় ফল উপভোগ করিয়াও ভোগের বিরাম কিছুতেই হয় না। কেন এমন হয়? হে মানব! ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ! তোমাকে ভগবান সকলই দিয়াছেন, কোনই অভাব তোমার রাখেন নাই, তত্রাচ তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা:—

"যদধাতু মতো ব্রহ্মণ্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা॥"

[২য় স্কন্ধ, ৮ম অঃ ৬]

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জীব ভূতাদি জড় পদার্থের অতীত, অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ ঘটে, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে কি না, তাহা সবিশেষ আমাকে বলুন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ কোনও সময়ে ব্রহ্মার নিকটে আগমন করতঃ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা:—

"গুণেষ্বা বিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ॥"

[১১শ স্কন্ধ, ১৩শ অঃ ১৭]

হে প্রভো! রাগের বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত স্বভাবতঃ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় এবং বিষয়ও বাসনারূপে চিত্তমধ্যে প্রবেশ করে, ইহা সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে; অতএব যাহারা এই সংসার-জলধিকে অতিক্রম করিতে বাসনা করেন, তাদৃশ মুমুর্ষুগণের এই চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর বিশ্লেষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে— তাহাই বর্ণনা করুন।

ভগবান কপিলদেবের জননী দেবহূতি, পুত্র কপিলদেবকেও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা :—

দেবহূতি উবাচ।

"নির্ব্বিণ্না নিরতাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ।
যেন সংভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥"

হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভো পরমেশ্বর! বিষয় সম্ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিসাধন করিলে, নরকাদি দুঃখের দ্বার প্রশস্ত হয় মাত্র, আমি এতাবৎ ভোগ লালসায় নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছি, আর যদি নিরন্তর এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের চরিতার্থতার জন্য অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমি ঘোর অন্ধকারপূর্ণ অজ্ঞান নরকেই নিমগ্ন হইব।

"অথমে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি।
যোঽবগ্র হোঽহং মমে তিতো তস্মিন্
যোজিতস্ত্বথা ॥
তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃতা
সংসারতরোকুঠারং।
জিজ্ঞাসয়া প্রকৃতেঃ পুরুষস্য নমামি
সদ্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠং ॥"

অতএব হে ভগবান! আপনি আমার এই ঘোর অজ্ঞানকে অপনোদন করুন। দেখুন! জীবের দেহাদিতে "আমি" ও "আমার" বলিয়া যে আসক্তি জন্মে তাহা আপনারই মায়া প্রভাব মাত্র! প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দ্বারা ভক্তগণের সংসার-তরুর মূলোচ্ছেদক মোক্ষ লাভের উপায়াভিজ্ঞ সর্ব্ব শরণ্য, শ্রেষ্ঠ পরম কারুণিকের শরণ গ্রহণে আমি প্রণাম করিতেছি।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিপরবশ হইয়া কেবল মাত্র এ সংসারে আত্ম সুখ সাধনই মানব-জন্মের উদ্দেশ্য নহে। মানব প্রবৃত্তিপরায়ণ বটে, কিন্তু ভগবান সেই প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিবার শক্তিও মানবকে দিয়াছেন। সেই ভগবদ্দত্ত শক্তির যদি যথোপযুক্ত ব্যবহার না হয়, মানব যদি নিরন্তর প্রবৃত্তি-মার্গে বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া সংসারাসক্তি এত প্রবল হয়, যে পরার্থপরতা বৃত্তি আর আদৌ থাকে না; ঘোর স্বার্থপর হইয়া মানব পশুতুল্য হইয়া দাঁড়ায় এবং এই সংসার তাহার পক্ষে অসীম দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির সংযমই "মানবধর্ম্ম"। আর্য্য জাতির যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই প্রবৃত্তি সংযমের উপায় বিধান করিয়া কিরূপে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানব স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া যদি আত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব অনুশীলন করে, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তি সংযত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এ সংসার মানবের কার্য্যভূমি, জন্মগ্রহণ করিয়া মানব কার্য্য না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না,

অথচ কার্য্যই মানবের ইহ ও পরকালের সুখ দুঃখের হেতু স্বরূপ। কার্য্যই মানবকে দেবতা তুল্য করে, কার্য্য প্রভাবেই আবার মানব পশু-তুল্যও হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু স্বভাবতঃ মানব পশুধর্ম্মপরায়ণ, স্বার্থপর, সুখলিপ্সু। মানবের এই পাশব-প্রবৃত্তির নিবৃত্তিসাধন, শাস্ত্রশাসন ভিন্ন আর কিছুতেই হইবার নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া মানব পরকালে বিশ্বাসী হয়, পরকালে বিশ্বাস হইলে, মানবের পাপকার্য্য করিতে ভয় হয়; সুতরাং ভগবৎ কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে "মানুষ" করে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীব-নিস্তারের জন্য মহাজনগণ যুগে যুগে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়া ধর্ম্মের জটিল বিষয় সমস্ত মীমাংসা করতঃ শাস্ত্র-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ জনগণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উন্মেষের পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া পরম-শান্তি সুখেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতাই তাহার একমাত্র কারণ। আজ সেই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র হতাদৃত, মানব কার্য্যভ্রষ্ট, নাস্তিকতা-পাপের প্রবল স্রোত আমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের শক্তি হরণ করিতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আর্য্য-শাস্ত্রকার মহাজনগণের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার দুই একটী প্রশ্ন মাত্র উল্লেখ করিয়া, প্রশ্নগুলি যেরূপে মীমাংসিত হইয়াছিল—তাহাই উল্লেখ করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রশ্নগুলি আমরা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার যেরূপ মীমাংসা হইয়াছিল, তাহাই উল্লেখ করিব। প্রায়োপবেশনোপবিষ্ট মহাভাগবৎ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান শুকদেব কহিলেন :—

শ্রীশুক উবাচ।

"আত্মামায়ামৃতে পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টু বিরাঞ্জসা ॥
বহুরূপ-ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রসমানো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥"

[২য় ৯ম অঃ, ১ | ২]

শুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ। জীব, প্রকৃতি প্রভৃতি যাবতীয় জড়তত্ত্বের অতীত জ্ঞানময় ও অনুভব-স্বরূপ। সুতরাং যেমন অজ্ঞান ব্যতীত স্বপ্ন দর্শন বা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থকে সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, সেইরূপ জগৎ রচয়িতার অজ্ঞানরূপা অচিন্ত্য মায়া ব্যতীত জীবের দেহ সম্বন্ধ ঘটে না। জীব একরূপ হইয়াও বিচিত্র মায়ার বশে দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেবতীর্থ আদি বিবিধরূপে এবং বাল্য-যৌবনাদি বিবিধভাবে পরিণত হইয়া আত্মাভি-মান (আমি জ্ঞান) ও বিষয়াভিমান (আমার জ্ঞান) করিয়া থাকে।

"শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃনাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং ॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবাচার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্ব ভরণেনবা ॥
দেহাপত্য কলত্রাদি ষাত্মসৈন্যেষ সৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্ত নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতে ॥"

লোকেরা গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। সুতরাং হে

রাজেন্দ্র, তাহাদিগের ন্যায় মনুষ্যের সহস্র সহস্র বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার আছে। গৃহস্থ রাত্রি-কালে নিদ্রা এবং স্ত্রীসহবাসে, দিবাভাগে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা এবং পরিবার-প্রতিপালনে বৃথা জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। আত্ম-সৈন্য স্বরূপ স্বীয় শরীর, পুত্র ও স্ত্রী কিছুই চিরস্থায়ী নহে; কিন্তু অনার্য্য লোকেরা এই সকল বিষয়ে এত আসক্ত হয় যে, পিত্রাদির মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও নিজের ও প্রিয়-জনের নিধন সম্যক্ দেখিতে পায় না।

তাহার পর সনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নোত্তর কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই উল্লেখ করিব। পুত্র-গণের প্রশ্ন শুনিয়া ব্রহ্মা কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না, এবং মনে মনে বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। বিষ্ণু হংসরূপে তথায় আসিয়া ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন যথা:—

শ্রীহংস উবাচ।

"বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মেক আশ্রয়॥
পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভোহ্যনর্থকঃ॥
মনসা বচসা দৃষ্টা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥
গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥
গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥
বিষয়িবিষয়া সংস্কার চিত্তাং দুর্ব্বে স্থিতস্তবেৎ।
অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ং॥"

হংস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! পরমার্থ-ভূত আত্মস্বরূপ জীবতত্ত্বের অবগতির জন্য যদি আপনারা "কে আপনি" বলিয়া প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে চৈতন্যাংশে আত্মার একত্ব বিধায়, আপনাদের এরূপ প্রশ্ন কখন সঙ্গত হয় না। এবং জীব মাত্রেরই আত্মার কোন ভেদ না থাকায়, কোন পার্থক্য অবলম্বনে যে আমি আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব, তাহারও নিরূপণ হয় না। দেব-মনুষ্যাদি শরীরেও যখন পঞ্চ মহাভূত সমানভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, তখন আপনাদিগের "কে আপনি" বলিয়া প্রশ্ন কি নিরর্থক বাগাড়ম্বর নহে? মন বাক্য চক্ষু বা যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন বস্তুকেই গ্রহণ করা যায়, সে সমস্তই একমাত্র আমি; আমি ভিন্ন জগতে অন্য কোন বস্তুই নাই, ইহাই বিশেষ বিচার পূর্ব্বক অবধারণ করুন। হে পুত্রগণ! বিষয়ে চিত্ত আসক্ত হয় এবং চিত্তে বিষয়-রস প্রবেশ করে সত্য কিন্তু বিষয় ও চিত্ত এই উভয়ই একত্র মিলিত হইয়া মদীয় অংশসম্ভূত জীব-তত্ত্বের ভোগায়তন দেহ নির্ম্মিত হয়; কেবল দেহ কখন জীবের স্বরূপ নহে। অতএব বিষয়-সম্ভোগ দ্বারা তৎসংস্কার নিবন্ধন চিত্ত বিষয়ের অভিমুখেই ধাবিত হয় এবং বিষয়রসও বাসনা-রূপে চিত্তকে আশ্রয় করে, সুতরাং মদীয় স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই এই উভয় চিত্ত এবং বিষয়ের হস্ত হইতে অব্যা-হতি লাভ করা যায়। দেহাদিকেই যে 'আমি' বলিয়া বোধ হয় এই অভিমানেই জীবের বন্ধন ঘটিয়া স্বকীয় পরমার্থ স্বরূপের অপ্রতীতি জন্মে, সুতরাং পরমানন্দ স্বরূপ হইলেও জীব আপ-

নাকে দুঃখ প্রভৃতি প্রকৃতির গুণে উপলব্ধি করে। কিন্তু স্বীয় বন্ধনের কারণ অবগত হইয়া বিষয় হইতে চিত্তকে বিনিবৃত্ত করতঃ তুরীয় স্বরূপ আমাতে জীব অবস্থান পূর্ব্বক যখন দেহাভিমান ও ভোগচিন্তায় বিরত হয়, তখনই তাহার কৃতার্থতা হয়—সন্দেহ নাই।

অতঃপর জননী দেবহূতীর প্রশ্নে ভগবান কপিলদেব যাহা উত্তর দিয়াছিলেন—তাহাই উদ্ধৃত করিলাম, যথা :—

শ্রীভগবানুবাচ।

"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনোমতং।
গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥
অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখম্ সুখং সমং॥"

অর্থাৎ দেখ! জীবের নিজ চিত্তই তাহার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। বিষয়-নিবিষ্ট চিত্তের দ্বারা বন্ধন এবং পুরুষোত্তমে আকৃষ্ট চিত্তের দ্বারায় জীবের মুক্তিলাভ হয়। দেহাদি ইন্দ্রিয়-বর্গে আত্মবোধ এবং স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে আমার-বোধ জন্মে তাহারই প্রভাবে জীবচিত্ত কাম-লোভাদি দ্বারা মলিন হইয়া যায়। মন যখন সেই মালিন্য-দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখা-দিতে অভিভূত না হয়, তখন তাহাকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল বলা যায়।

"প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষোনাজ্যতে প্রকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদ কর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ॥
স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসর্জ্জতে।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তেন সংসার পদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥
অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেন বিরক্ত্যাচ্য নয়েদ্বশং॥

৩য় স্কন্ধ, ২৭ অঃ ১-৪।

হে জননি! নভোমণ্ডলবর্ত্তী দিবাকরের প্রতিবিম্ব ভূতলস্থ জলে নিপতিত হইয়া তথায় দ্বিতীয় সূর্য্যের ভাব হয় বটে, কিন্তু জলস্থিত চাঞ্চল্যে আকাশের সূর্য্য যেমন চঞ্চল হয় না, সেইরূপ জীবরূপী পুরুষ চৈতন্য প্রকৃতি কার্য্য দেব মনুষ্যাদি বিচিত্র দেহে উপলব্ধ হইলেও প্রকৃতির গুণ পুণ্য, পাপ বা সুখ দুঃখাদি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। কারণ পুরুষ রাগ লোভাদি গুণ বিকারের অতীত। প্রকৃতির অতীত এই পুরুষই আবার যখন অহঙ্কারোৎ-পন্ন দেহ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণাদিতে আপ-নার স্বরূপ চিন্তনে নিজের পরম ভাব বিস্মৃত হয়, তখনই প্রকৃতির গুণ শব্দাদি বিষয়ে ও দেহাদিতে আসক্ত হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি কৃতকর্ম্মে "আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা"রূপে অভি-ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং এক কর্তৃত্বাভিমান নিবন্ধন প্রসঙ্গ ক্রমে উপনীত পাপ ও পুণ্যরূপ দেহাদি কৃত কর্ম্মদোষের অধীন হইয়া জীব পরমানন্দ লাভে অপারক হইয়াছে এবং উৎ-কৃষ্ট বা অপকৃষ্ট দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার-ভোগ অনুভব করিয়া থাকে। একদিকে ইন্দ্রিয়গণ অপরিতৃপ্তের ন্যায় নিরন্তর বিষয় পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং চিত্তও সতত বিষয় পথে আকৃষ্ট হইতেছে। অতএব ভগবদ্ভক্তি ও তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তকে বশীকৃত করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নগুলির যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, সকল উত্তরগুলির মর্ম্ম একই প্রকার। সকলেই বলিলেন যে "এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্রই আছেন, কার্য্য-কারণাত্মক সমগ্র জগত তাঁহার শক্তি-বিকাশমাত্র। এই শক্তিকেই অবিদ্যা বা মায়া বলা যায়। এই অনাদি অবিদ্যা জনিত ভ্রান্তি-বশতঃ জীব, দেহাদি উপাধির সম্বন্ধ নিবন্ধন আপনাকে সুখী ও দুঃখী মনে করিয়া সংসার দশায় জন্ম, জরা ও মরণাদি মহাদুঃখের অধীন হইয়া আছে। অবিদ্যা-প্রভাবে জীবের এই মিথ্যা-জ্ঞান, এবং তন্নিবন্ধন জীবের যে সংসার-বন্ধন, একমাত্র বিদ্যা প্রভাবে জীবের এ ভ্রম জ্ঞান অপনোদিত হইলেই জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ। এখন কি উপায়ে এই অবিদ্যার ধ্বংস হইতে পারে? ভগবান কপিলদেব সে সম্বন্ধে নিজ জননী দেবহুতিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমরা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম! যথা :—

শ্রীভগবান উবাচ।

যোগস্য লক্ষণং বক্ষে সবীজস্য নৃপাত্মজে।
মনো যে নৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথং॥

ভগবান কপিলদেব জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজনন্দিনি! যে উপায়ে মানব-মন কাম-ক্রোধাদি পরিহারে বিশুদ্ধ হইয়া ভগবানের স্বরূপ চিন্তনে নিশ্চিন্ত হয়, আমি তোমাকে সে সজীব সমাধির লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনং।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চণং॥
গ্রাম্য ধর্ম্ম নিবৃত্তিশ্চ মোক্ষ ধর্ম্মরতিস্তথা।
মিত মেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্ত ক্ষেম সেবনং॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থ পরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায় পুরুষার্চ্চনং॥

* * * * *

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভিমনো দুষ্টমসৎপথং।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জাত শনৈর্জ্জিত প্রাণোহ্যতন্দ্রিত॥"

৮ম স্কন্ধ, ২৯ অঃ, ১-৭।

অর্থাৎ যথাশক্তি স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিরুদ্ধ ও বিজাতীয় ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, প্রারব্ধবলে প্রাপ্ত অন্নাদিতে সন্তোষ, আত্মজ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তিগণের যথোপযুক্ত সেবা ও আরাধনা, ত্রিবর্গ সাধক গ্রাম্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদাসীন থাকা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মোক্ষ ধর্ম্মে অনুরক্ত, পরিমিত পরিমাণে পবিত্র ভোজন, নিত্য নির্জ্জন ও নিরত্যয় স্থানে বাস, অহিংসা, সত্য, অবলম্বনে পরাস্বাপহরণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের অধ্যয়ন, মন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতার পূজা।

ভগবান কপিলদেব জ্ঞানী ও যোগীপুরুষদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বলিলেন। অতঃপর ভক্তি পথাবলম্বিদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বলিতেছেন।

"নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেন মহীয়সা।
ক্রিয়া যোগেন শস্তেন নাতি হিংস্রেন নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্য দর্শন স্পর্শ পূজাস্তত্যভিবন্দনৌ।
ভূতেষু মদ্ভাবনা সত্ত্বেনাসঙ্গমেবচ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানমনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নাম সংকীর্ত্তনাচ্চমে।
আর্জ্জবেনার্য্য সঙ্গেন নিরহং ক্রিয়য়া তথা॥"

অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীর্য্যবান শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান, যথোপযুক্ত দানাদি,বৈধ হিংসা ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে অহিংসার অনুশীলন, মদীয় প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শ, স্তুতি ও বন্দনাদি দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য। জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সম্মান, গুণহীন জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, সমতুল্য ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দাস্থাপন, অহিংসা, যম, নিয়ম, ও শৌচাদি, নিত্যকর্ম্ম মোক্ষশাস্ত্রের অনুশীলন, আমার নামসংকীর্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ এবং অভিমানাদি পরিত্যাগ।

"মদ্ধর্ম্মনো গুণৈ রতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুত মাত্র গুণং হিমাং॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিত সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্তঃ কুরুতে হর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাপ্নানমীশ্বরং।
হিত্বাচর্চ্চং ভজতে মৌঢ়াত্তস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষত পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্ন দর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তি মৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরঃ মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতং॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মানুরাগী পুরুষগণ এতাদৃশ গুণগ্রামের পরিশীলনে পবিত্রচিত্ত হইয়া মদীয় গুণ এবং মধুর লীলাবার্ত্তা শ্রবণে আকৃষ্ট হন এবং অনায়াসে আমাকে লাভ করেন। আমি অন্তর্যামী এবং অধিনায়করূপে জীব মাত্রেরই অন্তরে সদা অবস্থিত থাকি, কিন্তু অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ মৎস্বরূপ উপেক্ষা করিয়া যে সকল সংসারী মানব প্রতিমার পূজা করে, তাহাদের অর্চ্চনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সর্ব্বভূতের অন্তরে সর্ব্বান্তর্যামী প্রত্যাগাত্মভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে অবলোকন না করিয়া, মূর্খতাবশতঃ যাহারা প্রতিমাকেই পরম উপাস্যজ্ঞানে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের সে অর্চ্চনা কেবল ভস্মে আহুতিপ্রদান করা হয় মাত্র। দেহাদিতে অভিমানবশতঃ নষ্টদৃষ্টি নরগণ ভেদজ্ঞানে ভূতবর্গের প্রতি বৈরতানিবন্ধন পরকীয় শরীরের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা আমারই দ্বেষ করিয়া থাকে এবং এতাদৃশ আচরণে তাহারা কখনই চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারে না। হে সর্ব্বদোষ বর্জ্জিতে! মানবগণ উত্তম মধ্যম নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহে এবং বহু পরিশ্রমে প্রতিমাপূজার উপলক্ষে আমারই অর্চ্চনা করে বটে, কিন্তু যদি তাহাদিগের মনোমধ্যে জীবগণের প্রতি ওরূপ দ্বেষ-ভাব থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের উপর কখনই সন্তুষ্ট হই না। কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে যে পর্য্যন্ত মানব নিজ হৃদয়মন্দিরে নিরন্তর অবলোকন করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি অর্চ্চনা অবলম্বনে আমার পূজা করা তাহাদিগের পক্ষে বিধেয়।

"ততোবর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।

ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো অর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান স্বধর্মকৃত।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ ॥" *

অর্থাৎ এই মানবকুলের মধ্যে যাহারা বর্ণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত তাহারা সাধারণ মনুষ্য জাতীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, বেদাধ্যায়ীর মধ্যে বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। সামান্য বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে যিনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন মীমাংসক তিনিই আদরণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সংশয়চ্ছেত্তা মীমাংসকও যদি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে সতত মনোযোগী থাকেন, তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক আদরণীয় এবং পূজ্য। এই সকল লোকের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ অন্যের প্রতি কোন প্রকার বিদ্রোহাচরণ না করিয়া কেবল নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনে ভগবানের অর্চ্চনা করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

ভগবান কপিলদেব ভক্তি-পথাবলম্বী জ্ঞানী এবং যোগী-জনগণের কার্য্য সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে জ্ঞানী, যোগী অথবা ভক্ত সকলকেই বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে. বর্ণাশ্রমকে অতিক্রম করিয়া যে কোন সাধনা করা হউক না কেন সকলই পণ্ডশ্রম মাত্র। বর্ণাশ্রম বিধি-বোধিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারাই ক্রমশঃ বিষয়-বাসনা পরিহারপূর্ব্বক শান্ত গুণাবলম্বনে ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পন করিতে সক্ষম হওয়া যায়, এবং সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি হয়, এ সংসারে কাহাকেও মিত্র অথবা শত্রুজ্ঞান থাকে না, অতএব বর্ণাশ্রমই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্বর্গ বা মুক্তির একমাত্র উপায়।

এক্ষণে আর একটী বিষয় বিচার করা আবশ্যক। প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেব দুইবার দুই কথা বলিয়াছেন যে, "যাহারা মূর্খতাবশতঃ প্রতিমাকেই পরম উপাস্যজ্ঞানে অর্চ্চনা করে তাহাদিগের সে অর্চ্চনা ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয় মাত্র।" এই কথাতে যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে প্রতিমা-পূজা নিরর্থক, বা কল্পনা মাত্র। কারণ কপিলদেব আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে মদীয় প্রতিমার দর্শন, স্পর্শ, পূজা স্তুতি ও বন্দনাদি দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং ইহাই প্রতিমা-পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সূর্য্যদেবকে ধারণা করিতে হইলে, যেমন দর্পণ অথবা জল মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব দর্শন করা প্রয়োজন, চিরকালই যদি এইরূপ দর্পণ অথবা জল লইয়া অতিবাহিত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সূর্য্য-দর্শন হওয়া কদাচ সম্ভব নহে; সেইরূপ প্রতিমাকে, কেবলমাত্র প্রতিমা বলিয়া পূজা করিলে কোন ফলই হইবে না। পরম ভক্তিসহকারে, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে, প্রতিমাতে তৎস্বরূপে চিন্তনীয়, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অনুসন্ধান করিয়া, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে একমাত্র তিনিই অধিষ্ঠিত ইহাই চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহাই প্রতিমা-পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

* শ্রী[illegible] শাস্ত্রীকৃত অনুবাদ ও আভাস।

শরতে বঙ্গ।

(গল্প)

যে দিন অন্তিম-শয্যায়-শায়িত প্রিয়তমা ভার্য্যা সুরবালাকে মহেন্দ্রনাথ শ্মশানের চিতাভস্মে পরিণত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সেদিন তাঁহার আর সংসারের প্রতি কোন টান রহিল না, সংসার যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত-কন্দরে বিধাতা যে দৃঢ়-বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, সেটীর কথা তখন তাহার মনে উদয় নাই। কালের গতিপ্রভাবে যখন দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল এবং শোকের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন তাঁহার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা আনন্দময়ী তাঁহাকে যেন সংসারের সহিত আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

মহেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেন, এখন পেন্সন লইয়া শেষ জীবনের শান্তি উপভোগ করিবার মানসে বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু বিধাতা বাম, তাই তাঁহার ভাগ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত দুঃখের ভার চাপাইয়া দিলেন। মহেন্দ্রনাথ চাকরী করিয়া বেশ সঙ্গতি করিয়া লইয়াছিলেন। অনেক জায়গা, জমী, পুকুর, বাগান প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছিলেন। পাড়া প্রতিবেশীরা জানিত, মহেন্দ্রনাথ একজন ধনী লোক। শুনিয়াছি—ব্যাঙ্কেও না কি তাহার অনেক টাকা জমা আছে।

মহেন্দ্রনাথ যেমন কন্যা আনন্দময়ীকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন, আনন্দময়ীও সেইরূপ মাতৃহারা হইয়া পিতার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। আনন্দময়ীর বয়স ১০ বৎসর হইলেও সংসারের অনেক বিষয় সে এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কিসে তাহার পিতার মন প্রসন্ন থাকে, কিসে তাঁহার কোনরূপ অযত্ন না হয়,—এই সব বিষয়ে আনন্দময়ী সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। পিতা স্নান করিতে যাইবেন, আনন্দময়ী গামছা, তেল যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছে; স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িবেন, আনন্দময়ী শুষ্ক কাপড়খানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিতা ভাত খাইবেন, আনন্দময়ী সম্মুখে বসিয়া পাখা হাতে করিয়া ব্যজন করিতেছে। পিতার পা টিপিয়া দেওয়া, স্বহস্তে তামাক সাজা—এ সমস্ত কায আনন্দময়ীর ছিল। মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেও আনন্দময়ী তাহা শুনিত না, সে বলিত,—"বাবা, আমার ত কোন কষ্টই হয় না, আপনি কেন বারণ করেন? মা ত চলে গেছেন, আমি কি আপনার সেবাও কর্‌তে পাব না?" বলিতে বলিতে যখন আনন্দময়ীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তখন মহেন্দ্রনাথ আর কোন কথা বলিতে পারিত না; কেবল এইরূপ কন্যা-রত্ন তাহার ভাগ্যে দেওয়াতে মহেন্দ্রনাথ মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতেন।

কিন্তু এক এক সময়ে যখন তাহার মনে হইত যে, এ সুখও বিধাতা তাহার ভাগ্যে বেশী দিন লেখেন নাই; আনন্দময়ীর বিবাহ

দিতে হইবে, সে ত তাহার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, তখন বৃদ্ধ যেন ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন, তাহার মাথা ঘুরিয়া পড়িত, সমস্ত যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হইত। মহেন্দ্রনাথের আর কোন সন্তান-সন্ততি নাই; শেষ বয়সে এই কন্যা-রত্ন লাভ করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিতব্যের গর্ভে এমন এক দিন নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট আছে, যেদিন তাহাকে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধ সেই দিনের কথাই মনে করিয়া যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিতেন। হায় ভাগ্য!

(২)

দিন ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না; সুখে হউক, দুঃখে হউক, যে রকমেই হউক, দিন কাটিয়া যাইবেই।

পত্নী-বিয়োগের পর মহেন্দ্রনাথের দিনও কোন রকমে কাটিতে লাগিল। আনন্দময়ী এখন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার বিবাহের জন্য বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় পাত্রের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মনোমত বর সহজে মিলিল না; ঘর ভাল হয় ত বর ভাল হয় না, আর বর ভাল হয় ত ঘর ভাল হয় না; আবার যেখানে দুইই ভাল পাওয়া যায়, সেখানে বাজার দর অত্যন্ত চড়া। এই রকম নানা প্রকার দেখিয়া শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, মেয়ের বয়স বেশী হইয়া যাইতেছে বলিয়া পাড়ার লোকের মাথা-ব্যথা তাহার নিজের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে, তখন বৃদ্ধ স্থির করিল যে যেমন করিয়াই হউক, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিবেন; তবে আনন্দময়ী তাহার অতি স্নেহের অতি আদরের একমাত্র কন্যা, তাহাকে ত জলে ফেলিয়া দিতে পারেন না; এবং ঘর ও বর দুইই ভাল দেখিয়া দিবেন, তাহাতে তাহার যত টাকাই লাগুক।

রামপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্র জিতেনের সহিত আনন্দময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হইল; জিতেন্দ্রনাথ বি, এ পাস করিয়া এম, এ পড়িতেছেন; বেশ শান্ত শিষ্ট নব্য প্রকৃতির যুবক।

লোকে বলিত, অনুকূল বাবু অতিশয় কৃপণ, প্রাতঃকালে তাহার নাম করিলে সেদিন একাদশী করার পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ কিংবদন্তী; কিন্তু লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করিয়া লইতে প্রস্তুত নই। এই দেখুন না, লোকে বলে, সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এখন অন্যরূপ প্রমাণ করিতেছেন। লোকে বলে, অন্ধকূপ-হত্যা হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কেহ প্রমাণ করিতেছেন, ওটা সবই ভুয়া; লোকে বলে, ঔরঙ্গজেব দুষ্ট ছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, না তিনি অতি সদাশয় ছিলেন। যাক্ সে সব কথা। লোকের কথার কোন মূল্য নাই।

আমাদের ত বিশ্বাস হয় না যে, অনুকূল বাবু কৃপণ। আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি। যে দিন অনুকূলের পুত্রের সহিত মহেন্দ্রনাথের কন্যার সম্বন্ধ স্থির হয়, সে দিন

ভাবী বৈবাহিকদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা হইতে বোধ হয় না যে, অনুকূল বাবু কৃপণ। পাঠক একটু শুনুন না :—

অনুকূল। তা হ'লে, মহেন্দ্র বাবু, এইবার বিবাহের দিন স্থির করা যা'ক।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, তবে কি না—

অনুকূল। তবে আর কি, আর ত কোন কথা নাই।

মহেন্দ্র। দেনা পাওনা·

অনুকূল বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, মহেন্দ্র বাবুর কথায় বাধা দিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"মহেন্দ্র বাবু, বলেন কি ? আমি কি ছেলে বিক্রী করতে বসেছি। ছেলের বিয়ে দিব, তাহাতে আবার দেনা পাওনার কথা কি ! আপনার কন্যা, আপনার জামাতা, আপনি যা' পারবেন তাই দিবেন ; এতে আমার কিছু বলবার নাই।"

মহেন্দ্রনাথ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। তিনি ত' অনেক জায়গায় মেয়ের বিবাহের জন্য ঘুরিয়াছেন, কিন্তু অনুকূল বাবুর ন্যায় সদাশয় লোক তিনি কাহাকেও দেখেন নাই। মহেন্দ্রনাথ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। অমন বর অমন ঘর আর এরূপ সুবিধা তিনি আর কোথায় পাইবেন ?

যাহা হউক, স্থির হইয়া গেল, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে বিবাহ হইবে।

আচ্ছা, লোকের কি নিন্দা করাই স্বভাব ? লোকে বলিল,--অনুকূল বাবু বিনা পণে বিবাহ দিবার পাত্রই নয়, ভিতরে ভিতরে কি বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিয়াছেন। ছেলের প্রতিজ্ঞা যে, তাহার বিবাহে পণ গ্রহণ করিলে সে বিবাহ করিবে না ; সেই জন্য ছেলেকে পণের সম্বন্ধে কিছু জানিতে না দিয়া প্রকাশ্যে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। আর এমনও হইতে পারে যে, মহেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা তাহার বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী দেখিয়া অনুকূল বাবু পণের কোন কথাই তুলেন নাই।

আমরা বলিতে পারি না,এ সব কথার মূলে কোন সত্য আছে কি না ?

(৩)

বিবাহের আর চারিদিন বাকী আছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, মহেন্দ্রনাথের ব্যাঙ্কে যে সব টাকা ছিল, তাহা তিনি সমস্তই তুলিয়া আনিয়াছেন।

বিবাহের ঠিক তিন দিন পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথের বাটীতে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া তাঁহার নগদ ও অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল সমস্তই লইয়া গিয়াছিল। হায়, হায়, বিধাতা তাঁহার কপালে এমন হরিষে-বিষাদ ঘটাইয়া দিলেন ! মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

যথাসময়ে অনুকূল বাবুর নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। তিনিও প্রমাদ গণিলেন। বড় আশায় মহেন্দ্রনাথের কন্যার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহ দিতেছিলেন ; সে আশা এখন তাঁহার নির্ম্মূল হইল।

মহেন্দ্রনাথ ভাবী বৈবাহিকের নিকট আসিয়া তাহার বিপদ জানাইলেন। অনুকূল

বাবু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"তাই ত, মহেন্দ্র বাবু, কি করিয়াই বা কন্যার বিবাহ দিবেন, আমার বিবেচনায়, বিবাহ এখন স্থগিত রাখুন, পরে সুবিধা মত দিবেন।"

মহেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, অনুকূল বাবু কোন রকমে সম্বন্ধটী ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না, চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল, অনুকূল বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অনুকূল বাবু, রক্ষা করুন, এ বিপদে আপনি আমায় না রক্ষা করিলে আমার মান-সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।"

অনুকূল বাবু। কি জানেন বিয়ের কথা, একি সহজে হয়; কথায় বলে, লক্ষ কথায় বিয়ে হয়।

"আপনি যা' চান, আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি।" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ যোড়করে প্রার্থনা জানাইল। হায় মহেন্দ্রনাথ, কেন কন্যার পিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এ যে বাঙ্গালা দেশ, এখানে তোমার কন্যার বিবাহ এত সহজে হইবে,এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিও না। অনুকূল বাবু তখন নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন মহেন্দ্র বাবু, আমি ছেলে বিক্রয় করিতে বসি নাই। তবে কি জানেন, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, আর যা' দিবেন তা' আপনার কন্যা ও আপনার জামাতারই থাকবে। ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই। উহারাই সুখী হবে। আজকাল জানেন ত, জার পাস করা বরকে কন্যা দিতে হ'লে কত টাকা লাগে। আপনি সেই রকমই দিবেন, তার এক পয়সা বেশী আমি চাই না। সালঙ্কারা কন্যা আর নগদ চার হাজার টাকা, পারবেন ত।"

মহেন্দ্রনাথ কাতরস্বরে বলিলেন,—"নগদ টাকা, চা—র হা—জা—র টাকা, আপনি ত সবই জানেন, কোথায় পাই বলুন, ডাকাতে সব নিয়ে গেছে।"

অনুকূল বাবু। "কেন জায়গা জমী ত আছে?" নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নু অনুকূল বাবু নিঃসঙ্কোচে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার আর কি আছে? কন্যাই তাহার একমাত্র সংসারের বন্ধন, সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি কন্যাটী ভাল যায়গায় পড়ে, তাহা হইলেও এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার মনে কিছু শান্তি আসিবে।

অবশেষে স্থির হইল যে, মহেন্দ্রনাথের বাস্তভিটা ছাড়া যে সব জায়গা জমী আছে, তাহা কলাই অনুকূল বাবুর নিকট বন্ধক রাখিবেন। তবে এ কথা কেহ ঘূণাক্ষরেও না জানিতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুকূল বাবু মহেন্দ্রনাথকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন; বিশেষতঃ, তাহার পুত্র শুনিলে বিবাহ নাও হইতে পারে। আরও কথাবার্ত্তা রহিল যে, আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যেই এই বন্ধক উদ্ধার করিতে হইবে।

(৪)

বৈশাখ মাসের ২৩শে তারিখে বিবাহ

হইয়া গেল। বিবাহের সময় টাকা কড়ি কিছু আদান-প্রদান হইল না, বরং অনুকূলবাবুই ঘর হইতে অলঙ্কারাদি আনিয়া কনেকে দিলেন। সংবাদপত্র মহলে অনুকূল বাবুর জয়জয়কার পড়িয়া গেল। এরূপ বিনাপণে বিবাহের দৃষ্টান্ত কয়টা লোক দেখাইতে পারে?—বটেই ত, সাধু! সাধু!!

লোক বন্ধক দেয় শুধিবার আশায়; মনে করে,এমন দিনই কি আমার চিরকাল থাকিবে, দুঃখের পর সুখ কি আসিবে না? কিন্তু হায়, আশামরীচিকা! মহেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন, যদি ডাকাতির কোন কিনারা হয়, যদি জিনিষগুলি ফিরাইয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসের মধ্যে তিনি সমস্ত শুধিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, ডাকাতির কোন কিনারা আর হইল না; অবশেষে, আশ্বিন মাস আসিল। অনুকূল বাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনাথ আত্মীয়ের নিকট অপমানিত হইবার ভয়ে যে সব জমী বন্ধক রাখিয়াছিলেন, তাহা অনুকূল বাবুরই নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, কেহ জানিল না; বন্ধক পরিশোধ করিয়া যে টাকা রহিল, তদ্দ্বারা নিজের শেষ জীবনটা কোন রকমে কাটাইয়া দিবার মনস্থ করিলেন।

শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি, শরতে কি মোহন মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে! মাঠের সেই নয়নাভিরাম মধুর ছবি, সেই ঢেউ খেলান ধান্য-ক্ষেত্র, বায়ু-হিল্লোলের সেই শ্রুতিসুখকর সর্-সর্ শব্দ, আকাশের সেই মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল স্নিগ্ধোজ্জ্বল বক্ষঃস্থল, প্রকৃতির সুন্দর নীরবতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রফুল্লতা, শ্যামল বিটপী-রাজির অন্তরালে বিহগকুলের মধুর কূজন বাস্তবিকই হৃদয়ে এক স্বর্গীয় শান্তি আনিয়া দেয়। আনন্দময়ীর আগমনে আজ সকলেই যেন আনন্দিত হইয়াছেন, সকলেই যেন শান্তি-সুধা উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু মা! ঐ যে সব ধান্যক্ষেত্র,উহারই মধ্যে যে বাঙ্গালীর কত দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে! ঐ শ্যামল ধান্য-ছায়ার মধ্যে কত বিষাদের উষ্ণ শ্বাস যে বহিয়া যাইতেছে! বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাঠ, বাঙ্গালার ঘাটের সহিত যে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের অনেক দুঃখের কাহিনীর ছাপ লাগিয়া আছে! মহেন্দ্রনাথের ধান্যক্ষেত্র আজ আর মহেন্দ্র-নাথের নহে; শরতে তাহা শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কন্যার বরপণজনিত এক বিষাদের ইতিহাস অঙ্কিত হইয়াছে।

মহেন্দ্রনাথের মনে আর সুখ নাই, তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। শেষ জীবনে একে একে তাঁহার যেন সমস্ত চলিয়া যাইতেছে। বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পরিজন প্রভৃতি সবই গিয়াছে। আছে কেবল আনন্দময়ী; পিতার এরূপ ভাব দেখিয়া আনন্দময়ী একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন,—"কেন বাবা, আপনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকেন?"

পিতা। "না মা, বিমর্ষ আর কি? তোমাদিগকে সুখী দেখে মরতে পারলেই আমার সুখ।"

কন্যা। "বাবা আপনি আমার কাছে

লুকোচ্ছেন কেন? আপনার কিসের জন্য মনে কষ্ট হয়েছে বলুন। ঘরে সর্ব্বদা বসে থাকা অপেক্ষা মাঠে এক একবার ধান দেখ্‌তে গেলে আপনার মন প্রফুল্ল হ'তে পারে।"

পিতা। আনন্দময়ী! মা আমার! তুই আমার যথার্থ মা। মা না হ'লে কি সন্তানের কষ্ট বুঝ্‌তে পারে? মাঠে আর কি যা'ব, মা, তোর কাছে লুকিয়ে আর কি হ'বে; মাঠে যে আমার জমী নাই— " বলিতে বলিতে মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া আনন্দময়ীর হাতে পড়িতে লাগিল; আনন্দময়ীও কাঁদিতে লাগিল। পিতা এবং কন্যা এইরূপ ভাবে কিয়ৎকাল শোকবিহ্বল হইবার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, মহেন্দ্রনাথ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। এতদিনে তাহার দুঃখের ভারগ্রহণ করিবার একজন অংশীদার পাইয়া মহেন্দ্রনাথের নিজের হৃদয়ের দুঃখও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

অগ্রহায়ণ মাসে আনন্দময়ীর দ্বিরাগমনের দিন স্থির করিয়া অনুকূলবাবু পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সে পত্রের উত্তর দিতে মহেন্দ্রনাথের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; প্রথম যে পত্রখানা লিখিয়াছিলেন, তাহা অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল, সমস্ত কথাও তাহাতে ঠিক লেখা হইল না। সে পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর অর্দ্ধঘণ্টা উপাধানে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রহিলেন। অবশেষে অতিকষ্টে চারিছত্রে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। আনন্দময়ীও পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে জানিয়া বিষাদে মগ্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করিবে? নারী-জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য ত তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

তারপর সেই বিদায়ের দিন;—কেমন করিয়া সে দুঃখেরকাহিনী লিখিব? বৃদ্ধের শেষ আশা-ভরসা, শেষ আশ্রয়স্থল—সেই স্নেহময়ী কন্যাকে যে দিন তিনি বিদায় করিলেন, তাঁহার সে দিনের দুঃখের ভার নিরূপণ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আহা হা! আনন্দময়ী যখন অশ্রুপূর্ণলোচনে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ফিরিয়া আসিয়া আপনার হাসিমুখ দেখিতে পাই।" তখন "এসো মা" বলিবার পর পিতা ও কন্যার যে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহাতে সে স্থলের ভূমি আর শুষ্ক রহিল না।

(৫)

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, মানুষের যখন দুঃখের মাত্রা অধিক হয়, তখন মানুষ অনেকটা শান্ত-প্রকৃতি ধারণ করে। দুঃখের প্রথম আঘাত কিংবা বজ্রাঘাতে লোক বিহ্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু এইরূপ আঘাত যদি উপর্য্যুপরি হইতে থাকে, কিংবা আঘাত গভীর হইতে গভীরতম হইতে থাকিলে, সে বিহ্বলভাব আর থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যভাব আসিয়া পড়ে; তখন তাহা নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ সরসী-বক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া মহেন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা হইল।

যে সকল জমী মহেন্দ্রনাথ অনুকূলবাবুকে

বিক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে সে বৎসর খুব সরু ধান হইয়াছিল। অনুকূলবাবু তাহা বাড়াই করিয়া একটী পৃথক গোলায় রাখিলেন। আনন্দময়ী তাহার পিতার জমীর ধান দেখিয়া পিতার বিষণ্ণ-বদনের কথা মনে করিতে লাগিল, বুকটা তাহার ছাঁাৎ করিয়া উঠিল।

একদিন ঐ ধানের চালে অনুকূলবাবুর বাড়ীতে পায়সান্ন প্রস্তুত হইল। সকলে আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন। আনন্দময়ী কিন্তু তাহা স্পর্শও করে নাই। রাত্রে তাহার স্বামী জিতেন্দ্রনাথ তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"তুমি পায়স খাইলে না কেন? আমাদের জমীতে এ বছর ভাল ধান হয়েছে, তারই চালের পায়স, খাইবে না কেন?" তখন আনন্দময়ী বলিয়াছিল,—"আমি উহা ভালবাসি না।" এই কথা কয়টী বলিতে তাহার চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিয়াছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক দেখিতে না পাইলেও অনুমান করিতে পারি যে, নিশ্চয়ই এরূপ হইয়াছিল।

তারপর বৈশাখ মাসে আনন্দময়ীর বাপের বাড়ী আসিবার কথা, কিন্তু আসিতে পারিল না। তাহার শ্বশুরের ভয়ানক অসুখ। জ্বর-অতিসারে ৩৪ মাস ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি শ্রাবণ মাসের শেষে ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

জিতেন্দ্রনাথের ঘাড়ে সংসারের সমস্ত ভার পড়িল। এতদিন জিতেন্দ্রনাথ বিষয়-কার্য্য কিছুই দেখিতেন না, নিজের বিদ্যাচর্চ্চা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাহাকে সমস্ত দেখিতে হইল।

একদিন পিতার সিন্দুক খুলিয়া জিতেন্দ্রনাথ তাহার শ্বশুরের লিখিয়া দেওয়া তাহার পিতার নাম বরাবর বিক্রয় কবালাখানি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আগ্রহের সহিত দলিলের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া জিতেন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল,—তাহাতে লেখা আছে,—"আমার কন্যার বিবাহ আপনার পুত্রের সহিত হইয়াছে, কিন্তু বরপণের টাকা যোগাড় করিতে না পারায় উক্ত পণের দরুণ ৪০০০৲ টাকা ও অলঙ্কারাদি বাবদ ২০০০৲ টাকা একুনে ৬০০০৲ টাকার জন্য আমি আপনার নিকট তপসীল বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াছিলাম। একণে তাহা পরিশোধ করিবার অন্য কোন উপায় না থাকায় আপনার নিকট উক্ত সমুদয় সম্পত্তি ৮০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া" ইত্যাদি। জিতেন্দ্রনাথ দেখিলেন,—তিনি যে বরপণের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, তাহার পিতা তাহাকে সেই পণের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাহার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তিও এ জন্য বিক্রীত হইয়াছে। জিতেন্দ্রনাথ আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিলেন। সে দুঃখের কাহিনী আনন্দময়ী স্বামীর নিকট বিবৃত করিতে করিতে সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। কেন সে এতদিন তাহার নিকট ইহা প্রকাশ করে নাই, কেন সে পায়স ভালবাসে নাই বলিয়াছিল, প্রভৃতি হৃদয়ের সমস্ত কথাই মনের আবেগে স্বামীর নিকট জানাইল।

নিজেকে বিক্রীত করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য কায আর নাই—এইরূপ ধারণা জি-

নাথ বরাবর হৃদয়ে পোষণ করিতেন; তাই, সেইদিনই আমলাদের দ্বারা একখানি দলিল লিখাইয়া ফেলিলেন; ইহার দ্বারা শ্বশুরের সমস্ত বিষয় তিনি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অভিলাষে লেখা-পড়া পাকা করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিন মাসে আনন্দময়ীর বাপের বাড়ী আসিবার দিন স্থির হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথের আর আনন্দের সীমা নাই। আজ এই শুভ শরতে আনন্দময়ীর আগমনে মহেন্দ্রনাথের গৃহ সত্য সত্যই আলোকিত হইয়া উঠিবে। তাঁহার হৃদয়-কন্দর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

নির্দ্ধারিত দিনে মহেন্দ্রনাথ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া পথপানে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে দুইখানি পাল্‌কী আসিয়া সদর দরজায় থামিল। জিতেন্দ্রনাথ ও আনন্দময়ী নামিলেন; দুইজনে মহেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। জিতেন্দ্রনাথ শ্বশুরের পদতলে সেই দলিলখানি রাখিয়া বলিলেন—"এই নিন্, আমি আমার বিবাহের সময় আপনার নিকট বিক্রীত হইয়াছিলাম, আজ আমার দেনা পরিশোধ হইল। গত বৎসর আপনার জমীতে যে সব ধান হ'য়েছিল, তাহাও গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিতেছে। আপনি কোন দ্বিধা করিবেন না, এ সব আপনার, আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।" মহেন্দ্রনাথ যেন থতমত হইয়া গেলেন, দলিল পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপারখানা কি? তারপর জামাতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি আজ ধন্য, তোমার ন্যায় যুবক যদি বাঙ্গালা দেশে জন্মাত তা' হ'লে আজ কন্যার বাপেদের এ দুর্দ্দশা ভোগ কর্ত্তে হ'ত না, তুমিই আজ আমার হৃদয়ে শরতে-বঙ্গের পূর্ণ আনন্দ প্রদান করলে; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও।" কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, ধান্য বোঝাই সারি সারি গরুর গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সব ধান্য মহেন্দ্রনাথের গোলায় তোলা হইল।

ওদিকে আনন্দময়ী বাড়ীর ভিতর যাইয়া প্রথমে বাড়ীর সংলগ্ন ধানের ক্ষেত দেখিতে গেলেন। সেই নবীন শ্যামল ধান্য ক্ষেত্র, সেই শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, সেই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য—আর তাহারই মাঝে সেই পূর্ণানন্দময়ী, দেবী-স্বরূপা, অনিন্দ্যসুন্দরী আনন্দময়ীর মূর্ত্তি প্রকৃতই শরতে বঙ্গের কি যেন একটা মন-মাতান, মোহন-ছবি জাগাইয়া তুলিতেছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল্।

উত্থান ও পতন।

(১)

কাল যারে হেসেছিনু সহাস্য-বদনে,
ক্রোড়ে লয়ে শিশু সুতে খেলিছে কৌতুকে
ধারে বারে মাতা তার যে অমূল্য ধনে
বুক দিয়ে চাঁদ মামা আয় আয় ডাকে!

(২)

তার সে আনন্দধ্বনি দিগন্ত বাতাসে,
তুলেছিল প্রতিধ্বনি গগন ভেদিয়া,
মুখপানে চেয়ে তার হৃদিভরা আশে
কতই আশার ঢেউ গিয়াছে বহিয়া!

(৩)

আজ সেই শোকাকুলা একাকিনী হ'য়ে,
কাঁদিছে এলায়ে বেণী হ'য়ে উন্মাদিনী।
আজ তার ভাঙ্গা হৃদে শোকাশ্রু বহিয়ে,
চারিদিক্ হ'তে উঠে বিষাদের বাণী।

(৪)

হা বিধাতঃ! একি তব জগতের রীতি?
কেন এ নিঠুর প্রথা ও শিশুর প্রতি?
তার সে স্বরগ-জ্যোতিঃ পুণ্য সে প্রভায়
কোন্ পাপরেণু আসি কলঙ্কিল তায়?

(৫)

কেমনে বুঝিবে প্রভো! মোহমুগ্ধ নর,
কেমনে বুঝিবে সে গো "উত্থান-পতন"!
সেও যে গো সৃষ্ট জীব ধরায় তোমার
কেমনে বুঝিবে সে গো অনন্ত বিধান!

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

বাঁধনের দায়।

বিচিত্র সংসার কারা, বাঁধা পড়ি' আছি তায়।
পলাইতে পথ নাই, মায়া-বেড়ী পায়-পায়॥
মিনতি করিলে শত, নাহি তায় পরিত্রাণ।
কাঁদিতে এসেছি শুধু, কাঁদিয়া যাইবে প্রাণ॥
এ কি ঘোর অত্যাচার,—দেখি তোর রে সংসার!!
দু' দিনো জুড়াতে কভু, নাহি অবসর আর?
কেন মিছে কাঁদি-হাঁসি, তা'ও ত' বুঝি না ছাই।
ছাড়িলে ছাড়াতে নারি, হায়-হায় কি বালাই॥
কিছু ত' রবে না শেষ, মিছে ঘোর দুরাশায়।
বলিহারি এ কুহক! আসা-যাওয়া বার-বার॥
শুনিতে বাসনা নাই, গরবের গরজন।
অবসাদ জাগিয়াছে, ডুবিয়াছে প্রাণ-মন॥
মহা প্রলয়ের কোলে জগৎ ভাসিয়া যা'ক্।
অথবা নাহিক ক্ষতি, থাক্ আর নাহি থাক্॥
আসিয়াছি পথ ভুলি' পথ ভুলি' চলে' যা'ব।
বারণ করিলে শত, কারো কথা না শুনিব॥
কত দিন আঁখি-জলে ভেসে গেছে বুকখানি।
হেথা ত' সান্ত্বনা নাই মনে মনে অনুমানি॥
কিন্তু হায় নিদারুণ করমের এ কি ফল!
ছাতি ফেটে যায় তবু তৃষ্ণায় নাহিক জল;
এই ত' রে ভালবাসা! এই ত' রে প্রলোভন!
এরি তরে কি রে হায় জীবনের মহা-রণ?
না না, আজ বহু দিনে, বাজিয়াছে বাঁশী তা'র।
পিঞ্জর-দ্বারেতে পাখি, কাঁদে বসি অনিবার॥
দূর কল্পবাহী ওই শুনাইছে কল গান।
জগৎ ছাপিয়া গেছে, সে মধুর মহা-তান॥
ডাকি'ছে ফুকারি' শুধু পাপী-তাপী আয় আয়।
বাঁধনে—বিষম দায়,—ঘটাল প্রমাদ হায়॥

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এল. এম. এস, এইচ্।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ-রাজ বংশের ইতিহাস।

নবম পরিচ্ছেদ।

দর্পনারায়ণ।

রাজা গণেশ অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। তিনি পাণ্ডুয়ার বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই রাজত্বের অবসানকালে গড়ভবানীপুরে রাজা দেবনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ সিংহাসনারোহণ করেন। রাজা দর্পনারায়ণ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ হইতে তমলুক পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগের স্বাধীন ভূপতি ছিলেন। মহাবীর মহেন্দ্রের বীর্য্যবলে রাজা গণেশ বঙ্গদেশে যবনরাজ্য উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই ব্রাহ্মণ রাজগণকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ ছিলেন।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র

চৈৎমল্ উত্তর বঙ্গের সিংহাসন লাভ করেন। ইনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং মুসলমানগণের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। চৈৎমল কোন আফ্‌গান ওমরাহের সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি নিজে মুসলমান হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, বঙ্গবাসী হিন্দুগণকে ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যে ভবানীপুরের পরম হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা দর্পনারায়ণ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা দর্পনারায়ণ চৈৎমলকে সতর্ক করিবার জন্য তাহার রাজসভায় একজন বিচক্ষণ দূত প্রেরণ করিলেন।

দূত পাণ্ডুয়ার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজা দর্পনারায়ণের নিদেশ মত বঙ্গাধীপ চৈৎমল্‌কে বিনয়সহকারে বলিলেন,—"রাজন্! হিন্দু-কুল-তিলক রাজর্ষি দর্পনারায়ণ আমাকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া আপনার রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছেন; যদি আদেশ করেন, তাঁহার সমস্ত কথা যথাযথ বর্ণন করি।" দূতের এই কথা শুনিয়া চৈৎমল্ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি অতীব অর্ব্বাচীন, তোমার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই; সভ্যতার লেশমাত্রও তুমি অবগত নহ; তোমার ন্যায় মহামূর্খকে দূতের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাজা দর্পনারায়ণও অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছেন। তুমি কোন্ সাহসে আমাকে "রাজন্" বলিয়া সম্বোধন করিলে; তুমি কি অবগত নহ যে, আমি আর পুত্তলিকা-উপাসক ঘৃণাস্পদ হিন্দু নহি; আমি আর কাপুরুষোচিত জাতি-বিচার গ্রাহ্য করি না, হিন্দুদিগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বর্ব্বরোচিত আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লামের সুমার্জ্জিত সুরুচিপূর্ণ রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছি! তুমি কি জান না যে, বিলাস-বিভ্রমবিহীনা, ব্রতোপবাসনিরতা, নৃত্যগীতানভিজ্ঞা, হিন্দুললনা আর আমার অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হয় না— তুমি কি অবগত নহ যে, আমি আর রাজা চৈৎমল নহি, আমি এখন সুল্‌তান জেলাল-উদ্দিন? যাহা হউক, রাজা দর্পনারায়ণ যখন তোমাকে পাঠাইয়াছেন তখন তোমার কি বক্তব্য আছে নির্ভয়ে বল; তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম; অন্য কাহারও মুখ হইতে এরূপ বাক্য উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইত।" দূত নির্ভীক-ভাবে, জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,— "আমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র শোণিত আমার শিরায় শিরায় এখনও প্রবাহিত হইতেছে, আমি জীবনের মমতা রাখি না; বিশেষতঃ, আমি দূত, আপনার অধীন প্রজা নহি যে, আপনি আমার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন। হিন্দুকুলাবতংস পরম ধার্ম্মিক রাজা গণেশের পুত্র যে নিজেকে রাজা বলিতে অপমান বিবেচনা করেন—ইহা অত্যন্ত ঘৃণার কথা। যাহা হউক, আপনাকে শিক্ষা দিবার আমার অধিকার নাই এবং আবশ্যকও বিবেচনা করি

না। মহারাজ, দর্পনারায়ণ যাহা আমাকে বলিতে বলিয়াছেন—শ্রবণ করুন।

"যবন-রাজ্য উচ্ছেদ মানসে বীরবর রাজা মহেন্দ্র মহাযুদ্ধে বঙ্গাধীপ, মহা অত্যাচারী কুকর্ম্মাসক্ত সামসুদ্দিনকে নিহত করিয়া পরম ধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ, বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি আপনার পিতাকে বঙ্গ-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আপনার পিতাও প্রাণপণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণের অভাব-মোচন করিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও বলে তাহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কিন্তু আপনি এই মহাপ্রাণ ধার্ম্মিক পিতার আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহার অক্ষয় নাম, অনন্ত কীর্ত্তি মহা পাপ-পঙ্কে প্রোথিত করিয়া হিন্দুর নাম পর্য্যন্তও চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতল সলিলে বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছেন; আপনি বঙ্গদেশের রক্ষকরূপে ভক্ষক হইয়া বসিয়াছেন—আপনি বল প্রয়োগ করিয়া হিন্দু প্রজাগণকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইতেছেন। হিন্দুগণ মুসলমানগণের দ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতেছে, আপনি তাহার প্রতিবিধান না করিয়া বরং উৎসাহ দান করিতেছেন—আপনি হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছেন, সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছেন, আপনার অত্যাচারে আবার বঙ্গদেশ হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে—আপনার এই সমস্ত অপকর্ম্ম ও অত্যাচারে আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি। আপনার পিতার সহিত আমাদের পরম বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু আপনার ব্যবহারে সে বন্ধুত্বভাব আর রাখিতে পারি না। আপনি আমাদের, কেবল আমাদের কেন, সমস্ত বঙ্গদেশের একজন মহাবন্ধুর পুত্র, সেই জন্য আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনি যদি এইরূপ অত্যাচার বন্ধ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে সাম্‌-সুদ্দিনের দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া দূত নীরব হইল। জেলালের চক্ষুদ্বয় হুতাশনের ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মহাক্রোধভরে কোষনিবদ্ধ অসি নিষ্কোষিত করিয়া দূতের মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু দূতের প্রাণবধ করিলে মহারাজ দর্পনারায়ণের রোষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িবে বুঝিতে পারিয়া আত্মসংযম করিলেন এবং দূতকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া রাজ-সভা হইতে বিদূরিত করিলেন। দূতও ক্ষিপ্র-পদে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ দর্পনারায়ণ দূতমুখে জেলালুদ্দিনের দম্ভপূর্ণ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং বঙ্গবাসী দুর্ভাগ্য হিন্দু-নরনারীগণের দুঃখ দূরীকরণ মানসে উদ্যোগী হইলেন। তিনি দেখিলেন—যখন জেলালুদ্দিন তাঁহার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে, তখন তাহার সহিত যুদ্ধ না করিলে উপায়ান্তর নাই; তরবারির দ্বারা শিক্ষাপ্রদান না করিলে তাহার চৈতন্যোদয় হইবে না। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা দর্পনারায়ণ বহু সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; এবং রাজা মহেন্দ্রের

পুত্র কুমার যোগেন্দ্রকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া স্বধর্ম্মত্যাগী পাপাত্মা জেলালকে রাজ্যচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কুমার যোগেন্দ্র অগণিত সমরকুশল বীর্য্যবান্ সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডুয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডুয়া অবরোধ করিলেন। রাজা দর্পনারায়ণের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিলেই পাণ্ডুয়া নগর। সেইজন্য জেলাল শত্রু-সৈন্যের আগমন পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, এবং শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুতও হইতে পারেন নাই। কুমার যোগেন্দ্রের সৈন্যগণ পাণ্ডুয়া বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। বাগ্দী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দুগণ পদাতিক-সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত ছিল। ইহাদের সমর-কৌশল অতীব আশ্চর্য্যজনক। ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইহারা অতি দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত। ইহাদের তাণ্ডব সমর-নৃত্যে মেদিনী কম্পিতা হইত, ইহাদের ভৈরব হুঙ্কারে গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত। বঙ্গদেশীয় লাঠিয়ালগণের লাঠি খেলিবার সময় তালে তালে ভয়ঙ্কর নৃত্য ও লোকভয়ঙ্কর 'কু'-ধ্বনি বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। যদি একজন লাঠিয়াল এই 'কু' ধ্বনি করে, মনে হয় যেন শত শত লোক এক সময়ে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। এরূপ বিভীষণ সমর হুঙ্কার পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয় বীরপুরুষ করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বঙ্গবীরগণের ন্যায় তরবারি চালনের অদ্ভুত কৌশল অন্য জাতির যোদ্ধারা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহারা ঢালের দ্বারা নিজ দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া মৃত্তিকার উপর পড়িয়া থাকিত, মনে হইত যেন একটী ঢাল মাত্র মাটিতে পড়িয়া আছে কিন্তু শত্রু নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সলম্ফে তরবারি হস্তে উত্থিত হইয়া শত্রু বধ করিত। তাহাদের প্রায় চারি পাঁচ হস্ত পরিমিত গুলি-বাঁশের লাঠি লোহার পাতে বাধান থাকিত। এরূপ সুকৌশলে তাহারা লাঠি চালনা করিতে পারিত যে, তীর কিংবা ঢিল ছুড়িয়া মারিলে উহা লাঠিতে লাগিয়া ভূপতিত হইত, কদাপি গাত্রস্পর্শ করিতে পারিত না। বঙ্গবীরগণ দুই হাতে দুই লাঠি সবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত্রুব্যূহ অবলীলাক্রমে ভেদ করিতে পারিত। তরবারি, তীর, বর্শায় তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিত না। তাহারা লাঠিতে ভর দিয়া ঘণ্টায় দশ বার মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইত।

জেলালও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নর-শোণিতে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইল। কখনও জেলালের পক্ষ জয়যুক্ত হইতে লাগিল, কখনও বা যোগেন্দ্র জয়লাভ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে অগণিত লোকক্ষয় হইতে লাগিল এবং দেশমধ্যে ভীষণ অশান্তির ছায়া পতিত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে মতিলাল শর্ম্মণ নামক এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। বিশেষতঃ, জেলালের পিতা রাজা গণেশ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। পণ্ডিত মতিলাল রাজা

গণেশের সাহায্যে বহু সংস্কৃত পুস্তক প্রণয়ন করেন। জেলালুদ্দিন মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও পণ্ডিত মতিলালকে সম্মান করিতে ত্রুটি করিতেন না।

বঙ্গের তৎকালীন সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত মতিলাল দেশের এরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং তাহার প্রতিকারকল্পে রাজ-সেনাপতি যোগেন্দ্রের শিবিরে উপনীত হইলে মহাবীর যোগেন্দ্র তাহার যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মন্! যুদ্ধস্থলে ভবাদৃশ জনের আগমনের কারণ বলিয়া আমার উদ্বেগ দূর করুন! আপনি কি কোন মূঢ়ের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন কিংবা আপনার কোন অত্যাহিত সংঘটিত হইয়াছে? শীঘ্র বলুন, আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—"বৎস যোগেন্দ্র, তুমি জেলালের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেন বৃথা লোকক্ষয় করিতেছ? ইহাতে যে দেশের বিশেষ কিছু উপকার হইবে, তাহা নহে। বরং মুসলমানগণ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া থাকিবে এবং সুবিধা পাইলেই তোমার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে। আমার ইচ্ছা, তুমি এই ভীষণ সমর হইতে নিবৃত্ত হও।"

ব্রাহ্মণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর যোগেন্দ্র বলিলেন,—'আপনি মহা পণ্ডিত; বলুন দেখি, হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে এরূপ পাষণ্ডের সহ যুদ্ধ অনিবার্য্য কি না? স্বধর্ম্মত্যাগী পাপাত্মা নিজে মুসলমান হইয়াই ক্ষান্ত হইল না, হিন্দু প্রজাগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে। এরূপ অত্যাচার জীবিত থাকিয়া কিরূপে সহ্য করা যাইতে পারে।

যোগেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—"দেখ যোগেন্দ্র, আমাদের দেশ কপটাচারী লোকে পূর্ণ হইয়াছে; হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, অর্থই এখন এ দেশের লোকের একমাত্র আরাধ্য বস্তু হইয়াছে, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তুমি মুসলমানের সহ যুদ্ধ করিয়া দেশের কোন উপকারই করিতে সমর্থ হইবে না। ভাবিয়া দেখ না কেন, তোমার দেশে মুসলমান কিরূপে আসিল! হিন্দু-কুল-কলঙ্ক, মহাপাতকী, স্বদেশদ্রোহী, কাপুরুষ জয়চন্দ্র না সাহায্য করিলে কি মহম্মদ ঘোরী কোন কালে ভারত-জয়ে সমর্থ হইত? বেহারের রাজপুত্রকে কৌশলে স্থানান্তরিত না করিলে ও বঙ্গাধীপ বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষ স্বার্থান্ধ মন্ত্রীকে বশীভূত না করিতে পারিলে কি বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ-বেহার বিনাযুদ্ধে অধিকার করিতে সমর্থ হইত? কখনই নহে। তবেই বুঝিতেছ না যে, মহানারকী ভারতবাসীর সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্যই ভগবান ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী। এই মুসলমান-রাজ্য এখন ভারতে সুদৃঢ় হইয়াছে। মুসলমানের অত্যাচারে বৃথা হিন্দুনামধারী ধর্ম্মদ্বেষী, হিন্দু-আচারবিদ্বেষী, হিন্দু-কুল-কলঙ্ক ভারতবাসী যখন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িবে, যখন মুসলমান রাজগণের সন্তোষ-বিধানের জন্য নিজেদের ধন, মান, প্রাণ—এমন কি, পুত্র-পরিবার পর্য্যন্ত

তালি দিতে বাধ্য হইবে, তখন কুলাঙ্গারগণ বুঝিবে, তখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইবে। হিন্দুধর্ম্মের শাসনে থাকিলে, মানুষ এত নীচ স্বার্থপর হইতে পারে না। অধুনা অধিকাংশ ভারতবাসী নামে হিন্দু মাত্র; কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের শাসন মানে না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পশ্বাচারই এখন তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু নামটী মাত্র রাখিয়া মুসলমানের আচার-ব্যবহার অনুকরণে সর্ব্বদা ব্যস্ত। মুসলমানগণের পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাস দেখিয়া ভারতের নর-নারী অভিভূত। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, দেহ ক্ষণবিধ্বংসি; ইন্দ্রিয়-সুখই তাহাদের জীবনের প্রধান সুখ হইয়া পড়িয়াছে সংক্ষেপতঃ তাহারা কুকুর, শৃগালাদি ইতরজন্তুর ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কার্য্যে জগতের মঙ্গল ও আনন্দ উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্য সম্পাদনে যতই বিপদ ও দুঃখ থাকুক না কেন, তাহাতে অবিনশ্বর অতুল আনন্দ নিহিত আছে, তাহা উন্নতচেতা ধার্ম্মিক মহাত্মা ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হিন্দুগণ যখন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল, তখন তাহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যে, গৌরবে মেদিনী পূর্ণ হইয়াছিল। এখন তাহারা অধঃপতিত; শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, পীড়া, অত্যাচার প্রভৃতি দ্বারা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত না হইলে তাহাদের চৈতন্য হইবে না। তাহারা এক্ষণে বিকারগ্রস্ত। কিছুতেই নিজ হিত বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যুদ্ধ করিয়া জেলালকে পরাস্ত করিতে পারিলেও ভারতবাসীর মনের ভাব দূর করিতে কি সমর্থ হইবে? রাজা গণেশ যখন বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় বিষয়ে তাঁহার কতই না আশা হইয়াছিল, কিন্তু কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে? তাঁহার স্বীয় পুত্র মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর মহাশত্রু হইয়া উঠিয়াছে। তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ ভারতবাসীই হৃদয়ে মুসলমান ভাব পোষণ করিতেছে ও সেই ভাবে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে, এই মোহময় ভাব তাহাদের হৃদয় হইতে যতদিন না দূরীভূত হইবে, যতদিন না তাহারা নিজেদের প্রকৃত সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে, ততদিন হিন্দুদের উন্নতির কোন আশা নাই। অতএব বৎস! যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া দেশের লোক যাহাতে প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।"

পণ্ডিত মতিলালের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন,—"যুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন কি প্রকারে নিবৃত্ত হইব, অধিকন্তু তাহাতে লোকে আমাকে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিবে, এবং জেলালও আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ছারখার করিবে।"

পণ্ডিত মতিলাল উত্তর করিলেন,—"বৎস, চিন্তিত হইও না; এই যুদ্ধে জেলাল যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; আমি এখনই তাহার নিকট গমন করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিব; আমার বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই ইহাতে স্বীকৃত হইবে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"আপনি যদি জেলা-

লের সভায় গমন করেন, তাহা হইলে, তাহার নিকট প্রস্তাব করিবেন—সে যেন হিন্দুধর্ম্মের ও জাতির উপর অত্যাচার না করে। তাহা হইলে যুদ্ধ পুনর্ব্বার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।"

অতঃপর পণ্ডিত মতিলাল, জেলালের সভায় উপস্থিত হইয়া' যোগেন্দ্রের প্রস্তাব তাঁহার গোচর করিলেন এবং জেলালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি হিন্দুর জাতি ও ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিলে, রাজ্যমধ্যে চির সমরানল প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

পণ্ডিত মতিলালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জেলাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার পিতা আপনাকে গুরুর ন্যায় বিবেচনা করিতেন, এবং আমিও আপনাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। যদি সেনাপতি যোগেন্দ্র সসৈন্যে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আমি আর কখনও হিন্দু-প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিব না।"

এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য মতিলাল শর্ম্মার চেষ্টায় সমরানল নির্ব্বাপিত হইল এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হইল।

জেলালুদ্দিন পণ্ডিত মতিলালের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায়-মুকুট" উপাধি দান করেন; এবং এই যুদ্ধের পরে রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করিয়া ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

জেলালের মৃত্যুর পর হইতেই উত্তরবঙ্গে মুসলমান রাজাগণ হীনবল হইয়া পড়েন এবং রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সময়ে গড় ভবানীপুরের সিংহাসনে ক্রমান্বয়ে উদয়নারায়ণ, সত্যনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ ও শিবনারায়ণ নামধেয় চারিজন ব্রাহ্মণ রাজা নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গ সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভুরশুট পরগণার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের নামানুসারে উদয়নারায়ণ পুর, প্রতাপপুর, শিবপুর প্রভৃতি গ্রাম স্থাপিত হয়। এখনও ঐ সমস্ত গ্রাম পূর্ব্ব নামে পরিচিত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত নরপতিগণের রাজত্বকালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; কিম্বা লোকপরম্পরায়ও এই সকল নৃপতি সম্বন্ধীয় কোন কাহিনী শ্রুতি-গোচর হয় না। তবে রাজা সত্যনারায়ণের রাজত্বকালে গৌড়ে হোসেন-সা নামক একজন মুসলমান রাজা প্রবল হইয়া উঠেন। হোসেন-সা বঙ্গের অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গ নিজাধিকার ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু রাজা সত্যনারায়ণ পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ ভূভাগ ছাড়িয়া দিয়া হোসেন-সার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

মন।

মদমত্ত করী পারি করিতে বন্ধন,
রজ্জু হাতে যেতে পারি সিংহের সদন,
গিরি চূর্ণ করিবারে পারি অনায়াসে,
সাগরে ডুবিতে পারি, উড়িতে আকাশে,
জগতে কিছুই মোর অসাধ্য দেখি না,
সবারে জিনিতে পারি, মনকে পারি না।

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

আশার প্রতি।

(১)

কি বলে সম্বোধি তোমা আশা সুহাসিনি!
তোমার মধুর হাসি
সদা দুঃখ-তমঃ নাশি
ঢালে হৃদে সুখ-জ্যোতিঃ মৃতসঞ্জীবনী।

(২)
তুমি দীন-হীন জনে অভয়দায়িনী।
তোমার অভয় বলে
পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চলে
উত্তুঙ্গ অচলশ্রেণী হিম কিরীটিনী।
(৩)
(তুমি) স্নেহময়ী মাতাসম শান্তিবিধায়িনী।
তোমার স্নেহের বলে
শোক-জ্বালা সবে ভুলে
নিরানন্দ নরে তুমি আনন্দদায়িনী।
(৪)
মুমূর্ষু নরের তুমি জীবনদায়িনী।
শক্তিহীন বৃদ্ধ নর
পাইয়া তোমার বর
হৃষ্ট হয় যুবা মত অয়ি সুহাসিনি!
(৫)
ঈশের দর্শন আশে যোগী ঋষিগণ
বসি যবে যোগাসনে
সেই পদ ভাবে মনে
জীবন অন্তিম কালে লভিতে নির্ব্বাণ।
(৬)
তদা কাম-ক্রোধ আদি ষড়রিপুগণ
নব জলধর মত
ঢালে বর্ষা অবিরত
সে প্রাণের দীপ্ত অগ্নি করিতে নির্ব্বাণ।
(৭)
সে প্রাণে নিরাশা তমঃ ঘনায় যখন
স্বজ্যোতিতে আলো করি—
অয়ি দেবি শুভঙ্করি!
তুমি তার প্রাণে অগ্নি জ্বালহ তখন।
(৮)
তুমি পথ দেখাইয়া চালায়েছ মোরে
বাণীর চরণোপরে
দিতে অর্ঘ্য ভক্তিভরে
আপন অভিষ্ট লাভ করিবার তরে।
(৯)
বিদ্রূপের শতধারা পড়িয়া যখন
বন্ধুদের ওষ্ঠ হ'তে
মোর জীবনের পথে
ভাসাইয়া জ্ঞান, মান করিবে হরণ।
(১০)
ঘনাইবে অন্ধকার জীবনে তখন
নিজ গুণে দয়া করে
তুমি দেবি হাতে ধরে
আমারে লইয়া, দিও শান্তি অনুক্ষণ।
(১১)
অয়ি প্রপঞ্চক! তোর এ খেলা কেমন?
চঞ্চলা চপলা মত
ক্ষণ উজলিয়া পথ
দ্বিগুণ আঁধারে মোরে ত্যজেছ এখন।
(১২)
সকলে মোহিত দেখি তোর সেই হাসি
(তোর) অধরে মধুর হাসি
হৃদয়ে গরল রাশি
হাসিতে ভুলিয়া তাই আঁখি জলে ভাসি।
(১৩)
সে হাসিতে আর কভু ভুলিব না মিছে
উন্মত্ত মাতঙ্গ মত
ছাড়িয়া বাসনা-রথ
আর কভু ছুটিব না তোর পিছে পিছে।
(১৪)
যা' করেন পরমেশ তাহাই মঙ্গল
নর-জন্ম হোক ব্যর্থ
না থাকুক মান অর্থ
তবু তোরে স্মরি নাহি চাহি অর্থ-বল।
(১৫)
সিদ্ধি-নীর লাভ তরে দুষ্ট কুহকিনি!
মরুভূমে মৃগপ্রায়
কত ভ্রমাইলি হায়!
নগর নগরী শৈল সাগর তটিনী।
(১৬)
কি বলে সম্বোধি তোমা কহ সুহাসিনি।
পাপীয়সী মায়াবিনী,
অথবা শান্তিদায়িনী
কি বলে সম্বোধি তোমা কহ সুহাসিনি!

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ সাল।

আর্য্য

আর্য্য—দেবতা। অনার্য্য—দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি। ধর্ম্মদ্বেষী, নাস্তিক, দস্যু ব্যবসায়ীরা প্রাচীনকালের অনার্য্য। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী আস্তিকগণই প্রাচীন সময়ের আর্য্য।

ঋ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় যোগে আর্য্যপদ নিষ্পন্ন। ঋ ধাতুর সাধারণ অর্থ গমন। এ অর্থে যাহারা যাযাবর, পরিব্রাজক তাঁহারাই আর্য্য। গৃহ নির্ম্মাণে উদাসীন, ঈশ্বর-উপাসক, শান্ত প্রকৃতি ব্যক্তিগণই প্রকৃত আর্য্য। ঋ ধাতুর একটী অর্থ চাষ করা। প্রথম যাহারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া চাষ-বাস দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন তাহারা আর্য্য। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যেতর মানবগণ পশুদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের কাঁচা মাংসই ভোজন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও শস্ত্র-বিদ্যায় আর্য্যগণ শিক্ষিত ছিলেন।

আর্য্য-পদের আভিধানিক অর্থ অনেকগুলি, তন্মধ্যে প্রথম অর্থ পূজ্য। গুরুস্থানীয়-গণ পূজ্য, গুরুস্থানীয়েরা আর্য্য। শিষ্যের নিকট গুরু, ছাত্রের কাছে অধ্যাপক আর্য্য। সম্মানিত ব্যক্তিমাত্রেই আর্য্য। প্রাচীনকালে যাঁহারা এইরূপ পূজ্য পদবীতে সমারূঢ় হইবার যোগ্য ছিলেন, তাঁহারা আর্য্য। পতির পিতা অর্থাৎ শ্বশুর স্ত্রীলোকের নিকট আর্য্য-পদে অভিহিত হইতেন।

আর্য্য শব্দের আর একটী অর্থ পবিত্র। "যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ" বলিয়া মহাকবি কালিদাস এই অর্থের ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শান্ত দান্ত উপাসক, যাঁহারা জীব-জগতের মঙ্গলে যত্নবান্, পাপ পরিহারে অবহিতচিত্ত, নিজেদের পারত্রিক কল্যাণার্থ চেষ্টাবান্, তাঁহারাই প্রকৃত আর্য্য।

আর্য্য শব্দের অপর একটী অর্থ জ্ঞানী। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ক্ষুদ্র বুদ্ধিবৃত্তিমূলক সাধারণ জ্ঞানও এই জ্ঞান। এই জ্ঞানী অর্থে ব্রহ্মবাদী ঋষিবৃন্দ হইতে অধ্যয়নরত দ্বিজমাত্রেই আর্য্য। বৈদিক ঋষিগণ হইতে জিতেন্দ্রিয় তপঃ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ আর্য্য। দেশরক্ষক, বেদ ব্রাহ্মণরক্ষক ক্ষত্রিয়েরা আর্য্য। কৃষি বাণিজ্য-সেবী বৈশ্য, সেবাপরায়ণ সৎশূদ্র মাত্রেই আর্য্য।

যাঁহারা বেদোপনিষৎ প্রচারক, সংহিতা-

পুরাণানুশাসনে শাসিত, স্বর্গার্থী, মুমুক্ষু, তাহারা আর্য্য। সরস্বতী-তীরে যাহারা শত মন্ত্রপাঠ করিয়া সামবেদের ঝঙ্কারে তপোবন প্লাবিত করিয়া, যজুর্মন্ত্রে যজ্ঞতীয়াগ্নিতে আহুতি দিয়া দেশের মঙ্গল বিধান করিতেন, তাঁহাদের আর্য্য আখ্যা। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, ধনুর্ব্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, অঙ্ক, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়নে অধ্যাপনে যাঁহারা বড় ছিলেন, তাঁহাদেরই আর্য্য নাম। আম মাংস ভক্ষণে একান্ত বিরত, কৃষ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে উদ্যুক্ত, শরণাগতবৎসল, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণই প্রকৃত আর্য্য-পদবীর যোগ্য। বিবাহ যাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্য, সংসার যাঁহাদের গার্হস্থ্যাশ্রম, অধ্যয়ন যাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ, তাঁহারাই আর্য্য নামের অধিকারী।

চতুর্থ অর্থ সৎকুলোদ্ভব, আভিজাত্য সৎকুলে জন্ম প্রভৃতি মানবের মঙ্গলের নিদান। অনার্য্য হইতে বিশেষত্ব এইখানেই সুব্যক্ত। সাধারণতঃ জারজ কখন সৎকুলোদ্ভব হইতে পারে না, কাজেই তাহারা আর্য্য নহে। স্বাতন্ত্র্য, পবিত্রতা, আভিজাত্য অটুট রাখিবার জন্য আর্য্যগণ আর্য্য।

আর একটী অর্থ শ্রেষ্ঠ। পূজ্য পবিত্র সৎকুলোদ্ভব সুসভ্য ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র এতই বিস্তীর্ণ যে, ইচ্ছামত অনেক অর্থ করা যাইতে পারে। অজ জন্মরহিত, অজা প্রকৃতি। এই অজ ও অজার অর্থ ছাগ ও ছাগী না হইতে পারে তাহা নহে। কোন কোন ব্যক্তিদের নিকট এইরূপ নূতন অর্থ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্বাধীন চিন্তাশীলতার নামে যে কত যথেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার চলিয়া যাইতেছে, তাহা কে লক্ষ্য করে। ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা অর্থ হয় বলিয়া ভারতীয় প্রাচীন মহাত্মাগণ কৃষক ছিলেন এমন কথাও শুনিতে পাই। আমরাও কৃষিবিদ্যা জানি, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি—এই অর্থে আমাদিগকে কেহ যদি কৃষক বলেন, তাহা হইলে আমরা কি সন্তুষ্ট হই? হাসির কথা "সেই আর্য্য কৃষকগণ লাঙ্গল হস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে আপন মনে যাহা মনে আসিত তাহাই গান করিতেন—ইহাই বেদ।" হায় কি মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা, ভারতের পণ্ডিতদের মধ্যেও দুই একজন এই মতাবলম্বী, বেদ কি ইহাই? সেই অপৌরুষেয় জ্ঞানময় বেদ কি চাষার গান? জগতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরমার্থ তত্ত্ব প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে সকল অশরীরিবাণী ঋষিগণের তপঃপূত অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাই বেদ। সেই অশরীরিণী দৈবী বাণী, সেই নিত্য অপৌরুষেয় ব্রহ্মনিশ্বাস স্বরূপা বাক্ ভারতের ধর্ম্মের মূল, জ্ঞানের আকর অভ্যুদয়ের হেতুভূত সেই শ্রুতি চাষার গান? আম-মাংস ফল-মূলই পূর্ব্বে মানবের খাদ্য ছিল, আর্য্যগণ কৃষি-বিদ্যার প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহারা স্বহস্তে লাঙ্গল দিতেন মানিতে হইবে? রাজর্ষি জনক যে যজ্ঞস্থল কর্ষণ করেন—তাহা ধর্ম্মমূলক আচার নিবন্ধন। সাবিত্রী-ব্রতের পরদিন লাঙ্গল দিয়া গৃহ-প্রাঙ্গন কর্ষণ করা এখনও আচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে,

সেই আদর্শ জ্ঞানী, কর্ম্মী মহারাজ স্বহস্তে কৃষকদের মত চাষ করিতেন ?

বেদের একটী নাম শ্রুতি আর তাহা গুরুপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। ইহাতে কেহ এমন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতেরা লিখিতে জানিতেন না। অদ্ভুত যুক্তি! পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথা, এজন্য আমাদের তেমন দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এখনও নব্য ন্যায়ের অনেক যুক্তিতর্ক গুরুপরম্পরাক্রমে মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার অনেকগুলি কোথাও লেখা পর্য্যন্ত নাই, উত্তরকালের বংশধরগণ সিদ্ধান্ত করিবেন, বাঙ্গালার নৈয়ায়িকেরা লিখিতে জানিতেন না!

আর্য্য—এই শব্দের চারিটী ধার বা দিক আছে। প্রথম পূজ্য, দ্বিতীয় জ্ঞানী, তৃতীয় পবিত্র, চতুর্থ সৎকুলোদ্ভব। আর্য্য চতুর্ব্বিধ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অনার্য্য মিশ্রণ শূদ্রদিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে ঘটিয়াছে বলিয়া শূদ্র যে অনার্য্য তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ, বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণও যে শূদ্র মধ্যে পরিগণিত না হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। নচেৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই কেন ?

আমাদের এই চতুর্ব্বিধ বিভাগ আজ প্রাচীনকাল হইতে অনেক বিষয়েই দেখা যায়; বেদ চতুর্ব্বিধ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। অথর্ব্ব বেদ—কেবল ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ (চৌবে) আছে; অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত উপনিষৎ আছে, তবে কেমন করিয়া বলিব অথর্ব্ববেদ—অধ্যাত্মজ্ঞান-গ্রন্থ বেদ নহে। তবে কোথাও অবশ্য বেদ তিনটী বলিয়াও উক্ত আছে।

আর্য্যদের আদি পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, চতুর্হস্ত,পিতৃস্থানীয় প্রজাপতিও চতুর্হস্ত ছিলেন। আর আর্য্যদের উপাস্য ব্রহ্মও চতুষ্পাৎ, তিনটী পদ যথাক্রমে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ, চতুর্থ পদ স্বাত্ম স্বরূপে। আর বামন অবতারেও তিনটী পদ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে, আর একটী পদ তাঁহার পরম ভক্ত বলিরাজের মস্তকে। নারায়ণ, কালিকা দেবী প্রভৃতিও চতুর্হস্ত। নারায়ণের চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। বেদমাতা গায়ত্রীও চতুর্হস্তা। চতুর্হস্তে "বরদাঙ্কুশাক্ষমালাং কমণ্ডলুধরাং" গায়ত্রীর ধ্যানও করি।

আর্য্যদের দেবদেবী সাধারণতঃ চতুর্হস্তা। মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন বলিয়া বা ধর্ম্মের সেবক ছিলেন বলিয়া আর্য্য চতুষ্পাৎ। ধর্ম্মেরও চারিটী পদ যথা দয়া, দান, সত্য ও সরলতা। এই অর্থে আর্য্য দয়ালু, দাতা, সত্যবাদী ও সরল।

আমাদের গৃহে, সংসারে, কাব্যে, নাটকে, পুরাণে ও দর্শনে আর্য্যশব্দের অতীব প্রভাব দৃষ্ট হয়। যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা স্পৃহনীয়, যাহা সুন্দর, যাহা পবিত্র,তাহাই আর্য্য। সে আর্য্য কাহারা ? ভারত যাঁহাদের লীলাক্ষেত্র, জগৎ যাঁহাদের নিকট নতশির, ঐহিক সুখ যাঁহাদের কাছে তুচ্ছ—সেই জগতের শিক্ষাগুরু আর্য্য কোথায় ? সেই সুন্দর, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ জাতির বংশধর

আমরা সে আর্য্যনামের উপযুক্ত আছি কি ?

আর্য্যের সে মহদ্গুণ, সে জ্ঞান-জ্যোতি কোথায় ? আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি, অতীতের জ্ঞানগুরু ভারতে আছে কেবল শূদ্রত্ব ও বৈশ্যত্ব। প্রকৃত সেবাপরায়ণ শূদ্রও মেলে কি ? আমরা যজ্ঞোপবীত গলায় রাখি, তাহার মর্য্যাদা কতটুকু রাখি ? জপ, তপ, ধ্যান, তিতিক্ষা, সংযম ও ধারণার দিকে অগ্রসর হইবার কৈ চেষ্টা করি ? দয়া, দান, আতিথ্য, সারল্য, সত্য, বিনয়, প্রভৃতি আর্য্য-গুণের কতটুকু অনুকরণ করি ? আর্য্যের প্রকৃত বিশেষণ আমাদের নাই ; তবে আমরা তাঁহাদের সন্তান বলিয়া যা' গৌরব অনুভব করি এই মাত্র। রাজা নাই, রাজপুরী নাই—গ্রাম যেমন রাজাপুর—সেইরূপ মত নহে কি ?

এই আর্য্যগণ কোথা হইতে আসিয়াছেন—এ লক্ষ বাদ বিসংবাদ না করিয়া তাঁহারা যেরূপ ছিলেন, সেইরূপ হইতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ভারতের আর্য্য মধ্য এসিয়া হইতে, ককেসস পর্ব্বত হইতে, মরুভূমি হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন—এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিত আলোচনা করুন। আমরা জানি ভারতেই এই গৌরবর্ণ জাতির নিবাস। যে কারণে মধ্য এসিয়ায় সেই গৌরবর্ণ জাতির আবাসস্থল মানা যায়, সেই কারণেই ভারতের অধিবাসীই বা না বলা হয় কেন ? হিমালয়ের পাদদেশে ব্রহ্মবর্ত্ত দেশই তাহাদের আদিম নিবাস। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি আর্য্যজাতির বাসস্থান হইল। আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা ভারতের অধিবাসী নন বলিয়া অণুমাত্র সংশয় আমাদের মনে জাগে নাই। মধ্য এসিয়ায় আর্য্যজাতির আবাস ছিল তাহার কোন বর্ণনা সংস্কৃত গ্রন্থে দেখি না। হইতে পারে, পাশ্চাত্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ মধ্য এসিয়া বা ককেসস পর্ব্বত হইতে ইউরোপে গিয়াছিলেন ; তাহাতে কি ভারতের অধিবাসীকে তাঁহাদের বংশধর বলিতে হইবে ? ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়, পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, আর্য্যেরা ভারতের অধিবাসীই ছিলেন।

আমরা আর্য্য—এ কথাটীতে কত গৌরব, কত সুখ বিরাজিত আছে। আর্য্যপদে যে প্রাণময়ী শক্তি, যে ধর্ম্মময় বীজ, যে তপঃপূত জ্ঞান-জ্যোতি মনে পড়ে, তাহার অধিকারী আমরা কি হইব না ? কালেও কি সে ভাব ফিরিয়া আসিবে না ?

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

মাহিষ্য-কবি দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মী-চরিত্র।

মেদিনীপুর জেলার কাশীযোড়া পরগণার অন্তর্গত ভোগপুর ষ্টেসনের অনতিদূরে কিশোরচক চণ্ডীতলা নামক গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবি দয়ারাম দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচয় সাহিত্য-সমাজে প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশের শান্তিপ্রিয় পরিশ্রমী কৃষক সম্প্রদায়ের গৃহে

নিত্য নিত্য যে "লক্ষ্মী-চরিত্র" নামক পুঁথি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার রচয়িতা এই কবি দয়ারাম দাস। মেদিনীপুর জেলার সাধারণ লোকের মুখে এখনও কবি দয়ারামের অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

তিনি বাল্যকালে প্রথমে স্বগ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া নিজ প্রতিভা-প্রভাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি দেবী কমলার বরে কবি হইয়াছিলেন। বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশঃ গভীর চিন্তাশীল হইতে লাগিলেন। এমন কি কিছুদিন পরে মধ্যে মধ্যে আহার ও শয়নের কথা ভুলিয়া যাইতেন। প্রবাদ আছে, একদিন তিনি নিশীথকালে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথা চলিয়া যান। দুই দিবস খোজ খবর করিয়া কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৃতীয় দিবস সায়ংকালে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বগৃহে আবির্ভূত হইলেন। তিনি এইভাবে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে যে কেবল আনন্দিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তৎপরে তিনি দেশবাসী জনসাধারণকেও আনন্দিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার পরে প্রকৃত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দেবী কমলার উদ্দেশে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়াছিলেন। দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণীর বেশে শ্রীচরণ দর্শন দিয়াছিলেন ও বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্ত তিনি "কমলার বরপুত্র" নামে প্রসিদ্ধ। কবি তাঁহার স্বরচিত পুস্তকেও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে,

> "দয়ারাম দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র।
> ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা যারে দিল গীত॥"
> "দয়ারাম দাস গায় কমলার বরে।"
>
> ইত্যাদি।

কিশোরচক গ্রামে একটী স্থান এখনও অতীত বৃত্তান্তের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ঐ স্থানে শ্রীশ্রী৺চণ্ডীদেবীর ভগ্ন মন্দির আছে। দেবীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। উক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম "চণ্ডীতলা" বা চণ্ডীপাড়া হইয়াছে। ঐ স্থানের দৃশ্য এরূপ মনোরম ছিল যে দেখিলেই দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইত। ইহা দেবদেবীর বাগান বা বাগিচাপাড়া নামেও অভিহিত হইত। কথিত আছে, কবি ঐ স্থানে কমলাদেবীর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছিলেন। স্থানটীর দৃশ্য যেরূপ রমণীয় তাহাতে সহজেই ভাবুকের চিত্ত আকুলিত হইয়া কবিত্বের উৎস ছুটিত। এই কবিকুঞ্জে তিনি নিজের উন্মেষশালিনী প্রতিভার প্রভাবে নিত্য নব নব মাল্য রচনা করিয়া মাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন।

কবির নিকট অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহারা আহার ও বাসস্থান পাইত। কাশীযোড়াধিপতি শামবীর রাজা তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কবি স্বরচিত "লক্ষ্মী-চরিত্র" পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন:—

"কাশীজোড়া মহাস্থান, মহারাজা নন্দনারাণ,
ধন্ত ধার্ম্মিক নরপতি।
হয়্যা তার পুস্তিষ্ঠীত, দয়ারাম রচে গিত।"
(১২৬৮ সালের হস্তলিখিত পুঁথি)

অনেকে বলেন তাঁহার উপাধি 'বেরা' ছিল; কমলার বর প্রাপ্তির পর তিনি কমলার দাস এই অর্থে দাস উপাধি লয়েন। কবির সন্তানের মধ্যে একটী কন্তা ছিলেন। তাঁহার নাম মতি দেবী। ঐ গ্রামের ভীমাচরণ সামন্ত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত ঐ কন্তার বিবাহ হয়। কথিত আছে ভীমাচরণ সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন। তিনি কবির অনেক সঙ্গীতাদির তান-লয় সংশোধনে সহায়তা করিতেন।

ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ভীমাচরণের বংশ-লতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

৺ভীমাচরণ + ৺মতিদেবী
|
৺রসিকমোহন + ৺অহল্যা
|
৺অদ্বৈত + বিলাসিনী ৺নিত্যানন্দ ৺চৈতন্ত + গৌরী
|
ঈশ্বর (বয়স ২৪ বৎসর) + গিরিবালা

এই বংশের একমাত্র বংশধর শ্রীমান ঈশ্বর-চন্দ্র সামন্ত দীনভাবে উক্ত গ্রামে জীবন যাপন করিতেছেন। যেখানে কবির বাসস্থান ছিল, সেই স্থানটী প্রায় ৭৮ বিঘা হইবে। উহার মধ্যে একটী পুকুর এবং উহার চারি পাশে বৃত্তাকারে একটী পরিখা বা গড় কাটা আছে। এখনও ঐ পুকুরটীকে 'কবির পুকুর', গড়টীকে 'কবির গড়' এবং স্থানটীকে 'কবির বাড়ী' ও 'কবির ভিটে' বলিয়া থাকে।

কবি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকের কোন কোন স্থানের ভাব সংগ্রহ করিয়া পত্তের ছন্দে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কলঙ্কভঞ্জন, শিবায়ণ, লক্ষ্মীচরিত্র, তরণী সেনের পালা, ধর্ম্মায়ণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, গোবিন্দমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবরামের যুদ্ধ ও শব্দরূপ এই কয়খানি গ্রন্থ বহু চেষ্টা করিয়া ভোগপুর ছাত্র-সম্মিলনীতে সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্ত গুলি গ্রন্থই ছিন্নভিন্ন ভাবে রহিয়াছে। আজকাল অনেক পাঁচালী-গায়ক আছেন, তাঁহারা কবির গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং স্বীকার করেন যে,—"আমরা কবি দয়ারামের অনুগ্রহে বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি!" যদি তদানীন্তন সময়ে আজকালকার মত মুদ্রাযন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে কবি দয়ারাম আজ সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। চৈত্র মাসের 'গাজনের' সময় অনেক ভক্ত তাঁহার রচিত শিবায়ণ প্রভৃতি পাঁচালী গাহিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। পল্লীস্থ বালকেরাও কবির রচিত অনেক ছড়া গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামস্থ বালকেরা গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া ও হিসাবাদি শিক্ষা করিবার পর, হস্তলিখিত দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, লক্ষ্মীচরিত্র প্রভৃতি পুঁথি পড়িয়া পাঠ সমাপন করিত। ঐ সময়ে তাহা-দের মাতাপিতা ও শিক্ষক মহাশয় কবি দয়া-রাম রচিত—

'চাষ করি চতুর্ব্বর্গ পায় বহুতর।'

"লক্ষ্মীকে যে জন চিনে লক্ষ্মী চিনে তারে
তার দুঃখ নাহি চারি যুগ যুগান্তরে॥"
'যাহার যেমন মন সে পায় তেমন।'
"ঘৃত অন্নে ভোজন করিবে বার মাস
অভাগা কপাল যার নাহি চাষ বাস।"
"আষাঢ়ের চষা ধান্য পৌষ মাসে পাবে
অসময়ে বপিলে ফল কোথা হতে পাবে॥"

ইত্যাদি অনেক উপদেশপূর্ণ প্রবচন শিক্ষা দিতেন। মোট কথা, অনেক পল্লীগ্রামে খনার বচন প্রভৃতির সহিত কবি দয়ারাম-রচিত অনেক প্রবচন স্থান পাইয়াছে। কোন্ বচন কাহার কর্তৃক রচিত, তাহা বর্তমান সময়ে ঠিক করা কষ্টকর। প্রবন্ধ বৃদ্ধির ভয়ে কবির রচিত অনেক বচন এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল না।

কবি দয়ারাম এইরূপে অক্ষয় যশঃ অর্জন করিয়া অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে নিকটে ডাকাইয়া সকলকে শ্রীহরির নাম স্মরণ করিতে বলিয়া সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

কবি দয়ারাম দাস পরম সাধক ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে একটী বিখ্যাত শীতলা-মণ্ডপ আছে। কবি কোনও কারণবশতঃ এক সময়ে সেই স্থানে গমন করেন এবং তথায় রাত্রিযাপন জন্য একটী বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে শীতলা-মণ্ডপ আছে, এ কথা বোধ হয় তিনি জানিতেন না। তিনি সেই শীতলা-মণ্ডপের দরজার বিপরীত পার্শ্বে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। কথিত আছে, কবি যে দিকে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, শীতলা-মণ্ডপের সেই দিকের দেওয়াল তৎক্ষণাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল।

তিনি সন্ধ্যার সময়ে শিষ্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংকীর্তন করতঃ চতুর্দিক আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেন। কবি পরলোকগমন করিলে, তাঁহার শিষ্যেরা কবির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চামর ও করতালি উক্ত জেলার অন্তর্গত 'কোলেমাঝি' নামক গ্রামে "ধর্মদেবের মন্দিরে" রাখিয়া দিয়াছেন; উহা অদ্যাবধি বর্তমান থাকিয়া কবির সংকীর্তনরূপ সদনুষ্ঠানের পরিচয় দিতেছে।

"বাণিজ্যে বিস্তর দুঃখ সদা সুখ চাবে
চাকর কুকুর যেন ফিরে দেশে দেশে॥"

ইহা তাঁহার রচিত। জগতে গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্য—লোকশিক্ষা। এক একজন ক্ষণজন্মা মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া যান যে, গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাগুলি সেই দেশের অধিবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে লোকশিক্ষা পরিচালন করে। চিত্রকর যেমন চিত্রাঙ্কনের আদর্শ লইয়া অঙ্কন এবং নয়নরঞ্জন, স্বাভাবিক বর্ণ সন্নিবেশ ও উহার প্রতিফলনে কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কবিগণও সেইরূপ এক একটা ঘটনা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে সেই সমস্ত ভাব সন্নিবিষ্ট করতঃ ধন্য ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। কবি দয়ারাম দাস এ দেশের লোক ও কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত মাহিষ্য ছিলেন; সুতরাং যাহাতে কৃষিকার্যের বিস্তার হয়, কৃষিকার্যকে কেহ ঘৃণার চক্ষে না দেখে, কৃষির

উন্নতি হইলে দেশের উন্নতি হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শ্রীমান্ হওয়া যায়, ইত্যা দি বিষয়ে, যাহাতে আমাদের স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধিত হয়, তৎ-প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব কাশীযোড়াধিপতি রাজার সভায় কবির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সময়ে সময়ে কবিকে উক্ত সভায় যাইতে হইত এবং স্বরচিত নূতন নূতন পুস্তক পাঠকরতঃ রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইত। রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণ আহ্লাদিত হইয়া ধন্যবাদ এবং পুরস্কার প্রদান করিতেন। তাঁহার রচিত হস্ত-লিখিত লক্ষ্মীচরিত্র গ্রন্থে এই কাশীযোড়াধি-পতির কথা উল্লিখিত আছে। মুদ্রিত লক্ষ্মী-চরিত্র পুস্তকে কবি দয়ারাম দাসের নাম পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহাতে এইরূপ আছে:—

কাশীযোড়া মহাস্থান, নর নারায়ণ আখ্যান
ধন্য রাজা ধার্ম্মিক ভূপতি।
হৈয়া তার প্রতিষ্ঠিত কবিবর গায় গীত
তাঁর রাজ্যে যাহার বসতি॥"

এই উদ্ধৃতাংশটী অনেক স্থলে সন্দেহ উপ-স্থিত করিয়াছে। এই অংশটী বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধের মুখে কিংবা আমাদের সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথিতে ইহার অনেক বিপরীত জানিতে পারা যায়।

যুবকের নিকট পুরাতন অনেক সময় আদৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরাও অনেক সময়ে নূতন পাইয়া পুরাতন ভুলিয়া যাই ১২১৮ সালের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি লক্ষ্মী-চরিতে এইরূপ আছে:—

"কাশিজোড়া মহাস্তান মহারাজা নন্দ নারাণ
ধন্য ধার্ম্মিক নরপতি।
হয়্যা তার পৃতিষ্ঠীত দয়ারাম রচে গিত
কিশোরচকে যাহার বর্শতি॥"

১২৫৪ সালের একখানি পুঁথি হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে রাজা নন্দনারায়ণের স্থলে সুন্দরনারাণ লেখা আছে। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বোধ হয়, কবি রাজা নন্দনারায়ণের রাজত্বকাল হইতে রাজা সুন্দরনারায়ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীদীননাথ দাস পাল (?) হইতে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মাজি প্রণীত "বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র" মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হই-তেছে। উহার সহিত হস্তলিখিত পুঁথির স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অমিল আছে। আমরা জানি, বর্ণাশুদ্ধি ও পদ্যের অমিল প্রভৃতি থাকিলে সেই সমস্ত শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইলে সংস্করণ করা হয়। যথা—

"বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে
কোথক দিন কাল কাটে কুড়্যার ভিতরে॥
ভোজনে ভাজনে নাঞি ভাত্তে জল খায়।
শনি পীড়া জেন রাজা শ্রীবচ্ছের প্রায়॥"

(হস্তলিখিত পুঁথি দ্রষ্টব্য)

এইরূপ পদ্যের স্থলে সংশোধন করতঃ—

"বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে।
বাস করি থাকে সেই কুঁড়ের ভিতরে॥

জলপাত্র বিহনেতে তাতে জল খায়।
শনিপীড়া হৈল যেন শ্রীবৎস রাজায়॥"

(মুদ্রিত পুস্তক দ্রষ্টব্য)

কিন্তু 'রাজা নন্দনারায়ণ' কিংবা 'রাজা সুন্দরনারায়ণ' স্থলে নরনারায়ণ (নর দিগের নারায়ণ এইভাবে লিখিত ?), 'দয়ারাম' স্থলে 'কবিবর' (যথা—'দয়ারাম দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র' স্থলে 'কবিবর গায় গীত লক্ষ্মীর চরিত্র), 'কিশোরচক' স্থলে 'তাঁর রাজ্যে' ইত্যাদি লিখিলে সংস্করণ করা হয় না। জানি না, ঠিকানাবিহীন মাজি মহাশয় কি উদ্দেশ্যে 'কিশোরচক' ও 'দয়ারাম দাসের' নাম (দীননাথ দাস পালই কি দয়ারাম দাস ?) বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ? মুদ্রিত পুস্তকে কেবল মাত্র 'তিলোত্তমা' পালাটিতে কবি প্রহ্লাদ দাসের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও কেবল বিনন্দ রাখালের পালা ব্যতীত অন্য হস্তলিখিত কোন পালা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

(বিনন্দ রাখালের পালার অবিকল প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)

এইরূপে আমরা হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে না পারিলে কবি দয়ারাম দাসের কোন সন্ধান লাভ করিতে পারিতাম না। মুদ্রিত লক্ষ্মী-চরিত্র পুস্তকে তাঁহার নাম বিলোপ করিয়া প্রাচীন কবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালীরা কত যে বাঙ্গালী কবির স্মৃতি হারাইয়া ফেলিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভোগপুর ছাত্রসম্মিলনীতে কবি দয়ারাম দাসের রচিত কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবল বিনন্দ রাখালের পালার (লক্ষ্মী-চরিত্রের একাংশ) অবিকল প্রতিলিপি এবং ১২১৮ সালের হস্তলিখিত পুঁথির কতিপয় জীর্ণ পত্র এবং একখানি মুদ্রিত বৃহৎ লক্ষ্মী-চরিত্র পুস্তক এই প্রবন্ধের প্রামাণ্য উপকরণ স্বরূপ তথাকার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় মহাশয় আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁহার দ্বারা লিখিত। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

(গল্প)

(১)

খুড়িমা বলিলেন, "সে কিরে অমূল্য ! বৌমার সঙ্গে কি এম্নি করে ঝগড়া কত্তে হয় ? বৌমা আজ কত কেঁদে তার দুঃখের কথা আমাকে বল্লেন। আহা ! এমন করে কেন লক্ষ্মীকে কষ্ট দিস্ বাবা ?"

উক্ত খুড়িমা অর্থাৎ গ্রাম সম্পর্কীয় বৃদ্ধ হরকান্ত লাহিড়ী খুড়া মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ইনি, অর্থাৎ (খুড়িমা) অতিশয় মুখরা এবং বাচাল স্ত্রীলোক এবং বাটীতে খুড়া মহাশয়ের সহিত এক মুহূর্ত্তও ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু পাড়াপড়শীদের

প্রতি ইনি খুব সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, শুনা যায়।

যাহার হোক্ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সেই জন্যই লোকে অনেক স্থলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কথা বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। যাহা হউক খুড়িমা, অমূল্যর শুধু গ্রাম সম্পর্কীয়া খুড়িমা ছিল না, ইহা ছাড়া তাহার অন্য একটী সম্বন্ধও ছিল।

যাহা হউক খুড়িমার উক্ত কথার উত্তরে অমূল্য অতিশয় অপ্রতিভ হইল, এবং মাথা হেট করিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না।

অমূল্য হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার রায় মহিমচন্দ্র রায় বাহাদুরের জ্ঞাতি-পুত্র। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিধবা মাতা কালীসুন্দরী শোকে অধীরা হন এবং পুত্রের ভরণপোষণ বিষয়ে আত্মীয়-জ্ঞাতি মহিম বাবুকে জানান। এবং তাঁহারই ফলে, তিনি উক্ত জমিদার বাবুর বাটী হইতে মাসিক ১২৲ বার টাকা মাসহরা পাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। কালীসুন্দরী আপাততঃ সাহায্য পাইয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, পুত্র অমূল্যকুমারকে ৫।৬ বৎসর দুঃখে কষ্টে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলে আর তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না, কিন্তু এখন সে আশাতরু ফলবতী না হইয়া প্রারম্ভেই শুষ্ক হইবার উপক্রম হইল। দিবারাত্রি মাতার চক্ষের জলধারা আর নিবারণ হয় না, নিয়তই দুঃখিনী এইরূপে কাটাইতে লাগিলেন, কারণ অমূল্যকুমার পাঠ্যাবস্থা হইতেই কুসঙ্গে মিশিয়া অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীদের গুণে লেখা করিতে শিখিল। এই দলের মধ্যে জমিদার মহিম বাবুর পুত্র বিজেন্দ্রই প্রধান দলপতি ছিল। তাহার সাহায্যে ও তাহার অর্থে মদ্যাদি পান রীতিমত চলিতে লাগিল। সে কিন্তু পিতার শাসন গুণে একেবারে উৎসন্ন যাইতে পারিল না, কিন্তু অমূল্যকুমার সকল রকম অন্যান্য কুঅভ্যাস ও কুক্রিয়ায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। সুতরাং বিধবা দুঃখিনী কালী সুন্দরীর আর দুঃখের অবধি রহিল না। বিধবার একমাত্র আশা ও ভরসা এই পুত্র, তাহার এইরূপ অবস্থা দর্শনে কোন্ জননীর হৃদয় দুঃখে গলিয়া না যায়? অমূল্যকুমার পাঠত্যাগের পর হইতে প্রত্যহ ভোর ৭টায় বাহির হইতেন, এবং মধ্যাহ্ন ২টার সময় বাটীতে আহারার্থ আসিতেন, এবং আহার করিয়া আবার বাটীর বাহির হইতেন, এবং রাত্রি ১২টা বা ১টার সময় বাটী ফিরিতেন, এবং কোন কোন দিন প্রাতে বাহির হইয়া রাত্রিতে বাটী আসিতেন, কিংবা আসিতেন না।

যখন অমূল্যকুমার এইরূপ বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন জননী আর কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে মিষ্ট বাক্য ও উপদেশ দ্বারা নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু ইহা সত্বেও যখন অমূল্যকুমার কুসঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইল না, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় অমূল্য বাটী আসিবার পর মাতা অতিশয় তিরস্কার করিলেন। সেই দিনই রাত্রে অমূল্যকুমার গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। মাতা কালীসুন্দরী রক্ষিত পুত্রের বিচ্ছেদজ্বালায়

তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন, কারণ নারী জাতির, বিশেষতঃ জননীর ইহা হওয়া স্বাভাবিক।

কালীসুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে লোক দ্বারা অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। জননী পুত্রের নিরুদ্দেশে অতিশয় শোক-বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদা তাঁহার মন হু হু করিয়া জলিত, আর বলিতেন, "কেন বাছাকে বকিলাম, সে কেন নেশাখোর, পাগল হয়ে বাড়ীতে থাকুক না" ইত্যাদি। প্রতিবাসিনীরা সকলে তাহাকে নানারূপ কথা দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল না। তিনি বড় বড় জ্যোতিষীর কাছে পুত্রের ঠিকুজী-কোষ্ঠী লইয়া দেখাইলেন, সকলেই তাঁহাকে "ভাল হইবে" এইরূপ আশা দিল।

প্রায় দুই মাস পরে অমূল্যর স্বহস্ত-লিখিত এক পত্র আসিল। পত্রখানি এইরূপ :—

"মা, আমি এখন মনুষ্যত্বের বহির্ভূত হইয়াছি। সুতরাং আমার আশা ত্যাগ করুন। আমি এ জীবনে নেশা ছাড়িতে পারিব না, এবং এ মুখও আর দেখাইব না। বৃথা আমায় পাইবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া অর্থব্যয় করিবেন না।" ইতি আপনার স্নেহের অমূল্য।

পত্র পড়িয়া মাতা নয়ন জলে ভাসিলেন, এবং মনে করিলেন যে তাহার মাতুল শ্রীযুক্ত হরনাথ বাবুকে কিছু টাকা দিয়া পুত্রের অনুসন্ধানে পাঠাইবেন।

কিন্তু অর্থ কোথায়? নগদ একটী পয়সাও যে কালীসুন্দরীর নিকট নাই! শেষে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,—তাঁহার পুরাতন "বেনারসী শাড়ীখানি" ও তাহার এক জোড়া "অনন্ত" বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থ দ্বারা মাতুল মহাশয়কে পাঠাইবেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি সিন্দুক হইতে কাপড়, এবং অনন্ত বাহির করিলেন এবং তাহা লইয়া জমিদার বাবুর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্রীযুক্তা রায় পত্নীর কাপড় ও অলঙ্কার পছন্দ হইল এবং তাহা ক্রয় করিলেন। কালীসুন্দরী সর্ব্বসমেত ১৫০৲ দেড়শত টাকা পাইলেন। বাটী আসিয়া সেই মুহূর্ত্তেই মাতুল মহাশয়ের নিকট যাইয়া সেই টাকাগুলি দিলেন। হরনাথ বাবু কালীসুন্দরীর নিকট এত টাকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কাপড় ও গহনা বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং হরনাথ বাবু তাঁহার হাতে ২৫৲ পঁচিশ টাকা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "মা, এ কয় টাকা তোমার কাছে রাখিয়া দাও, আমি নিজে এ পঁচিশ টাকা দিব।"

কালীসুন্দরী অগত্যা মাতুলের অনুরোধে টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন, এবং যাহাতে তিনি সেইদিনই অপরাহ্নে রওনা হন, সেজন্য তাঁহাকে বলিয়া বাটী ফিরিলেন।

(২)

দিন গেল, রাত্রি আসিল। দিন যায়, রাত্রি আসে, কিন্তু দিন যাহা লইয়া গেল, রাত্রি কি তাহা পুনরায় আনিতে পারে? এ সংসারে দুঃখের পর সুখ, বিরহের পর মিলন, সংযোগের

পর বিয়োগ, অমানিশার পর শুক্লজ্যোৎস্নাময়ী রজনী ত আছেই। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোনও কালে পরিবর্ত্তন হইবে না।

ক্রমে কালীসুন্দরীর মানসিক অবস্থাও মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল; যেন অমানিশার ঘোর তামসী নিশীথিনী ঘনঘোর মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইল। দুঃখিনী কালীসুন্দরী প্রত্যহ পত্রের আশায় পথপানে চাহিয়া থাকেন কিন্তু পত্র না আসিয়া হঠাৎ একদিন একখানি টেলিগ্রাম আসিল, তাহাতে কেবলমাত্র এই কয়টী কথা লেখা ছিল,—"ভাবিবেন না, শীঘ্রই অমূল্যকে লইয়া রওনা হইতেছি।"

কালীসুন্দরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে শুনিবার পর হইতেই কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে—মনে করিয়া মূর্চ্ছিতা হইবার ন্যায় হইয়াছিলেন, কিন্তু পাড়ার মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্র অবিনাশ সংবাদ পড়িয়া বলিল,—"সংবাদ ভাল, ভয় নাই।" তখন মাতা স্থির হইয়া পুত্রের সংবাদ শ্রবণে সুস্থ হইলেন। তৎপর দিবসই পত্র আসিল, এবং কালীসুন্দরীর সত্য খবর বলিয়া বিশ্বাস হইল, এবং অমূল্যকুমার সেখানেও এক নেশাখোরের আড্ডায় ছিল, ইত্যাদি সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন।

যাহা হউক, ৩।৪ দিন পরেই হরনাথ অমূল্যকে লইয়া হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছিলেন। মাতা অনেক দিন পরে নয়নের ধ্রুবতারা এক মাত্র পুত্রকে পাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। গ্রামবাসীরা সকলেই বলিলেন যে, "অমূল্যকুমারের বিবাহ দিলেই ভাল হইবে।" কালীসুন্দরী অগত্যা অমূল্যর বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কি কেহ চরিত্রহীন, নেশাখোর পাত্রের সহিত মেয়ের কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারে? সুতরাং দেশের মধ্যে কেহ অমূল্যকে কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল না। পরে তাহার জ্যেষ্ঠ মাতুল শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু কলিকাতার নিকট বরাহনগরে এক ভদ্র বংশের কন্যার সহিত অমূল্যর বিবাহের সমস্ত স্থির করিলেন। কন্যার পিতা দীননাথ বাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেইজন্যই কন্যাকর্ত্তারা দীননাথ বাবুর কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন।

(৩)

আজ অমূল্যকুমারের বৌ আসিয়াছে। আজ মাতা কালীসুন্দরীর কি আনন্দের দিন, কিন্তু তাহা হইলেও নারীজাতির স্বভাব কোন আনন্দের দিনে অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

কালীসুন্দরীও তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর মৃত্যু এবং তাঁহার নানাবিধ কথা স্মরণ করিয়া আজ এই আনন্দের দিনেও অশ্রুত্যাগ করিতে ছাড়িলেন না।

একমাত্র পুত্র অমূল্যকুমার, তাহার বিবাহে আত্মীয় স্বজনকেও আনিবার সামর্থ্য নাই, কাজে কাজেই কালীসুন্দরীর দুঃখের ইহাও একটী প্রধান কারণ হইয়াছিল।

নব বধূ তত সুন্দরী না হইলেও, মোটের উপর মন্দ নয়, কিন্তু প্রথম হইতেই অমূল্যকুমারের কি কু-নজরে যে পড়িল, সে বিষের অনেক দিন পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। অমূল্যকুমার বধূমাতাকে দেখিতে পারিতেন না বলিয়া

কালীসুন্দরী কতদিন, কতরূপে বুঝাইলেন ও ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। অমূল্যকুমার বিবাহের পর কিছুদিন শ্রীযুক্ত হরনাথ বাবুর ভয়ে কুসঙ্গে মিশিতে পারে নাই, কিছুদিন পরেই হরনাথ বাবুর কলিকাতা গমনের সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই, পুনরায় সে পূর্ব্বোক্ত আড্ডায় মিশিল, এবং ২।৪ দিন মধ্যেই পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

মাতা ঠাকুরাণী কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। যে আশা পুনরায় তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল, তাহাও নিষ্ফল হইবে ভাবিয়া এবং অমূল্যর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি দুশ্চিন্তারূপ মহাসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। দিন দিন অমূল্যকুমারেরও অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। শরীর অতি জীর্ণ শীর্ণ, এবং মদ্য পান প্রভৃতি কুক্রিয়ায় শিথিল হইয়া পড়িল, এবং সকলেই বলিল,—"অমূল্য আর বেশী দিন বাঁচিবে না।"

সেই সময় হইতে কালীসুন্দরী অমূল্যর উপর বিশেষ যত্ন লইতে আরম্ভ করিলেন। নব বধূ বিবাহের পরই পিত্রালয়ে গিয়াছিল, তাহাকে আনা হইল, তথাপি অমূল্যর কিছু মাত্র মনের পরিবর্ত্তন হইল না, বরং বধূর প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যবহারই রহিল। ইহা ছাড়া তিনি তাহাকে বড়ই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাতে বালিকা মনোরমা ভাবিল,—"এজগতে স্বামীই স্ত্রীজাতির একমাত্র সম্পদ, তাহার নিকট সন্দেহ এবং ঘৃণার পাত্র হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।" ইহা ভাবিয়া বধূ একদিন পাড়ার বধূকে দিয়া আফিং আনাইয়া খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার বুদ্ধিমতী শাশুড়ী ঠাকুরাণী কৌশলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

কালীসুন্দরী অমূল্যর এরূপ ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র ভাবিলেন,—"হয়ত আজকাল অত্যধিক নেশা করিতেছে, নচেৎ এরূপ তো কখন হয় না।"

কালীসুন্দরী স্বয়ং জমিদার মহিমবাবুকে এ সমস্ত বিষয় জানাইলেন, এবং যাহাতে তিনি অমূল্যকুমারকে ডাকাইয়া কিছু উপদেশ দেন, তজ্জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসিলেন। বৈকালে একজন দরোয়ান আসিয়া অমূল্যকুমারকে ডাকিয়া লইয়া গেল। মহিমবাবু অমূল্যকে কাছে বসাইয়া নানারূপ বুঝাইলেন, এবং উপস্থিত দুরবস্থা, এবং মাতা ঠাকুরাণীর ও তাহার স্ত্রীর দুঃখের কারণ সমস্তগুলি বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। অমূল্য নিঃশব্দে মস্তক অবনত করিয়া সমস্ত শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, সত্য সত্যই তিনি তাঁহার মাতা এবং স্ত্রীর অশান্তির একমাত্র কারণ। তাঁহার স্ত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা, এবং তাঁহার মাতার মনঃপীড়ার একমাত্র হেতু তিনি। আরও বুঝিলেন যে, মানবমাত্রেই মরণশীল। কে কখন এই জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। যে আজ লক্ষপতি হইয়া অতুল সম্পদ উপভোগ করিতেছে, সেও এক

দিন কালের করাল গ্রাস হইতে নিস্তার পাইবে না। সুতরাং এই মায়াময় পৃথিবীর নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, এবং তিনি বুঝিলেন, উচ্ছৃঙ্খল ও লম্পটভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা, সেই পরম শান্তি লাভের জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কর। সেইদিন হইতে তিনি মনুষ্যত্বলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং তজ্জন্য অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে অমূল্যর কিঞ্চিৎ বাহিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল।

সন্ধ্যা হইল। মহিম বাবু অমূল্যকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরবাড়ীতে গেলেন। ঠাকুরবাড়ীতে দৈনিক অতিথি সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং সাধু সন্ন্যাসী অতিথি প্রভৃতি প্রায়ই এই বাড়ীতে আসিত। অমূল্যও সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভালবাসিত, কারণ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে গঞ্জিকাদি সেবন উত্তমরূপে চলিত, কিন্তু এখন অমূল্যকুমারের আর সে অভিপ্রায় নাই, বলিয়া বোধ হইল। সে এখন আর সন্ন্যাসীদের নিকট গঞ্জিকাদি সেবনের নিমিত্ত যায় না, বরং কোন সদ্‌গুরু বা সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে ঘুরিত, এবং তখন হইতে তাহার সাংসারিক বৈরাগ্যের চিহ্নও কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল, শীতলের পর মহিমবাবু অমূল্যকে বৈকালিক প্রসাদ ভোজন না করাইয়া ছাড়িলেন না।

অমূল্য প্রসাদ গ্রহণান্তে বিদায় লইলেন। আসিবার কালীন পথে শুনিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীতে এক মহাত্মা সাধু আসিয়াছেন। অমূল্য এই কথা শুনিয়া অবধি সদ্‌গুরু লাভের আশায় কোনরূপে সে রাত্রি কাটাইয়া, অতি প্রত্যুষেই মহিমবাবুর বাটী গমন করিলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে অতিথিশালার একটী ঘরে সেই নবাগত, সৌম্য, দীর্ঘশ্মশ্রুধারী সাধু বসিয়া আছেন। অমূল্যকুমার সাধুকে প্রণাম করিলেন। সাধুও তাঁহাকে নিজ আসনে বসিতে স্থান দিলেন, কিন্তু অমূল্যকুমার তাহাতে না বসিয়া মাটীতেই উপবেশন করিলেন। সাধুর সহিত নানারূপ শাস্ত্রীয় কথাবার্ত্তা চলিল, এবং অতঃপর অমূল্যর প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহাকে গুরুরূপে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধু যুবকটীর এরূপ সাংসারিক বৈরাগ্যদর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং যাহাতে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে, তদ্বিষয়েই নানারূপ উপদেশ দিলেন,কিন্তু অমূল্যকুমার আর এই সাধুকে ছাড়িলেন না। দুই দিবস পরে সাধুর সেখান হইতে অন্যত্র যাইবার কথা ছিল, অমূল্যকুমার তাঁহার সহিত যাইবে মনস্থ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে, সন্ধ্যার সময় সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এ দিকে বাটীতে মাতা কালীসুন্দরী পুত্রের অনুপস্থিতিতে ভাবিলেন,—হয়ত মহিমবাবু আসিতে দেন নাই, তাই তাঁহারই বাটীতে আছে। কালীসুন্দরী মহিমবাবুর বাটীতে অমূল্যর অনুসন্ধানের জন্য পাড়ার গোয়ালা-পিসীকে পাঠাইলেন। গোয়ালা-পিসী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পুত্রের কোন উদ্দেশ পায় নাই, এইরূপ জানাইল। কালীসুন্দরী ইহা শুনিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন, এবং স্বয়ং পুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

অনেক অনুসন্ধানেও পুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবার আর নিজ অর্থে দূরদেশে পুত্রের অনুসন্ধানার্থ কোন লোক পাঠাইতে হইল না; এবার অমূল্যর শ্বশুর শম্ভুনাথ গোস্বামী মহাশয় একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে কিঞ্চিৎ মুদ্রাসহ শ্রীমানের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। শম্ভুনাথ বাবুর প্রেরিত লোকটী কলিকাতা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করতঃ কোথায়ও অমূল্যর সন্ধান না পাইয়া প্রায় দুই মাস পরে ফিরিয়া আসিল।

দুঃখিনী মাতা কালীসুন্দরী পুত্রের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মাদরোগগ্রস্তা হইবার উপক্রম হইল। তিনি এখন আর কাহারও সহিত বেশী বাক্যালাপ করেন না, সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হয়। এখন তিনি প্রায়ই নির্জ্জনে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া প্রতিবাসিরা উন্মাদ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুঃখিনী কালীসুন্দরী বধূমাতাকে লইয়া প্রায় দুই বৎসর জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইলেন।

কাশীধামের নিকটবর্ত্তী সারনাথ নামক স্থানে স্বামী যোগানন্দের আশ্রম। এই যোগানন্দ স্বামীকে পাঠক চিনিতে পারিয়াছেন কি? যে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের অমূল্যকুমার চিরদিনের মত সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, ইনিই সেই সন্ন্যাসী—যোগানন্দ স্বামী।

বৈশাখ মাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে মাঝে মাঝে "লু" চলিতেছে। অমূল্যকুমার স্বামিজীর আহারের পর খাদ্যাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমের একটী ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব অমূল্যকুমারকে তাঁহার ঘরে ডাকিলেন। অমূল্যকুমার তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্বামী যোগানন্দ ধীরে ধীরে অমূল্যকুমারকে কহিতে লাগিলেন,—"দেখ অমূল্য, প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল, তুমি আমার সঙ্গে আসিয়াছ। তোমার মাতা এবং স্ত্রী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিলে তোমার সন্ন্যাসাশ্রমের কোন ক্রিয়াই ফলবতী হইবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি পুনরায় সংসারী হইয়া, তোমার জননীর সেবা কর।" গুরুদেবের মুখে এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া অমূল্যকুমারের সংসারের কথা মনে পড়িল। সেই স্নেহময়ী জননীকে অব্যক্ত যন্ত্রণা দেওয়া, পতি-পরায়ণা সাধ্বী-সতী স্ত্রী মনোরমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, ইত্যাদি আপনার ঘৃণিত ব্যবহারের কথা অমূল্যকুমারের মনে উদিত হইয়া, অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। তিনি গুরুদেবের আদেশের কোন প্রতিবাদ না করিয়া অবনত শিরে তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইলেন। তৎপরে স্বামীজী অমূল্যকে ৺কাশীধাম হইতে হরিশ্চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত যাইবার গাড়ীভাড়া ইত্যাদি দিয়া বিদায় দিলেন। অমূল্যও গুরুপদধূলি মস্তকে ধারণকরতঃ ৺কাশীধাম হইতে রওনা হইয়া যথাসময়ে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

পাড়ার কেহ কেহ আসিয়া কালীসুন্দরীকে অমূল্য আসিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বেই সংবাদ দিল, কিন্তু তিনি সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কারণ, তিনি পুত্রের বিষয় একেবারেই নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি যে শেষ বয়সে পুত্রমুখ দেখিয়া সুখে মরিতে পারিবেন, সে আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" সুতরাং কালীসুন্দরীর দীর্ঘকাল দুঃখভোগের পর শুভদিন আসিল। তিনি বহু দিনের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমানা হইলেন।

অমূল্যকুমার এখন আর সে নেশাখোর গুণাহ অমূল্য নাই; এখন সে একজন সৎপথাবলম্বী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সহবাসগুণে মানবের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সাধু যুবকই এক সময়ে কুসঙ্গে মিশিয়া অতিশয় নেশাপ্রিয় এবং নানারূপ ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। আবার এখন সেই যুবকই সৎসহবাসে দেবতুল্য স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অমূল্যকুমারের মাতা কালীসুন্দরী পুত্রকে পুনরায় কোলে পাইয়া, আশ্বস্তা হইলেন এবং দেবদেবীর নিকট মানত পূজা প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে যত্নবতী হইলেন।

দুই চারি দিবসের মধ্যেই অমূল্যকুমারের কল্যাণার্থ দেবপূজাদি সুসম্পন্ন হইল। কালীসুন্দরী অমূল্য এবং বধূমাতাকে লইয়া পরম সুখে পুনরায় সংসার করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ প্রতিবেশীরা সকলেই অমূল্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে আসিল; এবং সেইদিনই গ্রাম মধ্যে "আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন" এই কথাটী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যবিনোদ।

কে তুমি ?

বহুদিন হ'তে হৃদয় আমার
বিষাদ-ধূলিতে ম্লান,
কে তুমি গো, আজ কি আনন্দ-জলে
আমারে করালে স্নান।
আশায় বসিয়া ছিনু যে সুপ্ত
দুখে মুছিয়া আঁখি,
কে তুমি জননী?—জাগালে আমারে
কখন্ কি মন্ত্রে ডাকি?
আজি উন্মুক্ত করিয়া অনেক দিনের
রুদ্ধ হৃদয়-দ্বার,
বল কে তুমি গো, আনন্দ-প্রতিমা
সম্মুখে দাঁড়ালে আমার?

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

পাপীর প্রার্থনা।

(১)

জানি না তোমারে আমি,
কোন্ দিকে আছ স্বামী,
জানি না কেমন রূপ, থাক তুমি কোথা।
জানি না ভকতি স্তুতি,
অবিশ্বাসী পাপী অতি,
নাহি মম জ্ঞান, ধ্যান আর একাগ্রতা।

পশু হয়ে নরাকারে,
আছি পড়ে অন্ধকারে,
অধম পাষণ্ড হয়ে, জান অন্তর্যামী।
পাপের অনল শুধু,
হৃদে জলে ধূ ধূ ধূ ধূ,
নাহি দিন, নাহি সন্ধ্যা, নাহি নাথ যামী

(২)

কেবল শুনি গো কাণে,
"আছ তুমি সব স্থানে,
সতত সদয় তুমি পতিতের প্রতি।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
তুমি নাকি সর্ব্বেশ্বর,
তুমি কালী, তুমি হরি, বিশ্ব-মূলাধার।
বিপদে ডাকিলে পরে,
তুমি নাকি ত্বরা করে,
রক্ষা কর পাপী জনে ওহে সারাৎসার॥"

(৩)

তবে আমি দয়াময়,
রব কিগো নিরাশ্রয়,
আশ্রয় যখন তব অভয় চরণ ?
দয়া করি তুমি প্রভু,
রাখিবে না মোরে কভু,
হবে না কি পতিতের কামনা পূরণ ?
আঁধার যামিনী প্রভু,
পোহাবে না কি গো কভু,
আবার যামিনী পরে পূত জাগরণ ?
পৃথিবীর জ্বালা, ক্লেশ,
কহ ওগো হৃদয়েশ,
কবে কোথা মম হবে সমাপন ?

(৪)

অসহ্য পাপের ভার,
কত কাল স'ব আর,
কখন ভাঙ্গিবে প্রভো রঙ্গীন স্বপন ?
কেটে যাবে ঘুম-ঘোর,
মোহের মদিরা মোর,
হৃদি হতে হবে দূর কেমনে, কখন ?
অজ্ঞানতা, অন্ধকার,
ছাড়িবে কি মোরে আর,
পাব কি দেখিতে প্রভো, আলোক জ্ঞানের ?
অনিত্য সংসার লীলা,
অলীক ভোগের মেলা,
কবে হবে শেষ নাথ এই অধমের ?

(৫)

প্রবল ইন্দ্রিয় দাহ,
জ্বলে হৃদে অহরহঃ,
কেবল কুচিন্তা আর লালসা ভীষণ।
শুচি, বুদ্ধি, সংযমতা,
অনুরক্তি, পবিত্রতা,
নাহি কিছু হৃদে মোর কেবল বাসনা।
চাহি না তোমারে প্রভু,
নাম নাহি লই কভু,
ইন্দ্রিয় সুখের চিন্তা করি অবিরত।
বিবেক গিয়াছে সরে,
মতি, গতি বহু দূরে,
নাহি আর মোর মাঝে পূত মানবত্ব।

(৬)

সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী,
দেখিছ নিয়ত তুমি,
পাপ-দগ্ধ প্রাণে মম কিবা আছে সার।

শুধু স্বার্থ সিদ্ধি তরে,
ডাকি মুখে বারে বারে,
মন কিন্তু অবিরত ঘোরে চারিধার ॥
চাহি ভোগ, চাহি অর্থ,
ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থ,
চাহি শুধু সংসারের অনিত্য বিভব।
শুনি না তোমার কথা,
গাহি না তোমার গাথা,
ভণ্ডতার আবরণে মিথ্যা কলরব ॥

(৭)

বদ্ধ আমি মায়া-ফাঁদে,
মত্ত আমি মোহ-মদে,
ভক্তি, স্তুতি, জ্ঞান, ধ্যান গেছি পাশরিয়া।
বিবিধ পাপেতে নাথ,
মগ্ন আমি দিন রাত,
শুনি না তোমার ডাক কভু মন দিয়া ॥
যোগ, যাগ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
বুঝি না কিছুর মর্ম্ম,
কেবল সুখের স্বপ্নে আছি দিন রাত।
দেখিছ সকলি তুমি,
কি আর বলিব আমি,
সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী নিখিলের নাথ ॥

(৮)

নাহি কি উপায় মোর,
এ বিরহ বিঘ্ন ঘোর,
হবে না কি কভু দূর পতিত-পাবন ?
প্রিয়তম সুহৃদেরে,
রাখি মোর হৃদি পরে,
হব না কি তৃপ্ত কভু আমি নরাধম ?
এই ঘোর বিভাবরী,
ত্বরা নাথ দূর করি,
দিবে না কি পাপিষ্ঠেরে কভু দরশন।
অসহ্য বিরহ ঘোর,
হবে না কি কভু দূর,
যাবে না কি দরিদ্রতা দারিদ্র্যভঞ্জন ?

(৯)

তবে কেন দয়াময়,
সর্ব্ব স্থানে পরিচয়,
সতত তোমার নাম দয়া নাহি হ'লে ?
কাঙ্গালের বন্ধু তুমি,
অনাথ জনের স্বামী,
কেন তব নাম যদি না রাখ দুর্ব্বলে ?
ভক্ত যারা নিজ গুণে,
লভে তাঁরা নিত্য ধনে,
পাপী যারা হয় তারা কৃপায় বঞ্চিত।
পাতকী-তারণ তবে,
কেন তোমা বলে সবে,
পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ বলে তুমি খ্যাত ?

(১০)

সকলি কি ভিত্তিহীন,
বুঝে না কি কিছুই দীন,
কেবা তুমি মহাজন জগত-রচক ?
নাহি জ্ঞান, ভক্তি, বুদ্ধি,
কেমনে গো উপলব্ধি,
করিব তোমায় আমি নিখিল-পালক ?
জ্বাল দীপ অন্ধকারে,
তুমি প্রভো দয়া করে,
টেনে লও অভাগারে তোমার চরণে।
তুমি জগতের গুরু,
তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
রক্ষ নাথ দয়া করে পতিত অজ্ঞানে ॥

(১১)

সংসার সমুদ্র পার,
তুমি বিনা কেবা তার,
করে নাথ অভিরাম যদি নাহি থাক।
অসহায়ে দয়া করে,
কে আর সাহায্য করে,
কে আর ঘুচায় সদা দরিদ্রের দুঃখ ?
মাভৈঃ মাভৈঃ নাদে,
জাগ নাথ এই হৃদে,
বিরহ বিষাদ মোর কর নাথ দূর।
যবনিকা নাটকের,
স্বপ্ন, দুঃখ প্রমোদের,
ফেলে দাও দীনবন্ধু, কর সব চূর॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পুরোহিত

বৈশাখ মাস, দুপুর বেলা, মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গরুগুলা সব মাঠ-ঘাট পরিত্যাগ করিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া জাবর কাটিতেছে। রাস্তায় কচিৎ দু-একজন লোক যাতায়াত করিতেছে। এমন সময় শিরোমণি মহাশয় জীর্ণ ছত্র মাথায় দিয়া গৃহ-ভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত নাম কি তাহা গ্রামের অনেকে জানে না। তাঁহাকে সকলে শিরোমণি মশায় বলিয়াই ডাকে। শিরোমণি উপাধিটী তিনি কোথা হইতে পাইলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তিনি উহা কোনও ব্রাহ্মণ-সভা হইতে প্রাপ্ত হন নাই। শিরোমণি মহাশয় ভট্টাচার্য্য মানুষ, নামাবলী গায়ে, চটিজুতা পায়ে দুর্গাপুর গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন। কি এক গভীর চিন্তার ছায়া তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখখানিকে বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি চিন্তায় বিভোর হইয়া একমনে চলিতেছেন,—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। দুর্গাপুরের জমিদার-বাটির দেওয়ান যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে ডাকিলেন, উত্তর নাই। দেওয়ান যদুনাথ বৃদ্ধ; ভোজ-নাদি সমাপন করতঃ বাহিরের ঘরে বসিয়া বিশ্রামলাভ ও তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। কোনও কাজ নাই, সুতরাং শিরোমণি মহা-শয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল। পুনরায় একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন "ও শিরোমণি ম'শায়, বলি কদ্দূর!" এবার শিরোমণি মহাশয়ের কর্ণে আওয়াজ পৌঁছল। তিনি দাঁড়াইলেন; দেখিলেন দেওয়ান যদুনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়া। তিনি কষ্টে মুখে হাসি আনিয়া কহিলেন,—"দেওয়ান জী ম'শায় যে, বলি কি হয় ?"

যদুনাথ। আসুন আসুন, তামাক ইচ্ছে করে যান।

শিরো। আর তামাক ইচ্ছে করে যান; আজকাল মান-রক্ষা করাই ভার হয়ে উঠ্‌ল।

মান বাঁচান ভার হইলেও তামাক ইচ্ছার লোভ সংবরণ করা শিরোমণি মহাশয়ের পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে দেও-য়ানজীর নিকট আসিয়া বসিলেন, এবং আম্র-পত্রের এক নল প্রস্তুত করিয়া হুকা গ্রহণ

করিলেন। শিরোমণি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অপরের হুকায় তাম্রকূট সেবন নিষিদ্ধ, তাই বোধ হয় এই আম্র-পত্রের নলের ব্যবধান প্রয়োজন। তিনি একমনে ধূমপান করিতে লাগিলেন, মুখে কোনও কথা নাই। অগত্যা দেওয়ানজীকে প্রথমে কথা আরম্ভ করিতে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি শিরোমণি ম'শায়, মান-রক্ষা করা ভার হয়ে উঠ্‌ল কেন? শিরোমণি মশায় আরও কিয়ৎকাল ধূমপান করিয়া জবাব দিলেন, "ও পাড়ার কেদার চাটুজ্যের ছেলে নবীন আমায় আজ তার বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্য বলেছিল।"

"আপনি বুঝি তাই এখন সেখান থেকে শ্রাদ্ধাদি সেরে আসছেন।"

"আমায় শ্রাদ্ধ করাতে দিলে ত সেরে আসব, তবে আর বল্‌ছি কি।"

যদুনাথ সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম?"

শিরোমণি মহাশয় কিয়ৎকাল নীরবে ধূম-পান করিয়া কহিলেন, "নবীন শ্রাদ্ধ করিতে বসিল, আমি মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলাম— "ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্যং", উদ্ধত যুবক মন্ত্রপাঠ করিল না, মন্ত্রের ব্যাকরণ ভুল ধরিয়া বসিল, বলিল, "নমস্কৃত্যং! যথ প্রত্যয়ান্ত পদে অনু-স্বার কি করিয়া আসিবে!" আমি ত অবাক্! আমার জীবনে কখনও এরূপ প্রতিবন্ধক পাই নাই। ভাল কথায় বুঝাইলাম "একমনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করিতে হয় বাবা, যা বলি তা বল।" ফল কিন্তু ইহাতে বিপরীত হইল। নবীন অবজ্ঞাভরে কহিল "তা বলিয়া কি তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতন যা বলিবেন তাই বলিতে হইবে।" আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

যদু। আপনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন না কেন?

শিরো। আমার রাগ করিয়া আর চলিয়া আসিতে হইল না, এমনিই উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল।

যদু। কি রকম?

শিরো। আমাদের দেবেন সেখানে উপ-স্থিত ছিল। নবীন তাহাকে বই দেখিয়া মন্ত্র পাঠ করাইতে বলিল। দেবেনও তার কথা মত 'হিন্দুসৎকর্ম্মমালা' লইয়া শ্রাদ্ধ করাইতে বসিল। আমার অপমান চরম সীমায় উঠিল, আমি গাত্রোত্থান করিলাম।

যদু। নবীনের কার্য্যে দেবেনেরও সহানু-ভূতি ছিল?

শিরো। তাই ত বোধ হ'ল।

জমীদার দেবীপ্রসাদ মৃত্যুকালে যদুনাথের দুইটি হাতে ধরিয়া বলিয়া যান,—যদু, আমার দেবেন রইল, আর জমীদারী রইল, দেখো। দেবেন তখন স্কুলে প্রবেশিকা পড়ে। তখন হইতে যদুনাথ জমীদার-বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং দেবেনের অভিভাবকস্বরূপ। শিরোমণি মহাশয়ের ঈদৃশ অপমানে দেবেন লিপ্ত থাকায় যদুনাথ বাস্তবিকই ব্যথিত হইল। আর নবীন, তাহাকে ত যদুনাথ উচ্চশিক্ষিত সৎযুবক বলি-য়াই জানেন। সে দেবেনের বাল্যবন্ধু, শুধু তাই নয়, জমীদার-বাটীর পরিবারবর্গের মধ্যেও

গণ্য; সম্প্রতি দেবেনের সহিত একত্রে সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষা দিয়া দেশে আসিয়াছে এবং সংস্কৃত-শিক্ষা-বিস্তারকল্পে নানা স্থানে টোল স্থাপন করিবার জন্য দেবেনকে অশেষ প্রকারে উৎসাহ দিতেছে। সে কেন আজ শিরোমণি মহাশয়ের উপর অযথা অত্যাচার করিল, তাহা বৃদ্ধ যদুনাথ অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

শিরোমণি মহাশয় বৃথা বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এখন আসি দেওয়ান জী ম'শায়, দেরী হইয়া যাইতেছে। আমার এখনও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করা হয় নাই।"

"তবে আসুন আর কি বলব বলুন।"

শিরোমণি মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার সেই জীর্ণ ছত্রটী মাথায় দিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বাল্যকালে শিরোমণি মহাশয় বাচস্পতির টোলে প্রাণপণে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আবৃত্তি করেন। "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী" এই ভাবিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তিনি ব্যাকরণের অর্থবোধ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাকে দশ কর্ম্ম বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার ব্যাকরণ-জ্ঞান আবৃত্তি পর্য্যন্ত থাকায়, মন্ত্রাদির উচ্চারণ স্থানে স্থানে অশুদ্ধ হইত এবং সেই ফলে আজ তিনি অবমানিত।

শিরোমণি মহাশয় চলিতে চলিতে কত কি ভাবিতেছেন। মান-রক্ষার চিন্তা, অন্ন-চিন্তা, কন্যাদায়-চিন্তা, আরও কত কি চিন্তা তাঁহার মনে একে একে উদয় হইতেছে। তাঁহার ভাবনার শেষ নাই, কিন্তু তাঁহার গন্তব্য-পথের শেষ আছে। তিনি ভাবিতে ভাবিতে নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে তাঁহার কন্যা অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়া ছিল; পিতাকে বিষণ্ণ বদনে রিক্তহস্তে ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এমন ভাবে শুধু হাতে?" শিরোমণি মহাশয়ের উত্তর দিবার কি আছে? তিনি নীরবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(২)

দেবেন তাহার পাঠাগারে বসিয়া নবীনের সহিত সংস্কৃত-ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। ব্রত-পূজাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর দুই বন্ধুর বাল্য-কাল হইতেই অনুরাগ। কিন্তু হইলে কি হয়, কতকগুলি ভাষাজ্ঞানরহিত পুরোহিতের কার্য্যে ইহারা একেবারে বীতশ্রদ্ধ। পূজায় মন্ত্র অশুদ্ধ হইলে অনুষ্ঠিত কার্য্য পণ্ড হয় এবং সেই হেতু যে ক্রমে ধর্ম্মের অবনতি ঘটিতেছে, ইহাদের মধ্যে এই ধারণাটা বদ্ধমূল। তাই আজ ইহারা গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পুরোহিত গঠন ও সঙ্গে সঙ্গে মূর্খ ভট্টাচার্য্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে ব্যস্ত।

দেবেন বলিলেন "আমাদের এলেকায় আপাততঃ মোট এগারটী টোল স্থাপন করা হয়েছে; তার মধ্যে দেখ্‌ছি অঙটা বড় সুবিধা রকম হচ্ছে না।"

নবীন। তা আজ বিকালে চল না, অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু করা যাক্।

দেবেন। হাঁ, আর একটা কথা। কাল বহু কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা হ'ল। তিনি বলেন, কুল-পুরোহিত ত্যাগ করে অনেকে হয়ত টোলের শিক্ষিত পণ্ডিতগণকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌তে চাইবে না।

নবীন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির এক্ষণে সবই ত গিয়েছে; সে বেদধ্বনিও নেই, সে যাগযজ্ঞাদিও নেই। আছে কি! আছে কেবল—কোনও কোনও স্থানের পুরমহিলাগণের মধ্যে পৌরাণিক ব্রত-নিয়মাদি ও কতিপয় নিষ্ঠাবান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের মধ্যে পিতৃ-তর্পণাদি এবং মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে প্রতিমা-পূজাদি। তাও যদি শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য ভাষাজ্ঞানরহিত মূর্খ ভট্টাচার্য্যগণের উপর নির্ভর করে, তা হ'লে এ জাতির অধঃপতনের আর বাকি কি?

দেবেন। সে কথা তুমি আমি বুঝলুম, সকলে ত বুঝবে না।

নবীন। যা'তে বোঝে তা কর্‌তে হবে।

নবীন হয়ত আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেবেনের মা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"বাবা দেবেন!"

"কেন মা!"

"মল্লিকপুরের কার্ত্তিক মুখুজ্যে তার মেয়েকে দেখিয়া আসিবার জন্ত দেওয়ানজীকে চিঠি লিখেছে।"

"আর কিছুদিন দেরী কর মা, পরীক্ষার ফলটা বাহির হয়ে যাক্ তারপর যা হয় করো।"

"আমার কি আর বৌ নিয়ে দু'দিন সাধ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায় না; আমি আর কদ্দিন আছি বল।"

নবীন আর থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে কহিল—"না জেঠাই মা, তুমি অনেক দিন আছ; তোমায় আমরা মরতে দেবই না।"

"দূর পাগলা ছেলে, মরণ কি কারো হাত-ধরা?"

এমন সময়ে তথায় একজন পরিচারিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ডাকৃছ?"

"হাঁ, একবার দেওয়ানজীকে আমার নাম ক'রে ডেকে নিয়ে আয়।"

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল—"এমন সময়ে দেওয়ানজীকে কেন মা?"

"পরশ্ব যে আমার অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত। তার বন্দোবস্ত করতে হবে, শিরোমণি মহাশয়কে খবর দিতে হবে।"

শিশুপুত্রকে আগুনে হাত দিতে যাইতে দেখিলে, তাহার মাতা যেমন আর স্থির থাকিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, দেবেন ও নবীনও সেইরূপ ব্রতকার্য্যে শিরোমণি মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; অন্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দিয়া ব্রতকার্য্য করাইবার জেদ ধরিয়া বসিলেন। দেবেন মাতৃভক্ত; স্বয়ং বাটীর কর্ত্তা হইলেও মাতার বিনানুমতিতে কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। অশেষ প্রকারে মাতাকে তাহার উদ্দেশ্ত

বুঝাইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেওয়ান যদুনাথও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে শিরোমণি মহাশয়কে ত্যাগ করিতে আপত্তি করিলেন; কিন্তু দেবেন ও নবীনের বিশেষ জেদ দেখিয়া আর কথা কহিলেন না। নীরবে বসিয়া রহিলেন। একদিকে কুলপুরোহিত-ত্যাগ এবং অপরদিকে ছেলেদের জেদ, দেবেনের মা এ ক্ষেত্রে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তাঁহার বিবেক বলিতেছে—শিরোমণি মহাশয়কে বিনাদোষে ত্যাগ করা ভাল কাজ হইবে না। তিনি এ ক্ষেত্রে কোনও অভিমত প্রকাশ না করিয়া কেবল কুলপ্রথার দোহাই দিতে লাগিলেন।

নবীন ও দেবেন আজ যে কার্য্য করিতে উদ্যত, সামান্য কুলপ্রথা তাহাদিগকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারে না। নবীন দেবেনের মাকে বুঝাইতে লাগিল যে, পূজার মন্ত্র ভুল হইলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হয়, দেবতা রাগ করেন এবং ইহারই জন্য তাহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া গ্রামে গ্রামে টোল খুলিয়া ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে।

দেওয়ান যদুনাথ এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, ভক্তিই দেবার্চ্চনার প্রধান উপকরণ। ভক্তি থাকিলে মন্ত্রের ব্যাকরণশুদ্ধিতে কিছু আসে যায় না।"

নবীন উত্তর করিল—"যদি কোনও প্রজা আসিয়া আপনাকে বলে—খাজানা এবার মাপ করিলাম। তাহা হইলে তাহার বক্তব্য আপনি কি করিয়া বুঝেন এবং তাহার উপর কিরূপই বা ব্যবহার করেন? সে ত বেশী কিছু ভুল করেনি, কেবল 'করুন' এর বদলে 'করিলাম' বলেছে।"

যদু। যা কিছু ভগবানকে বলবার দরকার তা যদি কেহ প্রাণের সহিত বলে, তাহার দোষ থাকিলেও, ভগবান অন্তর্যামী মনের কথা বুঝতে পারেন।

নবীন। কিন্তু যা কিছু ভগবানের কাছে বলব, তার যদি অর্থ না বুঝি, তা হ'লে সেই ভাষাটা প্রাণের সহিত বলব কেমন করে? আর যা বলব তার যদি অর্থ বুঝি তবে তাহায় ভুল হবে কেন?

যদু। মুখে আমি যাই বলি না কেন, মনে মনে যদি আমি আমার প্রার্থনা জানাই, তা হলে কি ভগবান তাহা শুনেন না?

নবীন। পুরোহিত তাহার নিজের প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানায় না, যজমানের প্রার্থনা তাঁহার কাছে জানায়। কোন কাজে কিরূপে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, আর্য্য ঋষিগণ তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। সুতরাং পুরোহিত তাঁহার নিজের মনের কথা ভগবানের কাছে জানালে ত চল্‌বে না, তাঁকে শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করতে হবে।

যদুনাথ দেখিলেন তর্কে ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিবেন না, সুতরাং নীরব হইলেন। দেবেনের মা ইহাদের যুক্তি-তর্ক যে ভাল বুঝিলেন এরূপ বোধ হইল না। তবে তিনি ভাবিলেন, ছেলেরা এখন উপযুক্ত,—লেখাপড়া শিখিয়াছে, যাহা করিতেছে হয় ত তাহা ভালই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও, সম্মত হইলেন, কহিলেন, "আমি মেয়ে মানুষ,

আর কি বুঝি বল ; তোমরা যা ভাল বুঝ কর, আমার ব্রতটা সুসম্পন্ন হলেই হ'ল।"

মাতাকে সম্মত হইতে দেখিয়া দেবেন সাহ্লাদে কহিল "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক মা খুব ভাল পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করা হবে।"

স্নেহবশতঃ হউক বা জেদে পড়িয়াই হউক বাটীর গৃহিনী যখন সম্মত হইলেন, তখন দেওয়ান যদুনাথ আর কি বলিতে পারেন। বিশেষতঃ দেবেন এখন শিক্ষিত জমীদার এবং তিনি বৃত্তিভোগী ভৃত্য মাত্র। কাজেই তিনি আর আপত্তি করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না, কহিলেন, "কা'কে পুরোহিত করা হবে স্থির করা হ'ল ?"

দেবেন উত্তর করিল "কল্যাণপুরের টোলের অধ্যাপক পঞ্চানন ন্যায়রত্নকে ডাকিলে হয় না ?"

"তা বেশ কথা" বলিয়া যদুনাথ গাত্রোত্থান করিলেন।

(৩)

"ও'মা, শুন্‌ছ ?"

"কি ?"

"হাঁড়িতে যে আর এক খুঁচির বেশী চাল নেই।"

"তা ভুতোর মার বাড়ী থেকে আর এক খুঁচি ধার করে নিয়ে আয়। আজকের দিন ত চলুক, তার পর যা হয় হবে।"

কন্যা প্রতিবেশীর বাটীতে চাল ধার করিতে চলিল। শিরোমণি মহাশয় প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। পথে কন্যাকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে আনি ?" কন্যার নাম অন্নপূর্ণা হইলেও সকলে তাহাকে আনি বলিয়া ডাকে।

আনি উত্তর করিল, "ভুতোর মার বাড়ী থেকে চাল ধার করে আন্‌তে যাচ্ছি।"

"ঘরে কি একেবারে চাল নেই ?"

"না এক খুঁচির বেশী আর নেই।"

ঘরে অন্ন নাই শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় চারিদিক শূন্য দেখিলেন। আর অন্ন কোথা হইতেই বা আসিবে ; তাঁহাকে আজ মাসাবধি কাল কোনও যজমান ডাকে নাই। যোগেশ রায়ের ছেলের অন্নপ্রাশন গেল, হরিপদ চক্রবর্ত্তীর মেয়ের বিবাহ গেল, কেহই ত তাঁহাকে মুখের কথাও বলিল না। তাঁহার সংসার এ ভাবে আর কতদিন চলিতে পারে।

এখন তাঁহার সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও একটী কন্যা বর্ত্তমান। কন্যা বয়স্থা, প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়। সমাজের কঠোর শাসন,— কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই, নতুবা লোকলজ্জা ও জাতিপাত অবশ্যম্ভাবী। পণ ব্যতীত কেহ যে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত নয়, এ কথা সমাজ শুনিবে না। সমাজ শাসন করিতে জানে কিন্তু উপায় বলিয়া দিতে জানে না। শিরোমণির ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যাহার অতি কষ্টে দিনপাত হয়, তিনি কি করিয়া কন্যার বিবাহ-পণের সংস্থান করিবেন, সে কথা সমাজ বলিয়া দিবে না। সমাজ কাহারও দৈন্য ভাবিবে না, কেবল বলিবে,—যদি সমাজে থাকিতে চাও, তবে আমার শাসন মানিয়া চল। শিরোমণি মহাশয় এতদিন কন্যা-

দারু-চিন্তায় বিভোর ছিলেন। উপস্থিত অন্ন চিন্তা তাঁহাকে আরও অধীর করিয়া তুলিল। তিনি চিন্তিত মনে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সমাজ কি ?

বর্তমান সময়ে এই ঘোর সমাজ-বিপ্লবের দিনে এমন কে আছেন বলিতে পারি না যার মনে একদিন না একদিন এক মুহূর্তের জন্যও "সমাজ কি ?" এই প্রশ্নের উদয় হয় নাই— যিনি ব্যাকুলচিত্তে নিভৃতে বসিয়া সমাজের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত ক্ষণেকের জন্যও চিন্তান্বিত হন নাই। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে প্রশ্নটী যত সরল ও সুখাধিগম্য বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহার প্রকৃত উত্তর পাইতে হইলে দর্শনের গহন কাননে প্রবেশ করিতে হইবে। এই যে বিপুল সমাজ অট্টালিকা, ইহার প্রধান উপাদান কি ? মনুষ্য। সুতরাং মনুষ্য কি, মনুষ্য-জীবন কি, মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য কি না জানিলে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। আবার মানব-তত্ত্ব ভাল রূপে বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানা একান্ত আবশ্যক। অতএব প্রথমেই আমরা সৃষ্টিরহস্য অথবা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইলে জগৎ-স্রষ্টার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ তাহাই অবধারণ করিবার প্রয়াস পাইব।

জগৎ-স্রষ্টা ও জগতের বা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্বন্ধ ? প্রথমতঃ, "সৃষ্টি"—(সৃজ + ক্তি) কথাটার প্রকৃতিগত অর্থ "প্রবাহ" অর্থাৎ 'অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ'; যেমন, নদীর বহিয়া যাওয়ারূপ কার্য্যটার মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যাহার সৃষ্টি হইতেছে (অর্থাৎ 'জগৎ') এবং যিনি, সৃষ্টি করিতেছেন (অর্থাৎ 'জগৎ-স্রষ্টা' বা 'ব্রহ্ম') উভয়ের-মধ্যে একটা 'অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ' বর্তমান আছে।

দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের শেষ ফল বেদান্ত এই ভাবটাকেই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন যে,—"কার্য্যকারণাভেদঃ" অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ নাই। 'কার্য্য' অর্থে 'জগৎ' ও কারণ অর্থে 'জগৎ-স্রষ্টা' বুঝিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, উপনিষদের সার গীতায় ভগবান স্বয়ং জলদগম্ভীর স্বরে এ অভেদাত্মক সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা স্পষ্ট বলিলেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥"

(৯ অঃ। ৪)

অর্থাৎ,—"আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। ভূতগণ (সৃষ্ট বস্তুগণ) আমাতে অবস্থিত; আমি সে সকলে অবস্থিত নহি।"

চতুর্থতঃ, কেবল আমাদিগের দার্শনিক ঋষিকুলই যে ঐ সত্যটী বার বার উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা নহে। গ্রীক দর্শনের শীর্ষ মণি 'প্লেটো' (Plato) তাঁহার 'টিমিয়স' (Timœus) নামক গ্রন্থে 'ব্রহ্ম'কে (Creative Idea) 'সূর্য্য' (the sun of the intelligible world) ও

'জগৎ'কে (sensible world) তাঁহার 'প্রতিচ্ছবি' (reflections) করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ জ্ঞান ঘুচাইয়াছেন। এবং জর্মণ দর্শনের উজ্জ্বল প্রদীপ 'হেগেল' (Hegel) তাঁহার "panentheism" ('pan'='all', 'theos='God' ; i. e. 'all is in God') অর্থাৎ সর্ব্বভূত ব্রহ্মে অবস্থিত' মত দ্বারা গীতার উপরোক্ত শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণই যে শুধু ওই সিদ্ধান্তটীকে তাঁহাদিগের নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন এমন নহে। প্রাচীন ভার্জিল (Virgil) অবধি বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কবিকুলতিলকগণও ঐ অভেদাত্মক সম্বন্ধকে গানের ধুয়া করিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। কোন এক অতীত যুগের কোন ঘনতমসাবৃত কোণে বসিয়া ভার্জিল (Virgil) তাঁহার 'ঈনিডে' (Eanied) কি বলিতেছেন শুনুন,—

"One life through all the universe creation runs,"

অর্থাৎ,—"এই অনন্ত জগতের মধ্য দিয়া একটী জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছে।"

এখন হয় ত অনেকে মনে করিবেন যে কেবলমাত্র "আপ্তবচনের" উপর কোন মত তিষ্ঠিতে পারে না। যুক্তির দ্বারা ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আপ্তবচন ছাড়িয়া একটী যুক্তি দর্শান নিতান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্ম যে ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, এই অনন্ত জগতের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যে তাঁহার অনন্ত সত্তায় স্পন্দিত হইতেছে—ইহা একটী জাগ্রত শাশ্বত সত্য। ইহার মূলে একটী কেন অসংখ্য যুক্তি নিহিত আছে। এখানে কেবলমাত্র সংক্ষেপে বিজ্ঞান-চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত একটী প্রমাণের কথা বলা যাইতেছে।

জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একটা শক্তির (Energy) পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই শক্তির দুইটী প্রকার-ভেদ করিয়া থাকেন, যথা—"Potential" বা "সম্ভব্য" এবং "Actual" বা "প্রকৃত"। প্রথমটীর কোনও কার্য্য যদিও আমরা অনুভব করি না বটে কিন্তু তা বলিয়া তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতার অভাব হয় না। যখনই সময় আসে তখনই সে দ্বিতীয় প্রকার শক্তিতে (Actual Energy) পরিণত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। মনে করুন একখানি পুস্তক একটী টেবিলের উপর রাখা হইয়াছে। তখন পুস্তকখানির অন্তর্নিহিত শক্তির কোন কাজই আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। তারপর মনে করুন টেবিলখানি সরাইয়া লওয়া হইল। তখন পুস্তকখানি নিশ্চয়ই মাটীতে পড়িয়া যাইবে। এই সময় উহার ঐ ভূ-পতনরূপ কার্য্যটী আমরা নয়নেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি। এখন ঐ ভূ-পতনরূপ কার্য্যটী কাহার ? না, পুস্তকান্তর্গত শক্তির। এতক্ষণ সে শক্তিটী 'সম্ভব্য' (potential) ছিল এইবার সময় পাইয়া 'প্রকৃত' (Actual) রূপে পরিণত হইল। এই উদাহরণ হইতে এটীও বুঝিতে পারা যাইতে পারা যাইতেছে যে যদিও

শক্তির প্রকার (aspect) দুইটী কিন্তু শক্তি দুইটী নহে। একই শক্তি কখনও 'সম্ভব্য' (Potential) কখনও 'প্রকৃত' (Actual)। আমরা আমাদের উপমায় যদি বলি তাহা হইলে প্রথমটী শক্তির সুপ্তাবস্থা, দ্বিতীয়টী তাহার জাগ্রতাবস্থা।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে শক্তির কখনও সুপ্তাবস্থা নাই। শক্তি সর্ব্বদাই জাগ্রত। ঐ যে পুস্তকখানি নিষ্কর্ম্মা হইয়া টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে যখন উহার উপর হাত রাখিয়া চাপিয়া ধরি, তখন কি উহার অন্তর্য্যামী শক্তি আমার হাতে প্রতিঘাত (Re-action) করিয়া বাধা দেয় (resistance) না ? ঐ যে অচল পাষাণস্তূপ পর্ব্বত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আমি যখন আমার দেহের সমস্ত বল একত্রিত করে উহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি তখন কি উহার অন্তর্নিহিত শক্তি আমার অঙ্গে প্রতিঘাত করিয়া বাধা দেয় না ? নিশ্চয়ই দেয়। তাহা হইলে কি করিয়া বলিতে পারি যে, উহাদের শক্তি 'সুপ্ত' বা 'সম্ভব্য' (Potential) ? মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীব-জগতের বা চেতন জগতের (Animate world) প্রত্যেক অধিবাসীই সচল ও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং এখানে সহজেই 'প্রকৃত' বা 'জাগ্রত' শক্তি (Actual Energy) কে বোঝতে পাওয়া যায় কিন্তু জড় জগতের বা অচেতন জগতের (Inanimate world) অধিবাসীরা অচল ও অপরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই কি তাহাদিগের মধ্যে নাই ? নিশ্চয়ই আছে। ঐ 'বাধা' দেওয়া (Resistance) বা 'প্রতিঘাত করা' (Re-action) যে সে জগতের ধর্ম্ম। আর এইটাই যে 'প্রকৃত' শক্তি (Actual Energy)। যদি এই "বাধা দেওয়া" রূপ (Resistance) প্রকৃত শক্তি (Actual Energy) না থাকিত তাহা হইলে জড় জগতের কোন বস্তুরই অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। এই যে লেখনী, যাহার দ্বারা আমি লিখিতেছি, ইহার অস্তিত্ব-জ্ঞান আমি কি উপায়ে পাইলাম ? যখন আমি অঙ্গুলির দ্বারা ইহাকে টিপিয়া ধরি তখন সে আমার অঙ্গুলির উপর 'প্রতিঘাত' (Re-action) করিয়া 'বাধা' (Resistance) দেয় বলিয়া। যদি সে ঐরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা না দিত তাহা হইলে আমি কি তাহার সত্তা (existence) অনুভব করিতে পারিতাম ? কখনই না। ঐ যে দূরে একটী কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে উহার অস্তিত্ব-বোধ আমার কিরূপে আসিল ? আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর 'প্রতিঘাত' করিয়া দৃষ্টির পথে বাধা জন্মায় বলিয়া অর্থাৎ তাহার অন্তরালে অবস্থিত জিনিষগুলি দেখিতে দেয় না বলিয়া। সে যদি ঐরূপ 'বাধা' না দিত তাহা হইলে আমি কি তাহাকে জানিতে পারিতাম ? কখনই না। এই জন্যই হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিতেছেন,—

"Matter is known to us only through its manifestations of Force : abstract its resistence mediately or

nothing but empty extension,"

[First Principles' Vol, I, p, 48;]

অর্থাৎ শক্তি-প্রকাশের দ্বারাই জড় জগৎ আমাদের কাছে পরিচিত। যদি ইহার ব্যবহিতভাবে বা অব্যবহিতভাবে প্রদত্ত 'প্রতিরোধ'কে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন কর তাহা হইলে শূন্যময় বিস্তার ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না অর্থাৎ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না।"

তারপর আর একটি কথা বলি শুনুন। নিউটন (Newton) প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বলেন যে, এই বিপুল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাকে তাঁহারা 'বিশ্ব-বিধান' (Universal Law) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব।

আবার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সমস্বরে বলিতেছেন যে, এই অখিল জগৎ একটা অনন্ত সমরাঙ্গন। এখানে অহোরাত্র একটি সংগ্রাম চলিতেছে। তাহার নাম জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence)। কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি চেতন, কি জড় সকলেই রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া অহোরহ তাহাদিগের স্ব স্ব বহিঃপ্রকৃতির (environment) সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। যিনি বিজয়ী তিনিই জীবন ধারণে সক্ষম (survival of the fittest) আর যিনি বিজিত তিনি জীবন ধারণে অক্ষম সুতরাং মরণ আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বিজিত হইয়া জীবিত এ যুদ্ধে কেহ থাকে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি এই যে, বিরাট শক্তি যাহার দীপ্তিমান আলোকের অরুণ কিরণে আজ আমরা ঐ ঘনান্ধকার পরিবেষ্টিত বিশাল দেহ নির্জীবপ্রায় জড় জগতকে চিনিতে পারিয়াছি—যার মহাকর্ষণের মোহন শৃঙ্খলে (Universal law of Attraction and Gravitation) শৃঙ্খলিত হইয়া আজ এই সীমাহীন বিশ্বের সীমাহীন কান্তারে উচ্ছৃঙ্খলগতি বস্তুনিচয় দূরদূরান্তস্থিত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না—যার হৃদয়োন্মাদকারিণী সঞ্জীবনী ধারায় অবগাহনান্তর উজ্জীবিত হইয়া আজ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু প্রত্যেক পরমাণু ও কালান্তব্যাপী জীবন-আহবে মাতিয়া চলিয়াছে—ইহা কি উন্মাদ মস্তিষ্কের অসম্বদ্ধ প্রলাপ? না, ভাবাবিষ্ট কবির মনোপ্রসূত কল্পনা? তা কখনই নহে। ইহা জাগ্রত—অতি জাগ্রত সত্তা। হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) কথায় বলিতে গেলে ইহা চরমের চরম—"ultimate of ultimates"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম-এ, বি-এল

সমালোচনা।

রবি বাবুর গোরা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হারাণ বাবু (পানু বাবু)

পানু বাবু ব্রাহ্ম; বিদ্বান কিন্তু বড় কলহপ্রিয় ও স্বার্থপর। ব্রাহ্মসমাজে বেশ প্রতিপত্তি আছে। কলিকাতায় কোন স্কুলে মাষ্টারি করেন; একখানি পত্রিকার সম্পাদক। পরেশ বাবুর বাড়ীতে এর গতিবিধি আছে। পরেশ বাবুর পালিতা কন্যা সুচরিতার সঙ্গে পানু বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। চেনাপরিচয় হবার পর গোরা ও বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। পানু বাবু ভাবলেন,—"I am the monarch of all I survey, my right there is none to dispute." সুতরাং পানু বাবুর রাগ ও হিংসা হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে পানুর সঙ্গে গোরা ও বিনয়ের তুমুল তর্ক যুদ্ধ হইত। পানু গোরাকে একেবারেই দেখতে পার্ত্তনা; গোরা তার চক্ষুশূল। পরেশ বাবুকে পানু দোষ দিতে লাগিল; লোকের কাছে পরেশ বাবুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন পানু তাঁর মুখের সামনে বলে ফেল্লে,—"পরেশ বাবু! আপনি বড় দুর্ব্বলচিত্ত; আপনার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। আপনি কোন্ সাহসে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিদের আপনার অন্দরমহলে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন? এটা ভাল নয়।" যখন গোরার সঙ্গে সুচরিতার এবং বিনয়ের সঙ্গে ললিতার ঘনিষ্ঠতা হই যাচ্ছে এবং ইহাদের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে তখন পানু বাবু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শত্রুতাচরণ করেন। বিবাহটা যাতে না ঘটে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। [illegible] বশতঃ পানুর মন হিংসা ও দ্বেষে পূর্ণ; দলাদলি গণ্ডগোলের মূলে পানু বাবু। প্রতিহিংসা লওয়াতে পৌরুষ আছে—এটা তার দৃঢ়বিশ্বাস।

দাদা, পানু বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের কলঙ্ক, কেমন না? রাগ, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এগুলি সব পানু বাবুতে ছিল।

ঠিক বলেচ।

মাধব চাটুয্যে।

মাধব চাটুয্যে নীল কুঠির নায়েব। এ লোকটার ভেতরে একখানা, বাইরে একখানা, বড় কপটী। গোরার কাছে তার মন যোগান কথা বল্লে আবার দারগার কাছে তার মনরাখা কথাটী বলে এল। আড়ালে যেমন গোরার নিন্দা করলে দারগারও তেমনি নিন্দা করলে। শেষে গোরার সমূহ অনিষ্ট করলে। গোরার জেল হওয়াটা মাধবের কুপরামর্শেই ঘটেছিল।

দারগা।

দারগা বড় দুর্ম্মুখ লোক, ভাল কথা বলতে জানে না। গোরাকে অনেক গালমন্দ দিলে বিস্তর অপমানও করলে। পরে ম্যেজেষ্টার সাহেবকে গোরার বিরুদ্ধে লিখে পাঠালে, তার ফল হল এই ম্যেজেষ্টার বাহাদুর জোরো হয়ে গোরাকে জেল দিলেন।

সতীশ।

সতীশ বারদাসীর [illegible] ছেলে। পরেশ বাবুর

বাড়ীতে দুই ভাই বোনে প্রতিপালিত। সতীশ বালক—বালকসুলভ চপলতা দেখিয়েছে। বিনয়ের বড় বন্ধু। সকল মেয়েরা সতীশকে বক্তিয়ার খিলিজী বলিয়া ডাকিত, তার কারণ সতীশ একবারও মুখের বিশ্রাম দিত না।

সুরেশ।

ছোকরাটী বি-এ পড়ে, সোণার চষমা চোখে পরে মেয়েদের ন্যায় ফরমাস খাটে। পরেশ বাবুর স্ত্রী ও মেয়েরা সুরেশকে বাড়ীর ছেলে জ্ঞান করে। দাদা, সতীশ ও সুরেশ যেন বাজে লোক বলে বোধ হয়।

স্ত্রীচরিত্র।

আনন্দময়ী।

আনন্দময়ী একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের কন্যা ও পৌত্রী। পূর্ব্বে এর খুব আচার বিচার ছিল; পরে স্বামীর অনুরোধে সে সব জলাঞ্জলী দেন। আনন্দময়ী রমণীকুলের আদর্শ, দয়া-মায়া-ক্ষমা-লজ্জা এ সমস্ত গুণে ভূষিতা। আনন্দময়ীর সদাই হাস্যবদন। পরের দুঃখে দুখী, পরের সুখে সুখী; তাঁর চক্ষে সকলেই সমান—তাঁর আত্মপর ভেদ ছিল না। গোরার গর্ভধারিণী জনৈক ইংরেজ মহিলা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ব্রাহ্মণের গোয়ালঘরে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তিনি প্রাণ-ত্যাগ করেন। সেই মাতৃপিতৃহীন দুগ্ধপোষ্য সদ্যজাত শিশুকে আনন্দময়ী আপন স্তন দিয়া কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করেন। আনন্দ-ময়ী এই সময় হতে তাঁর হিন্দু আচার নিষ্ঠা ত্যাগ করেন। একা গোরার মা নহেন, আনন্দ-ময়ী সমগ্র ভারতবাসীর মা। ইনি জননীর আদর্শস্থল—যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্ম্মিষ্ঠা, আবার তেমনি দয়াময়ী, বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতিকৃতি। গোরা আনন্দময়ীকে জীবন্ত ভারতবর্ষ জ্ঞান করিত আর সকলের কাছে বলিত ইনি আমার ভারতমাতা।

গোরা বলিতেছে,—"আমার মার (আনন্দ-ময়ীর) মুখ আমার মাতৃভূমির প্রতিমা স্বরূপ হইয়া আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক এবং দৃঢ় রাখুক।

একদিন সন্ধ্যার সময় গোরা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল আনন্দময়ী তাঁর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন। গোরা আসিয়া ইঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া তদুপরি আপনার মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুহাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া চুম্বন করিলেন। গোরা কহিল,—"মা তুমি আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। মা, তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ" অপর একস্থলে গোরা বলিতেছে—

"আমি যখন আমার মাকে দেখচি, মাকে জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রী-লোককেই এক জায়গায় দেখচি এবং জেনেছি।"

দাদা, বল দেখি আনন্দময়ীর চিত্র কেমন

ক্রমশঃ

বেশ হয়েছে। শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেশ-দিমোনার চরিত্র সুন্দর কিন্তু মা আনন্দময়ীর চরিত্র আরও সুন্দর, অতি মনোহর। আনন্দময়ী সাক্ষাৎ আনন্দময়ী ভগবতী।

বরদাসুন্দরী।

ইনি পরেশ বাবুর স্ত্রী, ব্রাহ্মিকা। ইনি বেশভূষা ঝাঁকজমক বড় ভালবাসিতেন ব্রাহ্মসমাজে এর নিয়মিত যাওয়া ছিল। মেয়েদের সকলকে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যেতেন। বাড়ীতে কোন অপরিচিত পুরুষ এলে বরদাসুন্দরী তাঁকে খাতির অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আপনার মেয়েদের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় করে দিতেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের সম্মুখে তিনি আপনার মেয়েদের গুণের প্রশংসা করিতেন। ডাক্তার প্রিয়রোজের স্ত্রীর ন্যায় ইহার স্বভাব ও প্রকৃতি—উভয়েই বিলাসপ্রিয়। লোকে বলিত তার দোষেই মেয়েদের চাল চলন বিগড়ে গেছে। বরদাসুন্দরী কখন কখন স্বামীর উপরে কখন কখন মেয়েদের উপরে রাগ করিতেন। হরিমোহিনীর প্রতি তাঁর বড় বিদ্বেষ। হরিমোহিনীর প্রতি বরদা ভাল ব্যবহার করেন নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিনয়ের প্রতি বড় সদয় ছিলেন। পরে ললিতার সহিত বিনয়ের বিবাহ হিন্দুমতে হইবে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল খাঁটি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হয়, তা হ'ল না। তাঁর কোট্ বজায় রহিল না. সেজন্য তিনি বিবাহে গেলেন না। কাজে কর্ত্তব্যে, কথায় বার্ত্তায় আচারে অনুষ্ঠানে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। একটু নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই সর্ব্বনাশ! যাহোক দোষে গুণে বরদাসুন্দরী মন্দ লোক ছিলেন না।

হরিমোহিনী।

হরিমোহিনী—পরেশ বাবুর আত্মীয়া, বহু কাল পরে পরেশ বাবুর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন। বাড়ীর উপর তালায় এক খানি ছোট ঘরে থাকেন আর সেই খানেই আপন ইষ্ট-দেবতার পূজা অর্চ্চনা করেন। রাধারাণী ও ললিতা তাঁকে বড় ভালবাসে, তিনিও তাহাদের বড় ভালবাসেন। বরদাসুন্দরীর সে সব ভাল লাগিত না; তিনি বিরক্ত হতেন। অবশেষে একদিন স্পষ্টই বলে ফেল্লেন,—"তোমার ভাই! এ বাড়ীতে থাকা হবে না। তুমি হলে হিন্দু, আমরা হলাম ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম বাড়ীতে বসে হিন্দুর দেবদেবী পূজা করাটা ঠিক নয়। আমি তা সহিতে পারি নে। এইরূপ মাঝে মাঝে দুজনার ঠোকাঠুকি হইত আর হরিমোহিনী চক্ষের জল ফেলিতেন। ক্রমে একদিন কলহ এত বাড়িয়া উঠিল যে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিমোহিনী পরেশ বাবুর বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেলেন। পরেশ বাবু সুচরিতার নামে একখানি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে গিয়া হরিমোহিনী বাস করিতে লাগিলেন। সুচরিতা ও তার ভাই সতীশও এখন আপনাদের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। এখানে এসে হরিমোহিনী বিলক্ষণ কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাই বোনের সামান্য ক্রটী দেখিলেই তিনি তাদের ধমক দিতেন ও তিরস্কার করিতেন।

বিনয় ও গোরা মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে সুচরিতার সহিত দেখা করিতে যাইত। তারা দেখা করিতে আসিলেই নির্জ্জনে বসে কথা কহিতে থাকিলেই হরিমোহিনী রাগভরে তাঁহাদের অনেক অকথ্য কুকথা বলিয়া অপমান করিতেন। হরিমোহিনী ব্রাহ্ম মেয়েদের আচার ব্যবহারের বিস্তর নিন্দা করিতেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা রাধারাণীর বিবাহ গোরার সহিত না হইয়া তাঁরই এক দেবরের সঙ্গে হয়। পত্র লিখিয়া দেবরকে বাড়ীতে আনান হইল। সুচরিতা সে বিবাহ পছন্দ করিল না। কাজেই সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

দাদা, বরদাসুন্দরী গোঁড়া ব্রাহ্ম, হরিমোহিনী গোঁড়া হিন্দু, contrastটা বেশ দেখান হয়েছে নয়?

হাঁ।

লাবণ্য ও লীলা।

লাবণ্য ও লীলা পরেশ বাবুর দুটী কন্যা। এ দুটী মেয়েই তার কথার বশ, সেজন্য তার বড় প্রিয়। লাবণ্য অপেক্ষা লীলা চতুরা।

গাছের ডালপালা না থাকিলে গাছের শোভা হয় না, নেড়া নেড়া দেখায়। এ দুটী চরিত্র গল্পের ফেকড়া বলেই বোধ হয়।

ঠিক বলেছ।

ললিতা।

ললিতা পরেশ বাবুর মেজ মেয়ে; খুব বুদ্ধিমতী, জিদ্দবাজ, একগুয়ে, যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না। ললিতার মহৎ গুণ এই, প্রাণ গেলেও সে লোকের অনিষ্ট করিবে না। ললিতার কাছে সত্যের আদর ও মিথ্যার অনাদর চিরকাল। কোন কাজটা ন্যায় আর কোন কাজটা অন্যায় এ বিচার ললিতা সততই করিত; অন্যায় বর্জ্জন ও ন্যায় গ্রহণ করিয়া সত্যের ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। ললিতা চপলা ও চতুরা, আপন মনের ভাব অপরকে জানিতে দিল না। সুতরাং ললিতা যে কার উপর তুষ্ট ও কার উপর রুষ্ট অথবা কখন তুষ্ট ও কখন রুষ্ট ইহা বুঝে উঠা ভার। কেহ দিন রাত সেবা করেও তার মন পেত না; আবার কেহ বিনা সেবাতে তার উপর আধিপত্য করিত। এ রহস্য বোঝা কঠিন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামচন্দ্র ঘোষ এম, এ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১। আমরা মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন সিংহ রায় বাহাদুর প্রণীত তুই খণ্ড ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী, আত্মদর্শন ও স্বপ্নদর্শন নামক পুস্তকগুলি উপহার পাইয়াছি। রায় বাহাদুরের সঙ্গীতে ভাবের এবং ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, এরূপ ভক্তিচ্ছাসপূর্ণ সঙ্গীত আমরা বহুদিনপাঠ করি নাই। আত্মদর্শন ও স্বপ্নদর্শন পুস্তকদ্বয় সাধকত্বের পরিচায়ক, বাহিরে জমিদার হইলেও ভিতরের জমীদারী তিনি অনেক অংশে আয়ত্ত করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "স্তবক ও কোরক" পুস্তকখানির অধিকাংশ কবিতাই মধুর ও মনোরম—পাঠে অরুচি হয় না।

৩। নিরুপমা পুরস্কার। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেশনার মেসার্স শর্ম্মা ব্যানার্জ্জীর এণ্ড কোর আবিষ্কৃত নিরুপমা কেশ তৈলের সংক্রান্ত গল্প পুস্তক, কেবল আবর্জ্জনাপূর্ণ নহে, পড়িবার মত হইয়াছে। ইহাদের "নিরুপমা"ও সুন্দর কেশ তৈল।

সম্পাদক।

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৪ সাল।

ওকলার কাল্‌কা মন্দির

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে মহামায়া আদ্যা-শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমে এই শক্তি-পূজা জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সময়ে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সময় হইতেই সম্ভবতঃ প্রস্তরাদিতে দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা হইতে থাকে। মধ্যযুগে শক্তি-পূজার এত অধিক প্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর্য্যগণ যখন যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইস্থানেই শক্তিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগের অনেক দেবদেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া দেন,—অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্ট শক্তি-মূর্ত্তির মধ্যে ওকলার কালিকামূর্ত্তি অন্যতম। ইহা সত্যজ নিপতিত পীঠস্থানের অন্তর্গত না হইলেও বহুদিন হইতে পীঠস্থানেরই ন্যায় সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

ওকলা, বর্ত্তমান দিল্লীসহরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সহর হইতে, পূর্ব্বে এখানে গোশকটাদি যানে যাইতে হইত; কিন্তু প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের আগ্রা-দিল্লী শাখা, এই স্থানের নিকট দিয়া লইয়া যাওয়ায় দেবী দর্শনার্থিদিগকে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানকার দেবীমূর্ত্তিকে এতদ্দেশীয়গণ 'কাল্‌কাজী' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। "কালিকেতি মমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া" কাল্‌কা শব্দটী বোধ হয় এই কালিকা শব্দেরই অপভ্রংশ। কাল্‌কাদেবীর মন্দিরটী রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা উচ্চতায় নিতান্ত ছোট নহে। যাত্রীদিগের দেবীপ্রদক্ষিণ ও দর্শনের সুবিধার জন্য মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত বারাণ্ডা এবং বৃহৎ বৃহৎ দ্বার নির্ম্মিত আছে। উৎসবাদির সময় সকল দ্বার-গুলিই খুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য সময় দুই একটী মাত্র খোলা থাকে। মন্দিরটী পাহাড়ের একরূপ নিভৃত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত যে,

দেখিলেই মনে হয় অতি প্রাচীনকালে কোনও সাধক জনশূন্য পর্ব্বত গুহায় সাধনা করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানটী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগদ্বিখ্যাত কুতবমিনারের পার্শ্বস্থ যোগমায়ার মন্দিরের কথা ছাড়িয়া দিলে, এই প্রাচীন কালিকাদেবীর মন্দির ব্যতীত ইন্দ্রপ্রস্থ মহানগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এমন কোনও দেবালয় বা দেবদেবীর মূর্ত্তি নাই—যাহা পুরাকালের হিন্দুকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। এরূপ নিভৃতস্থানে এই মন্দিরটী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; নতুবা যে স্থান পাঁচ শত বৎসর যাবৎ মুসলমানগণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, তথায় হিন্দুর দেব-মন্দির রক্ষা পাওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

শিব-পূজা ব্যতীত শক্ত্যুপাসনা সর্ব্বাঙ্গীন হয়না। ভারতের তীর্থক্ষেত্র সমূহে দেখা যায়—যেখানে শক্তিমূর্ত্তি সেখানে দু'একটী শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে। ওকলার কালকা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে যে প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা আধুনিক। পূর্ব্বে এখানে কিরূপ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই।

এই মন্দিরটী এত পুরাতন, যে, কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইতিহাসবেত্তা সৈয়দ আমেদ খাঁ বলেন, এরূপ জানা যায়, প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দ্বাপর যুগের শেষভাগে এই দেবীমূর্ত্তি এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানে কিরূপ মন্দির ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে উর্দ্দু ও পার্শী গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ 'রোয়াক' মার্ব্বেল ও লাল পাথরের (granite) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮১৬ খৃঃ অঃ ২য় আকবর সাহের রাজত্বকালে রাজা কেদারনাথ নামক তাঁহার একজন হিন্দু-কর্ম্মচারী এই মন্দির সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করেন। সেই অবস্থাতেই এখন ইহা সংরক্ষিত হইতেছে।

এতদ্দেশের পূজা-পদ্ধতি বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তান্ত্রিক উপাসকেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বীরাচারী ও পশ্বাচারী। বীরাচারী উপাসকেরা মদ্য-মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্বাচারী শাক্তেরা রাজসিক মতে উপাসনা করেন; ইঁহারা মদ্য-মাংস গ্রহণ করেন না;—কেবল মন্ত্রজপ ও পঞ্চ উপচার দ্বারা শক্তিপূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পশুবলির বিধান আছে। পূর্ব্বে ওকলার কালিকাদেবীর কিরূপ পদ্ধতিতে পূজা হইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পশ্চিমাঞ্চল বহুদিন যাবৎ মুসলমান শাসনাধীন থাকায় অধুনা বঙ্গদেশের ন্যায় এতদ্দেশে দেবদেবী পূজায় সেরূপ আড়ম্বর নাই। এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম এতদ্দেশে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই সময় হইতে এখানে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের

মধ্যে,—প্রাণিহিংসা অত্যন্ত ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। সুতরাং কালিকাপূজা তান্ত্রিকপূজা হইলেও, বলি যে শক্তিপূজার একটী প্রধান অঙ্গ, একথা ইহারা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা এখন কেবল পুষ্প, বিল্বপত্র ও মিষ্টান্নাদি উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বাসন্তী ও শারদীয় পূজা শক্তি-পূজার প্রধান উৎসব। এই দুই উৎসবে এখানে তিন দিন অহোরাত্রব্যাপী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় এত জনতা হয় যে, অষ্টমী ও নবমীর দিন, দিল্লী ষ্টেশন হইতে অনবরত special train যাতায়াত করিয়াও যাত্রিদিগের অভাব মোচন করিতে পারে না; গোশকট ও অশ্বযানে এই ছয় মাইল রাস্তা নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে। এই মেলা এত আড়ম্বরপূর্ণ হয় যে, হিন্দু ত দূরের কথা অত্রস্থ মুসলমান অধিবাসিগণও মসজিদ্ এবং মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তী বাগানে নাচগান ও উৎসবাদির আয়োজন না করিয়া থাকিতে পারে না। উৎসবে মুসলমানগণের যোগদান করাটা আশ্চর্য্যের কথা বটে এবং ইহার কারণও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে দেখা যায় এই দেশ বহুকাল মুসলমান শাসনাধীন থাকায়, কত অহিন্দু-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ হিন্দু-অনুষ্ঠানে এবং কত হিন্দু-অনুষ্ঠান এমশঃ অহিন্দু-অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বাসন্তী ও শারদীয় উৎসবে এখানে এত আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয় যে, অত্রস্থ মুসলমানগণ, উহা হিন্দুর উৎসব একথা বোধ হয় একেবারে ভুলিয়া যান এবং এই আনন্দোৎসবে নিশ্চেষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

মন্দিরটী পাহাড়ের উপরে অবস্থিত থাকায়, উহা হইতে দূরস্থিত বস্তুগুলি অতি সুন্দর দেখায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র (binocular) সাহায্যে দূরস্থিত কুতবমিনার, হুমায়ুণের কবরস্তম্ভ প্রভৃতি দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্যও উপভোগ করিতে পারা যায়। এই স্থানটী যেন প্রকৃতির রম্যস্থল। ইহার স্বাভাবিক শোভায় আকৃষ্ট হইয়া দিল্লীনিবাসী কতকগুলি ধনীলোক এখানে বাগানবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই তাঁহারা এখানে বাস করিয়া থাকেন। এখানে যে কেবল বাগানবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহা নহে; কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ সঙ্গতিপন্ন মহাত্মা দেবী দর্শনার্থিগণের সুবিধার জন্য অনেকগুলি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল যে উৎসবের সময়েই এখানে জনসমাগম হয়—তাহা নহে, ওক্‌লার স্বাভাবিক দৃশ্য এত মনোহর যে, ইহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দেবীদর্শনার্থী ব্যতীত অপর অনেকানেক লোকের প্রায়ই এখানে সমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে যমুনা নদী প্রবাহিত। সরকার বাহাদুর প্রস্তর সাহায্যে যমুনার জল অবরোধ করতঃ দুই হাত উচ্চ কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা এক বাঁধ প্রস্তত করিয়া, তাহার পার্শ্ব দিয়া, কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য এক খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। এই কাষ্ঠ প্রাচীরের কিয়দংশ বার মাস খোলা থাকে

এবং তথায় যমুনা ক্ষীণ গতিতে প্রবাহিত হন। বর্ষাকালে ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। নদী জলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে যখন কাষ্ঠ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন এই জলপ্রপাতের দৃশ্য বাস্তবিকই অতি উপভোগ্য। ইহার শব্দ প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়াই হউক অথবা দেবীদর্শনার্থী হইয়াই হউক অন্য সময় অপেক্ষা বর্ষাকালেই এখানে অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীকিশোরীমোহন সরকার।

"দিল্লীর বাঙ্গালী" সম্বন্ধে প্রকৃত কথা।

কিছুদিন হইল আমার কোন বন্ধুর লিখিত অত্র মাসিক পত্রের ফাল্গুন ও চৈত্রের যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত "দিল্লীর বাঙ্গালী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা" নামক আমার একটী প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে আমার বিশেষ গ্লানি করিয়াছেন। তিনি আমাদের ঘরোজোড় বন্ধু—একই আফিসের কর্ম্মচারী। তিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমরাও কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। এ সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত তাহা না দেখিয়া ও আমাকে অতি অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে আমার মনস্তাপের কোনই কারণ থাকিত না। যাহা হউক এরূপ প্রবন্ধের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া এত দিন উহার কোন প্রতিবাদ করি নাই কিন্তু যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া যাইবে ভাবিয়া যোগেন্দ্র বাবুর কোন্ কথা সত্য ও কোন্ কথাগুলি আপত্তিজনক তাহাই এখানে প্রকাশ করিতেছি।

(১) যোগেন্দ্র বাবুর প্রথম কথা এই যে, আমি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে দিল্লী সম্বন্ধে ২।১টী ভ্রম দেখাইতে গিয়া বলিতে চাহিয়াছি যে আমি ও আমার কতিপয় বন্ধু দিল্লীতে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের নামের পরিবর্ত্তে আমার নাম উক্ত পুস্তকে স্থান লাভ করুক। প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া আর কেহই বোধ হয় এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের নাম "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে বান্ধব-সমিতির সংস্রবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কখনই অসুখী হইতে পারি না বরং উক্ত সমিতির সংস্রবে আর একজনের নাম প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম ও প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধে যতীন্দ্র বাবুর নামের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় তিনিই আমাকে গালি দিয়া "আলোচনায়" প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য-সভা "বান্ধব-সমিতির" শাখা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই ভ্রম সংশোধনের জন্য এবং বান্ধব-সমিতির সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, ইহা প্রদর্শনের জন্য উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রবাসীতে প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। আমার ও আমার বন্ধুগণের নাম উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত হইবে এরূপ কল্পনা কখনও করি নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন,—"এখানে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা নামক যে একটী পুস্তকালয় আছে, তাহা কোন কালেও সাহিত্য সভা নহে, তথায় এমন একটু স্থান নাই যে, সেখানে বাঙ্গালী গিয়া সাহিত্যালোচনা করে। ঐ পুস্তকালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজের বাড়ীর একটী ক্ষুদ্র ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাই এখনও উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, নচেৎ উহার এমন অর্থ নাই যে, একটি ঘর ভাড়া করিয়া সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে।"—— বঙ্গ সাহিত্য সভার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরটী বঙ্গ-সাহিত্য-সভার ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন—ইহা সত্য কিন্তু তিনি স্থান দান না করিলে উহার অস্তিত্ব লোপ পাইত একথা সত্য নহে। পূর্ব্বে অনেক কাল ভাড়া দিয়া সভার জন্য গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং সে সময় অপেক্ষা এখন সভার অবস্থা অধিকতর স্বচ্ছল। যোগেন্দ্র বাবুর মতে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য-সভা কোন কালে সাহিত্য-সভা নহে ?' কিন্তু তিনি ভিন্ন অন্য সকলের মতে যদি উহা "সভা" বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাতে তাঁহার দুঃখিত হওয়া উচিৎ নহে। আর যখন তিনি কখনও বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সাধারণ অথবা বিশেষ অধিবেশন কালে কিংবা অন্য কোন সময়ে উক্ত সভায় পদার্পণ করেন নাই, তখন তাঁহার মতই যে অভ্রান্ত এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। হীরালাল বাবুর প্রদত্ত গৃহটী ক্ষুদ্র হইলেও এখনও সেখানে সাহিত্য-রস-পিপাসু সভ্যগণের সমাগম ও সাহিত্য-চর্চ্চা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে তাহারও ব্যবস্থা হইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ, তিনি লিখিয়াছেন,—"যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের মৃত্যু উপলক্ষে এখানে শোকসভা আহূত হইয়াছিল, তাহা দিল্লীস্থ বাঙ্গালীগণের সমবেত চেষ্টায়, বঙ্গ-সাহিত্য-সভার তাহাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব ছিল না"—— এ কথাও সত্য নহে। আমি প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম যে, বঙ্গ-সাহিত্য-সভা দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপাত্র হইয়া, এই সকল শোক সভার আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাতে অবশ্য সাধারণের সহানুভূতি ছিল—ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু যখন বঙ্গ-সাহিত্য-সভার উদ্যোগে এই সকল সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং যখন বঙ্গ-সাহিত্য-সভা এই সকল সভার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন (কোন কোন সভার

যায় ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্ত সভ্যেরা চাঁদা করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন) তখন ইহাতে তাহাদের কৃতিত্ব সূচিত হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(৪) চতুর্থতঃ, যোগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"উক্ত সভার সাধারণ অধিবেশনে কোনও কালে বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি পাঠ হইত না।" কিন্তু তাহার পরেই আবার স্বীকার করিয়াছেন যে,—"স্থানীয় হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এক সময় অত্রত্য বাঙ্গালা স্কুলে কতিপয় বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।" ধীরেন্দ্র বাবু ভিন্ন আরও অনেকে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার তালিকা বঙ্গ-সাহিত্য-সভার কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। যখনই কোন বক্তা বা প্রবন্ধ-লেখকের সম্মতি-লাভ করা গিয়াছে, তখনই তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা বা প্রবন্ধ-পাঠ বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সাধারণ অধিবেশনই হইয়াছে। বিগত বৎসরেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল দিল্লী-ভ্রমণে আসিয়া "বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, উপযুক্ত লোকের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা বাঙ্গালীদিগের হৃদয়ে প্রীতি ও সদ্ভাব সঞ্চার করিতে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা চিরদিনই যত্নশীল রহিয়াছে কিন্তু যোগেন্দ্রবাবু তাহার কোন পরিচয় পান নাই এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সভায় কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে বলিয়া তিনি জানেন না। আমি পূর্ব্বেও লিখিয়াছি যে তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-সভার কোন অধিবেশনে কখন পদার্পণ করেন নাই সুতরাং তিনি জানেন না বলিয়া কেহই জানে না বা তাঁহার নিকট কোন প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত না হইলে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না।

(৫) তারপর যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "গত বৎসর স্যার রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানকার বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা স্কুলে এক সভা করিয়াছিলেন কিন্তু সে সভায় বঙ্গ-সাহিত্য-সভার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হয় নাই। যদি বঙ্গ-সাহিত্য-সভা এখানকার সাহিত্য-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থলই হইবে, তবে সে সময় ইহা কি জন্য চুপ করিয়াছিল?"

——এ সকল কথার অধিকাংশই সত্য। এখানকার মিসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য-সভার এক জন সভ্য। তাঁহারই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এখানকার বাঙ্গালীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাঙ্গালা স্কুলে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সভা করিয়া কেহ সম্বর্দ্ধনা করে বা অভিনন্দন দেয়—ইহা তিনি ইচ্ছা করেন নাই। বঙ্গ-সাহিত্য-সভা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে অভিলাষী হইলেও তাহার অনভিমতে করিতে পারেন নাই।

(৬) ইহার পর যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "এখন দিল্লীর বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ১০০০ হয়। কিন্তু পুস্তকালয়ের পাঠকের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক হইবে না। ইতিপূর্ব্বে ৩০ জনের অধিক পাঠক কখনও হয় নাই, তবে শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়

সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করার পর হইতে অনেক অপব্যয় নিবারিত হয় এবং পুস্তকের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

বর্ত্তমানে দিল্লীতে ১০০০ ঘর বাঙ্গালী নাই। ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ভারত গভর্ণমেন্টের দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের আবাস স্থলে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদিগকে এই তালিকাভুক্ত করিলে স্ত্রী, পুরুষ ও বালকের সংখ্যা বোধ হয় মোট ১০০০ হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সভ্য সংখ্যা যে অধিক নহে, তাহা প্রবাসীতে আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে হীরালাল বাবু সম্পাদক হইবার পূর্ব্বে অনেক অপব্যয় হইত এবং সভার পূর্ব্ব ইতিহাস ভাল নহে, ইহা নূতন সংবাদ বটে, তিনি ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? যাহা তিনি জানেন না, এরূপ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার উচিত হয় নাই।

(৭) তারপর তিনি বান্ধব-সমিতির কথা উল্লেখ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্রের যত্নে (আমরা বলি তাঁহারও যত্নে) এখানে প্রতিষ্ঠিত বান্ধব-সমিতি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যাত্রা, থিয়েটার ও ঐক্যতান-বাদন সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমান ঐক্যতান-বাদন সমিতি ও বঙ্গীয় নাট্যসমাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুস (Rev. Andrews) সাহেব কর্ত্তৃক প্রশংসা এবং শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম ও সত্যচরণ সরকার প্রভৃতি যুবকগণের অভিনয়দক্ষতার যুক্ত-অবহিলে প্রদান প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য কিন্তু ঐ সকল অবান্তর কথায় ইহা বুঝায় না যে, সেই প্রাচীন কালের বান্ধব-সমিতি এখনও আছে ও ঐক্যতান-বাদন-সমিতি ও বঙ্গীয় নাট্য-সমাজের প্রাপ্ত গৌরব বান্ধব সমিতিরই প্রাপ্য। উক্ত দুই সমিতি বঙ্গ-সাহিত্য-সভার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যোগেন্দ্র বাবুর যুক্তি মানিয়া লইতে গেলে তাঁহার কথিত ঐক্যতান-বাদন-সমিতির সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয়-নাট্য-সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম ও সত্যচরণ সরকার ও আরও কেহ কেহ বঙ্গ-সাহিত্য-সভারও সভ্য বলিয়া উক্ত সমিতিদ্বয়কে বঙ্গ-সাহিত্য-সভার অংশবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা ত সত্য নহে। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পুস্তকে বঙ্গ-সাহিত্য-সভাকে বান্ধব-সমিতির শাখা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এই ভ্রম সংশোধনের জন্য প্রবাসীতে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত প্রবাসীর যে পত্রের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবু পূর্ব্বোক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সেই পত্র যোগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল, এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সভ্য তাঁহার পুত্র উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র বাবু এ পত্র লেখেন নাই জানিয়া উক্ত পত্রের লেখককে কাল্পনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। এতদিনে যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্বোক্ত ধারণা স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হইল। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার পুত্র জীতেন্দ্র বাবুর নামে উক্ত পত্র বেনামী করিয়া প্রবাসীতে

লিখিয়াছিলেন—ইহা প্রকাশ করিতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না। যোগীন্দ্র বাবুর পুত্র জীতেন্দ্র বাবু অনেক পরে বঙ্গ-সাহিত্য-সভায় যোগ দিয়াছেন। আলোচনার প্রকাশিত প্রবন্ধের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

তারপর যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বান্ধব-সমিতি যে সময় স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে সঙ্গীত-চর্চ্চা, সাহিত্য-চর্চ্চা, ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি সমস্তই হইত"——আমরা কিন্তু কেবল সঙ্গীত-চর্চ্চার কথাই জানি। সাহিত্য-চর্চ্চা, ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতির কথা আর কেহই অবগত নহে। যোগেন্দ্র বাবুর কথিত বান্ধব-সমিতি ও বর্ত্তমান ঐক্যতান-বাদন-সমিতির সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এ সকল কথা জানেন না। ইহা অবশ্য সত্য যে তদানীন্তন বান্ধব-সমিতির সভ্যগণের কেহ কেহ বঙ্গ-সাহিত্য-সভা এবং বহু পরে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যতান-বাদন-সমিতি ও বঙ্গীয় নাট্যসমাজের উৎসাহী সভ্য কিন্তু তাহাতে ইহা বুঝায় না যে পূর্ব্বেকার বান্ধব-সমিতি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া এই সকল সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীদের যত্নে দিল্লীতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সভা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "বান্ধব-সমিতি" সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে কিন্তু তৃতীয় দশকে যখন তাহার সত্তা বিদ্যমান্ ছিল না, তখন উহার কাল্পনিক অস্তিত্ব সমর্থন করিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া যোগেন্দ্র বাবু যদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনীকান্ত ঘোষ ও সত্যচরণ সরকার প্রভৃতিকে তাঁহাদের সমিতির নাম "বান্ধব-ঐক্যতান-বাদন-সমিতি" ও "বান্ধব-নাট্য-সমাজ" রাখিতে অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া বান্ধব-সমিতিকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইতেন। তখন উহার অস্তিত্বে আর কেহই সন্দিহান হইতে পারিত না এবং ঐরূপ নামকরণ দেখিয়া আমরাও প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম।

দিল্লীতে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একতা, প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনে বঙ্গ-সাহিত্য-সভা যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিতে না পাইলেও তিনি যে দিল্লীর বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য পরলোকগত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়কে এ সকলের জন্য ধন্যবাদার্হ বিবেচনা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। প্রবাসীতে প্রকাশিত (প্রবাসী ১৩০৯, চৈত্র সংখ্যা, ৪২৭ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বোক্ত বেনামী চিঠিতে তিনি হেমবাবুর উৎকর্ষের কথা স্বীকার করেন নাই বরং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলেন।

পরিশেষে যোগেন্দ্র বাবু আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে আমি যেন ভবিষ্যতে বান্ধব-সমিতির সাকারত্বে অবিশ্বাসী না হই এবং প্রবাসীতে অযথা যা তা কতকগুলা লিখিয়া সত্যের অপলাপ না করি।

সত্যের অপলাপ কে করিয়াছে ও যা তাই যা কে লিখিয়াছে এবং প্রবাসীতে যা তা প্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধিগণের বিচার্য্য। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীশিবশঙ্কর মল্লিক।

কুমার দামোদর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাণী দুর্গাবতী।

রংপুর জেলায় ডিমলার দক্ষিণে ধর্ম্মপুর নগর। নগরটী দুর্গবেষ্টিত, এবং রাজা ধর্ম্মপালের রাজধানী। রাজা ধর্ম্মপাল পতিনা নগরের রাজা মাণিকচাঁদের মহিষী রাণী ময়নামতীর সহোদরা ভগিনী রাণী দুর্গাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং রাজ্যের কেহই তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিত না, কিন্তু সকলেই ভয় করিত। রাজা ধর্ম্মপাল কোন লোককেই বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি নিজের মহিষীর উপরও বিশ্বাস ছিল না। রাণী দুর্গাবতী অতি সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন।

রাজা ধর্ম্মপাল একদিন সন্ধ্যার সময় রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে সময় রাণী সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া বাতায়নে বসিয়াছিলেন। সুমিষ্ট বাতাস মৃদুমন্দভাবে বহিয়া রাণীর কেশপাশ লইয়া খেলা করিতেছিল। রাণী অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কি যেন তাঁহার হৃদয়ে আলোড়িত হইতেছিল। রাজা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া রাণীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। অনেককাল সে সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তার পর সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এত চিন্তার কারণ কি?" রাণী চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন পশ্চাতে রাজা দণ্ডায়মান। তখন মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "রাজন্, সংবাদ পেলেম, রাজা মাণিকচাঁদ পীড়িত এবং কুমারের বিবাহ হচ্চে। বিবাহে আমায় যাওয়ার জন্য লিখেছে। দিদি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, অনেক দিন দেখি না। এখন মহারাজার অনুমতি হ'লেই হয়।" রাজার মুখ গম্ভীর হইল, তিনি উত্তর করিলেন "তা বুঝা যাবে, কবে বিবাহ হবে?" রাণী বলিলেন "এখনও দিন স্থির হয় নাই"। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় স্থির হ'ল? আমি যে কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না।" রাণী বলিলেন "সময়ে আপনি সব জান্‌তে পার্‌বেন। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের জগদ্বিখ্যাত কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে গোপীচাঁদের বিবাহ হবে।" রাজা চমকিয়া উঠিলেন, কি যেন তাঁহার হৃদয়ে তখন দংশন করিল। তিনি এ সংবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্র একজন শক্তিশালী নরপতি, তিনি যে রাজা মাণিকচাঁদের আত্মীয় হইবেন ইহা সুবিধাজনক নহে। রাজা ধর্ম্মপাল মাণিকচাঁদকে ভাল চক্ষে দেখেন না। বিশেষতঃ গোপীচাঁদের উপর তাঁহার বড় বিদ্বেষভাব। রাজা বলিলেন "আমাকে জানান আবশ্যক কি? আমি তাঁদের কে? রাজা গোপীচাঁদ একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কেন? রাণী জয়লক্ষ্মী—যিনি তোমার ভগিনী তিনি ত মাটিতে পা দেন না, মনে মনে বিশ্বাস, তাঁর মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ধরাধামে নাই। রাণী "তুমি রাজা মাণিকচাঁদকে জান না, তিনি একজন দেবদ্বিজভক্ত সর্ব্বজনপ্রিয় রাজা, আমার ভগ্নীর মত নারী আজকাল পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ, ইহাকে [illegible] কি

আছে ?” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “বিদ্বেষ-ভাব কি? তোমার মনে বিশ্বাস আমি তাঁহাদিগকে হিংসা করি। তাঁহারা বড়ই হন বা ছোটই হন আমার তাহাতে কি? আমি ত তাঁহার প্রজা নই বা কোনরূপে দায়ীক নহি। তোমার ইচ্ছা হয় ভগিনীর নিকট যেতে পার, আমার অনুমতির আবশ্যকতা কি? রাণী বলিলেন “তোমার অনুমতি ব্যতীত আমার যাওয়ার সাধ্য কি? যদি সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় দেও যাব, যদি না দেও যাব না।” রাণী শান্ত হইলেন। রাজা আর কথা বলিলেন না, কতক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মায়ের কোলে।

সুধা আজ বড় বিমন, অদ্য তাহার শেষ দিন। হয় বিবাহে সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা—প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আজ আর কোন আপত্তি চলিবে না। দস্যু-সর্দ্দার বলিয়াছে যে, সহজে সম্মতি না দিলে অদ্য জোর করিয়া পুরোহিত বিবাহ দিবে—ইহা-পেক্ষা মৃত্যু ভাল। তাই আজ সুধা প্রস্তুত হইতেছে—আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে স্থির করিয়াছে। সুধার চক্ষে জল আসিল, একবার সেই হিতকারী যুবকের কথা মনে হইল; তিনি এই বিপদ জানিলে অবশ্যই উদ্ধা-রের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দেবোপম কান্তি তাহার মানসে উদিত হইল। তারপর মায়ের কথা মনে হইল। মা যে কত চিন্তিত হইয়া-ছেন তাহা ভগবান জানেন। মা ব্যতীত তাহার আর কে আছে? সুধা একবার ভগ-বানকে স্মরণ করিল। মনে হইল যে সেই বিপদভঞ্জন ব্যতীত আর উপায় নাই। সে যুক্তকরে ঈশ্বরকে ডাকিল। সুধা ডাকিতে জানে না, সুধা কাঁদিতে জানে না, তবে প্রাণের বেদনা জগদীশ্বরকে জানাইতে জানে।

অদ্য দিনমণি অস্ত হইল, সুধার চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাইল। সে উদ্ধারের কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিল না। কক্ষের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল, বড় বড় লৌহ-দণ্ডে বাতায়নগুলি সুরক্ষিত। দ্বারটি বাহির হইতে বন্ধ। নৈরাশ্য তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে একস্থানে বসিল, চক্ষুর জলে গণ্ডস্থল সিক্ত হইল। সুধা শয়ন করিল, আহার্য্য দ্রব্য নিকটেই ছিল, স্পর্শও করিল না। গৃহে একটি আলো উপর হইতে জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রজনী এক প্রহর অতীত হইল, সুধার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল, হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, সুধার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিল তিনটি লোক প্রবেশ করিল। সুধা তখনই অনুমান করিল একজন সেই দস্যু-সর্দ্দার, একজন পুরোহিত ও একজন সাক্ষী, সম্ভবতঃ উহার সঙ্গী। দস্যু-সর্দ্দার বলিল “রূপসি, আজ কোন আপত্তি শুনবো না, পুরোহিত উপস্থিত, তুমি এখন সম্মতি দেও।” এই বলিয়া একগাছি বহুমূল্য হীরক হার তাহার সম্মুখে ধরিল। সুধা দুই হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিল, কোন কথা বলিল না। সর্দ্দার বলিল “সুন্দরি, একবার মুখ তোল, একবার

কথা বল, কি অনুমতি হয়। এ দাস ঐ চরণ-ভিখারী।" সুধা মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "আপনি শুনেছি দয়ার সাগর, আপনি পিতা, আমি আপনার কন্যা, এ কন্যার প্রতি দয়া করুন, আমাকে মুক্তিদান করুন। আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, ভগবান আপনার উপর সদয় হবেন। দয়া পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্ম, এ দাসীকে কৃপা করুন।" সর্দ্দার বলিল "তুমি আমাকে জান না, আমি এ বনের রাজা। আমাকে শাসন করে এমন কেহ নাই। আমার নাম ব্রজনাথ সর্দ্দার, আমাকে না জানে পূর্ব্ববঙ্গে কেহ নাই। আমার ধন-দৌলতের সীমা নাই। তুমি রাজরাণী হবে। ইহাপেক্ষা সুখী কুত্রাপি হ'তে পারবে না। ব্রজনাথের নামে ঢাকা জেলা কম্পবান্‌। আমার সৈন্যসংখ্যা কম নয়—প্রায় সহস্র লোক। আমি দেখিতেও কদাকার নই। অতএব আমাকে ভজনা কর্‌তে তোমার আপত্তি কি? তোমার রূপের মোহে আমি উন্মত্ত হয়েছি। তোমার কোন বিষয়ে কষ্ট হবে না।" সুধা দেখিল তাহার আর রক্ষার উপায় নাই, সে বুঝিল এই চতুর সর্দ্দারের হাত হইতে রক্ষা বড় কঠিন ব্যাপার। ব্রজনাথের নাম সে শুনিয়াছিল, সে সময়ে ব্রজনাথের নাম পূর্ব্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রজনাথ সহজে অত্যাচার করিত না। [illegible]ধনীর ধন অপহরণ করিয়া দরিদ্রকে দান করিত! সময় সময় অনেক লোককে সে সাহায্য করিত। কেহ বিপদে পতিত হইলে তাহাকে আশ্রয় দিত।

ব্রজনাথ ক্রুর প্রকৃতির দস্যু ছিল না। সে কখনও প্রাণিহত্যা করিত না। ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিত। তাহার দলস্থ লোক সকলেই তাহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত, তাহার কথা উহাদের নিকট বেদবাক্য ছিল। ব্রজনাথ বৈষ্ণব ছিল, সে তুলসীতলায় প্রণাম না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইত না। দস্যুরা সাধারণতঃ শক্তির উপাসক, কিন্তু ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। সে বলিত,—"শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের নেতা, তিনি কংস প্রভৃতি অসুরকে স্বহস্তে বধ করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার উপাসক হ'য়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোক দিগকে শাসন কর্‌বো। তবে দেখবো—অযথা প্রাণি-বধ না হয়।" সর্দ্দার বৈষ্ণব, দলস্থ লোকেরা সব বৈষ্ণব, তাহাদের হরিধ্বনিতে বনভূমি প্লাবিত হইত। ব্রজনাথের এক দোষ ছিল, সুন্দরী স্ত্রীলোক হইলে তাহার হাত ছাড়া কঠিন হইত। সুধা সুন্দরী, তাই আজ সুধার প্রতি এত লক্ষ্য। ব্রজনাথের আড্ডা নানা স্থানে ছিল, সে যেমন দস্যুতার খবর পাইত, তেমনি সুন্দরী স্ত্রীলোকের সংবাদ পাইত। ব্রজনাথের আর এক গুণ ছিল—সে কড়া কথা বলিত না, মিষ্ট কথায় নিজ কার্য্যোদ্ধার করবেই। আজ কিন্তু সুধার নিকট সে পরাজিত হইতে চলিল। সুধার কথায় এক একবার তাহার মন বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কার্য্যোদ্ধার করিতেই হইবে, অতএব ব্রজনাথ উদ্দেশ্য ভুলিল না।

যখন সুধা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, তখন ব্রজনাথ পুরোহিতকে বলিল,—"ঠাকুর, আপনি

স্বকার্য্য করুন। এ বালিকা নিজের ইষ্টানিষ্ট বুঝতে পাচ্ছে না, একবার দুই হস্ত একত্র হ'লেই সব আপত্তি ঘুচে যাবে; সব মান, অভিমান, রাগ যাবে। আপনার পুরস্কার জানেন ত? এক শত মুদ্রা দক্ষিণা, আর— ব্রাহ্মণীর স্বর্ণ গহনা এক খানি। অতএব আর বিলম্ব করবেন না।" পুরোহিত বলিলেন,—"এ যে অসম্মত, কি ক'রে বিবাহ হবে?" ব্রজনাথ বলিল,—"কেন হবে না? ইহার আবার সম্মতি অসম্মতি কি? যদি পঞ্চম বৎসরের বালিকার হিন্দুমতে বিবাহ হয়, তবে সে কি সম্মতি দিতে সমর্থ? আপনি অগ্রসর হন। এই নিন অগ্রিম ৫ খানা মোহর। পুরোহিত ঠাকুর মোহরের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়া গেলেন, হাত পাতিয়া মোহর গ্রহণ করিয়া বস্ত্রে বেশ করিয়া বন্ধন করিলেন, তারপর সুধাকে বলিলেন,—"মা, রাজরাণী হবে আর আপত্তি করো না, তুমি এখন সব বুঝতে পাচ্ছ না। কত ভাল ভাল বস্ত্র, কত স্বর্ণ অলঙ্কার পাবে।" সুধা পুরোহিতের কথায় কোন উত্তর করিল না, ব্রজনাথের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল,—"তুমি কিছুতেই আমার মিনতি শুনলে না? এ কাতরধ্বনি ভগবানের নিকট পৌঁছিবে, তিনি শুনবেন। তুমি জান না ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার অসীম দয়া, তিনি তাঁহার দাসীকে দয়া করবেনই। আর কিছু না হোক আমি ত আত্মহত্যা করতে পারবো, তথাপি দস্যুপত্নী হ'ব না।" দস্যু-সর্দ্দার হাসিয়া বলিল,—"সুন্দরি, যতই বল, যতই রাগ কর, আমি তোমাকে ছাড়বো না। এখন আমি তোমার অভিভাবক, তোমার ভালমন্দ এখন আমি ভাল বুঝবো।" তারপর পুরোহিতকে বলিল,—"ঠাকুর, আর বিলম্ব করবেন না।" পুরোহিত অগ্রসর হইলেন, তখনই পুষ্প ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনীত হইল, দস্যু-সর্দ্দার এক আসনে উপবেশন করিল, পুরোহিত বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে উদ্যত হইলেন। সুধা উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"দয়াময়, ভক্তাধীন, বিপদভঞ্জন, এ সময় কোথায় তুমি দাসীকে চরণে স্থান দেও।" তখন এক অপূর্ব্ব আলোক গৃহে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি শুক্লবসনা রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুধাকে কোলে করিয়া বসিলেন,—সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

অমাবস্যার রাত্রি, ভীষণ অন্ধকার। সাতা-রের উত্তর দিকস্থ মঠবাড়ী হইতে বংশাই নদীর ধার দিয়া বরাবর নিবিড় বন। পিঠালী পুকুরের চতুর্দ্দিকে বড় বড় পাদপ মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শাল, সেগুণ, দেবদারু এই সব বৃক্ষই অধিক। কণ্টকযুক্ত বন বাঁশ ও বেতসকুঞ্জ স্থানে স্থানে থাকায় পথিকের পথ চলা কষ্টকর হইয়াছে। এ সব স্থানে লোকের গতিবিধিও কম, কারণ দস্যুভীতি অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ রজনী-যোগে কেহই এ রাস্তায় চলে না। এই অমাবস্যার রাত্রে এক জন পথিক একাকী অতি ধীরে ধীরে পিঠালী পুষ্করিণীর ধারে

উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র অশ্ব, এই বনে রাত্রিকালে চলিতে পারিবে না বলিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া আনা হইয়াছে। পুষ্করিণীর নিকটে প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ, সেই বৃক্ষে অশ্বটিকে বন্ধন করিয়া পথিক ঐ স্থানে বসিলেন। পথিকের যেন ভয় হইতে লাগিল, কারণ এক একবার সঙ্কালিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। পথিকের শুভ্র বসন পরিধান, একটি শুভ্র চাদর গাত্রে আছে ও একটি শুভ্র পাগড়ী মস্তকে বাঁধা। লোকটিকে সহজে চিনিবার উপায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর একটি লোক তথায় উপস্থিত হইল। দুই জনে নিঃশব্দে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটি ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে দুই জনে গিয়া একখণ্ড প্রস্তর সরাইল, এবং বাতি অন্বেষণে নিম্নে অবতরণ করিল। তথায় একটি সুন্দর কুঠারী, সে স্থানে দুজনে বসিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

১ম। আমি যে বিষয় বলেছিলাম, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

২য়। আমার স্মরণ আছে সুবিধা হচ্ছে না।

১ম। তোমার এত লোক আয়ত্তে আছে, তোমার অসাধ্য কি?

২য়। যার কথা বলছ, তিনিও বড় সহজ লোক নন।

১ম। আমি তা জানি, সেইজন্যই উপযুক্ত পাত্রে ভার দত্ত হ'য়েছে।

২য়। আমি চেষ্টা করবো, তবে ফল কি হবে জানি না। সিংহের সঙ্গে লড়াই সহজ ব্যাপার নহে [illegible]

১ম। আমি শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার চাই। এই নেও বায়না। এই বলিয়া পঞ্চাশ টাকা তখনই গণিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"চাই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা, এত অল্প টাকায় কি হবে? অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা অগ্রিম না দিলে আমার লোকেরা এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবে না।"

১ম ব্যক্তি তখন কয়েক খানা মোহর বাহির করিয়া দিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির চক্ষু উজ্জ্বল হইল।

১ম। এখন হবে ত? কবে খবর শুনবো?

২য়। শীঘ্রই আমার লোক যাবে, কোন চিন্তার কারণ নাই। আপনার আর আসা কোন দরকার নাই। চলুন, আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

উভয়ে আবার উপরে উঠিল, অবশেষে পুকুরধারে উপস্থিত হইয়া ১ম ব্যক্তি বলিলেন,—"এখন আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, আমরা চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারি নাই। এবং আরও বিপদে পতিত হ'য়েছিলেম। যা'ক সে কথা, এখন আশা করি, কৃতকার্য্য হ'ব।

২য় ব্যক্তি বলিলেন,—"কোন চিন্তা করবেন না, আমি শীঘ্রই শুভ সংবাদ দিব। কোন একটা বিষয়ে আমার মন খারাপ আছে, কিন্তু উপায় নাই, তাই চুপ করে আছি। আপনি যান।" ১ম ব্যক্তি অশ্ব-বল্গা ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং অশ্বারোহণে রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুষ্করিণী-তীরে।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় পা ছড়াইয়া দিয়া সরস্বতী এক পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া আছে। সরস্বতী সুন্দরী—জ্যোৎস্নার আলোক তাহার গায়ে পতিত হওয়াতে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরস্বতীর লম্বা কেশ মৃত্তিকা চুম্বন করিয়াছে। সরস্বতী দুই পা জলে দিয়া এক একবার জল ছিটাইতেছে, আবার পদযুগল তুলিতেছে। সরস্বতী চাঁদের দিকে তাকাইতেছে, আবার জলের মধ্যে যে চাঁদ তাহাও দেখিতেছে। সরস্বতী গান ধরিল,—

"আমার কে ডাকে!

বাঁশীর গানে পাগলিনী ধ্বনি ফাঁকে ফাঁকে।
'রাধা' 'রাধা' বলে বাঁশী, প্রাণ মন হয় উদাসী
কোথায় পাব কালশশী ভাবি যে তাঁকে।
বনে বনে বেড়াই আমি, দেখা দাও হে জগৎস্বামি
ভক্তিপুষ্প উপহারে পূজি যে তোকে।

এস হে পরাণ-সখা,
দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
শ্যাম মূরতি খানি হৃদয়ে আঁকা।

অকারণে কেন নাথ, ক্লেশ দাও দিবারাত
আর যে সহেনা প্রাণে, ভাজিবে মোকে।"

সঙ্গীত তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। একে মধুর রজনী, তাহাতে মধুর সঙ্গীত, আবার সঙ্গীতকারিণীর মধুর মূরতিখানি মধু ঢালিতেছে, চারিদিকে যেন মধুর ছড়াছড়ি। সরস্বতীর কিন্তু জ্ঞান নাই, সে সঙ্গীতে তন্ময়। এক জন যুবক উপরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ সে দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন, পুনঃপুনঃ সে রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এমন সুন্দরী আর দেখেন নাই ও এমন সুন্দর সঙ্গীত আর শ্রবণ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, সরস্বতী আর উঠিতেছে না, তখন মনে হইল বুঝি বা পাগলিনী। তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাকিলেন,—"সুন্দরি!" সুন্দরি প্রথমবার শুনিল না, দ্বিতীয়বার ডাকাতে পশ্চাতে তাকাইল, এবং অবজ্ঞার ভাবে মুখ ফিরাইয়া আবার জলের দিকে তাকাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে লাগিল। যুবক অবাক হইলেন, একাকিনী রমণীর অন্য লোক দেখিলে ভীত হওয়ার কথা, এ সুন্দরী ভীত নয়। সে অবজ্ঞার ভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিল—মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিল না। নিশ্চয়ই এ রমণী পাগলিনী, কিন্তু পাগলিনী অনুমান করিতে তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি অগ্রসর হইলেন, জলের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"একাকিনী এ রাত্রে এখানে কেন? তোমার কি কিছু ভয় হয় না?" সরস্বতী হাসিয়া উত্তর করিল, "ভয়ের কারণ কি? মানুষ মানুষকে দেখিয়া ভয় করবে কেন? পশুকে ভয়ের কারণ আছে, মানুষকে আবার ভয় কি?" যুবক এ উত্তরে অবাক হইলেন, তবে ত উন্মত্তা নহে। তিনি বলিলেন—"সত্য বটে পশুকে ভয় করতে হয়, কিন্তু মানুষের মধ্যেও অনেক পশু আছে, তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম।" সরস্বতী

হাসিয়া বলিল,—"তুমি ত সেরূপ নও, তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই—এখানে এই নির্জ্জন স্থানে তোমার কি প্রয়োজন?" যুবক অপ্রস্তুত হইলেন, তিনি যে কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সরস্বতীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। সরস্বতী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল,—"আমার দিকে এত দৃষ্টি কেন? আমার মুখখানি কি বড় সুন্দর? আমার সৌন্দর্য্য কি উছ্‌লে উঠ্‌ছে?" যুবকের মুখে আর কথা নাই, তিনি এমন মুখরা স্ত্রীলোক আর দেখেন নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি যথার্থই সুন্দরী। চাঁদের দিকে লোকে তাকায় কেন? উদ্যানে প্রস্ফুটিত ফুল দেখ্‌লে লোকে সে দিকে দৃষ্টি করে কেন? তাই তোমার দিকে সকলেরই দৃষ্টি। তোমার সাহসকে ধন্য, বালিকা স্ত্রীলোক একাকিনী এমন স্থানে থাক্‌তে সাহসী হয় না। কতরূপ বিপদ হ'তে পারে।" সরস্বতী বলিল,—"আমি যে সাধারণ স্ত্রীলোক তাহার প্রমাণ কি? আমি দেবী হতে পারি, দেবী হ'তে পারি, ডাইনী হ'তে পারি, [illegible] হ'তে পারি। তুমি কি ক'রে জান্‌বে আমি কে? আমি একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক, আমি কাকে ভয় কর্‌বো? আমাকে সকলে ভয় করে।" যুবক অবাক হইয়া গেলেন, এমন স্ত্রীলোক কখনও দেখেন নাই। তিনি বলিলেন,—"যুবতী, আমি তোমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি, একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য, তুমি কে? এখানে কেন? বাড়ী কোথায়?" সরস্বতী বলিল—"আমি তোমার এত প্রশ্নের উত্তর দিতে কি বাধ্য? তুমি আমার কে?" যুবক উত্তরোত্তর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"উত্তর দিতে বাধ্য নয়, তবে ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিতে পার।" সরস্বতী হাসিয়া উত্তর করিল,—"এত ভদ্রতার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার কাজে যাও, আমি আমার কাজে যাই, আমাকে কি স্মরণ থাক্‌বে? আমি অনুসন্ধান কর্‌বো তুমি কে।" সরস্বতী বলিল,—"আমার ন্যায় লোকের অনুসন্ধানে কি ফল?" যুবক আর কিছু উত্তর না দিয়া উপরে উঠিলেন,—এবং এক বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনঙ্গানন্দ বসু, বি-এ।

তুমি

তুমি স্বর্ণ স্বপন কোলে তোল জাগাইয়া।
তুমি শৈশব-স্রোতে লও হাত ধরিয়া॥
তুমি ভাসাইয়া দাও দূরে, প্রেম-মলয়-সমীরে।
তুমি বারে রেণু হয়ে ঢাক নৌকা-তরীরে॥
তুমি আঁখির পলকে ডুবাও (সে) বসন্ত-তান।
ঘুমায়ে পড়ে গো যাতে আমার
(তরুণ) জীবন-গান।
আমার মন্দির-অলস-নিবেতোরা জীর্ণ দেহ।
নিভিয়া গিয়াছে যে গো [illegible]তা-স্নেহ॥
আমি ডুবিয়া রহি নিথে তোমার [illegible] আসিয়া।
স্বপ্নে খেলা করি পুনঃ তোমাতে [illegible] মিশিয়া॥

শ্রীনলাইলাল মুন্সী।

রবিবাবুর গোরা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাষা ও ভাব।

দাদা, এ উপন্যাসের ভাষাটা কেমন? রবিবাবুর রচনাপ্রণালীই বা কিরূপ? শব্দবিন্যাসই বল আর পদ-রচনাতেই বল, ওজস্বিতাতেই বল আর প্রসাদ-গুণেই বল রবিবাবুর রচনাপ্রণালী অতি মনোহর। ভাষাটা পরিচ্ছদ বই ত নয়। সে পরিচ্ছদে পারিপাট্য থাকিলে সুন্দরকে অধিকতর সুন্দর দেখায়। ভাষার গুণে ভাবের কান্তি ফোটে ও গৌরব ছোটে। রবিবাবু এক জন উচ্চদরের শিল্পী। গোরা উপন্যাসে তিনি বিলক্ষণ রচনানৈপুণ্য ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে এ জগতে নিখুঁৎ কোন জিনিষত নাই;—চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কুসুমে কীট আছে, রবিবাবুর লেখাতেও দোষ আছে।

দাদা, রবিবাবুর [illegible] দোষ আছে বলচ; আচ্ছা দুচারিটা দোষ দেখিয়ে দাও দেখি।

উদাহরণ চাও, এই নেও—"জনতার চলাচল জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল [illegible] গোরা সকলকে খাপছাড়া [illegible] দাঁড়াইয়া উঠেছে; রূপের শুভ্র অনাবশ্যক [illegible] অতিরিক্ত রূপের [illegible] অগ্রলোকদের মত মত [illegible] গোরা উঁকি দিয়েছিল; এমন [illegible] না পেয়ে বন্ধু বিনয় কথা-[illegible] ভাঙা ঘোড়ার মত; মনুর কথা শুনে আমার [illegible] ভিতর কি রকম একটা নাড়া চাড়া হল; [illegible] চিক্কণতা [illegible] যাইতেছে; [illegible] মিষ্টতার সঙ্গে যেন [illegible] বেদনা বহন করিয়া আনিল; আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানিবেন; সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল; তার মুখ ও কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল; শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিতেছিল; নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল; [illegible] এসে [illegible] ভাবে কহিল; অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত বলিল; তার শক্তির পাড়টুকু [illegible] ও অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল; প্রচুরভাবে হেসে উঠিল, কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততা; সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শুনিলেন; নির্দয় উৎসাহ; আপনার সহিত আলাপ করে আমার সন্ধ্যা খুব সুখে কাটিয়াছে।"

সাহেবরা বহুদিন বাঙ্গালাদেশে থেকে, বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশে, বাঙ্গালা ভাষা শিখে, বাঙ্গালীর সঙ্গে যে ছাঁদে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, এ সেই ছাঁদ সেই বুলি, সেই ভাষা। সহজেই মনে হয় এ বাঙ্গালা English Idiom এর অবিকল অনুবাদ।

রবিবাবুর লেখাতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা [illegible] কথা; তা [illegible] ইংরেজ বা; ভাষার সমাবেশ কেন হইল?

এ প্রশ্নের উত্তর—রবিবাবু কবি। [illegible] কবি তাঁরা দেখেন [illegible] শোনেন [illegible], বোঝেন [illegible], বলেন অন্য রকমে, লেখেন অন্য র[illegible] সাধারণ লোকে

ক'রে দেখে না বা দেখ্‌তে জানে না, তেমন ক'রে শোনে না বা শুন্‌তে শেখে নি, তেমন ক'রে বোঝে না বা বুঝ্‌তে পারে না, তেমন ক'রে বলে না, বল্‌তে শেখে না বা বল্‌তে পারে না, তেমন ক'রে লেখে না বা লিখ্‌তে অভ্যাস করে না। সেইজন্য রবিবাবুর শব্দ-বিন্যাস ও পদরচনা স্বতন্ত্র রকমের। এ উপ-ন্যাসে চলিত ভাষার প্রয়োগ আছে—যে ভাষায় আমরা ঘরে ঘরে বাপ-মা ছেলে-মেয়ে ও ভাই-ভগ্নীর সহিত কথা কই। কেতাবি ভাষায় কথা কওয়াটা স্বাভাবিক নয়; সাধু ভাষায় কেহই ত আমরা কথা কই না। এটা নিতান্তই বিড়ম্বনা। এ বুলি বল্‌তে গেলে গলায় বাধে, কাণে কর্কশ লাগে; এতে সরলতাকে সময়ে সময়ে গোপন কর্‌তে হয়। রবিবাবুর styleটী colloquial style, বড় মনোরম ও মর্ম্মস্পর্শী।

দাদা, রবিবাবুর ভাষার কথা বল্লে, রচনা প্রণালীর কথাও বল্লে, কিন্তু তাঁর ভাবের কথা কিছু বল্লে না তো?

তাঁর ভাবের কথা বলি শোন। রবিবাবুর লেখায় ভাষার ঔজ্জ্বল্য আছে, ভাবের গভীরতা আছে। তাঁর লেখায় যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস তেমনি ভাষার ছটা। মধুর ভাষায় মধুর ভাব প্রকাশ করা যার-তার কর্ম্ম নয়। গোরা উপন্যাস পড়্‌তে পড়্‌তে কতই কেঁদেছি, কতই হেসেছি। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, রাগ, দ্বেষ, বিস্ময় সময়ে সময়ে মনে উদয় হইয়াছে, আবার একে একে সেগুলি জলবুদ্‌বুদের মত মনেতেই মিলাইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত ভাব পাঠকের মনে উদ্দীপিত করিবার শক্তি রবিবাবুর বিলক্ষণ আছে। এই অপূর্ব্ব উপন্যাস হইতে দুচারিটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব। ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিতে চান নিম্ন-লিখিত কয়েকটী স্থান পড়িয়া দেখুন——

১। "পূর্ব্বদিকের উষার আভাস তার কাছে যেন একটা বাক্যের মত প্রকাশ পাইল; যেন প্রাচীন তপোবনে একটা বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া উঠিল, তার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণকালের জন্য তার মনে হইল তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটী জ্যোতিঃ-রেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় শতদল সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল। তার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।"

২। "অন্ত না থাকিলে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেন, নচেৎ তার প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নাই তার সম্পূর্ণতা নাই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।"

৩। "মনুষ্য ভুল করিবে, ব্যর্থও হইবে, দুঃখও পাইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিবে না; যাহা উচিত বলিয়া জানিবে তাহার জন্য আত্ম-সমর্পণ করিবে। এমনি করিয়াই পবিত্রসলিলা সংসার-নদীর স্রোত চিরদিন [illegible] হইয়া বিশুদ্ধ থাকিবে।"

৪। "ঈশ্বর কোন এক অবস্থার মধ্যে

তাঁর শরীরে শৃঙ্খল দিয়া আবদ্ধ রাখেন না। তাঁহাকে নব নব পরিণতির মধ্যে চির-নবীন করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন।"

৫। "ধর্ম্মের দুটো দিক আছে, একটা নিত্য দিক আর একটা লৌকিক দিক। ধর্ম্ম যেখানে সমাজের নিয়মে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেখানেও তাঁকে অবহেলা করতে পারা যায় না; তা করলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।"

৬। "প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটী বিশেষ অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় যে সকলের কাছে সুস্পষ্ট তাও নয়। কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করা ত মানুষের কাজ, গাছপালার মত অচেতন ভাবে নিয়ম মেনে যাওয়া তার সার্থকতা নয়।"

৭। "জীবনের একি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! বিনয় যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থটীকে হৃদয়ে পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে একি সকলে পায়? ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? এমন যদি সচরাচর ঘটিতে পারিত তবে বসন্তের একটী মলয় হিল্লোলে যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত, তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত শক্তি আছে, স্বভাবতঃই নানা বর্ণে, নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম। এই প্রেমই বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের দিনে গোরার হৃদয়ের মধ্যে একটী অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু সে সঙ্গীত কোন মতেই থামিতে চাহিল না। সমুদ্রগামিনী দুই নদী এক সঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল।"

৮। "গোরার কথাগুলি শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং। সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে, তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশ-প্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা যে মত নয়—তাহা সম্পূর্ণ মানুষ এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে।"

রবিবাবুর ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি অসামান্য। শেষ দুটী অংশে ভাব ও ভাষার কেমন সুন্দর সমাবেশ দেখেছ?

হাঃ, দাদা। বিশেষত শেষ কয়েক পংক্তি পড়িলে মনে হয় রবিবাবুর ভাষাতে অনবরত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে।

আমি বলি—নবীন নীরদ কোলে ক্ষণপ্রভা খেলে।

দাদা, রবিবাবুর humour সম্বন্ধে ত কিছুই বল্লেনা। তিনি কোন্ দরের humourist?

এইবার তাঁর রসালাপের কথার অবতারণা করিতেছি।

রবিবাবুর humour উচ্চ অঙ্গের; তিনি বড়দরের humourist বা সুরসিক। তাঁর humourএ গাম্ভীর্য্য আছে, চপলতা নাই। যাঁরা কেবল অসার আমোদপ্রিয় তাঁরা রবিবাবুর humour পড়ে রস আস্বাদন করিতে পারিবেন না। যাঁরা সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন,

চিন্তাশীল ভাবগ্রাহী, স্থিরমতি ও গম্ভীর-প্রকৃতির তাহারাই এ রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ। সমাজ-সংস্করণের অনেক উপায় আছে, তার মধ্যে satire একটী। যিনি satirist তিনি satire লিখে চোখে আঙ্গুল দিয়ে, প্রাণে খোঁচা মেরে লোকের দোষ দেখিয়ে দিয়ে সে দোষ সংশোধন করে দেন। সুতরাং ব্যক্তিগত দোষ, সমাজগত দোষ, রাজনীতিগত দোষ বা ধর্ম্মনীতিগত দোষ, সর্ব্বপ্রকার দোষ সংশোধন করা সংস্কারকদের কর্ত্তব্যের ভিতর। শ্লেষ বা ব্যঙ্গোক্তি satireএর আত্মা। মিষ্টি মিষ্টি করে দু'কথা শুনান অথবা চিপ্‌টেন করে দু'কথা বলা এ satiristএর স্বধর্ম্ম। Reformer বা সংস্কারকের হস্তে শ্লেষাত্মক বাক্য বা satire অমোঘ অস্ত্র। ইন্দ্রের বজ্র এ অস্ত্রের নিকট হারি মানে। এই satireএর মধ্যে irony আছে, sarcasm আছে, humour আছে, শ্লেষ আছে, চিপ্‌টেন আছে, ব্যঙ্গোক্তি আছে, রঙ্গরস আছে। গোরা উপন্যাসে satireএর বিকাশ মাঝে মাঝে দেখা যায়। রবিবাবুর শ্লেষপূর্ণ বাক্য কুসুমের ন্যায় কোমল নহে, বজ্রের ন্যায় কঠিনও নহে। যখন সেই বাক্যগুলি ও পড়ি তখন মর্ম্মস্থলে ব্যথা পাই, কথাগুলি তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় প্রাণকে বিঁধিতে থাকে; পরক্ষণেই সে ব্যথা জুড়াইয়া যায়, আমরাও সে বেদনা ভুলিয়া যাই। ইংরাজী সাহিত্যে Addison যে দরের satirist ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে রবিবাবু সেই দরের satirist; তাঁর লেখায় গাম্ভীর্য্যও আছে আবার রসাভাসও আছে। এই দুই গুণের সমাবেশ আছে বলিয়াই তাঁর লেখা একঘেয়ে নয়, একঘেয়ে হ'লে বিষম বিরক্তিকর হ'ত। তাঁর সুমিষ্ট রসালাপ আমাদের বড় ভাল লাগে। সকলেই জানেন তীব্র ঝালে মুখ জ্বালা করে কিন্তু একটু মৃদু ঝাল না দিলেও ব্যঞ্জনের আস্বাদ বৃদ্ধি হয় না। দু'চারিটা উদাহরণ দিলে কথাটা বেশ বোঝা যাবে।

১। "আমাদের হিন্দুর ভাঙ্গা চূড়ি পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য নয়। পুরুষ সাধকের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড চলে। সেই পবিত্র করপল্লবের উল্লেখটী পর্য্যন্ত যখন তোমার সহ্য হচ্ছে না "তদানাশংসে মরণায় সঞ্জয়।"

২। "শ্রীহস্তে যদি পরিবেশন করে, তবে ম্লেচ্ছর অন্নই দেবতার ভোগ।"

৩। "কুরুপক্ষে নারায়ণী সেনাতে আমার কাজ নেই আর পাণ্ডবপক্ষে নারায়ণেও আমার দরকার দেখি না।"

৪। "হিন্দুদের প্রাণ নিতান্ত সৌখীন প্রাণ। অল্প একটু ছোঁয়া ছুঁয়িতেই শুকিয়ে যায়, ঠেকাঠেকিতে মারা পড়ে।"

৫। "এ দেশে সাম্য থাকিলেও নীচ জাতিকে দেবালয়ে পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রে সেই সাম্য না থাকে, শাস্ত্র মধ্যে সে সাম্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি?"

৬। বরদা—গৌরমোহন বাবু? আপনি এ সমস্ত খাবেন না বুঝি?

গোরা—না।

বরদা—কেন? জাত যাবে?

গোরা—হাঁ।

বরদা—আপনি জাত মানেন?

গোরা—সেকি! জাত কি আমার তৈরি যে মানব না? সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি।"

৭। "ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে? তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না? কম্পাসভাঙ্গা কাণ্ডারীর মত তোমার পূর্ব্ব পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে?"

৮। "আপনার ফুল দুটী যতই সুন্দর হউক তবু তাতে ক্রোধের রংটুকু আছে। আমার এ ফুল সৌন্দর্য্যে তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু শান্তির শুভ্র রঙে নম্রতা স্বীকার করে হাজির হয়েছি।"

৯। "রাগ করোনা দাদা? তোমাকে যমের কিঙ্কর বল্লে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে দোষটা নয়, সেত জানা কথা। কি কোরবে তাকে খেতে হবে ত।"

১০। "খুব সভায় নিষ্কৃতি পাবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আসন, কীর্ত্তি ও যশ।

দাদা সাহিত্যিকদিগের ভিতরে রবিবাবুর আসন কোথায় দেওয়া উচিত? সাহিত্য-সেবিদের মধ্যে তাঁহাকে কোথায় বসাবে? বাঙ্গালা সাহিত্যের গুরু বলিয়া রবিবাবুকে তাঁর দেশের লোকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন হইয়াছে ও হইতেছে একথা অবাধে বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালী-প্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বারিকা নাথ বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, সারদাচরণ মিত্র, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার এরা বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। এ নক্ষত্রগুলি এখন অস্তমিত। বর্ত্তমানে যাঁরা উদিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামদয়াল মজুমদার, শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজলধর সেন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি।

উপরে লিখিত দুটী নক্ষত্রপুঞ্জের একটী পুঞ্জেও রবিবাবুকে পাওয়া গেল না। তাঁর নাম ও প্রতিষ্ঠা কবিকুঞ্জে। যে সময়ে বঙ্গ-দর্শনের, আর্য্য-দর্শনের, বান্ধবের খুব পসার ও প্রতিপত্তি, সে সময়ে কোন খ্যাতনামা সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে "বঙ্গের উদীয়মান কবি" আখ্যা দিয়া অভিহিত করেন। তিনি গীতি-কাব্যেই সিদ্ধহস্ত, নাটক বা মহাকাব্যে তাঁর হাত খোলে নাই। এখন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কবিকঙ্কন, কাশীদাস, কীর্ত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত ইহ জগতে নাই। এখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাই, নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র বা গিরিশচন্দ্র ঘোষও নাই এখন কাব্য-জগতে কবিকুঞ্জমাঝে দেখি এই সকল নাম—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন,

কুমার বড়াল, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী দাসী প্রভৃতি। কাহার উপরে ও কাহার নিয়ে রবিবাবুর নাম করা যায় এ বিষম সমস্যা; তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া, তাঁর কলকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সমগ্র য়ুরোপ খণ্ড তাঁকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। "বঙ্গের উদীয়মান কবি" আজ ভারতের কবিদিগের রাজা।

দাদা, রবিবাবুর কীর্ত্তি ও যশ সম্বন্ধে কিছু বল্লে না?

হাঃ, ঐ দুটী কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করিব।

গোরা উপন্যাস হইতে যে যে স্থান বা অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই সেই স্থান পাঠ করিলে এই কথা প্রতিপন্ন হইবে যে, রবিবাবু সংস্কারকের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কি রাজনৈতিক দোষ, কি সমাজনৈতিক দোষ, কি ধর্ম্মনৈতিক দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে রবিবাবু সেইখানে সেই দোষের উল্লেখ করিয়া যে উপায়ে তাহার নিরাকরণ হইতে পারে সে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে কার্য্যভার লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে কর্ত্তব্য পালনে তিনি কখন ক্রটী করেন নাই; এবং তাহার যে অংশ এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহা সম্পাদন না করিয়া তিনি নিত্যধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তাঁর জীবনের mission যে দিন শেষ হইবে, সেই দিন তাঁর অজপা-জপ ফুরাইবে। তিনি সেই এক আরার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার পথে চলিয়াছেন। এতাবৎ তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই; আশা করি কখনও হইবেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। যেখানে কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ সেখানে অন্তর্দৃষ্টিরও স্ফুরণ দেখা যায়। যিনি bard তিনি seer। কবি রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি এমন অনেক কথা বলে গিয়েছেন, যে গুলিকে আমরা দূরদর্শী ভবিষ্যৎ বক্তার ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তাঁহাকে Sir Oracle বলিয়া পূজা করি। রবিবাবু একজন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত; গোরা উপন্যাসে তিনি স্বাভাবিক মধুর ভাষায় গভীর দার্শনিকতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকল স্থান পড়িতে পড়িতে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই, বুঝিতে পারি না আমরা দর্শন পড়িতেছি, কি উপন্যাস পড়িতেছি, কি কাব্য পড়িতেছি। এ শক্তি বড় সামান্য শক্তি নহে। এই অসাধারণ শক্তি বলেই না রবিবাবু য়ুরোপকে অথবা সমগ্র জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারিয়াছেন। নোবেল প্রাইজ কি যে-সে লোকে পায়; কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র এই প্রাইজ পাইয়া থাকেন। রবিবাবু সেই নোবেল প্রাইজ লইয়া গৌরব ও যশোলাভ করিয়াছেন। ইহাতে যে তাহারই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে এমন নহে, তাঁর কুলের গৌরব, তাঁর জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে কবি ধন্য, আমরা ধন্য আর আমাদের দুঃখিনী ভারত-মাতাও ধন্য হইয়াছেন। তিনি ভারতমাতার কৃতী সুসন্তান, বাঙ্গালা ভাষার

ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক। কবি অমর হউন, তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত হউক।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ।

সীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজমহিষী সুমিত্রা-জননী প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রণত পুত্রদ্বয়ের মুখচুম্বন ও তাঁহাদিগকে সস্নেহ মধুর সম্ভাষণ পূর্ব্বক গদ গদ বচনে বলিলেন,—বৎস রাম, অদ্য সত্যবদ্ধ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; আহা! আজ অযোধ্যার কি আনন্দের দিন! এক্ষণে রঘুকুল দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি নিষ্কণ্টকে আজীবন বধূমাতা সীতার সহিত এ বিরাট অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করত পরম সুখে রাজরাজেশ্বররূপে অযোধ্যার রত্ন সিংহাসনে অবস্থান করিতে থাক। প্রার্থনা অচিরে এ বিশাল বিশ্বে তোমার অনন্ত কীর্ত্তি-কথা বিঘোষিত হউক।

রাম কহিলেন,—"জননী এদিকে কি হইয়াছে, তাহা কি এখনও আপনি জানিতে পারেন নাই? মহারাজ ইতিপূর্ব্বে বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট দুইটি বর দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এখন তিনি পিতার নিকট এক বরে আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ও অপর বরে বৎস ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাকে পিতৃসত্য পালনার্থ অদ্যই জটাবল্কল ধারণ করিয়া সীতা সহ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইবে।

এই শোকাবহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্নেহশীলা সুমিত্রা-জননী অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, এবং শোকাকুলচিত্তে রামকে বলিলেন,—"বৎস রাম! আমি তোমাকে ভালরূপই জানি, তুমি যে মহারাজের সত্যধর্ম্ম-রক্ষার্থ অপরের শত অনুরোধেও গৃহে থাকিতে সম্মত হইবে না,—তাহাও বুঝি; তাই তোমাকে বনগমনসঙ্কল্প হইতে বিরত থাকিবার জন্য বৃথা অনুরোধ করিব না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে, তোমার নিত্য সহচর লক্ষ্মণকে তোমাদের বনসঙ্গী করিতে হইবে। লক্ষ্মণ যে তোমার চিরদাস; তুমি কিছুতেই আমার এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

অতঃপর তিনি লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বৎস লক্ষ্মণ! যদিও সকলের প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, তথাপি আমি তোমাকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনগমনে আদেশ দিতেছি। বৎস! রামচন্দ্র যখন যেরূপভাবেই থাকুন,—সুখে-দুঃখে তিনিই তোমার একমাত্র গতি। জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়া অনুজের পরম ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তুমি এখন হইতে রামকে তোমার পিতা দশরথের এবং সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিয়া বনবাস কালে তাঁহাদের সেবা-পরিচর্য্যা করিবে। আমি অনুমতি ক

আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে স্বচ্ছন্দ বনে রামের অনুগমন কর।

সুমিত্রা-জননী জানিলেন না যে, ভ্রাতৃ-ভক্ত লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই রামসহ বনগামী হইবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।" একণে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—"জননি! ভ্রাতা লক্ষ্মণ ইতিপূর্ব্বেই আমার বনসহচর হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। রামের বাক্য সমাপ্ত হইলে সুমিত্রা দেবী বলিলেন,—"বৎস! আমি তোমার মুখে লক্ষ্মণের শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা নিরাপদে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অরণ্যবাস করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ চিরযশস্বী চিরপ্রসিদ্ধ রঘুবংশের মুখোজ্জ্বল কর। এই বলিয়া জননী বিদায়প্রার্থী প্রণত পুত্রদ্বয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহ পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। অপত্যবৎসল দশরথ পুত্র-পুত্রবধূ প্রভৃতির দর্শনে, অশ্রুপাত করিতে করিতে যেমন গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিতে যত্ন করিলেন, অমনি তিনি হা রাম! বলিয়াই সংজ্ঞাশূন্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পিতৃ-ভক্ত রাম ও লক্ষ্মণ দ্রুত গমনে পিতার সন্নিহিত হইয়া শোক-দুঃখ-কাতর মূর্চ্ছিত পিতাকে সসব্যস্তে ধরিয়া তুলিলেন। স্নেহাস্পদ পুত্র-দ্বয়ের শীতল হস্ত স্পর্শে রাজার মোহ অপনীত হইল। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজমহিষীরা সকলে নৃপতি সমীপে উপনীত হইয়া হা রাম! হা রাম! বলিয়া রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিষম আর্ত্তনাদে সে গৃহ পূর্ণ হইল। চির আনন্দ পূর্ণ রাজভবন মহাশোকের আধার হইয়া উঠিল।

উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ—রমণীগণের ক্রন্দন ধ্বনি, কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রথমতঃ শোকবিহ্বল রাজা দশরথের পাদবন্দনা করিয়া অনন্তর সমাগত রাজমহিষীগণের চরণে অভিবাদন করতঃ তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পুরদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহসা অযোধ্যায় দারুণ শোকের বিষম ঝড় বহিল। বিরাট রাজভবন এক মহা রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধা কৈকেয়ী ও কুজা মন্থরা ভিন্ন রাজপুরীর সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! অযোধ্যার রাজভবনের শোচনীয় দৃশ্য শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ কঠোর প্রাণ বজ্রসম পুরুষেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শোক-দুঃখে প্রাণে অনন্ত বিষাদের ঘোর কালিমা ঢালিয়া দেয়।

হায়! যিনি স্বল্পকাল মধ্যে অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য ও অতুল রাজ সম্পদের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন, তিনিই এক্ষণে নিতান্ত অনাথের ন্যায় তপস্বীর দীন বেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতাসহ বনগমন করিতেছেন। অহো! কি বিষম করুণ দৃশ্য! যিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের

অধীশ্বর রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক দুহিতা, রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং মহাবীর মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী; যিনি সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী সম্রাজ্ঞী হইতে যাইতেছিলেন, সেই অলোকসামান্যা অনন্যসাধারণ অসূর্য্যম্পশ্যা রূপিনী মহিয়সী মহিলা জানকী কি না আজ মহা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে রাজসম্পদ ও রাজভোগ-সম্ভার অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া তীর্থযাত্রা অভি-লাষিনী তাপসীর ন্যায় দীনবেশে বনগমন করিতেছেন! এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে কার হৃদয় না শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়? কোন্ পাষাণ-হৃদয় নরনারী অশ্রুমোচন না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন?

অনন্তর সুমন্ত্র সারথি তথায় উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে রথারোহণে বনগমন করিবার জন্য মহারাজের আদেশ ও স্বীয় অনুরোধ জানাইলেন। রাম অগত্যা ভাগীরথী-তীর পর্য্যন্ত রথারোহণে যাইতে সম্মত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ রথা-রোহণ করিলেন। রাম বনবাস-বার্ত্তা শ্রবণে নগরবাসিগণ যারপরনাই শোকাভিভূত হইয়া অশ্রুমোচন ও হাহাকারধ্বনি করিতে করিতে দ্রুত গতিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাজভক্ত প্রজাগণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়া তাঁহাদের রাজাকে বনে যাইতে না দিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল।

রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের ক্রন্দন শ্রবণ ও কাত-রতা দর্শন করিয়া করুণ-হৃদয় রাম রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দলে দলে মর্ম্মাহত প্রজাগণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অনবরত রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিল। অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ সকলে কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। অবিরত রোদন ও হাহাকার-ধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল। সকলেই শোকাভিভূত, সকলেই অশ্রুপ্লুত, কেহ কাহা-কেও সান্ত্বনা করিবার লোক নাই। সুখ-শান্তিপূর্ণ অযোধ্যানগরী ঘোর বিষাদ-মণ্ডিত ও গভীর শোক-দুঃখের আবাসভূমি হইয়া উঠিল।

এই শোচনীয় করুণ দৃশ্য—প্রজাগণের এই অতি কাতরতা ও আন্তরিক রাজভক্তি দর্শনে প্রজাবৎসল রাম যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি অশ্রুমোচন করিতে করিতে সস্নেহে ও মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—তোমরা ভর-তের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ প্রদর্শন করিবে; ভরত আমার প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ এবং অতি ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতি-কুশল। ভরত রাজা হইলে তোমাদের কিছু-মাত্র অশুভ বা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাদিগকে সসম্ভ্রমে ও সস্নেহে অনু-রোধ করিতেছি যে, তোমরা আর আমার সহিত অগ্রসর না হইয়া সত্বর স্ব স্ব গৃহে প্রতি-গমন কর। আমার প্রতি তোমাদের এরূপ প্রাণের টান ও আন্তরিক কাতরতা দর্শনে আমার প্রাণ বড় আকুল হইতেছে। অতএব তোমরা আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমার প্রাণে আর ক্লেশ দিও না। তোমরা এরূপ করিলে আমি তোমাদের বিরহ-ব্যথায়

বড় কাতর হইব ; সুতরাং তোমরা আমার হৃদয়ের বেদনা আর বৃদ্ধি না করিয়া—আমার কল্যাণ কামনায় এক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন কর।

রাজভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ শ্রীরামচন্দ্রের সে সনির্ব্বন্ধ করুণ আদেশ ও ঐকান্তিক অনুরোধ-বাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অগত্যা অজস্র রোদন, পরিতাপ ও হাহাকার ধ্বনি করিতে করিতে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে করুণ-প্রাণ রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে দ্রুত-বেগে রথ চালাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে অযোধ্যানগরী তাঁহাদের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইতে লাগিল। রথ বহুদূরে চলিয়া গেল। বিষাদ-মণ্ডিত অযোধ্যাপুরী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। যখন রামের রথ আর কাহারও দৃষ্টি পথের পথিক হইল না, তখন উপস্থিত জনসঙ্ঘ রোদন করিতে করিতে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেদিন চির-সুখ-শান্তিপূর্ণ, চির হাস্যময় অযোধ্যায় এক মহাশোকের বিষম ঝড়—এক প্রবল অশ্রু-প্রবাহের মহা বন্যা প্রবাহিত হইয়া গেল। অকস্মাৎ শোক-দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া বর্গসম পরম শান্তিধাম অযোধ্যাভবন যেন শোক-দুঃখক্লিষ্ট মানব-মানবীর ন্যায়ই নিরন্তর হা রাম! হা সীতা! ধ্বনি পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। রাম-সীতার শোকে যেন পাষাণ গলিল, বনের পশু-পাখী কাঁদিল এবং প্রকৃতির স্নেহ চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা বহিল; সোণার অযোধ্যা মুহূর্ত্তে মহা শ্মশানে পরিণত হইল। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

ভাগীরথী।

পুণ্য ভাগীরথী প্রবাহিতা তুমি
পুণ্য করি কত দেশ,
স্রোতে তব বক্ষে বিবিধ তরণী
লইয়া দ্রব্য অশেষ।
পুণ্য-কথা তব বহুকাল ধরি
আছে প্রচলিত ভবে,
করিতে প্রচার মহিমা তোমার
সাধুজন গায় সবে।
পূতনীরে তব পবিত্র হইয়া
সঞ্চিয়া অশেষ পুণ্য,
মহাজ্ঞানী কত গিয়াছেন চলি
ভারত করিয়া শূন্য।
পাপীতাপী জন প্রসাদে তোমার
তরিয়া গিয়াছে কত,
ধার্ম্মিক ঈপ্সিত মহনীয় পদ
লভেছে কতেক শত।
স্থান দিও পদে এই মা মিনতি
কি জানি কি আছে ভালে,
চলি যাব কোথা কিছুই না জানি
সে দিন অন্তিম কালে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

দাঁড়াও।

তোমার বাঁশরী জীবন-কুঞ্জে
বাজেগো শুধু বাজেগো।
মুরতি সেথায় পূত কিরণে
রাজেগো শুধু রাজেগো।
অন্ধ আমি গো কেবলি অন্ধ,
রেখেছি আমার দুয়ার বন্ধ।—

গানটী তোমার শুনিলে শ্রবণে,
থাকি গো আন্ কাজে গো!
তোমারি গানের মাঝারে স্বামী,
(যেন) কোথায় হারায়ে গিয়েছি আমি,—
আপনার মন দিয়েছি তোমারে,
একি দায় মরি লাজে গো!
বল প্রিয়তম এ কেমন ধারা,
(কেন) বাঁশী গানে প্রাণ হয় মাতোয়ারা;—
ব্রজাঙ্গনা-ধন,—বাঁশীটী তোমার
কেন গো এমন বাজে গো!
তবু, বাজুক বাঁশরী;—বাজাও তেমনি,
যমুনা উজান করাতে যেমনি,—
(মম) হৃদয়-যমুনাকি-তীরে গোপাল,
দাঁড়াও তেমনি সাজে গো!
যেন, নন্দ-দুলাল শিখি-পুচ্ছ-শিরে,
হাতেতে বাঁশীটী রাজে গো!
শ্রীঅতুলাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

[গত ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে লেখকের কোনও এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার স্মরণার্থ শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে লিখিত।]

(১)
একি রে নিদয় বাণী! তুই নাকি ফুল-রাণী!
তেয়াগিয়া যাবি আজ মোদের এ কাননে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(২)
সত্য কিগো এই কথা? শেলসম বাজে ব্যথা—
মা—মা—মা, চলনা, বুঝি, করিস্ কি কারণে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৩)
বহুদিন দেখি নাই, দেখিবারে সাধ তাই,
তোর সেই ফুল-খেলা আবার এ নয়নে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৪)
সংসারের উপবনে, নবীন উষার সনে,
সাজা, মা! আবার অঙ্গ সেই ফুলাভরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৫)
মধুর-অধর-হাসি, প্রীতি-ফুল রাশি রাশি
ছড়া, মা, সে বন-পথে সেইরূপে যতনে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৬)
স্বরগ-অমিয়ধারা তরল-রূপের ধারা
ঢালি' ভরা সেই বন, অয়ি চাঁদ বরণে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৭)
আনন্দে বিভোর হ'য়ে নাচি' করতালি দিয়ে
মাতা গো সে বনভূমি পুনঃ ধীর-কম্পনে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৮)
মধু-ভরা আধ-স্বরে, আবার আবেগ-ভরে,
গাও মা সে বন-গীতি—জুড়াই এ শ্রবণে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(৯)
(কে,রে,কে! সাধিলি বাদ!) না মিটিতে এই সাধ
যায় সত্য কোথা, বালা! বুঝি গো তা কেমনে!
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১০)
আসেনি সাঁঝের বেলা, সাঙ্গ করি' এই খেলা
তবে কেন যাস্, মাগো! তরুণ ও জীবনে।
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১১)
যাবি যদি দেখ্ চেয়ে, ওই—ওই—আসে ধেয়ে!
বিষাদিনী কে রমণী! জ্যোতি-হারা নয়নে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১২)
ছিল সে গো রাজ-রাণী, এবে হায়! কাঙালিনী
দুঃখিনী জননী তোর পড়ে নাকি স্মরণে?
কোথায় চলিলি, মাগো! কোন দূর-ভবনে॥

(১৩)
সে যে ভুলি' নিজ-সুখ নিজ-ব্যথা, নিজ-দুঃখ,

স্নেহের কোলেতে তোরে পেলেছিল যতনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৪)

তুই তার হৃদি-নিধি, তারে ছেড়ে যাস্ যদি
পাগলিনী হ'য়ে যে গো খুঁজিবে সে গহনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৫)

জানিনা কেমন প্রাণ ! কেমন সে শক্তিমান্ !
ছিঁড়ে যেতে চায় ওই মমতার বাঁধনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে !

(১৬)

একি ! একি! একি হ'ল !— নিমেষে কোথায় গেল
না শুনি', না শুনি', বালা ! এত যে আকিঞ্চনে ॥
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৭)

সাধের কানন হায় ! দেখ্ গো শুকায়ে যায় !
বন-দেবী ! বন-দেবী ! ওগো ! তোর বিহনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৮)

না গো না করিব মানা, মিছে মোর এ শোচনা,
দেবেন্দ্র-নন্দিনী সে যে ! গেছে দেবাবাহনে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(১৯)

কত তাপ, কত জ্বালা, হয় ত গো দেব-বালা,
পেতেছিল—কে জানে তা ? এই মায়া-কেতনে
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২০)

কাঁদিল দেবেন্দ্র-হিয়া, তাই বুঝি আহ্বানিয়া
ল'য়ে গেল তনয়ারে স্বরগের কাননে ?
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২১)

নাহি সেথা ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি !
নাহি শীত, নাহি গ্রীষ্ম, নাহি তাপ তপনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২২)

মিশে সেথা জল, স্থল, বায়ু, ব্যোম, কি অনল,
ধরণের যত ভেদ, এক মহা-মিলনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৩)

নাহি স্বার্থ-মলিনতা, এ কঠিন কুটিলতা,
ভাসে সেথা সরলতা প্রেম-ভরা কিরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৪)

সংসারের কোলাহল ছোঁয় না সে স্বর্গ-তল
সকলি ঘুমায় যেন নীরবতা-শয়নে।
কোথায় চলিলি মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৫)

নাহি মৃত্যু-জরা-ক্লেশ, সীমাহীন সেই দেশ,
রচিত যেন বা সত্য ভাবময় স্বপনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৬)

নাহি মায়া সুখ-খেলা, আছে নিত্যানন্দ-মেলা,
শান্তির হিল্লোল উঠে সুরভিত পবনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৭)

ত্রিদিব-সুষমা মাখি', পঞ্চমেতে গায় পাখী
চির-বসন্তের প্রান্তে মাতায়ে সে নন্দনে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৮)

নিতি ফুটে কত ফুল, মিলি' দেবাঙ্গনাকুল
কুঞ্জে কুঞ্জে নাচি' যায় পারিজাত-চয়নে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(২৯)

তুই (ও) মা তাদের সাথে তুলি' ফুল সাজি হাতে
রচি' ভক্তি-মালা দিবি দেব-দেব-চরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর-ভবনে ॥

(৩০)

থাক্ মা, থাক্ গো সেথা, আর না আসিস্ হেথা
কি ছার ! এ দেশ ওগো ! সে দেশের তুলনে
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর ভবনে ॥

(৩১)

কোন্ দিন ? বল্ মোরে, তোমাও এমনি ক'রে
জীবনের সফলতা লভিব গো মরণে।
কোথায় চলিলি, মাগো ! কোন দূর ভবনে ॥

শ্রীগদাধর সিংহ রায়।

পুরোহিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ অক্ষয়-তৃতীয়া, কই জমীদার-বাটীতে ত কেহ ডাকিল না? এবার শিরোমণি মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল। শিরোমণি মহাশয় সাত আট ঘর যজমান যাজন করিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করেন। এই মুষ্টিমেয় যজমান ঘরের মধ্যে প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ; কেবল একমাত্র জমীদার বাটীতেই ব্রত পার্ব্বণাদি বিশেষ রকমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই কোনরূপে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আজ যদি জমীদার বাটীর পৌরহিত্য যায়, তাহা হইলে তাঁহার মনের ক্ষীণ আশা-দীপটীও এইখানে নিভিয়া যায়। শিরোমণি মহাশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন। একবার মনে করিলেন, হয় ত তাঁহার অনুপস্থিতিতে কেহ বাটীতে বলিয়া গিয়া থাকিবে। হায় আশা! বার বার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, তবু আশা ছাড়ে না। ভাবিলেন জমীদার বাটীতে যাইবেন; কিন্তু বিনা আহ্বানে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? আশা কাণে কাণে বলিল দোষ কি? বিশেষ তিনি যখন তাহাদের কুল-পুরোহিত। যাহার গৃহে অন্ন নাই, তাহার আবার মান-সম্ভ্রমই বা কি আর লোক-লজ্জাই বা কোথায়?

আজ জমীদার বাটীতে নূতন পুরোহিত আসন গ্রহণ করিয়া নব যুগের সূচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দেবেনের মা স্থিরনেত্রে নূতন পুরোহিতের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে সকলই যেন বে-বন্দোবস্ত। প্রত্যেক বৎসর যেমনটী হয় ঠিক যেন তেমনটী হইতেছে না। ঘটের উপর সিন্দুরের টিপগুলি যেন যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই। শিরোমণি মহাশয় কেমন সুন্দরভাবে সিন্দুরের টিপ গুলি লাগাইতেন। কৈ নৈবিদ্যের উপর ফুল দেওয়া হয় নাই। শিরোমণি মহাশয়ের এসব কার্য্যে কখনও ত ত্রুটী হইত না। পুরোহিতের কার্য্যে দেবেনের মার তৃপ্তি হইতেছে না। তাঁহার মনে সকল কার্য্যেই খুঁৎ রহিয়া যাইতেছে। বিস্তৃত দালানের এক পার্শ্বে বসিয়া দেবেন ও নবীন ধূনা দিতেছে এবং মনোনিবেশ সহকারে পূজা দেখিতেছে। এমন সময় শিরোমণি মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদন বিষণ্ণ—সকরুণ কাতর দৃষ্টিতে তিনি দেবেনের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত করুণ, কত বেদনা পীড়িত। সে দৃষ্টির দিকে দেবেন চাহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া লইল। সে দৃষ্টি দেবেনের মার মর্ম্মস্থল ভেদ করিল, তিনি বিচলিত হইলেন। শিরোমণি দেখিলেন—তাঁহার সকল আশা ভরসা এইখানেই শেষ। তিনি তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস আর সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না কহিলেন,—"দেবেন" কি করুণ স্বর! দেবেন চমকিয়া উঠিল। শিরোমণি মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন, এ গরীব ব্রাহ্মণ তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে, যে আজ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ। শুধু তার মুখের গ্রাস নয়, তার স্ত্রী-কন্যাও সেই সঙ্গে অনশনে প্রাণ ত্যাগ কর্‌তে বসেছে। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাস

কেড়ে লওয়াই কি তোমাদের ব্রত! সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, কাহারও মুখে কথা নাই,—নীরব। শিরোমণি মহাশয় ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি কোথায় যাইবেন, তাহা তিনি জানেন না; লক্ষ্যহীন-ভাবে পথে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল গ্রামের সকলেই যেন তাঁহার দুঃখে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, সকলেই যেন তাঁহাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে একে একে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পথিমধ্যে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি কাহারও বা প্রশ্নের জবাব দিলেন, কাহারও উত্তর দিলেন না, নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আবার কেহ বা প্রশ্ন করিল না,—তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। শিরোমণি সে চাহনিতেও উপহাস দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল জগৎ নিষ্ঠুর, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন কেহ নাই। তিনি ভাবিলেন গৃহে যখন অন্ন নাই, অন্ন সংস্থানেরও তিনি যখন উপায়-হীন তখন তাঁহার পক্ষে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাওয়া বিড়ম্বনা; বরং অন্য জমীদারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটা বিহিত করাই কর্ত্তব্য। উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাহানা-বাদের পথ ধরিলেন। গৃহ হইতে জীর্ণ ছত্রটী লইতেও তাঁহার বিলম্ব সহিল না।

(৪)

শিরোমণি মহাশয়ের কথাগুলি দেবেনের বাণ অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়াছে। তিনি নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন;—কেন তিনি ছেলেদের প্রথায় পুরোহিত ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, এ দোষ ত তাঁহারই। তিনি যে ব্রত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই উপাখ্যানটী তাঁহার মনে বাড়িল। এক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের পত্নী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কোনও তৃষ্ণাতুর ব্রাহ্মণকে জল দান করায়, তিথি-মাহাত্ম্যে তাঁহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছিল এবং তিনি ও তাঁহার স্বামী বিষ্ণুর প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। ব্রতকথা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, দেবেনের স্নায় মনের মধ্যে কি একটা ভাব তড়িত প্রবাহের মত সঞ্চারিত হইয়া হৃদয় স্পন্দিত হইল। অজ্ঞাত ব্যাধির ন্যায় তাঁহার বেদনা-পীড়িত অন্তর বিদীর্ণ হইয়া সহসা নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্রাহ্মণকে সামান্য জলদান করায় এত পুণ্য, সেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তিনি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের,—বিশেষতঃ কুলপুরোহিতের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছেন। দেবতারা নিশ্চয়ই তাঁহার অন্যায় আচরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার ব্রত পণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; পুরোহিতের অনুসন্ধানে ধাবিত হইলেন।

বালক যেমন কুকর্ম্ম করিলে অভিভাবকের নিকটে আত্ম গোপন করিতে চেষ্টা করে, নবীন ও দেবেন সেইরূপ লজ্জায় মায় সহিত

সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইতেছে না, দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের কার্য্যের ফল যে এরূপ অপ্রীতিকর হইবে, ইহা তাহারা কখনও স্বপ্নেও আশা করে নাই। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তাহাদের কখনও ইচ্ছা ছিল না; ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মূর্খ ভট্টাচার্য্যগণের হস্ত হইতে পৌরহিত্যভার কাড়িয়া লইতে গেলে, তাহাদের যে মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইবে, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকে অনশনে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে, একথাটা তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও ভাবে নাই। এখন তাহারা তাহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত; ইহার প্রতি-বিধানের জন্য চিন্তিত। নবীন কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে কিন্তু দেবেন কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতেছে না। দেবেনের শয়নকক্ষে বসিয়া দুই বন্ধুতে জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, এমন সময় সহসা দেবেনের মা তথায় আসিয়া উপস্থিত; ডাকিলেন,—"দেবেন"।

"কেন মা"

"কাজটা কি ভাল হ'ল? যাও এখনই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে এস।"

"তাঁর দেখা পাচ্ছি না, মা। সেই সকালে যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, আর ফেরেন নি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠাচ্ছি, আমরা নিজেরাও ২।৩বার গেছি, কিন্তু দেখা পাই নি।"

"সন্ধ্যা হয়ে এলো এখনও তিনি বাড়ী ফেরেন নি! তাঁর খোঁজ করবার কি বন্দোবস্ত করেছ?"

"চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি।"

"বল তা হলেই কর্ত্তব্য হয়ে গেল। না, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না; যা করবার আমিই করছি। তোমরা কেন যে লেখাপড়া শিখেছিলে তা বুঝতে পারছি না।"

(৫)

আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল, শিরোমণি মহাশয়ের দেখা নাই। দেবেন সংবাদ-পত্রাদিতে উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও যখন শিরোমণি মহাশয়ের কোনও উদ্দেশ পাইল না, তখন স্বয়ং একবার অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার জন্য নবীনের নিকট প্রস্তাব করিল। নবীন বলিল,—"আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াই ত নিশ্চিন্ত হই নাই, উপযুক্ত লোক বাছাই করে চারিদিকে পাঠিয়েছি। এক্ষেত্রে তুমি নিজে গিয়ে আর বেশী কি করবে।"

দেবেন বিরক্ত হইয়া কহিল,—"এ তর্কের কথা নয় নবীন, মা যে প্রাণে কতটা ব্যথা পেয়েছেন তা বুঝছ না।"

"বুঝছি সব কিন্তু—" নবীন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেওয়ান যদুনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—"বাচস্পতি মহাশয় বাহিরে অপেক্ষা করছেন, টোল সম্বন্ধে কি কথা বলতে চান।"

দেবেন।—আর টোলে কাজ নেই কাকা, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন একে একে টোলগুলি তুলে দিবার চেষ্টা করুণ।

যদু।—অধীর হয়ো না বাবা, অধীর হ'লে কি কোন কাজ হয়। তোমরা যা করছ

...ত এক সময়ে দেশের একটা মহৎ উপকারই সাধন হবে। তবে এখন যাঁরা পুরোহিতের কাজ কর্‌ছেন, তাঁদের সেই কাজ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়াটাই তোমাদের ভুল হচ্ছে। কুলধর্ম্মও ত একটা ধর্ম্ম। তোমরা এসব বোঝ বাবা। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও কুলাচারের উপর আর কোনও বিধান খাটে না বলে গিয়েছেন। নবীন বলিল,—"আজ্ঞে সে কথাটার মানে আলাদা। তবে অজ্ঞ পুরোহিতগুলিকে তাঁদের কাজ থেকে অবসর দেবার আগে একটা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল। সেইখানেই হচ্ছে আমাদের ভুল।

এত কথা কাটাকাটি দেবেনের ভাল লাগিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল "ও সব ক'রবার হয় আপনি করুন কাকা, আমি আর কিছুতেই হাত দিচ্ছি না।" অগত্যা দেওয়ান চলিয়া গেলেন।

আজ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্য করিয়া জমীদার-গৃহিণী শিরোমণি মহাশয়ের কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে। শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রী শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, জীবনের সুখ দুঃখ যা কিছু সবই বরাতে করে। তাহা না হইলে আজ জমীদার-গৃহিণী তাহাদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন, কিছুদিন আগে তিনি যদি ইহার কণামাত্রও করিতেন, তাহা হইলে ত তাহার এ সুখের সংসার এরূপে ছিন্ন হইয়া যাইত না। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, চিন্তাস্রোত ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

জমীদার-গৃহিণীর খাস দাসী ভোলার মা আজ শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। ভোলার মা কহিল "বসে বসে ভেবে আর কি হবে মা, চল রান্না চড়াও।"

"না ভোলার মা আমার আজ ক্ষিদে নেই" এমন সময় দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। ভোলার মা দ্বার খুলিয়া দিয়াই অবাক; বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল "দাদা ঠাকুর!"

শিরোমণি মহাশয় অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীকে গৃহাগত দেখিয়া শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রী কি একটা ভাবে জড়ীভূতা হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। আনন্দোচ্ছ্বাস অশ্রুরূপে প্রকাশ পাইয়া কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া দিল; শত চেষ্টাতেও তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, অনিমেষ লোচনে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের বস্ত্র জীর্ণ মলিন, কেশগুলি রুক্ষ, মুখখানি শুকাইয়া পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় উন্মাদ। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ সাশ্রুনয়নে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "জাহানাবাদের জমীদারীতে ১০৲ টাকা মাহিনার একটী চাকরী জোগাড় করেছি, অনির বেরও কতকটা ঠিক করে এসেছি। এখন গুছিয়ে নাও, আজই জাহানাবাদ রওনা হই।"

শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রী কি জবাব দিবেন ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "অনি কোথায়?"

"জমীদার-বাটীতে।"

"সেখানে কেন?"

"আজ গিন্নি মা নিয়ে গেছেন।"

"তবে আমি এখনই তাকে নিয়ে আসি।" শিরোমণি মহাশয় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জমিদার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

জমীদার-গৃহিণী সবে মাত্র সান্ধ্য আহ্নিক সমাপন করিয়া প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় সম্মুখে শিরোমণি মহাশয়। এরূপ আকস্মিক শিরোমণির আবির্ভাবে জমীদার-গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি সহসা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না; গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা নিমেষ মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। যদুনাথ,

দেবেন, নবীন প্রভৃতি সকলে একে একে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথমে শিরোমণি মহাশয় কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আনি এখানে আছে ?"

জমীদার-গৃহিণী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, সে উপরে পান সাজছে।"

শিরো।—"তাকে ডেকে দিন, আজই আমি বাড়ী-ঘরের মায়া কাটিয়ে সকলকে নিয়ে আহামাবাদে যাব মনে করেছি।"

জমীদার গৃহিণী।—"আমি বেঁচে থাক্‌তে তা হ'তে পারে না। আমি এতদিন কেবল ছেলেদের বিদ্যার দৌড়টা দেখ্‌ছিলুম। দেবেন লেখাপড়া শিখলে কি হয়, সে এখনও ছেলে মানুষ। তার উপর কি অভিমান করা আপনার সাজে ?"

শিরো।—"অভিমান! অভিমান কিসের? দায়ে পড়ে যে আমায় সবই কর্ত্তে হচ্চে।"

জমীদার গৃ।—"দায় কিসের ? আনিকে আমি বাড়ীতে এনেছি, তাকে আমি ঘরেই রাখতে চাই। আমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, এটাও সহ্য করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শাশ্বত রূপ।

শাশ্বত যাঁর রূপের মাধুরী
শাশ্বত যাঁর জীবন-দীপ,
সবার মাঝারে যাঁরে পাওয়া যায়
তাঁহারে চাহিয়া দেখে না জীব॥
পদ্মের মাঝে গন্ধ রূপেতে
যাঁর রূপ-বাস বদ্ধ
ফাল্গুন বায় মৃদু মৃদু বয়
তাঁহারি মধুর ছন্দ॥
কুসুমের মাঝে নানারূপে রাজে
প্রতি পাপড়ির গাত্রে
তাঁরি শাশ্বত মহান দেহটী,
প্রকাশে দিবস রাত্রে॥
নিশিথ হিমানী দিবস রৌদ্র
প্রভাতে নীহার-কণা,
সে যে তাঁরি রূপ—তাঁরি রূপ সে যে
জানে কি এক জনা॥
কোকিলের সেই পঞ্চম রাগ
জাহ্নবী-স্রোত ধ্বনি
শিশু অধরের আধ আধ স্বর
সেও তাঁরি বাণী গণি।
বিরহীর সেই হৃদয়ের মণি
যামিনী মাঝারে চন্দ্র।
নব প্রস্ফুটীত প্রভাতি ফুলের,
মনোজ্ঞ মোহন গন্ধ॥
প্রভাত-মিহিরে শোণিত-ঝলক,
হৃদয় রক্ত তাঁর;
সকলের মাঝে শাশ্বত রূপে
বিরাজে তাঁহারি সার॥
মরুভূমে তিনি তপ্ত বালুকা
সাগরে লবণ জল,
পর্ব্বত মাঝে বিদারিয়া তিনি
ঝোড়া রূপে নিরমল॥
দেহীর শরীরে রক্তমাংস,
কণ্ঠের তিনি শব্দ,
কাম, ক্রোধ, ভয়, ষড়রিপু আদি
তাঁহারি হৃদয় লব্ধ॥
শরতের মাঝে ছড়া ছড়া মেঘ,
মাঠ ভরা সব ধান্য
সে যে তাঁরি ওগো মূরতি শুধুই
নহে কিছু আর অন্য॥
আলোক আঁধারে উষায় সাঁঝেতে
তাঁহারি মূরতি রাজে।
এত দেখে নর শিখিল না কিছু
শির নিচু হয় লাজে॥

শ্রীনীহাররঞ্জন সিং

থমে মনোজগতের শক্তি। হয় ত কেহ কহ ঘোর জড়-বাদিত্বের মলিন চশমা পরিয়া ই শক্তির চিন্ভাব বা চিন্ময়তা (consciousness) নাও দেখিতে পারেন সুতরাং তাহাদিগের নির্ভুল দৃষ্টির জন্য একটী কথা বলা আবশ্যক। চিন্ময়তাকে আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাই না কারণ উহা গুণ (quality) অতএব উহা অব্যক্ত (abstract)। তবে উহাকে কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়? ব্যক্ত অভিব্যক্তির (concrete expression) দ্বারা। সেই ব্যক্ত অভিব্যক্তিটী (concrete expression), উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্য্য (purposive action) ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থাৎ, যে কার্য্যের মধ্যে একটী উদ্দেশ্য (purpose) দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই কার্য্যের কারণস্বরূপ যে ব্যক্তি, তাহাকে চিন্ময় বা চেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কেন না অচেতন (unconscious) শক্তির উদ্দেশ্যপূর্ণ (purposive) কার্য্য বন্ধ্যা নারীর পুত্রের মত অসম্ভব। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মনোজগতের মধ্যে যে অনন্ত কার্য্যপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কি উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না? যে মন একদিন দূর-হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বরে বসিয়া মহাসত্যের অন্বেষণে ত্রিভুবন আলোড়ন করিয়াছিল—যে মন একদিন পুণ্যভূমি ভারতের তমোহর তপোবন, স্বর্গীয় সামগানের মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিয়াছিল, যে মন একদিন বীরদর্পে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার একমাত্র অধীশ্বর হইবার কামনায় সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে বিজয়-হুঙ্কারে কম্পিত করিয়াছিল—যে মন একদিন মানব-জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিবার মানসে রামায়ণ, মহাভারত, মাঘ, নৈষধ, উত্তর-রামচরিত, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, ইলিয়াড্ (Illiad), ওডিসী (Odyssey) হ্যাম্‌লেট্ (Hamlet), ওথেলো (Othelo) প্রভৃতি কত শত রত্ন-গ্রন্থ প্রসব করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল—যে মন একদিন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই প্রকাণ্ড সৌরজগতের ছবি মানব-সমাজের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল—যে মন এই বর্ত্তমান মহাসমরে স্বার্থের দাবানল জ্বালাইয়া সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে পুড়াইতে উদ্যত হইয়াছে—সেই মনকে অন্ধ উদ্দেশ্যহীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে কোন্ সাহসী সাহস করিতে পারেন তাহা বলিতে পারি না, আমাদের ত সাহসে কুলায় না। অতএব এই মনোজগতের অসীম কার্য্যাবলীর কেন্দ্রীভূত যে শক্তি তাহাকে চিন্ময় না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এইবার জড়জগতের শক্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যদি কার্য্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য পাওয়া যায় তবেই সেই কার্য্যের কারণ-স্বরূপ শক্তিকে চিন্ময় বলা যাইবে, নচেৎ নয়। এখন এই জড় জগতের কার্য্যের মধ্যে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি? হাঁ পাওয়া যায়। জড়বিজ্ঞান (Physics) উচ্চৈঃস্বরে প্রতিমুহূর্ত্ত সেই কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যখন সে তাপ (Heat) ও আলো (Light) সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান (Laws) * দেখায় তখন কি সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া

* অবশ্য জড়-বিজ্ঞানে শুধু যে তাপ ও আলো সম্বন্ধে

বলে না,—"হে মানব। চাহিয়া দেখ, ঐ তাপ ও ঐ আলো কেবল মাত্র এক অন্ধ ভৌতিক শক্তির বিশৃঙ্খল কার্য্য নহে—উহাদের মধ্যেও এক শৃঙ্খলতা আছে—এক নিয়ম আছে।" যদি কার্য্যের মধ্যে উদ্দেশ্য না থাকিত তবে কার্য্যপরম্পরার মধ্যে ঐ নিয়ম-শৃঙ্খল আসে কোথা হইতে? উদ্দেশ্য-হীন কার্য্যের নিয়ম থাকা অসম্ভব। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে জড় জগতের কার্য্য-ধারার মধ্যে এক নিয়ম আছে, আর যেহেতু এক নিয়ম আছে, অতএব এক উদ্দেশ্যও আছে এবং যেহেতু এক উদ্দেশ্য আছে অতএব ঐ জগতান্তর্গত শক্তির এক চৈতন্যও আছে। §

তবু যেন এখনও আমাদিগের মন জড়-শক্তির চিন্ময়তা স্বীকার করিতে চায় না। ইহার কারণ কি? ইতঃপূর্ব্বে মনোজগৎ ও জড়-জগতের যে দ্বৈতভাবের বা ভেদজ্ঞানের কথা বলিয়াছি—তাহাই ইহার কারণ। আমরা কল্পনা করিয়া থাকি যেন মনোজগৎ ও জড়-জগৎ দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য, আর তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিদ্বয় দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন রাণী। দুই জনের মধ্যে গঠন-গুণের এত প্রভেদ এবং ব্যবধানও এতদূর যে পরস্পর পরস্পরকে আদৌ চেনে না এবং চিনিতেও পারে না। এক একটী আপনার স্বতন্ত্র কার্য্য-স্রোতের মধ্যে আপনি ভাসিয়া চলিয়াছে যদি কখনও পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, তবে শত্রুতার বেশে—মিত্রতার বেশে নয়। সুতরাং এতই যখন পার্থক্য তখন যদি মনোজগতের রাণী চিন্ময়ী হয়, তবে জড়-জগতের রাণী চিন্ময়ী হইতে পারে কিরূপে? ইহা আমাদিগের চরম দ্বৈতের (Absolute duality) কল্পনা কিন্তু, বাস্তবিক কি তাই? না—তাহা নহে। এই যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পরিদৃশ্যমান চরাচর (World of experience), যাহাকে লইয়া আমরা সারা জীবন ধরিয়া অহোরাত্র 'কারবার' করিতেছি, ইহার জন্ম হইল কি প্রকারে? কিরূপে আজ ঐ প্রচণ্ডতেজোপুঞ্জ সূর্য্যকে সূর্য্য—ঐ অতলজলগর্ভ সমুদ্রকে সমুদ্র—ঐ অনন্ত প্রসারী নভোমণ্ডলকে নভো-মণ্ডল বলিতে সমর্থ হইতেছি? সে কেবল ঐ দুইটী শক্তির সম্মিলন-ফলে। মনে করুন জড়জগৎ ও তাহার শক্তি আছে কিন্তু মনো-জগৎ ও তাহার শক্তি নাই (অর্থাৎ আপনার বা আমার বা অন্য কাহারও একটীও 'মন' নাই) কিংবা মনোজগৎ ও তাহার শক্তি আছে কিন্তু জড়-জগৎ ও তাহার শক্তি নাই, তাহা হইলে ঐ সূর্য্য—ঐ সমুদ্র—ঐ নভোমণ্ডলের অস্তিত্ব কি সম্ভব হইত? কখনই না। এই দুই শক্তির সম্মিলনকেই লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের শাস্ত্র-কারগণ তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়" (পাশ্চাত্য:) দর্শনের কথায় ("Knower and known") বা ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র" সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা শুধু আমার কথা নহে, বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের

কতকগুলি বিধান আছে—তাহা নহে। এখানে কেবলমাত্র ঐ দুই চার কথাই বলা হইল।

§ বাস্তবিক পক্ষে অচেতন জগৎ বলিয়া কোন জগৎ আছে কিনা সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানরাজ্যে এক নূতন উপপত্তি হইয়াছে।

(Psychology) গবেষণার একটী শ্রেষ্ঠ ফল। বেন্ (Cr. Bain) বলেন,—"We are incapble ever of discussing the existence of an independent material world: the every act is a contradiction We can speak only of a world presented to our own minds"

("Senses and Intellect—P. 329)

অর্থাৎ—"একটী স্বাধীন জড়-জগতের অস্তিত্বের কথা আলোচনা করিতেও আমরা অক্ষম ; ঐ কার্য্যটাই একটী বিরোধ বা বৈপরিত্য। আমরা কেবল মাত্র আমাদিগের মনের সম্মুখে উপস্থিত (অর্থাৎ, মনের সহিত সম্মিলিত) জগতের কথাই বলিতে বা আলোচনা করিতে পারি।"

James Word (জেমস্ ওয়ার্ড)ও বলেন—"What a subject without objects, or what object without subject, would be, is indeed unknowable ; for in the truth the knowledge of either apart is a contradiction"

(Naturalism and Agnosticism, Vol. II. P. 112) *

অর্থাৎ,—"জড় পদার্থ ব্যতীত মন বা মন ব্যতীত জড়পদার্থ কি হইতে পারে—ইহা বাস্তবিকই অজ্ঞেয় ; কারণ, উভয়ের মধ্যে পৃথকভাবে প্রত্যেকের জ্ঞান সত্য সত্যই একটী বিরোধ।"

ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্যও বলিতেছেন,—"অনুভাব্য (জড়পদার্থ) ব্যতীত অনুভূতি থাকিতে পারে না।—

[বেদান্তের ২য় অঃ। ১ম পাঃ। ১ম সূত্র—"শারীরিক-মীমাংসাভাষ্য"]

অতএব যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ঐ দুই রাজ্যের রাণী যদিও বিভিন্ন বটে তবে একেবারে বিভিন্ন নয়, তাহাদিগের চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও চির-মিলন আছে—চির দ্বন্দ্বের মধ্যেও চির-সন্ধি আছে এবং এমন কি তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তই এক বিপুল প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সখিভাবে পরস্পর পরস্পরকে আকুল-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ একই লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন কি আমরা বলিতে পারি যে ঐ দুয়ের মধ্যে একটী শুধু চেতন, একটী শুধু অচেতন—একটী শুধু কাঞ্চন, একটী শুধু মৃত্তিকা—একটী শুধু আলোক, একটী শুধু অন্ধকার ? এরূপ ঐকান্তিক বৈষম্যধর্ম্ম (qualitative difference) থাকিলে কি তাহাদিগের মধ্যে কখনও কোনও যুগে ঐরূপ মহামিলনের সম্ভাবনা থাকিত ? কিছুতেই না। সুতরাং উভয়েই চৈতন্যময়—উভয়েই এক অনন্ত শক্তির দুইটি বিভাগ (aspect) মাত্র।

এইবার জিজ্ঞাসা করি এই যে, এক দ্বৈতাদ্বৈতভাব (unity-in-duality) (১)—সম্পন্ন চিন্ময় শক্তির চিরন্তন বিকাশ কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় ইহার কি কোন আধার নাই ? আধার ব্যতীত ইহা কি থাকিতে পারে ? পারে না ? যেমন এই স্থূল প্রাকৃতিক জগতে এক উজ্জ্বল তরল কিরণ-জালে বিশ্ব-চরাচরের যাবতীয় পদার্থকেই স্নাত দেখিতে পাইয়া মানব-মন

* এই গ্রন্থখানি খুব আধুনিক।

স্বতঃই ঐ যে এক দীপ্তিমান সূর্য্য আকাশের এক প্রান্তে জ্বলিতেছে, উহাকেই তাহার আধারস্বরূপ জ্ঞান না করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগতে ঐ এক জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির অসীম স্ফূরণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইয়া এক চির-চিন্ময় চিদ্-ভাস্বর অধ্যাত্ম-ভাস্করকে উহার আধাররূপে ধারণা না করিয়া মানব-মন থাকিতে পারে না; কেন না আধার আধেয় সম্বন্ধ মানব-চিন্তার একটী মূল নীতি (fundamental principle)। এই অধ্যাত্ম-ভাস্করকেই আমরা সেই অনন্ত-শক্তিমান মহাপুরুষ বা পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারি।

তাহা হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় এত দূর যাহা বলা হইল সংক্ষেপে তাহার পুনরুক্তি করিলে এই দাঁড়ায়। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করি যে ঘড়ি-নির্ম্মাতা যেমন ঘড়ির বাহিরে অধিষ্ঠিত সেইরূপ জগৎ নির্ম্মাতাও জগতের বাহিরে অধিষ্ঠিত—তাহা ভুল। জগৎ-নির্ম্মাতা জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই আছেন। এ সত্যটী প্রথমতঃ "আপ্তবচনের" ভূমি হইতে দেখা হইল, পশ্চাৎ বিজ্ঞানসম্মত একটী যুক্তির ভূমি হইতে দেখা হইল। সে যুক্তিটী এই যে, এই দৃশ্যমান জগতের কুত্রাপি কোনও বস্তু শক্তিশূন্য নহে, যেখানে সেই শক্তি সেইখানেই তাহাকে চিন্ময়ী ধরিতে হইবে, সেই বিরাট চিন্ময়ী শক্তির একটী অনন্ত চিন্ময় আধার আছে, আর সেই আধারই পরব্রহ্ম, অতএব যেখানেই শক্তি সেইখানেই পরব্রহ্মের বিকাশ (manifestation) বুঝিতে হইবে; সুতরাং জগতের সর্ব্বত্রই তিনি পরিব্যাপ্ত আছেন।

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের পরিব্যাপ্তিটুকু বলিলেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সব কথা বলা হইল না। ইহার আর একটি ধার আছে। সেটীও জানা আবশ্যক, যেহেতু পরে তাহার প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি আমাদিগের এই বিশ্ব-চরাচরের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই আছেন বলিয়া তাহাতেই নিঃশেষিত হইয়া যান নাই। তিনি অনন্ত ও অসীম; সুতরাং এই একটী মাত্র বিশ্বের মধ্য দিয়া তাঁহার সেই অনন্ত ও অসীম সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। কে বলিতে পারে এখনও কত বিশ্ব, কত গ্রহ-নক্ষত্র, কত সৌর জগৎ বর্ত্তমান আছে। অতএব তিনি যে মুহূর্ত্তে আমাদিগের এই বিশ্বের অধীন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি এই বিশ্বের অতীত (Transcendent)। পূর্ণব্রহ্ম বলিলে শুধু আমাদিগের এই বিশ্বের আত্মাকে বুঝায় না, যিনি সেই অসংখ্য বিশ্বের আত্মা তাঁহাকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণরূপী পূর্ণব্রহ্ম ভগবানই স্বয়ং তাঁহার এই বিশ্বাতীত ভাব (Transcendental aspect) বুঝাইবার জন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১১ অঃ। ৭ শ্লোক।

অর্থাৎ,—

"হে গুড়াকেশ! (অর্জ্জুন!) এই আমার দেহে একাংশমাত্র স্থাবরজঙ্গম সহিত সমস্ত জগৎ—অদ্য দেখিয়া লও; এবং আরও যদি

কিছু দেখিবার থাকে তাহাও দেখিয়া লও।”

এইবার আমাদিগের দ্বিতীয় প্রশ্ন—মানুষ কি? বা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি? ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম, এ, বি, এল।

সই।

(গল্প)

(১)

একটু বৃষ্টি হইলে প্রায় সমস্ত বাটীর সম্মুখে জল জমে, রাস্তায় এক হাটু কাদা হয়, একদিন বৃষ্টি হইলে এক সপ্তাহ জুতা চলে না। গ্রামের নাম পাহাড়পুর; এমন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পুষ্করিণীর পারে তাল-বৃক্ষের নাম গন্ধ না থাকিলেও, পুকুরের নাম “তালপুকুর”, গ্রামের মধ্যে রাজার নাম গন্ধ না থাকিলেও গ্রামের নাম “রাজাপুর”। আমাদের পাহাড়-পুরের শত ক্রোশের মধ্যে পাহাড়ের চিহ্নমাত্র না থাকিলেও ইহার নাম পাহাড়পুর। গ্রামটী ক্ষুদ্র, কাজেই গ্রামবাসীর সংখ্যাও যে ক্ষুদ্র হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এক সময়ে এই ক্ষুদ্র গ্রামের শ্রীছাঁদ যে ভালই ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রামের ছোট বড় সকলেই এক সময়ে পরস্পর সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; একের বিপদে অপরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে দেখা যাইত। এখন আর সেদিন নাই, সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই। এখন গ্রামের অধিকাংশ লোক নিঃস্ব ও অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির।

(২)

গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত; বৎসরান্তে গ্রামের ছোট বড় সকলে পূজার সময় তাঁহার বাটীতে কয়েকদিন পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। কিন্তু তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল বলিয়া ক্রমশঃ তাহাকে ঋণ-গ্রস্ত হইতে হইল, কিন্তু চাল-চলনের কিছুই কমিল না। অনেক বড় লোকের ঘরে দেখা যায় যে, যখন তাহাদের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহারা সেই মলিনতা ঢাকিবার জন্য পূর্ব্বের চালচলন বজায় রাখিতে গিয়া, অধিকতর দায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন। গোপী-নাথের একমাত্র পুত্র হরিনাথের বিবাহের পর, তিনি যে পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, ততদিন সমান ভাবেই সমস্ত খরচ পত্র চলিয়া গেল; হরিনাথ উপযুক্ত হইলও কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন না, বড় মানুষের ছেলেরা যাহা করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিয়া দিন কাটাইয়াছেন; এবং বোধ হয় ভাবিতেন চির-দিন একভাবেই কাটিবে। তারপর একদিন গোপীনাথের উপর হইতে তলপ হইল; তিনি সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন, পুত্র, পুত্র-বধূ ও একমাত্র সোহাগের আদরিণী পৌত্রী সুমতী কেহই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। দুই দিন যাইতে না যাইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল, গোপীনাথ দেনায় ডুবিয়া বহু কষ্টে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। হরি-নাথ এতকাল বড় আনন্দেই কাটাইয়াছিলেন;

কিন্তু তিনি যে পর্ব্বতের পশ্চাতে ছিলেন, সে পর্ব্বত সরিতেই চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিলেন; পাওনাদার, মহাজন, দোকানদার ও জমিদারের লোকে তাঁহার বাড়ী প্রায় সদর রাস্তায় পরিণত করিল। পিতৃশোক অপেক্ষা পাওনাদারের নির্দ্দয় তাগাদা তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত করিতে লাগিল। গ্রামের লোকের মধ্যে এক মাত্র হারাণ ঘোষ সকল বিষয়ে তাহার সাহায্য করিতে লাগিলেন, আর তাহার যুক্তিমত তিনি মাত্র পৈত্রিক ভদ্রাসন ও সামান্য একটী জোত রাখিয়া, বাকী সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। অবস্থা শোচনীয় হইলেও পূর্ব্ব নাম-ডাকের খাতিরে পিতৃশ্রাদ্ধ তাঁহাকে ভাল করিয়াই করিতে হইল, এবং এই ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার স্ত্রীর ও কন্যার সমস্ত অলঙ্কারগুলি একে একে বিক্রয় করিতে হইল, রহিল মাত্র ঐ সামান্য জোতটী, ইহারই আয় তাহার একমাত্র ভরসা ও শেষ সম্বল।

(৩)

গোয়ালা হারাণ ঘোষ হরিনাথের প্রতিবেশী, হারাণ ঘোষের এবং হরিনাথের বাটীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটী ছোট পুষ্করিণী। দুইটী গৃহস্থের মধ্যে বরাবর বেশ সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছে। মুখুয্যে বাড়ীর মধ্যে বাল্যকাল হইতে হারাণ চন্দ্রের অবাধ গতি! কর্ত্তা গোপীনাথ হারাণকে নাতি সম্বোধন করিতেন এবং সেই হিসাবে হারাণচন্দ্র হরিনাথকে বাবাঠাকুর বলিয়া ডাকিতেন। হরিনাথের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন হারাণচন্দ্রের সাদা প্রাণে বড়ই বাধা দিয়াছিল। কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর শ্রীছাঁদ যে এভাবে চলিয়া যাইবে, হারাণ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, তাহার ধারণা ছিল না যে একটীমাত্র লোকের অভাবে এরূপ পতন হইতে পারে। হারাণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেনকা হরিনাথ-কন্যা সুমতীর "সই"; দুই জনের মধ্যে বয়সের কিছু প্রভেদ থাকিলেও, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট প্রণয় লক্ষিত হইত। কেহ কাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, ঘরে কোন একটী সামান্য জিনিষ হইলেও মেনকা সুমতীকে না খাওয়াইয়া সুখী হইতেন না। গ্রামের মধ্যে হারাণ ঘোষের অবস্থা মন্দ ছিল না; একটা প্রবাদ বহুকাল হইতে শুনা যাইত যে, হারাণ ঘোষের অনেক অর্থ ছিল, তিনি নাকি কোন দৈববলে সাত ঘড়া মোহর পাইয়াছিলেন; তাঁহার চালচলন সাদা সিধা ও মোটা রকমের হইলেও, তাহার খরচের কৃপণতা ছিল না; নিজের পাঁচ হাত ধুতি এবং স্ত্রীর হাতে এক জোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত শাঁখা ছাড়া অন্য কোন প্রকার বাহুল্য লক্ষিত হইত না। গ্রামের মধ্যে এখনো কেবল হারাণ ঘোষের বাড়ীতেই বৎসরান্তে দুই একখানি প্রতিমা আসিয়া থাকে; পিতার সময় হইতে যে নিয়মে সমস্ত কার্য্য কলাপ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। বৎসরান্তে তাহার বাড়ীতে গরিব লোক এখনো পেট ভরিয়া আহার করিয়া থাকে; সময়ে সময়ে এক আধখানা নূতন বস্ত্রও যে তাহারা মাথায় বাঁধিয়া আনন্দে চলিয়া না যায়, এমনও নয়।

(৪)

ভগবান মানুষকে বোধ হয় সর্ব্বসুখে সুখী হইতে দেন না, হারাণচন্দ্রের—ছিল না কি? গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর পোরা মাছ, এ সমস্ত থাকা সত্বেও, একটীর অভাবে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বড়ই বিষণ্ণ করিয়া তুলিত। হারাণচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী সৌদামিনীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তিনি মেনকাকে স্ত্রীরূপে ঘরে আনিয়াছেন; আশা ছিল মেনকা তাঁহাকে পুত্রমুখ দর্শন করাইতে পারিবে, কিন্তু কৈ? ভগবান না দিলে মেনকা কোথায় পাইবে? হারাণ ঘোষ সে আশায় এখন নিরাশ। হইয়াছেন। মেনকা নিঃসন্তান হইলেও, তাহার আদর-যত্নে হারাণকে সুখী করিতে পারিয়াছিলেন; মেনকা হারাণচন্দ্রের হৃদয়ের শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ করিয়া সমস্ত হৃদয়টা যেন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

(৫)

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না; পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে সকলের যেমনভাবে দিন কাটে হরিনাথের কষ্টের দিনগুলি সেইভাবে কাটিয়া যাইতেছিল; হরিনাথের বাল্যকাল ও বর্ত্তমানের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও, নিরুপায় হরিনাথ অগত্যা বর্ত্তমানকেই সুখের বলিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া কি করেন? হরিনাথের সকলই গিয়াছে, আছে মাত্র তাঁহার "ঈশ্বরে-বিশ্বাস।" অবস্থার বিপর্য্যয়ে ও সাংসারিক অশান্তিতে যখন তিনি প্রপীড়িত হইতেন, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চিন্তার বোঝাটী তখন ভগবানের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইতেন। কন্যা সুমতী ক্রমশঃ বিবাহযোগ্যা হইতে চলিল; সংসারের অভাব-অভিযোগের উপর স্ত্রীর নিকট হইতে এ সম্বন্ধেও অনুযোগ শুনিতে হইত, এবং স্ত্রীর নিতান্ত আগ্রহে তাঁহাকে এ সম্বন্ধের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইত,—"ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে", অবশ্য হরিনাথ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; বিবাহের চেষ্টা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তেমন কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না, কন্যার রঙ কিঞ্চিৎ ময়লা, পয়সাও তেমন খরচ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে, সেই রকমই হইল।

(৬)

"সই, ও সই, সই?" মেনকা ডাকিল; সুমতী আসিয়া বলিল—"কেন সই, আমায় তুই ডাকছিস?" "হাঁ, এই তোর জন্য একটু ছানা এনেছিলাম, খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে? বেশী টক হয় নি তো?" সুমতী মেনকার হাত হইতে ছানার তালটী লইয়া চিনি সহ প্রায় সমস্তটাই শেষ করিয়াছেন,—এমন সময় সুমতীর মা আসিয়া বলিলেন,—"মা মেনকা, তোর সইকে তো দুধ, ছানা খাইয়ে খুব মোটা করছিস; কিন্তু মা বিয়ের কি হবে? এখনও কোন স্থানে ঠিক হলো না।" মেনকা হাসিয়া বলিল,—"মা ঠাকরোন্, সইয়ের বিয়ে যেন দেরিতেই হয়, বিয়ে হলে সই তো আমায় ছেড়ে চলে যাবে?" ব্রাহ্মণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন;—"মা মা

এমন কথা বলিস্ নি, এই তো ১৩ বছর পেরুলো, কে জানে ভগবান কত দিনে কূল দিবেন"।

(৭)

প্রায় দুই বৎসর হরিনাথ সুমতীর বিবাহের জন্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করিলেন; কিন্তু তিনি কোথাও সুবিধা করিতে পারিলেন না। কন্তা ক্রমশঃ বড় হইতে চলিল; হরিনাথও অস্থির হইতে লাগিলেন, আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন; যতদূর তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতেছেন; আহার-নিদ্রা, প্রায় তিনি ভুলিয়াছেন; লোকের মুখে কোন নূতন সংবাদ পাইবামাত্র সেই স্থানে হাজির হইতেছেন, কিন্তু মানবের শরীর কত সহ্য করিতে পারে? একে তো তাঁহার চেষ্টার সাফল্য সুদূরপরাহত, তাহার উপর দারুণ পরিশ্রম; আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের অনিয়মে, তাঁহার দেহ ক্রমশ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িল; স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময় একদিন হরিনাথ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী প্রবেশ করিলেন; তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন, জ্বরের প্রকোপে অস্থির; তাঁহার মুখের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় তিনি আজ সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন; বাটী প্রবেশ করিয়াই অবসন্ন দেহে দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন; ব্রাহ্মণী সাংসারিক কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, হরিনাথের গলার আওয়াজে মা ও মেয়ে উভয়েই উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছেন; ব্রাহ্মণী ত্বরিৎপদে এক ঘটী জল আনিয়া হরিনাথের ধুলিপূর্ণ পদদ্বয় ধৌত করিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন; এবং একটী শয্যায় হরিনাথকে শয়ন করাইয়া তাঁহার নিকট বসিলেন, হরিনাথ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"বোধ হয় সুমতীর বিবাহ দেওয়া আমার দ্বারা হইল না, এত চেষ্টাতেও কোন ফল ফলিল না, আমার দেহও ভগ্ন হইল, আর আশা নাই।" তাহার অবস্থা দেখিয়া মাতা ও কন্যার চক্ষে জলধারা বহিল; ব্রাহ্মণী ধীর-ভাবে স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বলিলেন,—"তুমি এত হতাশ হইও না, তোমার মুখেই না শুনিতাম, ভগবান যাহা ইচ্ছা করিবেন? ভগবানে বিশ্বাস তুমি হারাইতেছ কেন? তিনিই আমাদের ভরসা।"

হরিনাথের জ্বর ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিল, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন; সুমতী বালিকা, পিতার অবস্থা, পিতার রোগ-যন্ত্রণা, মাতার চক্ষের অবিরল ধারা,—তাঁহাকে বড় ব্যথিত করিল; মেনকা এই ব্রাহ্মণ পরিবারের এবং তাঁহার প্রাণাধিক সইয়ের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; সেই দিন হইতে তিনি বাড়ীতে থাকিয়া গেলেন।

হরিনাথ প্রায় একমাসকাল শয্যাগত; দূর গ্রাম হইতে একজন ভাল চিকিৎসক আনান হইয়াছে; মেনকার আগ্রহে ও অনুরোধে তাঁহার স্বামী হারাণ ঘোষ এ বাড়ীতে রাত্রিদিন হাজির থাকেন, ডাক্তার আনয়ন, ঔষধ লইয়া আসা প্রভৃতি সমস্ত বাহিরের কাজ হারাণচন্দ্র সমাপন করিতেছেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে চলিল, ডাক্তার হারাণচন্দ্রকে

রোগীর সঠিক অবস্থা জানাইলেন। এই ক্ষুদ্র সংসারের প্রত্যেক লোক বিষণ্ণ; কন্যা সুমতী শয্যাগত, হরিনাথের স্ত্রী বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সংসারের চিন্তা এক রকম ত্যাগ করিয়া অনিমিষ নয়নে স্বামী-শয্যায় সমাহিতা; কোন দিকে তাঁহার দৃকপাত নাই; একাগ্রচিত্তে সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান স্বামী-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় অনিমেষলোচনে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিতেছেন। আর মেনকা? সুমতীর সই মেনকা কি করিতেছেন? এই সংসারের সমস্ত কর্ম্ম, রোগীর পথ্যাপথ্য, চিকিৎসকের আবশ্যকীয় দ্রব্য, যখন যাহা দরকার তদ্দণ্ডেই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, তাঁহার মুখে বাক্য নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, কর্ম্মে অবসাদ নাই, এবং দেহে ক্লান্তি নাই। কোন এক মহৎভাবের প্রেরণায় আজ তাঁহার দেহ-মন পূর্ণ, আন্তরিক যত্ন এবং প্রাণান্ত-পরিশ্রমে এই দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যে তিনি ব্যস্ত।

আরও তিন সপ্তাহ এইভাবে কাটিয়া গেল; ব্রাহ্মণীর কাতর প্রার্থনা, মেনকার অদম্য পরিশ্রম, সুমতীর চক্ষের অবিরল ধারার, বোধ হয়, কিছু মূল্য ছিল; ভগবান বোধ হয় কৃপা করিলেন; অদ্য ডাক্তার বলিয়া গেলেন, "আর কোন ভয় নাই, আশা হইয়াছে"। হরিনাথ পূর্ণ দুই মাস শয্যাগত থাকিয়া এখন সুস্থ হইয়াছেন, দেহ এখনো বড়ই দুর্ব্বল, একদিন কথায় কথায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"যদি এ যাত্রা আমি বাঁচিয়া যাই, তবে একমাত্র ভগবানের কৃপা এবং মেনকার জন্যে"। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন; সুমতীর বিবাহের চিন্তা আবার তাঁকে আতুর করিল; স্ত্রীর মুখে একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার বহু কষ্ট সঞ্চিত তিন শত মুদ্রা তিনি কন্যার বিবাহের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই চিকিৎসার জন্য ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কথাটা তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে বড়ই বাজিল; একবার আকুল নয়নে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন,—"হা ভগবান!" ইতিপূর্ব্বে যে চিন্তায় তাহাকে শয্যাগত করিয়াছিল, সেই চিন্তাই পুনর্ব্বার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। অনেকক্ষণের পর স্থির করিলেন, যে কোন উপায়ে অচিরে বিবাহ দিতেই হইবে; উপস্থিত অর্থচিন্তা অপেক্ষা পাত্রের চিন্তাই তাঁহার প্রধান জ্ঞান হইল; অগত্যা তিনি পাত্রের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

(৯)

ঐকান্তিক চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল নিশ্চয়ই আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা বোধ হয় এতদিন পরে ভগবানের দ্বারে পৌঁছিল, পাত্র স্থির হইয়া গেল। পাত্রের পিতার অর্থাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় থাকিলেও, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতর মিনতি তিনি একেবারে অবহেলা করিতে পারিলেন না; অবশেষে শতত্র মুদ্রা পণে পুত্রের বিবাহ দিবেন স্বীকার করিলেন, ১৭ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তিনি হরিনাথ-কন্যা সুমতীকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, কন্যাটী ময়লা হইলেও তাঁহার অপছন্দ হয় নাই। হরিনাথ নিজ

অবস্থা বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকিলেও এ সুযোগ ত্যাগ করিতে তাঁহার সাহস হইল না, কারণ যতদূর তিনি জানিয়াছেন এ ঘরে কন্যা পড়িলে কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব হইবে না।

বেলা প্রায় ১০টা, রৌদ্রের দারুণ তাপে পল্লীগ্রামের লতা-বৃক্ষ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; বেলা দশটার মধ্যেই লোক ঘরের বাহির হইতে ভয় পাইতেছেন; ঘরের দাওয়ায় হরিনাথ একখানি জলচৌকিতে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন, কন্যা সুমতী এক বাটী তৈল লইয়া পিতার দেহে মাখাইয়া দিতেছেন, সম্মুখে স্ত্রী পান প্রস্তুত করিতেছেন। পাত্র স্থির করিয়া হরিনাথ ২।৩ দিন হইল বাড়ী ফিরিয়াছেন। সুমতীর মাতা বলিলেন "পাত্র তো ঠিক করিলে কিন্তু হাজার টাকা? এত টাকার যোগাড় কোথা হইতে হইবে?"

হরিনাথ।—টাকা কিছু বেশী লাগিবে বটে, কিন্তু ঘর ভাল?

ব্রাহ্মণী।—ঘর ভাল, বরও ভাল, কিন্তু টাকার কি হইবে?

হরিনাথ বাস্তবিক আসল কথাটী এখনও ভাল করিয়া মনের ভিতর স্থান দিতে সাবকাশ পান নাই; তিনি যে পাত্রটী স্থির করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই যেন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল, স্ত্রীর দুইবার প্রশ্নে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল; বাস্তবিক এইবার তিনি অর্থ চিন্তায় মগ্ন হিলেন, বলিলেন—"তাইতো, এত টাকার যোগাড় কি করিয়া হয়?" "ভগবান ভরসা মাত্র।" স্নান করিয়া আহার করিলেন; গ্রামে ২।১টী স্থানে টাকার যোগাড় হইবার আশা ছিল; সকলের নিকট স্তুতি মিনতি জানাইলেন, কিন্তু কৈ? প্রত্যেক স্থানেই—যে তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল; নিজ গ্রাম ছাড়িয়া ক্রমে গ্রামান্তর অবধি বহু চেষ্টা করিলেন, প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কোন ফল হইল না। আবার এই ক্ষুদ্র সংসারটী যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; সকলেই চিন্তামগ্ন, বিবাহের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে চলিল, ততই যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল! মেনকা সমস্তই শুনিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর, সুমতীর মনোকষ্টের কারণ তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন।

(১০)

বৈশাখের বারটা বেলা, আর আগুনের হল্‌কা দুইটীই সমান; এই রকম সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় হারাণ ঘোষ বাড়ী প্রবেশ করিল; তাহাকে দেখিলে বোধ হয় অনেকক্ষণ হাঁটিয়া আসিতেছেন; বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পুকুরে পা দু'টী ধুইয়া আসিয়াছেন, মেনকা অন্ন-ব্যঞ্জন থালায় রাখিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, আসিবামাত্র অন্নপূর্ণ থালাখানি লইয়া আসনের সম্মুখে রাখিলেন; সমস্ত সামগ্রী দিবার পর,একখানি তালবৃন্ত হস্তে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, আর হারাণ চন্দ্র সময়ের অপব্যয় না করিয়া মোটা মোটা হাতে থাবা থাবা অন্ন গলাধঃকরণ করিতেছেন; তাড়াতাড়ি আগমনের দরুণ মধ্যে মধ্যে গলায় ভাত আটকাইয়া যাইতেছে, আবার ঘটী হইতে জল লইয়া সে বাধাটি সরল করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে মেনকা বলিলেন—"কিছু করিতে

পারিলে কি?"

হারাণচন্দ্রের এ সময়টী বড়ই মূল্যবান, তিনি ইহার অপব্যয় করিয়া যে কথা কহিবেন, সে পাত্র তিনি নহেন। প্রায় অর্দ্ধেক অন্ন উদরে স্থান পাইবার পর, বলিলেন,—কিসের কি?

মেনকা।—কি রকম লোক তুমি? তোমায় চেনা ভার!

হারাণ।—কেন? এতকালেও আমায় চিন্‌তে পারিলে না?

মেনকা।—তামাসা এখন রেখে, কাজের কথাটী বল দিকি।

হারাণ।—কোন্ কাজের?

মেনকা।—সুমতীর বিবাহের টাকার কি হইল?

হারাণ।—ও তোমার সইয়ের? বিয়ের টাকার কথা? এতক্ষণ বল্‌তে হয়? আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম।

মেনকা।—নাও, তোমার সব সময়ই তামাসা, আসল কথাটা কি হলো বলে ফেল না।

হারাণ।—তবে শুন্‌বে? টাকার যোগাড় শুধু হাতে হ'তে পারে না, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হ'ল না।

মেনকা।—খালি হাতেই হোক আর পূর্ণ হাতেই হোক, যে কোন প্রকারে টাকার যোগাড় করা চাইই, বিয়ের আর কয়দিন বা আছে?

মেনকা এবার বাস্তবিক যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিল—"দুনিয়ার লোকের উপকারে তুমি থাকিতে পার, কিন্তু আমার সইয়ের জন্য টাকার দরকার কিনা, তাই তোমার গ্রাহ্য হয় না; কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি যে, তোমাকে যে কোন উপায়ে টাকা আনিয়া দিতেই হইবে, ইহা মেনকা রাণীর হুকুম জানিবে।"

হারাণচন্দ্র যেন একটু অপ্রস্তুত। একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন—"হুকুম শিরোধার্য্য, টাকার যোগাড় কালাই করিব।" মেনকা বলিল—"কাল যদি না টাকার যোগাড় করিতে পার, তবে আমার যাহা আছে আমি সইকে সব দিয়া আসিব, আমার টাকার উপর তো আর তোমার জোর নাই, আর এক কথা, তোমার সহিত কাল হইতে আমার কথা বন্ধ হইবে ইহাও জানিয়া রেখো।"

(১১)

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হরিনাথ বাটীর বহির্ভাগে একটী বটবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন; দক্ষিণ পবন তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তকের উপর দিয়া হু হু করিয়া বহিতেছিল, দারুণ গ্রীষ্মের সময় পল্লী-গ্রামের মাঠের হাওয়া সন্ধ্যাকালে যে কত মিষ্ট কত স্নিগ্ধ, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। এমন সময় সুমতী আসিয়া বলিলেন—"তোমায় হারাণদা কেন খুঁজি-তেছেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হারাণ, কখন আসিল? আমি তার কথাই ভাবিতেছিলাম! সে কোথায়? কন্যা বলিল—"মায়ের কাছে বসিয়া আছেন, আমার সইও আসিয়াছেন।"

হরিনাথ বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, হারাণ-চন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া রহিয়াছেন; হরি-

বাবাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণচন্দ্র বলিলেন "বাবাঠাকুর, প্রণাম হই।" হরিনাথ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া নিজেও বসিলেন। "বাবাঠাকুর, বিবাহের টাকার যোগাড় হইল কি?"

হরিনাথ।—কোথা হইতে হবে বাবা? কেহই দয়া করিল না।

হারাণ।—তবে উপায় কি? বিবাহের দিন তো সংক্ষেপ শুনিলাম।

হরিনাথ।—সবই তো জানি কিন্তু ভগবান দয়া না করিলে, আমার দ্বারা তো কিছুই হইল না।

হারাণ।—শুধু হাতে টাকা পাওয়া আজকাল মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। আপনার জোতের দলিলখানি, আমায় যদি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করিব মনে করিতেছি।

হরিনাথ।—কোন আপত্তি নাই, স্বচ্ছন্দে দলিলখানি তুমি লইয়া যাইতে পার, আমি তো ঐ দলিল লইয়াও অনেক স্থানে ফিরিলাম, অত টাকা কেহ দিতে স্বীকার হয় না। এই কথাগুলি বলিয়া হরিনাথ একটী ছোট হাতবাক্স হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়া হারাণের হস্তে দিলেন;

হারাণ।—এই জোতটী মাত্র আপনার সম্বল, পরে কি করিয়া সংসার চলিবে।

হরিনাথ। বাবা, পরের চিন্তা পরে হইবে, এখন উপস্থিত দায় হইতে আমায় উদ্ধার কর; তুমি ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না।

(১২)

সুব্রতীর জ্ঞান হইয়াছে সংসারের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছে তাঁহার অগোচর কিছুই নাই; তাঁহার পিতার একমাত্র সম্বল, যাহা কিছু ঐ জোতটী তাহাও বন্ধক পড়িতে চলিল। আজ তিনি বড়ই বিষণ্ণ, তাঁহার সই মেনকা তাঁহাকে যত বুঝাইতেছেন, ততই তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, মেনকা তাঁহাকে বলিলেন,—"সই, তোর কোন চিন্তা নাই, ভগবান সমস্ত ঠিক করিয়া দিবেন।"

একদিন মধ্যাহ্নে হরিশ্চন্দ্র আসিয়া হরিনাথের হস্তে পাঁচ শত টাকার দুই খানি নোট দিল; এবং প্রণাম করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাঠাকুর, আপনি তাহা হইলে কবে কলিকাতায় যাইতেছেন?" হরিনাথ বলিলেন,—"আর তো বিবাহের বিলম্ব নাই বাবা, তোমার কল্যাণে এতদিন পরে সুব্রতীর বিবাহ হইবে আশা হইল, তোমার উপকার এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পূর্ব্বে কখন ভুলিবে না। আগামী বুধবারে বিবাহ, অদ্য সোমবার, আগামী কল্য প্রাতের ট্রেণে কলিকাতায় যাইব।"

(১৩)

হরিনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন; দুই খানি নোটই তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন; উদ্দেশ্য একখানি ভাঙ্গাইয়া অলঙ্কার, বস্ত্রাভরণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি খরিদ করিবেন, অপরখানি কারেন্সি আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া পাঁচশত নূতন কলের টাকা লইবেন, কারণ তাহা বরকর্ত্তাকে পণ-স্বরূপ দিতে হইবে। প্রথমে একখানি নোট ভাঙ্গাইয়া অলঙ্কারগুলি খরিদ

করিলেন, পরে অপরাপর আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র সমস্ত দিন ধরিয়া খরিদ করিয়া, সন্ধ্যার সময় অবসন্নদেহে গ্রামস্থ কোন লোকের বাসায় রাত্রিযাপন মানসে উপস্থিত হইলেন। বক্রী নোটখানি বাসায় শয়নের পূর্ব্বে সাবধানে চাদরে বাঁধিলেন, এবং মস্তকের নিম্নে রাখিয়া শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন, প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সমস্ত জিনিষগুলি একজন মুটের মাথায় উঠাইয়া দিয়া বাসা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইচ্ছা গন্তব্য পথে করেন্সি আফিস হইতে নোটখানি ভাঙ্গাইয়া সেই দিনেই বাটী ফিরিবেন।

মুটে অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল, হরিনাথ পশ্চাতে, বাসা হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া নোটের কথা তাঁহার স্মরণ হইল, তৎক্ষণাৎ স্কন্ধদেশ হইতে চাদরখানি হাতে লইলেন, যে স্থানে নোটখানি বাঁধা ছিল সে স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নোট নাই; একবার দুইবার বহুবার দেখিলেন, কিন্তু কৈ নোটের কোন চিহ্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল না অকস্মাৎ, তাহার মস্তকে যেন কে দারুণ আঘাত করিল, সমস্ত জগৎ আঁধার দেখিলেন? মুটেকে ফিরিতে বলিলেন,—আবার বাসায় ফিরিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন; কেহই তাঁহার নোটের সংবাদ দিতে পারিল না; একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"হা ভগবান, তোমার মনে এই ছিল।" অগত্যা যাহা ছিল তাহাই লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

(১৪)

আজ সুমতীর বিবাহ; মেনকা'ও হারাণ-চন্দ্র আজ বড়ই ব্যস্ত, বাহিরের সমস্ত ব্যবস্থা হারাণচন্দ্রের হস্তে, তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে সেই ব্যবস্থায় ব্যস্ত। আর অন্দরে মেনকা, আজ মেনকা বড় প্রফুল্লা, সদা হাসিভরা মুখ-খানি লইয়া সকলের সম্মুখে হাজির, যাহার যে বস্তু আবশ্যক মেনকা সকলের অনুরোধ রক্ষায় নিযুক্তা; সন্ধ্যার সময় হরিনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিছিলেন; তাঁহার অনুপস্থিতিতে যেন কোনপ্রকার ত্রুটী লক্ষিত না হয়, সে বিষয়ে মেনকা হারাণ-চন্দ্রকে উপদেশ দিয়া সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সকলেই হরিনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণীর মুখে আজ যেন কে হাসিরাশি মাখাইয়া দিয়াছে, সমস্ত কার্য্যের ভার তিনি মেনকার হস্তে ন্যস্ত করিয়া আত্মীয়া নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকগণকে অভ্যর্থনা এবং সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন।

বিবাহ-সভা হারাণচন্দ্রের মনোমত সজ্জিত হইলে, তিনি বরাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন; গ্রামের মধ্যে দশ বারটী ভদ্রলোক তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন; এবং হারাণচন্দ্র হাস্য-মুখে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রায় আটটা বাজিল, সভাস্থল আলোক-মালায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; হরিনাথ এখনো পৌঁছান নাই; প্রত্যেকেই বিশেষতঃ হারাণ-চন্দ্র বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ঠিক সেই সময়ে দূরে বেহারা এবং সানাইয়ের চিরপরিচিত শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, সকলে বর আসিতেছে বলিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন; বরসহ বরযাত্রিগণ আসিয়া

পৌঁছিলেন, হারাণচন্দ্র অগ্রসর হইয়া সকলকে সাদরে সভাস্থলে আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন; বর সভাস্থলে আসীন; সভাস্থল কিয়ৎ কালের জন্য কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ. বরকর্ত্তা হরিনাথ বাবুকে খুঁজিলেন, বিবাহ-লগ্ন ৯৷টার সময়, মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। এমন সময় হরিনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সভাস্থল দেখিয়া বুঝিলেন, হারাণচন্দ্রের সুব্যবস্থার তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কোন কার্য্যের ক্রটী হয় নাই, সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা-সম্প্রদানের শুভ লগ্ন আসিল; বরকর্ত্তার সম্মুখে সমস্ত দান-সামগ্রী রক্ষিত হইল, তিনি একে একে প্রত্যেকটী পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিতেছেন, দুইটী পৃথক আসনে পাত্র ও পাত্রী উপবিষ্ট. পুরোহিত পার্শ্বের আসনে অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত জিনিষ পরীক্ষার পর বরকর্ত্তা হরিনাথ বাবুকে পণের টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; ঠিক সেই সময়ে কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত সভামধ্যে সকলের নিকট বিবাহের অনুমতি চাহিয়া বরকর্ত্তার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন, বরকর্ত্তা বলিলেন,—"একটু বিলম্ব করুন।"

(১৫)

হরিনাথ বাবু বরকর্ত্তার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না; তিনি হাত যোড় করিয়া বলিলেন,—"আমি বড়ই বিপদ-গ্রস্ত টাকা......" বরকর্ত্তা রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"টাকার কথা বলুন। এখন বাজে কথার সময় নাই, কোথায় টাকা?"

হরিনাথ।—আমার কথা সমস্ত না শুনিলে, আমার বিপদ কি রকম গুরুতর আপনি বুঝিবেন না।

বরকর্ত্তা।—আপনার সমস্ত কথা শুনিবার সময় উপস্থিত আমার নাই; অগ্রে টাকা লইয়া আসুন, পরে সমস্ত শুনিব।

হরিনাথ বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন,—"টাকা চুরি গিয়াছে। আপনি আমার কৃপা করুন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করুন বিবাহ হইয়া যাউক, কল্য আপনার টাকা যেখান হইতে পারি যোগাড় করিয়া দিব।"

বরকর্ত্তা।—সেটী হবে না, যদি টাকার যোগাড় এই মুহূর্ত্তে করিতে পারেন তবেই, নচেৎ বর লইয়া ঘর যাইব।

হরিনাথ বলিলেন,—"ভগবান ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?" তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না বরকর্ত্তার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—"আমায় রক্ষা করুন" তাহার পর সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

এত মিনতি, এত স্তুতি, এত করিয়াও বর-কর্ত্তার পাষাণ প্রাণে দয়ার চিহ্নমাত্র প্রকাশ হইল না, তিনি বরযাত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বর উঠাও, চল ফিরিয়া চল।"

সভাস্থ সকলে এবং হারাণচন্দ্র বুঝিলেন, পণের টাকা চুরি হইয়াছে, বিবাহ হইবার আর কোন উপায় নাই, হরিনাথ জ্ঞানশূন্য, হারাণ-চন্দ্র তাঁহার সেবায় মন দিলেন; ব্রাহ্মণের মস্তকে ও মুখে জল সিঞ্চন করিয়া তাঁহার জ্ঞান ফিরাইলেন। তখন একটী বালক আসিয়া

তাঁহাকে অন্দরে লইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, সম্মুখে সাশ্রুনয়নে মেনকা দণ্ডায়মানা, হস্তে একটী পিত্তল-নির্ম্মিত ঘটী।

মেনকা।—ব্রাহ্মণের বিপদ; কাতর প্রার্থনা, সমস্ত দেখিলাম, সমস্ত শুনিয়াই আমি আসিয়াছি, এই লও; আমার পাঁচশত টাকা ইহাতে আছে, শীঘ্র যাইয়া বরকর্ত্তাকে দাও, মানুষের ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ হইতে পারে না; আর ইহা অপেক্ষা দানের উত্তম সুযোগ পাওয়া সুকঠিন।

হারাণচন্দ্র স্থির, স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, ভাবিতেছেন,—মেনকা "মানবী" না "দেবী ?" মেনকা আবার বলিলেন,—"যাও বিলম্ব করো না, এখান বর উঠিয়া পড়িবে।"

হারাণচন্দ্রের আর বাক্য সরিল না; এতক্ষণ তাহাকে কে যেন কোন স্বর্গের ছবি তাঁহার নয়ন সম্মুখে ধরিয়াছিল, তিনি ঘটীটী হস্তে সভাস্থলে আসিয়া বরকর্ত্তার সম্মুখে তাহা ধরিলেন, এবং বলিলেন,—"টাকার যোগাড় হইয়াছে, টাকা গণনা পূর্ব্বক গ্রহণ করুন; বরকর্ত্তা ঘটীটী নাড়িলেন, ভিতর হইতে রজতখণ্ডের মধুর ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তাঁহার মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল; এবং বলিলেন,— "পুরোহিত মহাশয়, সম্প্রদান করুণ, আর বিলম্ব না হয়।" শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে সুমতীর বিবাহ হইয়া গেল; হরিনাথ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন; হারাণচন্দ্র বরযাত্রিদের আহারের বন্দোবস্তে ব্যস্ত; পাত্র-পাত্রী বাসর-ঘরে গমন করিয়াছেন, মেনকার আনন্দের সীমা নাই। আজ যে তাহার সইয়ের বর আসিয়াছে, তিনি বরের আচ্ছা করিয়া কর্ণমর্দ্দন পূর্ব্বক বলিলেন "এটা কি সইয়ের বিয়ে ? না টাকার বিয়ে ?" বর কর্ণে হস্ত বুলাইয়া মেনকার মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিলেন; মেনকা বলিলেন,— "ও সই, কাণে একটু তেল মাখাইয়া দে, এখনো যে অনেক বাকি ?"

অদ্য সুমতীর শ্বশুরালয় গমনের দিন; হরিনাথের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আজ আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ; মেনকা ও সুমতীর মাতা কন্যা পাঠাইবার আবশ্যকীয় বন্দোবস্তে ব্যস্ত; বাড়ীটী জনরবে মুখরিত; বরকন্যা গমনের পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদের প্রথা অনুযায়ী একটি গালিচার উপর বরকন্যাকে বসান হইয়াছে, গুরুস্থানীয় আত্মীয়স্বজন নিজ নিজ সাধ্যমত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যিনি যাহা দিতেছেন বরের হস্তে এবং কন্যার হস্তে তাহা প্রদান করিতেছেন; যিনি টাকাকড়ি দিতে না পারিতেছেন তিনি ধান্য ও দূর্ব্বার দ্বারা আশীর্ব্বাদ-কার্য্য সমাধা করিতেছেন। একে একে সকলের আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে অবশেষে মেনকা ধীর মন্থর গতিতে সুমতীর নিকট বসিল; এবং অঞ্চল হইতে জোড়া সুবর্ণ শঙ্খ বাহির করিয়া অতি ধীরে সুমতীর হস্তে পরাইয়া দিতেছেন, তাঁহার মুখে ঈষৎ হাসি; চক্ষের জলধারা গণ্ড বহিয়া মুক্তা-মালার ন্যায় একটীর পর একটী, তারপর একটী, পড়িতেছে, এ সময় তাঁহার হাস্যরোদন মিশ্রিত বদনখানি বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, শঙ্খ

সমাপন হইলে পর, একটা কাগজের মোড়ক হস্তে করিয়া এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লোহিত চূর্ণ লইয়া সুমতীর সীমন্তে দিয়া বলিলেন,—"আজ সই সত্যি সত্যি আমায় ছেড়ে চল্‌লি" আর কথা কহিতে পারিলেন না, সুমতীর গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া আবার বলিলেন,—"সই আমি শূদ্র, গরীব, তোমায় আশীর্বাদের ক্ষমতা আমার নাই, তবে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তোমার শাঁখার সিন্দুর অক্ষয় হয়; ইহার অধিক আমার কি ক্ষমতা আছে?" সুমতী সইয়ের কথায় বড় কাতর, তাঁহারও চক্ষুদুটী শুষ্ক ছিল না।

ঠিক সেই সময়ে হরিনাথ অন্দরে আসিয়া বলিলেন,—"মা মেনকা, একটু সত্বর সারিয়া লও, অধিক বিলম্ব হইলে পথে দারুণ রৌদ্রে সকলকেই কষ্ট পাইতে হইবে। মেনকা বলিলেন,—"বাবা ঠাকুর, বরকন্যাকে একটু জলযোগ করাইয়া দিতে পারিলেই হয়।" হরিনাথ সদরে আসিবার জন্য যেমন ফিরিলেন, সম্মুখে দেখিলেন হারাণচন্দ্র, বলিলেন,—"এস বাবা এস", হারাণচন্দ্র প্রণাম করিয়া বলিলেন "আপনি একটু অপেক্ষা করুন আপনার সহিত একটু কাজ আছে" এই কথা বলিয়াই হারাণচন্দ্র মেনকার নিকট গেল এবং দুই জনে কি কথা হইল, পরক্ষণেই হারাণচন্দ্র হরিনাথের সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"আপনাকে আমায় একটী ভিক্ষা দিতে হইবে, আপনি যদি স্বীকার হলেন তবে আমি বলিতে সাহস করি।" হরিনাথ বলিলেন, "তোমার আমার কি অদেয় থাকিতে পারে? বল তুমি কি চাও?" হারাণচন্দ্র নিজ স্কন্ধবিলম্বিত চাদরখানি হস্তে লইলেন, এবং চাদর হইতে একটী কাগজের পুলিন্দা বাহির করিয়া হরিনাথের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বেই আপনি স্বীকার করিয়াছেন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এখন আমার প্রার্থনা এই যে, এই দলিল লিখিত জোতটী যাহা আপনার কন্যা সুমতীর বিবাহ কারণ বন্ধক রাখিয়া এক হাজার মুদ্রা লইয়াছিলেন, উক্ত সহস্র মুদ্রা আমার স্ত্রী মেনকা দাসী তাহার "সই" সুমতী দেবীর শুভবিবাহের উপহারস্বরূপ মহাজনকে পরিশোধ করিয়াছে, এবং উক্ত জমির দলিলখানি আপনাকে ফেরৎ দিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছে; আমার স্ত্রীর এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।"

হরিনাথের হস্তে দলিল; তিনি নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, নিমীলিত নেত্রে একবার দলিলখানি দেখিলেন, দলিলখানি যে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির শেষ চিহ্ন, অন্ধের যষ্ঠি; দরিদ্রের ধন, ক্ষুধিতের অন্ন, তৃষিতের বারিবিন্দুস্বরূপ, তাহা তিনি ভাবিলেন, আর ভাবিলেন, ইহা ছাড়া হইলে তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। উদ্বেলিত প্রাণে একবার হারাণচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, সে মুখে সেইরূপ উদ্বেগশূন্য ভাব ছাড়া নূতনত্ব কিছুই ছিল না। হরিনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কম্পিতহৃদয়ে হারাণচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার, বোধ হয় শূদ্র ব্রাহ্মণভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল।

কুমার দামোদর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভবসাধন রায়।

এক বৃদ্ধ একাকী বসিয়া কি লিখিতেছেন। তাঁহার লেখনী অনবরত চলিতেছে। এক একবার কি ভাবিতেছেন, আবার লিখিতেছেন। রাত্রিকাল, নির্জ্জন। বৃদ্ধ দ্বারের দিকে তাকাইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিন চারি পৃষ্ঠা লেখা হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন। যখন পাঠ শেষ হইল তখন একখানি কাগজে মোড়ক করিয়া শিরোনামা লিখিলেন,—

"প্রবল প্রতাপান্বিত—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল

বাহাদুর।"

দুই তিন বার শিরোনামা পাঠ করিয়া ডাকিলেন,—"ভজনরাম!" ধীর পদবিক্ষেপে এক জন ভৃত্য ঐ কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বলিলেন,—"এই পত্রখানি মহারাজার নিজ হস্তে দেওয়া চাই।" ভৃত্য কোন কথা না বলিয়া মাথা নোয়াইল। ভজনরাম বেশী কথা বলে না। বৃদ্ধ তাহার হস্তে পত্র দিলেন, সে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল

ভবসাধন জাতিতে ব্রাহ্মণ, রাজা ধর্ম্ম-পালের মন্ত্রী। ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত রাজা কোন কার্য্যই করেন না। ভবসাধনের কূট-বুদ্ধিতে সকলে পরাজিত। ভবসাধন রায় এই রাজ্যের কর্ণধার। তিনি রাজাকে যে ভাবে চালান, রাজা সেই ভাবে চলেন। রাজা ধর্ম্ম-পাল যদিও বুদ্ধিমান লোক, তথাপি তিনি জানিতেন যে এই বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও রাজার মঙ্গল সাধন করিবেন, তাই তাঁহার প্রতি অসীম ভক্তি ও বিশ্বাস। অদ্য রাজা একটি গুপ্ত বিষয়ে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, সেই উত্তর রাত্রে একাকী বসিয়া লিখিয়া বিশ্বাসী ভৃত্য দ্বারা পাঠাইলেন।

রাজা তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া আছেন, কয়েক জন শরীর-রক্ষক অপর কক্ষে বিশ্রাম করিতেছে, এক জন বিশ্বাসী ভৃত্য কক্ষের দ্বারদেশে বসিয়া আছে, এমন সময় ভজনরাম তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাঠাইল। ভজনরামকে সকলেই চিনিত, দ্বার ছাড়িয়া দিল, সে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। রাজা ভজনরামকে দেখিলেই রহস্য করিতেন। তিনি ভজনরামকে বলিলেন,—"কি ভজনরাম, কেমন আছ? কি উদ্দেশ্যে আগমন?" ভজনরাম মস্তকের পাগড়ী হইতে লিপিখানি বাহির করিয়া পুনরায় অভিবাদন করিয়া রাজার হস্তে দিল। রাজা আবার হাসিয়া বলিলেন,—"ভজনরাম, তোমার কি কোন কথা নাই? এই পত্রখানি আমাকে দিলেই মুক্ত হ'লে?" ভজনরাম ঘাড় নাড়িল। রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী মহাশয় বেশ ভৃত্য পেয়েছেন, মূক বটে, বধির হ'লে আরও ভাল হ'ত।" রাজা ভজন-রামকে নিকটে ডাকিলেন, ভজনরাম নিকটে আসিলে দেখিলেন তাহার মুখখানি শুষ্ক, চক্ষু

চক্ষে, রং খুব কালো, কিন্তু চক্ষু দুটি বেশ পটল-চেরা, লম্বা লম্বা কেশ পাগড়ীতে ঢাকা। বদনে কেশের কোন চিহ্ন নাই। অতএব ভজন-রামের বয়স ১৮।১৯ মনে করিলেন। ময়লা একখানি বসন পরিধানে, গাত্রেও একখানি চাদর, অপরিষ্কৃত। গলায় একগাছি তুলসীর মালা, তাহাতেই অনুমান হয় যে, সে বৈষ্ণব। রাজা মুখের দিকে দৃষ্টি করাতে ভজনরাম চক্ষু নত করিল। রাজা বলিলেন "তোমার মুরব্বিকে গিয়ে বল কাল ভোরে যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আজ আর পত্রের কোন উত্তর নাই।" ভজনরাম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রাজা পত্রখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, তার পর খুলিয়া পাঠ করিলেন :—

"যে বিষয় অবশ্য কর্ত্তব্য, কিছুতেই অবহেলা করবেন না। এই সুযোগে না হ'লে আর হবে না। কাহারও কথা গ্রাহ্য করবেন না। এই স্থান যেদভূমি, পাপ পুণ্য বিচার আবশ্যক, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ক। অনেকে বিরুদ্ধাচরণ করবে, কেহ কেহ বা অন্তদিকে কথা বলবে, কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করা দরকার।" রাজা ২।৩ বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রত্যূষে আমি শয়্যোত্থান করবো।" ভৃত্য যে আজ্ঞে বলিয়া চলিয়া গেল। রাজা সে রাত্রিতে আর অন্তঃপুরে গেলেন না, বাহিরের ঘরেই শয়ন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তুমি কে?

রাজা ধর্ম্মপাল শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা-দেবী শীঘ্র উপস্থিত হইতেছেন না। কতরূপ চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। তিনি বহুক্ষণ নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিলেন, কিন্তু দেবীর কৃপা হইল না। হঠাৎ দ্বারদেশ আলোকিত হইল, রাজা দেখিলেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। সুন্দরীর পরিধানে রেশমী শাড়ি, গলে ওড়না। সমস্ত শরীরে ফুলের অলঙ্কার। কর্ণে ফুলের দুল, গলায় পুষ্পহার, হস্তে পুষ্প বলয়, কোমরে পুষ্পের চন্দ্রহার। অপূর্ব্ব শোভা! এমন সুন্দরী কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ সময়ে এমন নির্জ্জন স্থানে, এ সুন্দরী কোথা হইতে আসিল? চারিদিকে প্রহরী, গৃহের দ্বারে সশস্ত্র রক্ষক, কক্ষের বাহিরে লোক, এ সুন্দরী কিরূপে রাজকক্ষে প্রবেশ করিল? তবে কি এ মানবী নহে? এ কি কোন দেবী না অপ্সরা? এইরূপ নানা প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইল। রাজা দেখিলেন, সুন্দরী শ্রীরাজভক্তি হইয়া দাঁড়াইল। একবার মনে হইল এ বুঝি স্বপ্ন। রাজা অচেতন অবস্থায় আসিলেন, মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না। তখন বীণানিন্দিত স্বরে যুবতী বলিল "রাজন্, এখনও সাবধান, কূটবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, জীবন হারাবে। আমি তোমাকে সাবধান করতে এলেম। ভিন্ন আর তোমাকে সাবধান করতে এই এখন চাই। যদি আমার কথা না শুন রাজা নষ্ট

হবে, নিজে প্রাণ হারাবে।” রাজা দেখিলেন যুবতী ক্রমশঃ দ্বারদেশ হইতে অপসৃত হইতেছে। তিনি স্তম্ভিতের মত শয়ন করিয়া থাকিলেন। দেখিলেন ক্রমে সুন্দরী চলিয়া গেল।

তখন রাজার চৈতন্য হইল. তিনি লম্ফপ্রদানে উঠিলেন। কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুন্দরী, আর নাই, প্রহরীগণ বসিয়া আছে। তিনি একজন প্রহরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন যুবতী স্ত্রীলোক এসেছিল?” সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—“হুজুর আমরা কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পাই নাই। আমরা এস্থানে ব'সে আছি, কার সাধ্য বিনানুমতিতে প্রবেশ করে?” রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রধান ফটকে দেখিলেন, সবত্র প্রহরীগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে প্রশ্ন করাতে তাহারা বলিল “হুজুর, কোন লোকই ভিতরে প্রবেশ করে নাই।” রাজা উত্তরোত্তর চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং নিজ কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষে তাহার যে বিশ্বাসী ভৃত্য শয়ন করিয়া থাকে, তথায় গেলেন। দেখিলেন ভৃত্য নিদ্রিত। তিনি তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন, তারপর যুবতী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সে অবাক্ হইয়া গেল, মনে করিল, রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সভয়ে যোড় হস্তে বলিল “হুজুর, আমার এ কক্ষ দিয়া কেহ প্রবেশ করে নাই।” রাজা ... থাকিলেন, তারপর তথা হইতে স্বীয় কক্ষে ... হইয়া আবার শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাজা ভাবিলেন, এ সুন্দরী কে? অনিন্দ্য সুন্দরী ত আমার চক্ষে পড়ে না। আমার এই সুরক্ষিত কক্ষে কেমন ক'রে প্রবে[শ] করলে। প্রহরীরা এ সংবাদ কিছুই জা[নে] না। তবে কি গুপ্ত দ্বার আছে? আমি কিছু জানি না। রাণীকে একথা বলা হই[বে] না। বৃদ্ধ মন্ত্রী কি এসব কিছু জানেন? তাঁ[কে] গোপনে বল্‌তে হবে। অস্ত্র নিয়া যা[ও] আমাকে কিসের জন্য এত সাবধান করলে? রাজা এই সব বিষয় চিন্তা করিতে করি[তে] নিদ্রিত হইলেন, স্বপ্নেও সেই সুন্দরীকে দে[খি]লেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুমার দামোদর।

“মা, একবার এদিকে আসুন।”

রাজ্যেশ্বরী দেবী পুত্রের স্বর শুনিয়া ত[ৎ]ক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন। কুমার প্রণ[াম] করিলে মা বলিলেন—“বাবা, এতদিন কো[থায়] ছিলে? একবারও ত আমার নিকট এস নাই।” কুমার উত্তর করিলেন “মা, রাজকর্ম্মে মোটে সময় পাই নাই। মামা, সর্ব্বদা নিকটে বসা[ইয়া] কার্য্য শিখাচ্ছেন। বিশেষতঃ, কুমারী[র] বিবাহ আগামী মাসে সুসম্পন্ন হবে, উদ্যোগও করতে হচ্ছে।” রাজ্যেশ্বরী দেবী[র] মুখ প্রফুল্ল হইল. রাজা যে এখনও কুমা[রের] এতদূর যত্ন করিতেছেন, ইহা সুখের বিষ[য়]। তিনি বুঝিলেন, ভাগিনেয়কে সিংহাসন দেও[য়ার] ইচ্ছা এখনও রাজার আছে। তিনি সঙ্গে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন,

পুত্রকে নিকটে পাইয়া বলিলেন "বাবা, সর্ব্বদাই বাবুদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাক্‌বে। তোমার ভগ্নীদের বিবাহ, যাহাতে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় তা কর্‌বে, লোকে নিন্দা না করে। তুমি এ রাজ্যের ভাবী রাজা, তোমার উপর সব নির্ভর। আমার বিশ্বাস কেহ কেহ তোমার অনিষ্টাচরণ কর্‌বে, সেজন্ত ভয় করো না। তোমার যিনি গুরুদেব তিনি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বেন। সর্ব্বদাই তাঁর সদুপদেশ গ্রহণ কর্‌বে। এমন সাধু আজকাল ভারতে নাই। তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা।" কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, এইবার আপনার আদর কম্‌বে।" মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "আবার তোর কে মা এল?" কুমার বলিলেন "বনের মধ্যে এক মা পেয়েছি, তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাই। কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি অনিন্দ্য কান্তি! যেন বনদেবী বনের মধ্যে বিচরণ কচ্চেন। দেবী কি মায়াবী আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। স্বয়ং গুরুদেব তাঁকে সম্মান করেন। তিনিই আমাকে মায়ের নিকট নিয়ে যান। তিনি কে কেহই জানে না, সকলেই তাঁকে 'মা' ব'লে ডাকে।" রাজ্যেশ্বরী দেবী এই বিবরণ শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি বলিলেন "আমার ভাগ্যে এ মায়ের দর্শন ঘটিবে না?" "ঘটিবে না কেন? আমি যে সকলেরই মা।" এই কথা বলিতে বলিতে 'মা' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। 'মা' হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার ছেলেকে আমি নিয়েছি, আর তোমার তার যত্ন কর্‌তে হবে না। তোমার ছেলে বড় ভাল, এমন ছেলে তুমি যে গর্ভে ধারণ করেছ, ইহাতে তুমি সৌভাগ্যবতী। আর তোমার পুত্রের আদরের সুধাকে আমি নিয়ে এসেছি। বৎস, নিশ্চিন্ত হও, সুধা এখন আমার নিকট আছে, আর কোন ভয়ের কারণ নাই।" রাজ্যেশ্বরী দেবী এই সব কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কুমারের মুখখানি সুধার কথায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহার মা কি মনে কর্‌বেন? তিনি বড় লজ্জিত হইলেন, চক্ষু দুটী অন্যদিকে ফিরাইলেন। রাজ্যেশ্বরী দেবী 'মাকে' প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন, তিনি সেই রূপরাশি নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "নিশ্চয়ই কোন দেবী।" তখন চৈতন্য হইল, তিনি পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মা বলিলেন "দেবি, তোমার আর প্রণাম কর্‌তে হবে না। আমি বাহ্যিক আড়ম্বর ভালবাসি না। মোট কথা, তোমার গুরুদেব তোমাদের উপর খুব সন্তুষ্ট। তিনি দেব, তাঁহার সন্তোষে জগৎ সন্তুষ্ট, অতএব আমিও সন্তুষ্ট। আমি সর্ব্বদা নাচিয়া খেলিয়া বেড়াই, সংসারের কোন ধার ধারি না। অথচ সংসার আমারই। আমাকে সকলে 'মা' বলে, আমিও সকলকে 'মা' বলি। 'মা' ডাক্ বড় মিষ্ট। এমন সুমধুর ডাক্ পৃথিবীতে নাই, তাই 'মা' নাম এত ভালবাসি। ভগবানকে 'মা' বলে ডাক্‌লে বড় সন্তুষ্ট, আর কিছুতেই এত সন্তুষ্ট নহে। তোমার ছেলে

'মা' বলে তাকে, আমি বড় খুসী। আজ তোমাকে দেখতে এলেম। রাজকন্যাদের বিবাহ, তোমার ছেলে খুব পরিশ্রম কচ্ছে। তোমার ছেলের বিবাহে আমি উপস্থিত থাকব, বৌ বরণ ক'রে ঘরে নিব। বৌ ত আমার কাছেই আছে, লক্ষ্মী স্বরূপিনী মেয়ে, তোমার আর ভাবতে হবে না। তুমি তাকে দেখ নাই, একদিন দেখতে পাবে।" তারপর কুমারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"বৎস, আমি চল্লেম, তুমি নিশ্চিন্ত হও। সুধার জন্য তোমার লজ্জিত হ'তে হবে না। তোমার মাতুল ও মা উভয়ে এক মত হ'য়ে তোমার বিবাহ দিবেন। এখনও সময় হয় নাই। সম্মুখে তোমাদের বড় বিপদ, সে বিপদ হ'তে উদ্ধার হওয়া কঠিন, যদি স্বয়ং মাধব রক্ষা করেন। তোমার গুরুদেব তোমার ভার গ্রহণ করেছেন, এমন গুরুদেব আর পাবে না।" দেখিতে দেখিতে দেবী চলিয়া গেলেন। তখন রাজেশ্বরী দেবী বলিলেন "ইনি কে? দেবী না মায়াবী?" এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভ পরিণয়।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে গোপী-চাঁদের বিবাহ স্থির হইল, এবং ঢাকা সহর হইতে সুকুমারকে আনিতে লোক গেল। স্থানে স্থানে নহবৎ, আজ্জায় আজ্জায় প্রতি রাস্তার মোড়ে পত্রপুষ্প শোভিত দ্বার, সৈন্যদের সমাবেশ, অশ্বারোহিদের গতিবিধি, ভৃত্যদের ছুটাছুটি, সবই যেন বিবাহের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। দলে দলে ভিক্ষুক, সম্রান্ত লোক, অতিথি, ব্রাহ্মণগণ, রাজধানীতে আগমন করিতে লাগিল। রাজধানী যেন আনন্দে মাতোয়ারা। রাজা বলিয়া দিয়াছেন, সমস্ত প্রজারা বিবাহের দিন আহার পাইবে।

সন্ধ্যার পর বর আসিয়া পৌঁছিলেন, সঙ্গে কর্ম্মচারিবৃন্দ, সৈন্যগণ, ও ভৃত্যমণ্ডলী। রাজা ইহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাদের বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং আহারাদির সুবন্দোবস্ত হইল।

রাত্রি এক প্রহর গতে শুভ লগ্ন, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ আসন গ্রহণ করিলেন। বিবাহ কার্য্য যথাবিহিতরূপে সুসম্পন্ন হইল। রাজা দুই কন্যাই কুমার গোপীচাঁদকে অর্পণ করিলেন। কয়েকদিন খুব আমোদে রাজধানী মত্ত হইল, আবালবৃদ্ধবনিতা নৃত্যগীতাদিতে যোগদান করিল। কয়েক দিন পরেই কুমার গোপীচাঁদ স্ত্রী দুটিকে লইয়া নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। রাণী ময়নামতী পুত্রবধূ ঘরে বরণ করিয়া তুলিলেন, তাঁহার আর আনন্দ ধরে না, তিনি মনে করিলেন, এতদিনে পুত্র নীতিমত সংসারে আবদ্ধ হইল। কিন্তু এক চিন্তা দূর হইল না, পুত্রের বিপদ সম্মুখে, সন্ন্যাসী বলিয়া গিয়াছেন। যদি এই পুত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সংসার ত্যাগ না করে, তবে জীবন সংশয়। এই কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখ মলিন হইল। এই বৌদের দশা কি হইবে? বিবাহ না দেওয়াই উচিত ছিল, এই চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া দুশ্চিন্তা

তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের অধিক বিলম্ব নাই, কি যে হইবে ভাবিয়া আকুল হইলেন। বৌদের রূপে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ চিন্তা আসিয়া সে আনন্দের স্রোতে বাধা দিল। অবশেষে মনে মনে করিলেন "যা হবার হবে, সেজন্য ভেবে কি হবে? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হবেই, আমরা উপলক্ষ মাত্র। নির্ব্বোধের ন্যায় আর চিন্তা কর্‌ব না। এখন বৌদের আদর করে সংসার আরম্ভ করি, যখন সংসার ভাঙ্‌বে, তখন বুঝা যাবে।"

রাজা মানিকচাঁদ পুত্রবধূদ্বয়ের মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। কিন্তু তিনি কাতর, অধিক আনন্দে যোগদান করিতে পারিলেন না। তিনিও হরিদাস বাবার মুখে পুত্রের বিপদের কথা শুনিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যে কি হইবে ভাবিয়া আকুল হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদযুগল ধরিয়া কাঁদিবেন স্থির করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের চিহ্ন।

সরস্বতী একটী আম্রবৃক্ষমূলে নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। সে নির্জ্জন স্থানই অধিক ভালবাসে, অন্তঃপুরে অধিকক্ষণ থাকে না। রাজান্তঃপুরের সকলের ধারণা সরস্বতী পাগল, সুতরাং তাহাকে কেহ কিছু বলিত না। সরস্বতী সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত। কখন অন্তঃপুরে, কখন উদ্যানে, কখন আম্র-কাননে, কখনও বনের মধ্যে। সে কাহাকেও ভয় করিত না, কাহাকেও কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইত না, লজ্জা কি তাহা জানিত না। সে কোন সময় রাজ্যেশ্বরী দেবীর নিকট যাইয়া আব্‌দার করিত, কখনও বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া রাজকন্যাদ্বয়কে অস্থির করিয়া তুলিত। সরস্বতী বড় সরলা ছিল, তাহার নিকট বড়-ছোট ছিল না, সে সকলকেই সমান-ভাবে দেখিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সরস্বতী ভয়ঙ্কর মুখরা; কেবল এক স্থানে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না, সে কুমার দামোদরের নিকট। সে যতই চেষ্টা করিত, কিছুতেই কুমারের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না।

অদ্য সন্ধ্যার সময় আম্রকাননে বসিয়া কুমার দামোদরের বিষয় ভাবিতেছে। "বামন হ'য়ে চাঁদে হাত কেন? আমার ন্যায় লোকের সে আশা বৃথা। তবে আমার প্রাণ দিয়ে যদি কুমারের উপকার হয় তা কর্‌বো। আমার প্রাণের মূল্য কি? কুমারের কত মূল্যবান প্রাণ।" এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি উপস্থিত হইল। সরস্বতীর সে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে এই প্রীতিকর চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। দুটি একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশ খচিত করিল। বৃক্ষের নীচে বসিয়া সরস্বতী বুঝিতে পারিল না কত রাত্রি হইয়াছে। তথাপি সে উঠিল, ধীরে ধীরে রাজবাটী অভিমুখে রওনা হইল। এই আম্র-কানন হইতে রাজবাটী অনেক দূর, মধ্যে বড় একটী প্রান্তর, সরস্বতী নির্ভয়ে প্রান্তর পার হইতে লাগিল। হঠাৎ সে একটা শব্দ শুনিতে

পাইল, অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি অশ্ব মৃতাবস্থায় পতিত আছে, নিকটে অন্য কেহ নাই। তখন সরস্বতীর সন্দেহ হইল, সে অনু-মানে এক দিকে চলিল। তাহার কোমরে যে একখানি অসি বস্ত্রে লুক্কায়িত ছিল, তাহা সে বাহির করিয়া হস্তে লইল এবং নির্ভয়ে প্রান্তর পার হইতে লাগিল। আর কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, একজন লোক অন্তিম দশায় পরিণত। সরস্বতী তাহার মুখের নিকট গিয়া বসিল, চিনিতে পারিল না, কারণ সে সময় অন্ধকার আকাশে শশাঙ্ক উদয় হয় নাই। সরস্বতী তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে হস্ত দিল, দেখিল একখণ্ড লিপি আছে, তাহা বাহির করিয়া লইয়া সরস্বতী আবার রওনা হইল। এ ব্যক্তির জীবনের আশা নাই, বোধ হয় দুই এক মিনিটের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিবে, অতএব আর তথায় অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিল। আরও কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি অশ্বের সরঞ্জাম পতিত আছে। তখন সরস্বতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কতক দূর গেলে অনেকগুলি অশ্বের পদ-শব্দ শুনা গেল, সরস্বতী তখন প্রান্তর পার হইয়া একটি বনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সরস্বতী এখন গাছের আড়ালে আড়ালে উহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিল। বনের মধ্যে অশ্বারোহী-দল প্রবেশ করিল। সরস্বতী সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিল একটি ভগ্ন অট্টালিকার নিকট সকলে থামিল, তারপর আর কাহারও নিদর্শন পাওয়া গেল না, হঠাৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। যে স্থানে ঐ লোকগুলি দাঁড়াইয়াছিল, সে স্থানে সরস্বতী গেল, কিন্তু কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, সরস্বতী অবাক হইয়া গেল। সে সেই ভগ্ন অট্টালিকার নানা স্থানে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশ্রান্ত হইয়া এক স্থানে উপবেশন করিল। সরস্বতী মনে মনে বলিল, একি? হঠাৎ ইহারা কোথায় লুকাইল? আমার চক্ষুর ভ্রম হইল। অথবা ইহারা মনুষ্য নহে?" তাহার মনে কিন্তু কোন ভয়ের সঞ্চার হইল না, সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হটাৎ সরস্বতীর তন্দ্রার আবেশ হইল, যাহাতে নিদ্রা না আসে সে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার দাঁড়াইল, একবার এদিক ওদিক পদসঞ্চালন করিল, কিন্তু নিদ্রার আবেগ ত্যাগ হইল না। সরস্বতী আবার বসিল, এবং বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। ক্রমে যেন তাহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল, সে মৃত্তিকার উপরেই শয়ন করিল ও নিদ্রিত হইয়া পড়িল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিল সে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে খট্টার উপরে শয়ন করিয়া আছে, ক্ষুদ্র একটি আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-শয্যায়।

রাজা মাণিকচাঁদ অন্তিম-শয্যায় শায়িত। রাজা ভয়ানক পীড়িত, বড় বড় সুচিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতেছে, কিন্তু জীবনের আশা

বড় কম। রাণী ময়নামতী চক্ষুর জল ফেলিয়া অন্ত প্রকোষ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের বিবাহের পরই এই ঘটনা, পুত্র বিবাহিত হইয়া পিতার শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট, বিবাহের আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না। সভাসদ-গণ এক একবার আসিতেছেন, আবার চলিয়া যাইতেছেন, সকলেই বিষণ্ণ। অস্থ রাজবাটী যেন দুঃখভারে পরিপূর্ণ। রাজাও বুঝিয়া-ছিলেন আর অধিক দিন পৃথিবীর সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না, তাই তিনি পুত্রকে কতকগুলি সদুপদেশ দিলেন এবং বলিয়া গেলেন—এ সময়ে তোমার বড় বিপদ, সাবধান। আমার মৃত্যুতে অনেকে সুযোগ পাবে, শত্রুপক্ষ মস্তক উত্তোলন করবে। আর এক বিপদ তোমার সম্মুখে ঝুল্‌ছে, গুরুদেব তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। আমাদের এ পৃথিবীতে কোন হাত নাই। ভগবান যাহা করবেন—তাহাই হবে। আমার স্বর্গ গমনে কোনরূপ শোক করো না, সকলকেই এক দিন তথায় যেতে হবে, এতে শোকের কারণ নাই। আমারা সেই পরম পিতার নিকট যাবো, ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কি আছে? তুমি দৃঢ় হস্তে রাজ্য শাসন করবে, সর্ব্বদাই রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করবে। তিনি বুদ্ধিমান লোক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হ'লে তোমার সুমঙ্গল হওয়ারই সম্ভাবনা। তুমি শোকে বিহ্বল হ'য়ো না, কর্ত্তব্য কর্ম বিস্মৃত হ'য়ো না।" পুত্রকে উপদেশ দিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, বাহিরে অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অতএব অন্ধকার ঘনীভূত। কয়েক দিন পরিশ্রমে রাজবাটীর সকলেই ক্লান্ত ও নিদ্রিত। রাজা মানিকচাঁদ শয্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার আর নিদ্রা নাই। রাণী ময়নামতী পাদদেশে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন, এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ সেবন করাইতেছেন। কুমার গোপীচাঁদ এতক্ষণ থাকিয়া মাতার আদেশানুসারে অপর কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। পুত্রবধূদ্বয় এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, রাণীর কথামত অন্য গৃহে গিয়া গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘরে আর কেহই নাই। রাণী ক্রমাগত নিদ্রার সঙ্গে লড়াই করিতেছেন। ক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়া রাণীর শরীরও ভাল নাই, তিনি দাসদাসীগণকে রাজার নিকট রাত্রে আসিতে দেন না, নিজেই থাকেন। স্ত্রীর স্বামীসেবা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত—ইহা তিনি জানিতেন। অদ্য কিছু জোর করিয়া ঘুমকে বাধা দিতে হইতেছে। এরূপ তাঁহার কখনও হয় নাই। তিনি একবার উঠিয়া চারিদিকে বেড়াইলেন, আবার আসিয়া উপবেশন করিলেন। কিছুতেই নিদ্রার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না, একবার মৃত্তিকায় শয়ন করিলেন, মনে করিলেন অল্পক্ষণ শুইয়াই উঠিবেন, কিন্তু তাহা হইল না, তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগি-লেন। এই সময় রাজা একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তখনও রাজার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি একখানি ছবির প্রতি লক্ষ্য করিলেন, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"গুরুদেব! আর কত দিন এ পৃথিবীর দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বো, কবে আপনি এসে আমাকে মুক্ত কর্‌বেন। ঐ পদযুগল আমার মস্তকে না দিলে এ প্রাণ যে বহির্গত হবে না, আপনার আগমনের এত বিলম্ব হচ্চে কেন? আমি কি এতই পাপী যে আমার কর্ম্মসূত্র এখনও খণ্ডন হয় নাই? আসুন, দয়াময়, আমাকে উদ্ধার করুন। আমার কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই। আমি রাজ্য চাই না, স্ত্রী চাই না, পুত্র চাই না, ধন চাই না, জন চাই না, সকল বিষয়েই আমার নিবৃত্তি হইয়াছে, এক বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এখন হৃদয়ে জাগরুক, সে আকাঙ্ক্ষা আপনি আসিয়া পূর্ণ করুন। এই ত প্রকৃত সময়, একবার পদযুগল আমার মস্তকে দিন।" হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ হইল,—"বৎস! প্রস্তুত হও, তোমার সময় আগত।" এই শব্দে রাজার মন পুলকিত হইল, তিনি দেখিলেন হরিদাস বাবা মস্তকের নিকট দণ্ডায়মান। রাজা বলিলেন,—"গুরুদেব! আমার মস্তকে পদযুগল প্রদান করুন।" গুরুদেব বলিলেন—"সংসারের বাসনা তৃপ্তি হ'য়েছে? এখন চল, যেখানে শোক নাই, তাপ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, সদাই আনন্দ, সদাই প্রফুল্লতা বিরাজিত, এস বৎস, আমার কোলে এস, আর কোন বিষয় তোমায় ভাব্‌তে হবে না। তোমার উপযুক্ত পুত্র এখন সংসার করুক, তুমি পরম পিতার নিকট চলে এস।" সন্ন্যাসী পদযুগল রাজার মস্তকে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল। সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইল না, এই সময় রাজা সকলকে ফাঁকি দিয়া অন্তিম প্রয়াণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুধার হাসি।

চাঁদের হাসির সঙ্গে সঙ্গে সুধার হাসি মিশিয়াছে। আজ সুধা বড় প্রফুল্ল, সে তাহার মাকে পাইয়াছে, আবার নিজ বাটীতে আসিয়াছে। আবার সেই পুষ্প উদ্যানে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে আলো করিতেছে, অপেক্ষায় আছে সেই যুবক পুনরায় আসিবে। সুধা মায়ের কৃপায় মাকে পাইয়াছে, কত গল্প করিতেছে, কত আনন্দ করিতেছে। আবার হরনাথ আসিয়া জুটিল। হরনাথ বহুস্থান অন্বেষণ করিয়া সুধাকে না পাইয়া আবার এইখানে আসিল, আসিয়া দেখিল সুধা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। হরনাথ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আবার সকলে একত্র হইল, কিন্তু সে যুবক কোথায়? তাই আজ জ্যোৎস্নালোকে উদ্যানে দাঁড়াইয়া সুধা যুবকের অপেক্ষা করিতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল কিন্তু আশা পূরিল কই? তবে কি সে সুধাকে ভুলিয়াছে? তবে কি যুবকের কোন বিপদ হইল? এই সব চিন্তা তাহার হৃদয়ে উদয় হইল। সে ভুলিয়াছে, এই কথা মনে করিতে তাহার বড় কষ্ট হইল। এক বিন্দু অশ্রু তাহার নয়ন কোণে দেখা দিল। সুধা একটি অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া—অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় তাহার মাতা

আসিয়া ডাকিলেন,—"সুধা!" সুধা চমকিয়া উঠিল। তাহার মা বলিলেন,—"সুধা, এত রাত্রি হইয়াছে, তবুও এখানে কেন? অসুখ হবে যে মা!", সুধা উত্তর করিল,—"না মা, অসুখ হবে না, আমার অভ্যাস আছে।" মা বলিলেন,—"সুধা, তোকে যিনি রক্ষা করলেন তিনি কে?" সুধা হাসিয়া বলিল,—"আমি কেমন করে তাঁকে চিনবো। তিনি সকলের মা। আমি 'মা' বলে ডেকেছি, সকলেই তাঁকে 'মা' বলে। এমন সুন্দরী আমি আর কখনও দেখি নাই, এমন মিষ্ট কথা আর কখন শুনি নাই। এমন ভাবও আর কোথাও দেখি নাই। মা যথার্থই জগজ্জননী। সকলের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, কিন্তু সর্ব্বদাই হাস্যমুখ। তিনি না থাক্‌লে আমার জীবন রক্ষা হ'ত না। সুধার মা এই সকল বিবরণ শুনিয়া জগন্মাতাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু তিনি কোথায়? যেখানে বিপদ, যেখানে দুঃখ, যেখানে কষ্ট, যেখানে শোক, সেখানে তাপ, সেইখানেই তিনি মাতৃরূপে উপস্থিত। তিনি ধনীর নিকট যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন না, কিন্তু যখন সে ধনী কষ্টে বা বিপদে পতিত হয়, তখন তিনি সেখানে যান। নিজের সুখ জ্ঞান নাই, নিজের কষ্ট জ্ঞান নাই, সর্ব্বদাই পরদুঃখকাতর। সুধার মাতা তখন ডাকিয়াও দেখা পাইলেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত ভক্তি হইল। সুধার মা তখন কন্যাকে ডাকিয়া গৃহের অভ্যন্তরে গেলেন। সুধা ভাবিলেন আর তিনি আসিবেন না, তিনি এ ভুলিয়াছেন, হয়ত তিনি এখানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন—ইহারা এস্থানে আর নাই, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, অতএব আর আসিবেন না। সুধা তাঁহার পরিচয় জানে না, কেমন করিয়া খবর দিবে? তথাপি সে দুঃখিত নহে, ভগবান যখন তাঁহাকে এত বড় বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই চরণে আশ্রয় দিবেন। সুধার মুখে হাসি দেখা দিল। সে জোড়হস্তে ভগবানকে প্রণাম করিল এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিল। ইহার পরই তাহার মনের কষ্ট দূর হইল, তাহার মনে হইল যেন তিনি তাহার অঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন। সুধার মাতা বলিলেন,—"মা, তোমাকে আজ এত অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন?" সুধা বলিল,—"মা, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির কথা ভাব্‌ছিলেম।" মা ও মেয়ের আর কোন কথা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য নষ্ট।

রাজা মানিকচাঁদের মৃত্যু হইলে রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাণী ময়নামতী শোকে ম্রিয়মানা হইলেন না, তিনি রাজ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কুমার গোপীচাঁদ রাজ্য পাইলেন। এই সুযোগে রাজা ধর্ম্মপাল ভবসাধন রায়ের পরামর্শ মত এই রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাণী দুর্গাবতী বড় লজ্জিত হইলেন, এই বিপদের সময় সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের রাজ্য আক্রমণ—বড় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু

মন্ত্রীর কথা কে শুনে ? রাজা ধর্ম্মপাল সসৈন্যে গোপীচাঁদের রাজ্য আজ আক্রমণ করিলেন এবং অনায়াসে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য দখল করিলেন। রাণী ময়নামতী পুত্র-সহ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রাজা ধর্ম্মপাল এই সিংহাসনে আরোহন করিয়া তাঁহার নিজ রাজ্য ইহার সঙ্গে যুক্ত করিলেন। রাজা ধর্ম্মপালের ব্যবহারে সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। প্রজারা মানিকচাঁদকে যেরূপ ভক্তি করিত, সেরূপ ভক্তি ধর্ম্মপালের প্রতি আসিল না। ধর্ম্মপাল ইহাদের মনের ভাব বুঝিয়া সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, ভক্তি না করুক—ভয় করুক—এই তাঁহার অভিলাষ হইল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র জামাতার এই রাজ্য হানির বিষয় শুনিলেন। এই অবিচারের কথা শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে একটা বিপদ ঘটিল—কুমার দামোদর কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। রাজা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুমারের কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। কুমার দামোদর সাহসী যোদ্ধা এবং বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ তিনি রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। এ সময়ে তিনি কোথায় গেলেন, রাজা ভয়ানক চিন্তিত হইলেন। তিনি রাজ্যেশ্বরী দেবীর নিকট স্বয়ং গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন খবরই পাইলেন না। কুমারের নিরুদ্দেশে রাজ্যেশ্বরী দেবীও বড় ভাবিত হইলেন। চারিদিকে লোক প্রেরণ করা হইল, কিন্তু সকলেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। রাজা অভাগিনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মায়ের প্রাণে সে সান্ত্বনা স্থান পাইল না। আর একটী বিষয়ের জন্য সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল সরস্বতীকে কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা ধর্ম্মপাল সিংহাসনে বসিয়াই ভব-সাধন রায়কে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, এবং তাঁহাকে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দিলেন। ভবসাধন রায় বলিলেন,—যে আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই, পুনরায় গোপীচাঁদ রাজ্যো-দ্ধারের চেষ্টা করবে। রাণী ময়নামতীও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সাহসী স্ত্রীলোক, রাণী কি করেন বলা যায় না। রাজা ধর্ম্মপাল একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে বৃদ্ধবয়সে মন্ত্রীর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজা প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, এবং কাহাকে কাহাকে পুরস্কারও দিতে লাগিলেন। রাজ্যের লোকেরা তাহাতে ভুলিল না। তাহারা গোপনে গোপনে গোপীচাঁদকে সাহায্য করিবে এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইল।

রাণী এক দিন নির্জ্জনে পাইয়া রাজাকে বলিলেন,—"এ কাজ কি ভাল হ'ল ? ধর্ম্মে সহিবে না। ভগবানের রাজ্যে এখনও ন্যায় অন্যায়ের বিচার আছে। কোথায় তুমি গোপী চাঁদকে এ সময় রক্ষা করবে, সে পিতৃহীন, তা না ক'রে তুমি তার রাজ্য নিলে, তাকে তাড়ায়ে দিলে, আমার ভগিনীকে নির্ব্বাসিত করলে। ইহার ফল ভোগ করতে হবে। আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সঙ্গে আমারও উত্থান-পতন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তোমার

চক্র তুমি কি বুঝবে, সেই চক্রে তুমি ঘুরছ। আমি জানি আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তুমিই বা কি করবে।" রাজা বড় চিন্তিত হইলেন, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"তোমার বুদ্ধি মত কি আমি চলবো? স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে চলে তার মত নির্ব্বোধ জগতে নাই। তুমি রাজ-রাণী হ'য়েছ, বসে বসে খাও, আমাকে তোমার বক্তৃতার দ্বারা বিরক্ত করো না।" রাণী শুনিলেন, আর কোন উত্তর করিলেন না। বুঝিলেন—'মরণ সময়ে বিপরীত বুদ্ধি।' নির্জ্জনে এক বিন্দু অশ্রু ফেলিলেন। বলিলেন,—"ভগবন্, আমার স্বামীর সুমতী দেও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দী কে?

সরস্বতী দেখিল ক্ষুদ্র একটি কক্ষে সে আবদ্ধ, তখন সে শয্যা হইতে উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। দ্বার বাহির হইতে বদ্ধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি বাতায়ন দুদিকে আছে, তাহাতে বড় বড় লৌহ শিক দেওয়া, সহজে বাহির হওয়ার উপায় নাই। সরস্বতী দেউলগুলি ভাল করিয়া দেখিল, কিন্তু পলাইবার কোন পথ দেখিল না। আবার আসিয়া শয্যায় শয়ন করিল। ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে পলাইতে পারে। রাজার যে মৃত অশ্ব ইত্যাদি দেখিয়াছে, তাহারই বা অর্থ কি? সে ত অট্টালিকায় ঘুমাইয়াছিল, এখানে তাহাকে কে আনিল? সবই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। সরস্বতী চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। এ কক্ষে বসিয়া দিবারাত্রি ভেদ করা কঠিন, সর্ব্বদাই অন্ধকার। জানালার ফাঁক দিয়া, একটু একটু আলো প্রবেশ করিতেছে। এ বাড়ী কি ভূগর্ভস্থ? সরস্বতী বুঝিতে পারিল না, তথাপি তাহার সন্দেহ হইল। কিন্তু সরস্বতীর মনে কোনরূপ ভয় হইল না। সে জানে তাহার কোন শত্রু পৃথিবীতে নাই, বিশেষতঃ তাহার অনিষ্ট করিয়া লোকের লাভ কি? সরস্বতী দেখিল তাহার আহার্য্য উপর হইতে রশি যোগে নামিয়া আসিতেছে। থালা ঘরের মেঝায় স্থাপিত হইল, রশিটি উপরে উঠিয়া গেল। সরস্বতী থালাখানায় নানারূপ মিষ্টান্ন, ফলমূল, পানীয়, দেখিতে পাইল। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, অতএব সে সবগুলি আহার করিল, তারপর আবার শয়ন করিল। সে নিদ্রার ভাণ করিয়া রহিল, কিন্তু কোন লোকই আসিল না। গৃহে একটী আলোক উপর হইতে ঝুলিতে লাগিল, তাহাতেই সরস্বতী অনুমান করিল—রাত্রি হইয়াছে। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিল—একটী গর্ত্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে। সে বুঝিল—এখন সে বন্দিনী। পলায়নের উপায় কি? একাবে যে সে অধিক দিন জীবিত থাকিবে না—তাহা নিশ্চিত। বনের বিহগ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিলে যেমন ছটফট করে, সরস্বতীর পক্ষেও তাহাই হইল। ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া একস্থানে উপবেশন করিল। আবার

বোধ হইল সে স্থানের ইষ্টক যেন সরিয়া যাইতেছে। আশ্চর্যান্বিত হইয়া সরস্বতী হস্ত দ্বারা ইষ্টকখানি নাড়িল, ইষ্টক সরিয়া গেল। এইভাবে আরও তিনখানা ইষ্টক সরিয়া গেল,তখন একটা গহ্বর দেখা গেল। ভয়ানক অন্ধকার, নামিতে ভয় হয়; কিন্তু সরস্বতী নির্ভয়, তাহার প্রাণের মমতা নাই। সে মরিলে কাহারও ত কোন কষ্ট হইবে না, এবং তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের মূল্যই বা কি? সে প্রথমতঃ বাম পদ দিল, তারপর দক্ষিণ পদ দিল, তৎপর সমস্ত শরীর ঐ গহ্বরে প্রবেশ করাইল। একখানি ইষ্টক ধরিয়াছিল, তদবলম্বনে কতক্ষণ থাকা যায়? হস্ত শিথিল হইল, সে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া অচেতন হইল। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না, যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল সে অর্দ্ধেক জলে ও অর্দ্ধেক স্থলে পতিত আছে। যদি জলের মধ্যে সম্পূর্ণ শরীর পতিত হইত, তবে জীবনের আশা ছিল না। তারপর সে উঠিয়া বসিল, স্থানটি পুতিগন্ধময়। অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিলে বাঁচিবার আশা নাই, এবং উপরে উঠিবারও উপায় নাই, তখন সে সাহসে নির্ভর করিয়া হস্ত দ্বারা স্থান নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে স্থানে জল ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে চলিল। যাইতে যাইতে একটি আলোক শিখা দেখিতে পাইল, সে শিখা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কতক দূর গিয়া দেখিল—ভয়ানক দৃশ্য! সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। একটি আলো জ্বলিতেছে, নিকটেই একটি নরকঙ্কাল ঝুলিয়া আছে। প্রথমতঃ সরস্বতী ঐটাকে পিশাচ মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিল, এখন নিকটবর্ত্তী হইয়া সে ভয় দূর হইল। নরকঙ্কাল এক একবার বায়ুতে খড়্ খড়্ করিয়া শব্দ হইতেছে। সরস্বতী সে স্থানে বসিল, একদৃষ্টে মনুষ্যের পরিণাম দেখিল, এবং একবার সে বিষয় ভাবিল। এই সময় বড় বড় অক্ষরে সে স্থানে লেখা আছে—"মনুষ্যের পরিণাম দেখ, সাবধান হও।" ইহা দেখিয়া—এ কাহার বাটী, এ আলো কোথা হইতে আসিল, কে এ নরকঙ্কাল এভাবে রাখিয়াছে, কে বড় বড় অক্ষরে ঐ বিষয়টী লিখিয়া রাখিয়াছে, চিন্তা করিবার বিষয় বটে। সরস্বতী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতক দূর গিয়া দেখিল উপরে যাইবার সিঁড়ি, সে আনন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উঠিয়া দেখিল একটি বৃহৎ কক্ষ, তাহাতে তিনচারি জন লোক বসিয়া গল্প করিতেছে। এবার সরস্বতীর ভয় হইল, যদি ইহারা টের পায়, তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বধ করিবে। সরস্বতী সে কক্ষে প্রবেশ করিল না, অন্যদিকে যাইতে লাগিল। একটী ঘরের বাহির হইতে তালা বদ্ধ, সরস্বতী সেই স্থানে দাঁড়াইল। সে স্থানে কোন প্রহরী ছিল না, সরস্বতী তালা খুলিতে চেষ্টা করিল। তাকাইয়া দেখিল একটি স্থানে কয়েকটি চাবি ঝুলিতেছে, সে ঐ সব চাবি আনিয়া তালা খুলিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল একটি লোক শয়ন করিয়া আছে। বোধ হইল সে ব্যক্তি নিদ্রিত।

সরস্বতী এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র একটী আলো এক কোণে জ্বলিতেছে কিন্তু বন্দী আলোক-বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিয়াছিল, চিনিবার উপায় নাই। সরস্বতী ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে গেল, মুখে আঁধার পড়াতে চিনিবার উপায় নাই, বোধ হয় অপরিচিত, ইহার জন্ম এত মাথা ব্যথাই বা কেন? সরস্বতীর কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয় সেকথা মানিল না, সে আলোর দিকে গিয়া একটু শব্দ করিল, বন্দী চকিতের ন্যায় মুখ ফিরাইল। সরস্বতী চমকিয়া উঠিল, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! দেখিল বন্দী স্বয়ং "কুমার দামোদর।"

শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ।

অপরের দ্রব্য।

সূর্য্যের কিরণ নিয়া চন্দ্রের বিভব।
হরির করুণা নিয়া ভক্তের গৌরব॥
দরিদ্রের অর্থ নিয়া ধনীর গরিমা।
একের জিনিষ নিয়া অন্যের মহিমা॥

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

গৃহ-লক্ষ্মী।

হাসি মুখে সদা বুকে প্রীতি লয়ে
গৃহ আলো করি রহে।
সুখ, দুঃখ, ধন, মান অপমান
কিছুই সে নাহি চাহে।
আবগুণ্ঠা থেকে আপনার মনে
আপনার কাজ করে।
জানেনা কখন ক্রোধ কারে বলে
সাধ্বী বাঙ্গালীর ঘরে।
ছিন্ন মলিন বসনেতে ঢাকি'
আপনার দেহখানি,
তোষে অপরের মন সদা আহা
বরষি' মধুর বাণী।
মনে হয় যেন ছিন্ন বসন
উপরের আবরণ—
ভিতরে তাহার মনোহর বেশে
সজ্জিত আছে মন।
কভু প্রিয়া হয়ে স্বামীর সেবায়
পাত করে স্বীয় দেহ
ভগিনী সাজিয়া কভু আলো করে
রমণী পিতার গেহ।
তখন জননী দশভূজা যেন'
বক্ষে আপন ছেলে
দশদিকে যায় আপদ ঠেলিয়া
অসীম স্নেহের বলে।
আহারে বিহারে ত্যাগী শতগুণে
মানব তোমার চেয়ে
সেই—তবু তুমি দেবতা তাহার,
চরণ তলে সে শুয়ে!
সকলের সুখে সুখ মনে করে;
দুঃখ সকলের দুখে!
স্বার্থপরতা নাহি যায় লেশ
প্রীত সদা ত্যাগ-মুখে।
সেই বাঙ্গালীর গৃহের লক্ষ্মী
স্বরগের দান সেই।
ত্যাগে ও ধর্ম্মে ক্ষমা মহত্ত্বে
যাহার তুলনা নাই।
শান্তি যেথায় চির বিরাজিতা;
প্রেম যেথা ভাসমান।
শত আনন্দের শত বাহু যথা
যার বলে হয় ক্ষীণ।
চাহি না অর্থ, অপর সকল
দাও প্রভো এই বর
জনমে জনমে পাই যেন সদা
এমন মধুর ঘর।

শ্রীসুধীরেন্দ্র কুমার সান্যাল

আলোচনা, একবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৪ সাল।

বসন্ত-পঞ্চমী।

এস মাগো বীণাপাণি! কনক-কমল দামে,
এস মা সারদারাণী! এস মা গো বিশ্বরথে।
"বসন্ত-পঞ্চমী" আজি,—এস মা কমলেশ্বরি!
হৃদয়-পঙ্কজাসনে লইব তোমায় বরি'।
ফুটন্ত বাসন্তী মা গো,—শোভে চন্দ্র নীলাম্বরে,
এস মা বরদা দেবি! রাখি পদ পদ্ম'পরে।
রাতুল চরণে মোরা দিব ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
অবিদ্যা নাশিতে দেবি, দেখ গো নয়ন খুলি।
দীনের অপূর্ব্ব সাধ পূরাও মা বেদরাণী,
বাসনা এ হৃদি-মাঝে পূজিব ও পা-দুখানি।
সিত-শুভ্র আভরণে, এলায়ে কুন্তল-ভার,
শ্বেত রূপে উজলিয়া এস বঙ্গে পুনর্ব্বার।
মানস-বীণার তারে তোমার অমৃত-বাণী,
উঠুক ভরিয়া মাগো! মাতাইয়া হৃদিখানি।
ভকতি-কুসুমে গাঁথা, সরোজ-আসনে বসি,
বিলাও করুণা কণা!—হৃদয়-তিমির নাশি।

মা তোমার আগমনে—পঙ্কজ-লাবণ্য রাশি,
ফুটিয়াছে শত ধারে—কমলে চন্দ্রমা হাসি।
মা তুমি আসিবে বলে' এই হৃদি-সিংহাসন—
পাতিয়া রেখেছি যে গো—রাখ তায় শ্রীচরণ।
ফুটিয়া উঠুক মম এ হৃদয়-কোকনদ,
পরশিয়া আজি তব রাতুল-রাজীব-পদ।
মরম-মন্দার মাঝে এস মা সরোজরাণী,
বিতরি বিবিধ শান্তি—এস বিশ্ব-বিধায়িনী।
চন্দ্ররশ্মি-বিলেপিত ফুটন্ত-পঙ্কজ-দলে,
উজল কর মা বিশ্ব আশীষিয়া ভক্তদলে।
পূর্ণ ক'রে দাও হৃদি আবার স্বর্গীয় গানে,
নীরব চেতনা যেন কভু নাহি আসে প্রাণে।
পূজিয়া চরণ তব আজি পূত অশ্রুজলে,
সার্থক করিব নরজন্ম সেই পুণ্যফলে।
ধর মা গো সন্তানের ভক্তি-সিক্ত উপহার,
প্রেম-রত্ন কোথা পাব—ধর এই ফুলহার।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

অনাথ বালক।

দুর্গানারায়ণ বাবু যখন কর্ম্ম উপলক্ষে সপরিবারে সুদূর পশ্চিমে বাস করিতেছিলেন, তখন সেখান হইতে দেশে ফিরিবার সময় তাঁহার পত্নী রাজলক্ষ্মী একটী অনাথ, অভিভাবকশূন্য শিশুকে লইয়া আসিয়াছিলেন। এই বালকটীর প্রকৃত নাম লছমন প্রসাদ হইলেও তাঁহারা কিন্তু উহার ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মাখনলাল নামে অভিহিত করিতেন। উক্ত লছমনপ্রসাদ মাখনলাল নামেই বাঙ্গালায় পরিচিত হইয়াছিল। মাখনলাল যখন পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করে, তাহার দুই বৎসর পরে বা তাহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার মাতাপিতা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। সুতরাং উক্ত মাখনলালের লালনপালন করিবার কেহ ছিল না। এই সময় তাহার নিকটবর্ত্তী এক প্রতিবাসিনী এই শিশুটী আহার অভাবে মারা যাইবে বলিয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া আসেন। সেই সময়ে দুর্গানারায়ণ বাবু মাখনলালের জন্মস্থান হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত সীতাবাগ গ্রামে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় এই অনাথ শিশুটী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে ঐ সমস্ত কথা বলায়, তিনি ঐ শিশুটীকে বাটীতে আনিয়া লালনপালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৃহিণীর এইরূপ অভিলাষ, সুতরাং স্বামী তাহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করিতে আর কাল বিলম্ব করিলেন না; বরং প্রার্থনা অনতিবিলম্বে পূর্ণ হইল। একদিন মধ্যাহ্নে সকলের আহারের পর রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী বাটীস্থ ঝি শ্যামলীকে সেই গ্রামে পাঠাইলেন। গ্রামটী তাঁহাদের বাসস্থান হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কর্ত্তা দুর্গানারায়ণ বাবু লছমন প্রসাদকে লইয়া আসিবার কথা তাহার বর্ত্তমান অভিভাবক বা আশ্রয়দাতাকে পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন। সুতরাং এখন ঝি শ্যামলী কর্ত্তার লিখিত পত্র লইয়া গেল এবং সেই অনাথ শিশুটীকে লইয়া আসিল।

রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর কোন পুত্রকন্যা ছিল না, সুতরাং তিনি এই শিশুটীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ এবং মমতা ছিল, তাহা যেন তাহার অজ্ঞাতসারে এই শিশুটীই সমস্ত অধিকার করিয়া লইল। ক্রমে শিশুটী বড় হইতে লাগিল। এখন সেই শিশুটী আর আধ আধ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে না, বাঙ্গালীর মত খাঁটী বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছে। সম্ভবতঃ আর কেহ বুঝিতে পারুন আর না পারুন, দুর্গানারায়ণবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, এ বালকটীকে কেহই হিন্দুস্থানী বলিয়া জানিতে পারিবে না, অধিকন্তু তাহার পুত্র বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে, কারণ তাহার আকৃতিরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যাহা হউক, সত্য সত্যই যখন তাঁহারা পশ্চিম হইতে সেই বালকটীকে লইয়া স্বদেশে আগমন করিলেন, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। ক্রমে মাখনলাল যখন চতুর্দ্দশ বর্ষে উপনীত হইল, তাহার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরেচ্ছায় দুর্গানারায়ণ বাবুর একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

বিধাতার আশীষ-কুসুম স্বরূপ এই পুত্রটীকে পাইয়া রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু তথাপি একদিনের জন্যও মাখনলালের প্রতি তাহার একটুও স্নেহের হ্রাস হইল না; বরং নিজ পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। মাখনলাল আসিবার পর হইতে তাঁহাদের সংসারে অনেক উন্নতি দেখা গিয়াছিল, সেই কারণে দুর্গানারায়ণ বাবু ও রাজলক্ষ্মী তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। মাখনলাল শিশুকাল হইতেই দুর্গানারায়ণ বাবুর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায় রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে "মা" এবং দুর্গানারায়ণ বাবুকে "বাবুজী" বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার নব কুমারের নাম রাখিলেন—অমিয়কুমার।

অমিয়কুমার মাখনলালকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিত, এবং সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই জানিত। যদিও কিছুকাল পরে পিতার মুখে মাখনলালের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি পিতামাতার গুণে মাখন দাদার প্রতি অমিয়কুমারের ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহারা এক বৃন্তে দুইটী পুষ্পের ন্যায় পরস্পর শোভা পাইতে লাগিল।

• • • • •

দুর্গানারায়ণ বাবু ক্রমে অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিলেন এবং প্রবাস ত্যাগ পূর্ব্বক পেন্‌সন্ লইয়া দেশে ফিরিলেন, আশা, জীবনের শেষ কয়টা দিন এইখানেই কাটাইয়া দিবেন, শীঘ্রই পেন্‌সন্ মঞ্জুর হইল। দুর্গানারায়ণ বাবু ও মাখনলাল এবং অমিয়কুমারকে লইয়া বাটী আসিলেন। পাড়াপড়শী সকলেই দুর্গানারায়ণ বাবুর ছেলে দেখিতে আসিল, এবং দুটিকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। দুর্গানারায়ণ বাবু মাখনলাল ও অমিয়কুমারকে স্থানীয় রামনগর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক দিন এইরূপে আনন্দে কাটাইয়া দিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনয় হইবার সূত্রপাত হওয়ায়, তিনি মাখনলালকে আর বেশীদূর পড়াইবার আবশ্যক নাই বুঝিয়া তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া তিনি অমিয়কুমারের ভার তাহার উপর দিলেন, এবং যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যতে কোন কষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত অর্থাদি মাখনলালকে বুঝাইয়া তাহার রক্ষার সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ক্রমে দুর্গানারায়ণ বাবুর দিন ফুরাইয়া আসিল। তিনি একদিন হঠাৎ অমিয়কুমারকে ডাকিয়া মাখনলালের হাতে সঁপিয়া দিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। মাখনলাল এখন অকূল সমুদ্রে পড়িল। কারণ তাহার সাংসারিক বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কিন্তু দুর্গানারায়ণ বাবু নগদ অর্থ এবং ভূসম্পত্তি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাতে তাহার সংসার-চিন্তার কোন কারণ ছিল না; তবে মাখনলাল তো ছেলে মানুষ! সে সংসারের বিষয় কি জানে? ইহা ভিন্ন সে দুর্গানারায়ণ বাবুকে তাহার "পিতা" এবং রাজলক্ষ্মী দেবীকে তাহার "মাতা" বলিয়াই জানিত। এ সংসারে তাহারা ভিন্ন হতভাগা মাখনের আর কে আছে!

অমিয়কুমারের শিক্ষার এবং সংসারের সমস্ত কার্য্যাদির তত্ত্বাবধানের ভার এখন মাখনলালের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং মাখনলাল উপস্থিত শোকে অধীর না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইল। অমিয়কুমার স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। নিকটে কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুল ছিল না। আর তখন প্রত্যেক জেলায়, এবং মহকুমায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ভিন্ন আজকালকার ন্যায় প্রায় গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হয় নাই। মাখনলাল উচ্চশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। সুতরাং অযথা কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই অমিয়কুমারকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিল, এবং তাহার থাকিবার সমস্ত স্থির করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বাটী আসিবার জন্য রওনা হইল।

(২)

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ধরাতল অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। দুর্গানারায়ণ বাবুর সম্মুখস্থ উদ্যানের নানাজাতীয় পুষ্প-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। দুর্গানারায়ণ বাবু কলিকাতা হইতে "হেনা" "গ্রাণ্ডিফ্লোরা" এবং চম্পক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃক্ষ আনিয়া যত্নে রোপণ করতঃ এই মনোহর পুষ্পোদ্যানটি রচনা করিয়াছিলেন। আজ পূর্ণিমা রজনীতে সুধাংশুর স্নিগ্ধ ঘনায়মান কিরণ সম্পাতে এই পুষ্পোদ্যানটির শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী এই সময়ে উদ্যানের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। চন্দ্রের আলোকে, উদ্যানের শোভায়, এবং পুষ্পের সুবাসে তাঁহাকে অতীত স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর। রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী নানারূপ চিন্তাভারক্লিষ্টা হইয়া বিল্ববৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। প্রায় পাঁচ দিবস হইল স্নেহের পুত্র অমিয়কুমার মাখনলালের সহিত অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় গিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পান নাই; ইহাই তাঁহার বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তিনি কখনও একাকিনী নির্জ্জনে এই বাটীতে বাস করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, সেই জন্যই যেন তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তিনি সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইলেন। নিশীথিনী রাজলক্ষ্মীকে দারুণ উদ্বেগ-সাগরে রাখিয়া যথাসময়ে স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপনান্তে প্রস্থান করিল। অতি প্রত্যুষেই মাখনলাল বাটী পৌঁছিল, এবং তাহার প্রমুখাৎ শ্রীমান্ অমিয়কুমারের কুশলবার্ত্তা শ্রবণে মাতা উপস্থিত চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাখনলাল সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, এবং অতি যত্নে সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় বৎসরাধিক কাটিল।

সময়ে সময়ে অমিয়কুমার ছুটিতে বাটী আসে, এবং ছুটীর অবসানে আবার কলিকাতায় চলিয়া যায়। এইরূপে অমিয়কুমারের পড়াশুনা বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু দেখিলে বোধ হয় অমিয়কুমার এখন আর সে অমিয়কুমার নহে। মানব শিশুর সরল স্বচ্ছ ভদ্রতা, এবং সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ

করিতে চেষ্টা করে, এবং রুচিও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অমিয়কুমার বাটী আসিলে মাখনের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তাহার নীরব জীবনটি অমিয়'র সাহচর্য্যে প্রফুল্লতর হইয়া উঠিত! অমিয় যখন বাটী আসিত, প্রতিবারই কলিকাতা হইতে নানারূপ উৎকৃষ্ট সুগন্ধ দ্রব্যাদি লইয়া আসিত। বিশেষ মাখন দাদা সুগন্ধ তৈল, এবং আতর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ভালবাসিত, সেজন্য প্রতিবার ঐ সকল দ্রব্যাদি আনিতে কখনও ভুলিত না। অমিয়কুমার যথা-সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সকলেরই আনন্দ আর ধরিল না! আর মাখনলালের কি আনন্দ! শ্রীমান্ অমিয়-কুমার এককালে আরও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই বংশ উজ্জ্বল করিবে, ইহাই তাহার মনে মনে স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু বিধাতা কি নির্ম্মম! কি নির্দ্দয়! এইরূপে যাহাকে একটু সুখের আশা দিতেছেন, তৎপরেই আবার তাহাকে কঠোর দুঃখের শেলাঘাতে মর্ম্মাহত করিতেছেন। কোথায় পুত্র অমিয়কুমার শিক্ষিত হইয়া এক সময়ে তাহার মাতার দুঃখ দূর করিবে, এবং সৎপুত্রের মাতা বলিয়া তিনি গর্ব্ব অনুভব করিবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া হায়! একি হইল! বিধাতা যে সাধে বাদ সাধিলেন! হঠাৎ অমিয়কুমারের এক বন্ধু কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম করিলেন— "Come sharp, Amiya seriously ill"— মাখনলাল অমিয়দের বাটীতে টেলিগ্রাম পাইয়াই খুলিয়া পড়ে আদ্যোপান্ত খানখানি পড়িয়া দেখিল এবং অমিয়র সংশয়াপন্ন অবস্থা ভাবিয়া বালকের মত একবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু বাটীতে বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? যাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হয়, তজ্জন্য সত্বর নিজেই কলিকাতা যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। সেই দিনই মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বেই মাখনলাল কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। কিন্তু সে কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে একটী বন্ধুর নিকট শ্রীমান্ অমিয়কুমারের অকস্মাৎ কলেরায় মৃত্যুর কথা শুনিয়া বজ্রা-হতের ন্যায় ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। হায়! হায়! কি হইল? আজ কি বলিয়া মাতা রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে এই নিদারুণ বার্ত্তা জানাইবে, আর তিনি একথা শুনিয়া হয়ত বাঁচিবেন না, এইরূপ ভাবিয়া মাখন অবিরল-ধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহার সেই এক এক বিন্দু অশ্রু যেন কত স্নেহ, কত ভালবাসা, কত বন্ধুত্বের পরিচয় দিতেছিল।

যাহা হউক মাখনলাল এখন কি করিবে, তাহা ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিলে বা কাঁদিলে তো তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না, এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া বাটী ফিরিল। কোন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও, উহা অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এস্থলেও তাহাই হইয়াছিল। রাজ-লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া উন্মত্ত এবং শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, এক্ষণে মাখনলালকে দেখিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মাখনলাল কাঁদিতে কাঁদিতে

মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "মা, আর এ জাদাহাটে থাক্‌বো না, চল, সেই নিত্যানন্দ-পুরী বারাণসীধামে গিয়া বাস করিগে।"

দুই চারি দিন মধ্যেই রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী মাখনলালকে সঙ্গে করিয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। দুঃখিনী বিধবা রাজলক্ষ্মী ঠাকুরাণী শোকে দুঃখে শেষ বয়সটা মণিকর্ণিকার তীরে কাটাইতে লাগিলেন। মাখনলাল এখন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, আর মনের আবেগে সন্ধ্যার সময় মণিমর্ণিকার তীরে বসিয়া তন্ময় হইয়া গাহে,—

"অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা
আমি কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
আমার যা ছিল সকলি গেছে,
মিছে শুধু ঘুরে মরি।"

রাজলক্ষ্মী মাখনলালের পার্শ্বে বসিয়া নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, হইয়া গীত শ্রবণ করিতেন। এক এক সময় নিজের মনে সেই দারুণ শোক জাগিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ সে স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পুত্রশোক মুছিয়া ফেলিবার জিনিষ নহে। তথাপি সেইক্ষণে মনে মনে বলিতেন,—

"কর বিতাড়িত এ হৃদয় হ'তে
তাহার মূরতি খানি।
যদিও জীবনে ভুলিতে তাহারে
পারি না ধ্রুব জানি॥

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইত, সেকি! আমার প্রাণপ্রিয়তম পুত্র অমিয়কুমারকে আমি কেমন করিয়া ভুলিব? তাহার সেই মূর্ত্তিখানি এখনও যে আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সে যে হৃদয়ের পঞ্জর সম
সে যে গো মাথার মণি
দুদিনের তরে ভুলায়ে মোদের,
ত্যজেছে সে তনু খানি॥
দুদিনের তরে আসিয়ে সে যে
গেল চিরতরে (মোদের) কাঁদায়ে।
সে যে আর আসিবে না, আর ফিরিবে না,
আর না পড়িবে চরণে লুটায়ে॥

মাখনলাল মাতা রাজলক্ষ্মীকে সর্ব্বদাই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইত না, তখন বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া বলিত—

হায় বিধাতঃ! এই কি বিচার।
দানি, যে রত্ন লইলে আবার।
হইলে কি ধন্য নিকটে সবার
হরিয়া সে রত্ন হইতে মোদের?

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

কুমার দামোদর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেবীর দেখা।

সরস্বতী কুমার দামোদরকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কুমারের এ অবস্থা কেন? আর বিলম্বের সময় নাই, অতএব কুমার কে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কুমারও সরস্বতীকে দেখিয়া অবাক হইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার বদনে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি [illegible]

সরস্বতীর অনুসরণ করিলেন। সরস্বতী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, কুমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অন্ধকারে যাইতে যাইতে উভয়ে এক দ্বারের নিকট গেলেন, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। তখন সরস্বতী কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। ভিতর হইতে দরজা টানিল, খুলিল না। কি প্রকারে বাহির হইবে বুঝিতে পারিল না। সরস্বতী ধীরে ধীরে বলিল,—"কি উপায় হবে? দ্বার বন্ধ। এই স্থানেই কি আমাদের শেষ?" কুমার দামোদর বলিলেন,—"তুমি কোথায় ছিলে? কেমন ক'রে এলে?" সরস্বতী বলিল,—"সে অনেক কথা, এখানে তা বলা যাবে না। এখন উপায় কি?" কুমারও চিন্তিত হইলেন। হঠাৎ লোকের পদশব্দ শুনা গেল, উভয়ের ভয় হইল। কুমার সরস্বতীকে লইয়া এক কোণে লুকাইলেন, দুটি লোক ধীরে ধীরে ঐ স্থান দিয়া চলিয়া গেল। কুমার আবার বাহির হইলেন। সঙ্গে কোন অস্ত্র নাই, যদি কেহ আক্রমণ করে, আত্মরক্ষার অবলম্বন কি? সরস্বতী তাহার ক্ষুদ্র ছুরিকাখানি কুমারের হস্তে দিল, তাহাতে অনেক সাহস বৃদ্ধি হইল। এই স্থান কোথায়? কে আনিল? কেন উহাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে, সরস্বতীই বা কোথা হইতে আসিল; সেও কি বন্দিনী? এই সব প্রশ্ন কুমারের হৃদয়ে উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার মীমাংসা করে কে? কুমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, নানা স্থান ঘুরিয়া আবার দ্বারের নিকট আসিলেন। দ্বার ভাঙ্গা সুকঠিন, অতি দৃঢ় অথচ বেশী শব্দ হইলে সকলে টের পাইবে। কুমার বলিলেন,—"বাহির হওয়ার উপায় নাই, চল আবার কক্ষে গিয়া বন্দী হয়ে থাকি।" সরস্বতীর মন বুঝিবার জন্য এই কথা কুমার বলিলেন। সরস্বতী সগর্ব্বে বলিল,—"তা হবে না, আমি যাবোই, ইহাতে প্রাণপণ। বিশেষতঃ আপনাকে এ কষ্টে রাখা যায় না। আমার নিজের প্রাণের জন্য মমতা নাই, কিন্তু আপনার প্রাণ মূল্যবান, এ প্রাণ রক্ষা করা চাই।" সরস্বতী দ্বারে করাঘাত করিল, কেহই উত্তর করিল না। চারিদিকে কোলাহল ও আলো—কত লোক যাতায়াত করিতেছে বোধ হইল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কুমার দেখিলেন—বিপদ অবশ্যম্ভাবী, তিনি সরস্বতীকে এক পার্শ্বে রাখিয়া দাঁড়াইলেন। কত লোক আলো লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কুমার বুঝিলেন ইহারা হয় সরস্বতীর না হয় তাঁহার পলায়নের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছে, তাই অন্বেষণ চলিতেছে। কুমার সরস্বতীর জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন। তিনি সরস্বতীর হস্ত ধারণ করিয়া অন্ধকার রাস্তা দিয়া চলিলেন, সরস্বতীর তখন মনে হইল এসুখ যেন চিরকাল থাকে, যদি এ সময়ে মৃত্যুও হয়, তথাপি তাহার দুঃখ নাই। সরস্বতী কুমারকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে—সে ভালবাসা স্বার্থশূন্য—সে ভালবাসা স্বর্গীয়। সে কুমারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আজ এ বিপদেও সে প্রফুল্লচিত্ত।

যে ঘরে কুমার ও সরস্বতী আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে ঘরের উত্তর দিকে একটি দ্বার, সে

ঘরে করাঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল, উভয়ে সেই দ্বার দিয়া বাহির হইলেন। তাঁহারা অতি দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের পদশব্দ পশ্চাত পশ্চাত শুনা যাইতে লাগিল। কুমার বলিলেন,—সরস্বতী আবার ধরা পড়বে, আবার বন্দিনী হবে। আমি ধরা পড়ার পূর্ব্বে একবার শেষ যুদ্ধ করে নিব। আমার প্রাণের মমতা নাই, এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সরস্বতী, এইবার তোমার কাছে শেষ বিদায় লইব। তুমি চিরকাল আমাকে ভ্রাতৃভাবে দেখেছ, আমিও তোমাকে ভগিনীর ন্যায় দেখেছি, এক সঙ্গে ভ্রাতা ভগিনী বিপদে ঝাঁপ দি। দুই জনে সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। একটি উচ্চ প্রাচীর দেখা গেল। কুমার তাহাতে উঠিলেন, সরস্বতীকে বলিলেন,—"এস ভগিনি, আমার বস্ত্র ফেলে দিচ্চি, শক্ত ক'রে ধর, তোমাকে ধরে তুলি।" সরস্বতী বস্ত্রখণ্ড ধরিল, কুমার দামোদর তাহাকে অনায়াসেই টানিয়া উচ্চ প্রাচীরের উপর উঠাইলেন। অপর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন ভয়ানক গর্ত্ত—জলে পরিপূর্ণ। নিজে তথায় লম্ফ দিয়া নামিতে পারিবেন, কিন্তু সরস্বতী কেমন করিয়া নামিবে? কুমারের চিন্তা হইল। তিনি সরস্বতীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ভয় হচ্চে কি? এখন উপায়?" সরস্বতী বলিল,—"ভয় কাকে বলে জানি না। চলুন ঝাঁপ দি।" তখন দেখিলেন একটি আলোক গর্ত্তের নিকট—মা তথায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তিনি বলিলেন,—"কুমার আর প্রাণনষ্ট করার প্রয়োজন নাই। যদি ঝাঁপ দেও, উঠবে না, এই গর্ত্তে নানারূপ বিষাক্ত জিনিষ আছে। তোমার জীবন অমূল্য, আমি যখন তোমার মা, তোমার আবার ভাবনা কি? তোমরা দুজনে প্রাচীরের উপর দিয়া দক্ষিণ দিকে যাও, সেখানে সিঁড়ি পাবে, নেমে এস। উহারা তখন নির্ভয়ে সেই দিকে গেলেন, দেখিলেন একটি সিঁড়ি তথায় আছে, কিন্তু প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। মা বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, নেমে এস।" কুমার নির্ভয়ে নামিতে লাগিলেন। সরস্বতীও সঙ্গে সঙ্গে নামিল। প্রহরী কোন কথা বলিল না। মা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। কুমার আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মা বলিলেন,—"এস বৎস, আর ভয় নাই; কেহ কিছু বলবে না। আমার সঙ্গে এস।" উভয়ে মায়ের সঙ্গে চলিল। কতক দূর গিয়া বলিলেন,—"বাবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই হবে। এ দস্যুর দল মাধবের বিরোধী, নিশ্চয়ই মাধব শাস্তি দিবেন।" তারপর সরস্বতীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, সরস্বতী মনে করিল তিনি অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছেন; বড়ই লজ্জিত হইল। মা বলিলেন,—"সরস্বতী তুমি সাবধানে চলো। তোমাকে এক উপদেশ দিচ্ছি—মাধবের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর; শান্তি পাবে; নচেৎ অশান্তিতে তোমার জীবন অতিবাহিত হবে। এ পৃথিবীতে শান্তি ও অশান্তি দুটি ফল, কর্ম্মের উপাদে এ দুটির সৃষ্টি। নিজের মনকে নিজে আয়ত্ত রাখতে হয়, পরাধীন কিছুতেই হবে না। দয়াময়ের অসীম দয়া, তিনি দয়া করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তুমি আমার সঙ্গে চল;

শান্তি পাবে, এখানে তোমার শান্তি নাই।" সরস্বতী কিছু বলিল না, মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। মা হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার এখনও বাসনা যায় নাই, তবে নিশ্চয়ই জান্‌বে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে না। এক দিন আমার নিকট আসিয়া কাঁদতে হবে। যাও, আরও কিছু দিন তোমার ভোগ আছে। কুমারকে বলিলেন,—"সত্বর রাজধানী যাও, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, তোমার বীরধর্ম্ম পালন কর। পাপীর শাস্তি বিধান কর, আবার আমার দেখা পাবে।" ইহার পর আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দস্যু ও মন্ত্রী।

বেলাবসান সময়ে এক জন পথিক নীরবে নদীর তীর দিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে বন, ক্ষুদ্র একটি রাস্তা নদীর ধার দিয়া গিয়াছে,সেই রাস্তা অবলম্বনে পথিক নির্ভয়ে যাইতেছে। একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল সূর্য্য অস্তাচলগামী, পথিক তখন দ্রুতবেগে চলিল। রাস্তায় ব্যাঘ্রের ভয়, সর্পও মধ্যে মধ্যে পড়িয়া থাকে, পথিক সে সব গ্রাহ্য না করিয়া চলিতেছে। একস্থানে কতকগুলি বৃক্ষের সমাবেশে স্থানটি অন্ধকার হইয়াছে, সূর্য্যালোক তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। সেইখানে পথিক কি সঙ্কেত করিল, সে শব্দের অনুরূপ শব্দ অদূরে হইল, দেখিতে দেখিতে আর একটী লোক বৃক্ষের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। পথিক বলিল,—"শাহ", সে ব্যক্তি বলিল,—"জাদু", তখন উভয়ে মুখামুখী হইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইল। এক ব্যক্তি বলিল,—"আপনি এসেছেন ভালই, আমি আপনার আদেশ মত এতদূর এলেম।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"এলে কি হবে? তুমি ত কৃতকার্য্য হতে পার্‌লে না? এত টাকা তোমাকে দিলেম, আরও পুরস্কার দিব অঙ্গীকার করিলাম, সেই সামান্য কাজটা আর সাধন কর্‌তে পার্‌লে না? তুমি ইচ্ছা কর্‌লে সব কর্‌তে পার,আমার বিশ্বাস,তুমি বিশেষ চেষ্টা কর না, অথবা অপর পক্ষে অধিক টাকা খেয়েছ।" প্রথম ব্যক্তি একটু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল,—"চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। আপনার উপদেশানুসারে আমি তাঁকে বন্দী করেছিলেম,এমন কি আমার দুই তিনটি লোক তাহাতে মৃত ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, ভয়ানক ক্ষতি। অনেক দিন থেকে সুযোগ খুঁজছিলেম হঠাৎ একদিন জান্‌তে পার্‌লেম তিনি মাঠ পার হ'য়ে যাচ্ছেন, অমনি আমার লোক ও আমি তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলাম। তিনি বীর-পুরুষ, তাঁকে আটক কর্‌তে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে ও অনেক ক্ষতিস্বীকার করিয়া অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করা গেল, মৃত্তিকায় নিয়ে সেই বাড়ীতে রাখা হইল,তারপর তিনি কোথায় পলায়ন কর্‌লেন।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"পলায়ন কর্‌লে কেমন করে? উপযুক্ত প্রহরী ছিল না? ইহাতে তোমার অসতর্কতা বুঝা যায়।" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না, অসতর্কতা কিছুই নয়। যাঁহার কৃপায় তিনি মুক্তি পেলেন, আমরা সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করি, তিনি আমাদের সকলের

না। আমার দলের কেহই তার বিপক্ষতাচরণ করতে সাহসী হইবে না বা ইচ্ছা করবে না। অর্থ লোভই বলুন, আর ভয় দেখানই বলুন, কিছুতেই আমরা সেই আরাধ্যা মাতার বিরুদ্ধে যাব না। তাঁরই কৃপায় কুমার মুক্তি পেয়ে গেলেন।" পুরন্দর শাহ শুনিয়া অবাক হইলেন, মনে মনে বলিলেন—"এ স্ত্রীলোকটি আবার কে? সকলে তাঁকে 'মা' বলে কেন?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দেখ এবার যুদ্ধ বাঁধিবে, এই যুদ্ধেই কর্ম্ম শেষ হবে. আর কিছু করতে হবে না। কিন্তু তোমার উপর আমার বিশ্বাস আর নাই। তোমরা অর্থ পেয়ে কুমারকে ছেড়ে দিয়েছ। আমি সব খবর জানি।" দস্যু সর্দ্দার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আপনি আপনার অর্থ ফেরত লউন, আমরা কেহই মায়ের বিরুদ্ধে যেতে পারবো না।" পুরন্দর শাহ বলিলেন,—"মা কে?" দস্যু সর্দ্দার বলিল,—"তিনি কে জানি না. কখনও কখনও তাঁর দেখা পাই. আমরাও পবিত্র হই। দয়াময়ীর অসীম দয়া। আমরা দস্যু, তথাপি আমাদিগকে পদাশ্রয় দেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা, তিনি সব জানেন. সব করতে পারেন।" পুরন্দর শাহ অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি অর্থ ফেরত চাই না, আমার যদি দরকার হয় তোমাকে জানাবো।" এই বলিয়া তিনি বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমর।

তিস্তা নদীর ধারে দুই পক্ষ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান। রাজা ধর্ম্মপাল বহু সংখ্যক সৈন্য আনিয়াছেন, অপর পক্ষে রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাণী ময়নামতী স্বয়ং, কুমার দামোদর ও গোপীচাঁদ। রাজা হরিশ্চন্দ্র জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিতে আসিয়াছেন। রাণী ময়নামতী রণরঙ্গিনী বেশে হস্তীর উপর আসিয়াছেন। তিনি নির্ভয়. আজ হয় পুত্রের রাজ্য উদ্ধার করবেন, নতুবা সমর প্রাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করবেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ভবসাধন রায় রাজা ধর্ম্মপালকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা যখন মন্ত্রীর উপদেশ শুনিলেন না তখন মন্ত্রী বলিলেন,—"মরণ কালে বিপরীত বুদ্ধি।" রাজা ধর্ম্মপাল বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজেই সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে আসিলেন। প্রাতঃকালে সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, প্রান্তরের উভয় পার্শ্বে দুই দলেই ছাউনী করিয়াছে। রাণী দুর্গাবতী বলিলেন,—রাজা ছেড়ে দেও, অধর্ম্মাচরণ করো না, তোমার নিজের রাজ্য নিয়ে তুমি সুখে থাক। আর যদি না শুন, ফল ভাল হবে না। ধর্ম্ম সব দেখছেন। আজও চন্দ্র-সূর্য্য উদয় হচ্ছে, আজও ভগবান সব বিচার কচ্ছেন। আমার কথা শুন, নিজের সম্পত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাক?" রাজা আজ রাগ করিলেন না, হাসিয়া উত্তর

করিলেন,—"আমি তোমাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত কর্‌বো, আর অন্য পণ্ডিতের উপদেশ শুন্‌ব না।" রাজার এইরূপ বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া রাণী অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানকে ডাকিলেন, ভগবান তাহা শুনিলেন কিনা কে জানে। ধর্ম্মপালের উপর প্রজারা অসন্তুষ্ট, সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট, সভাসদেরা অসন্তুষ্ট, অতএব অনিচ্ছার সহিত সকলে যুদ্ধে নামিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর উদিত হইলে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং বাহিনী চালাইতে লাগিলেন, কুমার দামোদর দক্ষিণ ভাগে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। রাণী ময়নামতী হস্তী আরোহণে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিলেন। কুমার গোপীচাঁদ বাম ভাগ আক্রমণ করিলেন। রাজা ধর্ম্মপালও বীর পুরুষ, অসি হস্তে বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অনেক সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তিনি দেখিলেন ধর্ম্মপালের সৈন্যের নিকট তাঁহার সৈন্য দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই সব শিক্ষিত সৈন্য ধর্ম্মপাল অন্য স্থান হইতে আমদানী করিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সূর্য্যতাপে সকলেই ম্লান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, পিপাসার্ত্ত। তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেছে না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সৈন্য হটিয়া আসিতেছিল। ধর্ম্মপালের বীরত্বের নিকট কেহই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। কুমার দামোদর অমিতবিক্রমে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিয়া তাহাদের সৈন্যের এক ভাগ হটাইয়া লইয়া চলিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র মনে মনে ভাগিনেয়কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে একটি বর্শা তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সে বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, বর্শাগ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল এবং তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা ধর্ম্মপাল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক জন অশ্বারোহীর জিম্মা করিয়া দিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর হইল না, কেবল বিপক্ষ সৈন্যকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। এই সময়ে "জয় রাণী মায়ের জয়" বলিয়া সৈন্যগণ উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। সকলে দেখিল—অসি হস্তে স্বয়ং রাণী ময়নামতী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা। কুমার দামোদর ও গোপীচাঁদ দুই ভাগ পরাজয় করিয়া রাণীর সঙ্গে যোগদান করিলেন। রাণী অসি ও বর্শা হস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অবাক হইয়া এদৃশ্য দেখিতে লাগিল। রাজা ধর্ম্মপাল অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, নিকটবর্ত্তী বিপক্ষ সৈনিকের অসির আঘাতে ভূপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাজা ধর্ম্মপালের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। অস্ত্র রাণী ময়নামতী জয়ী হইয়া পুত্রকে হস্তীপৃষ্ঠে লইয়া রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। কুমার দামোদর মাতুলের

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন তাঁহার জীবনের আশা নাই। কুমার দামোদর বাষ্পাকুল লোচনে বলিলেন,—"আপনি পিতৃ-তুল্য, আপনি অন্নদাতা, ভগবান করুন আপনি আরোগ্যলাভ করুন। রাজা ধর্ম্মপাল নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে স্বর্গে গিয়াছেন।" রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি ভাগিনেয়ের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমার আর জীবনের আশা নাই। আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি, রাজ্যে গিয়া সুখ-শান্তিতে রাজত্ব কর। আমার কন্যাদ্বয়কে ও গোপীচাঁদকে আশীর্ব্বাদ জানাবে। আমি বেশী কথা বল্‌তে পাচ্ছি না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও। তুমি সাবধানে চল্‌বে, সতত ধর্ম্মে মতি গতি রাখ্‌বে। তোমার মাকে আমার জন্য শোক কর্‌তে বারণ কর্‌বে, আমি স্বর্গে চল্‌লেম। তোমরাও একদিন তথায় আসিবে, তখন আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" রাজা হরিশ্চন্দ্র আর কথা বলিতে পারিলেন না, প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কুমার কাঁদিয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন। এই সময় অন্তরাল হইতে কে বলিল—"কুমার, কাঁদছো কেন? সকলেরই ত এই পরিণাম। সকলকেই যে যেতে হবে।" কুমার দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমার সঙ্গে এস, শোক তাপ ভুলে যাবে।" কুমার সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

বিড়ম্বনা।

তৃষিত পরাণে চারিদিক পানে
ঘুরিয়া হ'লাম সারা;
লোকালয়-পথে ছুটিয়া ধাইতে
হইনু গো পথহারা!
যার কাছে যাই বিলাইতে মোর
এ দগ্ধ পরাণ খানি,
দেয় গো ফিরায়ে কঠিন হইয়ে
আমায় অভাগা জানি।
কতই লাঞ্ছনা সহিয়া সহিয়া
ঘুরি সদা প্রতি দ্বারে;
কে নেবে স'পিতে এ দগ্ধ পরাণ
মায়ের চরণ 'পরে?
কত শত আশা সদাই ভাসিছে
এ' বিশ্ব-মরুর মাঝে;
পরাণ-আবেগে ছুটিয়া ধাই রে,
শ্রম করা হয় মিছে।
ইহ জগতের প্রতিদান সম,
বলিল গো একজনা,
এস না এদিকে ফিরে যাও ওগো
এ যে সব "বিড়ম্বনা"।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

ধর্ম্ম-সাধন।

আত্মাতে সকল গুণের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, আত্মা সকল গুণবীজের কোষ-স্বরূপ। এই কোষস্থ বীজ সমূহের বপন করিতে হইলে ক্ষেত্রের আবশ্যক। সুতরাং আমরা যেরূপ ক্ষেত্র পাইয়াছি।

এই ক্ষেত্রে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়, ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। বীজস্থ শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ এই দেহে ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেহ যন্ত্র-সমষ্টি মাত্র। ডাল ভাত খাইয়া এই দেহ গঠিত হইয়াছে। আত্মা, ডাল ভাত প্রভৃতি ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করাইয়া দেহের গঠন ও বর্দ্ধন করান। অর্থাৎ আত্মার এরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ভুক্ত পদার্থ রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাতে পরিণত হয়। এ ছাড়া, শরীরে কতকগুলি নাড়ি আছে। তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি হয় (sensory) কতকগুলি দ্বারা শক্তি সঞ্চালন ক্রিয়া হয় (motor) আর কতকগুলি দেহের পুষ্টিসাধন করে (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না)। যন্ত্রের অসম্পূর্ণতা থাকিলে শক্তির বিকাশ হয় না। যদি যন্ত্রগুলি অসম্পূর্ণ থাকে বা বিকল হয়, তবে আমরা তাহাদের পূর্ণায়তন করিবার চেষ্টা করি; অসম্পূর্ণতা বা বিকলতা যাহাতে ঘুচে, তদ্বিষয়ে আমরা যত্ন করি। আত্মাতে শক্তির প্রথম স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সেই স্ফুরণ অতি কোমল, মৃদু ও সূক্ষ্ম। যখন সেই শক্তি স্থূল শরীরে বিকাশ হয়, তখন অপরে তাহা দেখিতে পায়। শক্তির বিকাশ দুই প্রকারঃ—প্রথম, আভ্যন্তরিক বিকাশ; দ্বিতীয়, বাহ্য বিকাশ। প্রথম অবস্থাতে সূক্ষ্ম দেহে, দ্বিতীয় অবস্থাতে স্থূল দেহে বিকাশ হয়। প্রথম অবস্থাটা কেবল নিজের অনুভাব্য; দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশমান, অপরেরও দৃষ্টির বিষয়ীভূত। আত্মা সদাই হা, হা করিতেছে,—কি যেন অভাব! এ হা হা,—এ অভাব, যেন সহজে মিটে না। আত্মা ব্যাকুল, আত্মা অতৃপ্ত। আত্মার দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে; দেখিবার শক্তি আছে, সেই শক্তির ক্রিয়া হইবে বলিয়া যন্ত্র আছে। সে যন্ত্র চক্ষু। আত্মা চক্ষু দ্বারা বহিঃস্থ বিষয় দৃষ্টি করিতেছে; বাহ্য বস্তুর রূপ দেখিতেছে। আত্মার দর্শন-শক্তি আত্মাতেই ফুটিল; আবার সেই শক্তি, চক্ষু-যন্ত্র দ্বারা বাহিরে বিকাশ হইল। দর্শন-যন্ত্র না থাকিলে বা সেই যন্ত্র বিকল হইলে, আত্মার দর্শন-শক্তি আত্মাতেই ফুটিয়া, আত্মাতেই মিলাইয়া যায়, বাহিরে বিকাশ পায় না।

আত্মা শুনিবে, তাই শুনিবার যন্ত্র কর্ণ। আত্মা কর্ণ দ্বারা বাহিরের শব্দ শুনিতেছে। আত্মার শ্রবণশক্তি আত্মাতেই ফুটিল; আবার সেই শক্তি কর্ণ দ্বারা বাহিরে বিকাশ পাইল। শ্রবণ-যন্ত্র না থাকিলে বা বিকল হইলে, আত্মার শ্রবণশক্তি আত্মাতে ফুটিয়া আত্মাতেই লয় পাইত, বাহিরে বিকাশ পাইত না। সেইরূপ আত্মার ঘ্রাণশক্তি আছে; ঘ্রাণ-যন্ত্র নাসিকা দ্বারা আত্মা বাহিরের দ্রব্যের গন্ধ আঘ্রাণ করে। আত্মার ঘ্রাণশক্তি আত্মাতে ফুটিয়া নাসা দ্বারা বাহিরে বিকাশ পায়। নাসা না থাকিলে বা উহা বিকল হইলে, আত্মার ঘ্রাণশক্তি আত্মাতে স্ফুরণ হইয়া আত্মাতেই বিলীন হইয়া যাইত, বাহিরে ফুটিত না।

জিহ্বা ও ত্বক্ সম্বন্ধেও এই কথা। অর্থাৎ আত্মার রসাস্বাদনের ইচ্ছা হইলে জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন হয়; স্পর্শনের ইচ্ছা

হইলে ত্বক্‌ দ্বারা আত্মা স্পর্শানুভব করে। যদি জিহ্বা ও ত্বক্‌ না থাকিত বা বিকল হইত, তাহা হইলে রসাস্বাদন-শক্তি ও স্পর্শন-শক্তি অন্তরে ফুটিয়া অন্তরে মিলাইয়া যাইত, বাহিরে সে শক্তির বিকাশ হইত না।

নানা কারণে অনেক যন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অনেকগুলি বিকল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক শক্তির আদৌ বাহিরে বিকাশ হয় না। সকল লোকের সকল যন্ত্র নাই; কাহারও বা কোন যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের মধ্যে জ্ঞানের এত প্রভেদ; সকলের জ্ঞান সমান নহে, সকলের সকল শক্তির বিকাশ হয় না।

ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কি কি আবশ্যক? ধর্ম্মসাধনের জন্য এই পাঁচটী জিনিষ চাই:—

(১) ক্ষেত্রের সংস্কার, (২) আহার-বিচার, (৩) সদাচার, (৪) ইন্দ্রিয়নিয়োগ শিক্ষা, (৫) সংযম। এখন এক একটীর পৃথক বিচার করা যাউক।

(১) ক্ষেত্রসংস্কার—যেমন ক্ষেত্র অপরিষ্কার থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, ফসল হয় না, ক্ষেত্রজাত আগাছা-পরগাছা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক, জল-সেচন প্রয়োজন, সেইরূপ দেহের সংস্কার করা আবশ্যক। অন্নপ্রাসন, উপনয়ন, ও বিবাহ এই তিনটী প্রধান সংস্কার। আজকাল সংস্কার নামমাত্র আছে। কলিতে ইংরাজী শিক্ষার দোষে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, সকলই বিশৃঙ্খল।

(১) উপনয়নটী কি? উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জীবন লাভ করিবার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় জীবন কৈ হয়? যাহার উপনয়ন হয়, তাহার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিবে ও সে ব্যক্তি উন্নতিমার্গে গমন করিবে। এখন সে উন্নতি কৈ হয়? উপনয়নে স্বতন্ত্র, অভিনব, উন্নত জীব সৃষ্ট হইবার কথা। তা কৈ হয়? হইবার মধ্যে হয়—যজ্ঞসূত্র গলায়। তাহাও কেহ কেহ বড় হইয়া পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ নিজের দোষে আপন গৌরব ও পদ-মর্য্যাদা হারাইতেছেন।

(২) আহার-বিচার—এখন আহারের বড় একটা বিচার করা হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে শরীর পুষ্ট হয়; অপুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে শরীর ক্ষীণ হয়। শরীরের সহিত ধর্ম্মালোচনার নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা যায় না। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে খাদ্যাখাদ্যের বিচার হইয়া থাকে। যাহাদের প্রকৃতি সত্ত্ব-গুণ-প্রধান, তাহাদের সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা; যাহাদের প্রকৃতি রজোগুণ-প্রধান, তাহাদের পক্ষে রাজসিক আহারই প্রশস্ত; আর যাহারা তমোগুণে পরিপূর্ণ তাহারা কেবল তমোগুণ-বর্দ্ধক আহারে তৃপ্ত। যাহারা যে প্রকার দ্রব্য আহার করে, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ আহার্য্য দ্রব্যের গুণ প্রাপ্ত হয়। কাহারও প্রবৃত্তি মৎস্য, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, সালগম, গাজোরে; কাহারও প্রবৃত্তি রুটি, লুচি, মিঠাই, মণ্ডা, রসগোল্লাতে; কেহ বা ছানা চিনি, ফলমূল, দুগ্ধ আহার করিতে ভালবাসে।

আবার পর্য্যষিত আতপান্নে কাহারও পরিতোষের সীমা নাই। কেহ টাট্‌কা সামগ্রী খাইতে ভাল বাসেন; কাহারও বাসী ও পচাতে তৃপ্তি। মোট কথা, অখাদ্যটা না খাওয়াই ভাল; আহার বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া উচিত। অখাদ্যে কেবল তমোগুণ বৰ্দ্ধিত করে; সুতরাং অখাদ্য-ভোজন ধর্ম্ম-সাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ধরুন পঁ্যাজ,—ইহাতে গন্ধক আছে, তাই এটা এত দুর্গন্ধ। মলমূত্রে, নিশ্বাসবায়ুতে, ঘর্ম্মে এ দুর্গন্ধ থাকে। ইহা খাইলে তমোগুণ বৰ্দ্ধিত হয়, সত্বগুণের শক্তিকে প্রতিহত করে। তাই বলি যে খাদ্যে সত্বগুণ বাড়ায়, তাহাই খাওয়া বিধি; আর যাহাতে তমোগুণ বাড়ায়—তাহা পরিবর্জ্জনীয়।

(২) আচার সম্বন্ধে দেখিতেছি সব ব্যভিচার। ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট; তাহাদের দেখাদেখি অপর জাতিরাও আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ ও পবিত্র আচারে থাকিলে ধর্ম্মসাধনের সহায়তা হয়। অশুচি ও অপবিত্র হইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেই জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে,—কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইবে;—জল-শৌচের নিয়ম কি,—মৃত্তিকা-ব্যবহারের ব্যবস্থা কিরূপ। প্রস্রাবের পর অনেকেই জল লয় না! অন্য কিছু হউক আর না হউক অশুচি হইতে হয় ত—ময়লাটা শরীরে লাগে ত; ইহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্মের খাতিরে না হউক, স্বাস্থ্যের খাতিরেও ত পরিষ্কার থাকা উচিত।

(৩) ইন্দ্রিয়-নিয়োগের কথা—এ কথা সত্য যে, আমরা উঠিতে, বসিতে, চলিতে, জানি না। ইন্দ্রিয় আছে সত্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়া হইতেছে সত্য; কিন্তু কোন্ যন্ত্র কিরূপে কি ভাবে রাখিতে হয় বা ধরিতে হয়, তাহা কি আমরা জানি, না বুঝি? যন্ত্রগুলি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা সকলেই দর্শন-যন্ত্র ব্যবহার করি—দেখি সত্য; কিন্তু ঠিক দেখিতে জানে কয় জন? কেমন ভাবে চক্ষু রাখিলে দৃষ্টি করা হয়, বল দেখি ভাই! কাহারও বা সুদৃষ্টি, কাহারও বা কুদৃষ্টি। মনে কর, একটী পরমা-সুন্দরী রমণী আপন শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতেছেন। সেই রমণীকে অনেক ভাবে ত দেখা যাইতে পারে। তুমি কুদৃষ্টিতে তাঁহার পানে দৃষ্টি করিলে,—বক্র-দৃষ্টিতে দেখিলে, যেন রমণী তোমার ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্যা, এই ভাবে চক্ষু স্থাপন করিয়া অপাঙ্গবীক্ষণ করিলে। তোমার মনে পাপের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু যদি তুমি ইন্দ্রিয়-নিয়োগ শিক্ষা করিতে, যদি দর্শনযন্ত্র স্থাপন করিতে জানিতে, তাহা হইলে সেই রমণী-মূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যা এই অপবিত্র ভাবে দেখিতে না,—তোমার মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব উদয় হইত। তুমি পবিত্র চক্ষে দেখিতে—সেই রমণীর জগদ্ধাত্রী-ভাব, জগন্মাতা-ভাব;—দেখিতে, সেই আদ্যাশক্তিই বিশ্বপালন করিতেছেন। আহা, মরি মরি!!

(৫) সংযম—বাসনাকে যত সংযত করা যায়, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল। ইন্দ্রিয়গণ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে সুখের

প্রবাহে আমাদের বিবেক, বৈরাগ্য সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আবশ্যক। সংসারে থাকিলে ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যাঘাত ঘটে, একথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু কথাটা তত সারবান্ নহে। এ সংসার শিক্ষার স্থল। সংসারে থাকিয়া সংযম-শিক্ষা সুচারুরূপে হইতে পারে। আয়ের অনুরূপ ব্যয় করিতে হইবে, এ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই হয়। কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে হইবে, ইহা এই সংসারের শিক্ষা। দেখা যায়—যে ব্যক্তি যত্র আয় তত্র ব্যয় করে, তাহার কিছুই সঞ্চয় হয় না—সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র-পরিবার বড় কষ্ট পায়। ধর্ম্মপথে গেলে সঞ্চয় করাটা শিক্ষা করিতে হয়—ধর্ম্মে, অর্থ-সঞ্চয় নহে—তেজসঞ্চয়; তেজসঞ্চয় হইলে ক্ষয় হয় না। আমার এই আয়, আমাকে যে কোন প্রকারে হউক না, ঐ আয়ের ভিতরে চালাইতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে মনের একটা দৃঢ়তা জন্মে। সেটা সংযম শিক্ষার অনুকূল! এইরূপে সংসারে থাকিয়া অনেক প্রকার সংযম শিক্ষা করা যায়। ভোগের পদার্থ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও যে মানব ভোগবাসনা দমন করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত সংযমী। নির্জ্জন বনবাসী মুনি-ঋষির সংযম অপেক্ষা ইঁহার সংযম অতি উচ্চাঙ্গের।

এইগুলি হইলে, ধর্ম্মসাধনের অধিকারী হইলে, তাহার পর ভগবানকে আরাধনা করিবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ।

সমাজ কি?

বা

সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনুষ্য কি?—তাহাকে আমরা এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে একটী শীর্ষস্থানীয় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; সুতরাং সমস্ত জাগতিক পদার্থের সম্বন্ধে যাহা সত্য মনুষ্যের সম্বন্ধেও তাহাই সত্য।

"আপ্ত বচনের" ভূমি হইতে এবং বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির ভূমি হইতে পূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে জগৎ-স্রষ্টা বা পরব্রহ্ম জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন নহেন পরন্তু জগতের আত্মা-স্বরূপ যাবতীয় জাগতিক পদার্থের মধ্যেই আছেন—এইটা তাঁহার বিশ্বাধীনতা (Immanence)। আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে তিনি এই জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যান নাই—অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত জগতের অনন্ত দেশ অনন্ত পদার্থের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—এইটা তাঁহার বিশ্বাতীতত্তা (Transcendence)। তাঁহার এই নিত্য বিশ্বাধীনতা ও বিশ্বাতীততার ফলে তিনি একই বস্তুতে থাকেন ও থাকেন না। এই কারণে যদিও প্রত্যেক পদার্থের সত্তা তাঁহারই উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক পদার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম নহে। প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটী দিক আছে—একটী ভিতরের দিক, একটী বাহিরের দিক—একটীতে ব্রহ্মের

বিদ্যমানতা একটীতে ব্রহ্মের অবিদ্যমানতা। * প্রথমটীতে নাম, রূপ, দেশ, কাল প্রভৃতি উপাধির দ্বারা বিভিন্ন ও বহু। (১) যেমন, 'আলো' 'ছায়া'র কারণ হইলেও তাহারা বিভিন্ন—কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি রহিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থের ভিতরের দিকটী—অর্থাৎ ব্রহ্মের দিকটী বহির্দ্দিকের কারণ হইলেও তাহারা বিভিন্ন—কিন্তু অবিচ্ছিন্ন—ইহারা পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

উপরে সকল পদার্থের পক্ষে যাহা বলা হইল মানুষের পক্ষেও তাহা বলা যাইতে পারে। মানুষেরও দুইটী দিক আছে—একটী অন্তর্দ্দিক বা ব্রহ্মের দিক আর অপরটী বহির্দ্দিক বা জগতের দিক। প্রথমটীতে সে অসীম, দ্বিতীয়টীতে সে সসীম। এই অসীমতা ও সসীমতার বিচিত্র সমাবেশে মানুষ একটী বিরোধময় পদার্থ হইয়াছে—"Man is a contradiction in himself." মানুষের এই আত্ম বিরোধকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য দর্শনকারগণ "Higher self" ও "Lower self" এই দুইটী কথার ব্যবহার করিয়াছেন। (২) আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণও ঐ একই বিরোধ বুঝাইবার জন্য "পরমাত্মা" ও "জীবাত্মা" এই দুইটী আত্মার কথা বলিয়াছেন। তবে এটা কেহ মনে করিবেন না যে ঐ বিরোধটী একেবারে চরম, অর্থাৎ "Higher self" বা "পরমাত্মা" ও 'Lower self" বা "জীবাত্মার" মধ্যে আদৌ মিল নাই। বস্তুতঃ দ্বিতীয়টী প্রথমটীর বিরূপ মাত্র। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে যে "তত্ত্বমসি" নামক সর্ব্ববিখ্যাত মহাবাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এ দুইটী আত্মার ভেদের মধ্যে অভেদ দেখাইতেছে। তৎ=পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; "ত্বং"=জীবাত্মা; "অসি"=হও—অর্থাৎ, "হে জীবাত্মা! তুমিই পরমাত্মা হও।"

পূর্ব্বে যে 'আলো' ও 'ছায়ার' দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এই পরমাত্মা ও জীবাত্মার পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। ঐ অসীম পরমাত্মারূপ আলো সসীম জীবাত্মারূপ ছায়ার আশ্রয় ও প্রকাশক।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মা একটী বৃত্তের (circle) কেন্দ্র (centre), যে বৃত্তের পরিধি (circumference), জগৎ আর সেই পরিধির অসংখ্য বিন্দু (points in the circumference), অসংখ্য জীবাত্মা। যেমন বৃত্তের কেন্দ্র না থাকিলে পরিধির কোনও বিন্দুর থাকা অসম্ভব, সেইরূপ 'পরমাত্মা' না থাকিলে 'জীবাত্মার' থাকাও অসম্ভব, কেন না, পরিধির বিন্দুর মত

* "ব্রহ্মের অবিদ্যমানতা" কথায় আমরা যেন চমকিয়া উঠি: কিন্তু এখানে চমকিবার কিছু নাই। বুঝাইবার জন্য ভাষার এই কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। অবিদ্যমানতা মানে অনস্তিত্ব নহে। পরে আলো ও ছায়ার উপমার দ্বারা বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

(১) উপাধিকভেদবাদ। পাশ্চাত্য দর্শনের,—"Unity-in-plurality বা One-in-many.

(২) Kantএর "Homo noumenon" ও "Homo phenomenon" যাহাতে যায়।

'জীবাত্মার'ও নিরপেক্ষ সত্তা (indipendent existence) বা স্বাধীন সত্তা নাই। পরিধিস্থ বিন্দুকে থাকিতে হইলে বৃত্তের কেন্দ্রাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে আর 'জীবাত্মা'কে থাকিতে হইলে পরমাত্মাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। উঁহাদিগের এই সাপেক্ষ সত্তা আমরা সাধারণতঃ সাপেক্ষ সত্তা বলিলে যাহা বুঝি তাহা হইতে অন্যরূপ। পর্ব্বত নিজে স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, মাটীর উপর দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং এখানে মাটীকে পর্ব্বতের সাপেক্ষ সত্তা বলিতে হইবে, যেহেতু উহা নিজের অস্তিত্বের জন্য মাটীর অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু পর্ব্বতের এই সাপেক্ষ সত্তা এবং পরিধিস্থ বিন্দুর বা জীবাত্মার সাপেক্ষ সত্তা তুল্যরূপ নহে। তাহার কারণ এই যে পর্ব্বত নিজের অস্তিত্বের জন্য যে মাটীর অপেক্ষা করিতেছে, সেই মাটী পর্ব্বত হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু; কিন্তু পরিধিস্থ বিন্দু যে কেন্দ্রের অপেক্ষা করে, বা জীবাত্মা যে পরমাত্মার অপেক্ষা করে তাহা উঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র নহে। পরিধিস্থ বিন্দু যেমন একটী বিন্দু; বৃত্তের কেন্দ্রও সেইরূপ একটী বিন্দু এবং 'জীবাত্মা' যেমন চৈতন্যময়, 'পরমাত্মা'ও সেইরূপ চৈতন্যময়। উঁহাদিগের এই সাপেক্ষ সত্তা আরও ভালরূপে বুঝিতে হইলে 'সূর্য্য-রশ্মির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যাপেক্ষী হইলেও তাহা হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। মনে হয় যেন ঐ একই অনন্ত আলোকপিণ্ড সূর্য্য নিজেকে ঐ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-বিভিন্ন রশ্মিতে বিতরণ করিয়া তাহাদিগের সকলের অস্তিত্বের ভার নিজের উপর লইয়াছে। একটী বৃত্তের কেন্দ্রও ঠিক ঐরূপ, নিজেকে স্বপরিধিস্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-বিভিন্ন বিন্দুতে বিতরণ করিয়া তাহাদিগের সকলকার অস্তিত্বের ভার নিজে বহন করিতে থাকে—পরমাত্মাও ঠিক ঐরূপ অসংখ্য সীমাবদ্ধ পরস্পর-ভেদিত জীবাত্মার মধ্যে আত্ম-বিতরণ করিয়া তাহাদিগের সকলকারই সত্তা নিজেই পোষণ করিতেছে।

আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের প্রতি একবার অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পরমাত্মারূপী কেন্দ্র জগৎরূপী পরিধির প্রত্যেক বিন্দুতে স্বাধিষ্ঠান করতঃ উপাধির সীমার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। সুতরাং জীবাত্মা বলিলে শুধু ঐ উপাধির সীমা বুঝায় না। পরন্তু ঐ অসীম পরমাত্মার বিন্দু ও ঐ উপাধির সীমা উভয়কেই বুঝায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে উপাধি-কল্পিত-সীমা-বেষ্টিত অসীম পরমাত্মা-বিন্দুই জীবাত্মা। (৩)

এইরূপে জীবাত্মা বা মানবাত্মা অসীমতা ও সসীমতার দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া উহা তাহাদিগের একটী দ্বন্দ্বভূমি, যে দ্বন্দ্বভূমিতে ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় মানবজাতির সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের ঐ দ্বন্দ্বাভিনয়ের পুনরভিনয় করিয়া চলিয়াছে। একবার একটু ভাবিলেই ঐ অভিনয় কিরূপ তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) যে জিনিষের সীমা নাই, তাহার অংশও নাই। সুতরাং অসীম পরমাত্মা নিরংশ। কেবল ভাষায় বুঝাইবার জন্য 'পরমাত্মা-বিন্দু' বলা হইল।

আমি এক মহাশ্মশানের উন্মুক্ত বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছি; প্রতিপদে চরণদ্বয় নরাস্থিতে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে; ভাবিলাম আমারও ত পরিণাম এই অস্থি; হতাশে ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া পড়িলাম; কিন্তু এই সময় হঠাৎ কে যেন আসিয়া বলিল—আমার পরিণাম ঐ অস্থি নয়, আমার পরিণাম নূতন জীবন; আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া আবার চলিতে লাগিলাম—এই আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বই যে ঐ অসীম ও সসীমের দ্বন্দ্ব। আমি একমাত্র পুত্রের বিয়োগে শোকক্ষিপ্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতেছি; বন, উপবন, গিরি, নদী, সমস্তই এক শূন্যময় মরুভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে; আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে বা নিমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব ভাবিতেছি; এমন সময় কে যেন আসিয়া বলিল,—পুত্র নাই বলিয়া কি ঐ বন, উপবন, গিরি, নদী কিছু নাই, ওরা যে আমার আছে, ওদের সঙ্গে যে আমি এতকাল বাস করিয়া কেমন যেন এক স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন আমি কেমন করিয়া কাটিয়া যাইব; আবার সান্ত্বনায় শমিত হইয়া জীবনধারণে সমর্থ হইলাম—এই শোক ও সান্ত্বনার দ্বন্দ্বই যে সসীম ও অসীমের দ্বন্দ্ব। আমি দেখিতেছি আমাদের দুই ভ্রাতার মাঝে এক বিশাল ভূসম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারত্ব রহিয়াছে; আত্ম-সুখ ভোগের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি আমার মনকে মাতাইয়া তুলিতেছে; শেষে ভ্রাতার প্রাণসংহার করিয়া সেই প্রবৃত্তির সাধনে তৎপর হইয়াছি; এমন সময় কে আসিয়া বলিল,—ভ্রাতার জীবন কি বিষয় অপেক্ষা বড় নয়? ত্যাগ কি ভোগের অপেক্ষা বেশী তৃপ্তিকর নয়? আবার ভোগের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া ত্যাগের প্রবৃত্তির সাধনের জন্য উদ্যত হইলাম—এই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বই যে সসীম ও অসীমের দ্বন্দ্ব। মনুষ্যজীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার কুত্রাপি ঐ দ্বন্দ্বের বিরাম নাই।

এখন মানুষ চায় কি? মানুষ চায় ঐ দ্বন্দ্বের চিরাবসান। কিন্তু যতদিন না জীবাত্মা তাহারই সেই উপাধি-রচিত সীমার অবরোধ ভাঙ্গিয়া সেই অসীম পরমাত্মায় সম্পূর্ণরূপে লীন বা অধিষ্ঠিত হইতে পারে, ততদিন ঐ দ্বন্দ্ব কিছুতেই ঘুচিবে না। জীবাত্মার এই পরমাত্মায় সম্যকভাবে অধিষ্ঠানের নামই স্বরূপে অবস্থান (কারণ পরমাত্মাই যে তাহার স্বরূপ বা নিজের আসল রূপ)—আর তাহার এই স্বরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। (১) সুতরাং আমরা বলিতে পারি মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি।

যদি কেহ মনে করেন যে মুক্তি আমাদিগের দার্শনিক চিন্তার একটী মস্ত বড় সিদ্ধান্ত বটে কিন্তু তা বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ের কথা নহে, তাহা হইলে তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। যদি কেহ স্থিরচিত্তে সংসারের কর্ণভেদী কোলাহলের অন্তরালে বসিয়া কোন দিন তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ

(১) "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত (২ | ১০ | ১৩)

অর্থাৎ,—"আত্মা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত করে, তাহারই নাম মুক্তি।"

অন্তর্দৃষ্টিকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন এক প্রবল চেতনা-স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে; শুনিতে পাইবেন, সে আকুলভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে বলিতেছে,—"কোথায় অসীম চৈতন্যসাগর—কোথায় তুমি! তোমার ঐ অনন্ত-বিস্তৃত বক্ষের উপর আমাকে স্থান দাও, এ সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাকে মুক্ত কর।"

মুক্তির জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা যে মানবের ধর্ম্ম—না, আরও জোর করিয়া বলিলে বলিতে পারা যায়, মুক্তির জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতাই মানবতা। এমন মানুষ আছে কি, যার এই ব্যাকুলতা নাই! যখন উদার-উন্মুক্ত অনন্তের বক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহারী পক্ষী ক্ষুদ্র পিঞ্জরের ভিতর লৌহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়, তখন যখন সে আবার একবার সেই অসীম গগন-পথে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার ফলে পুনঃ পুনঃ পিঞ্জরের কাছে বাধা পাইয়া যাতনা পায়, সেই যাতনা কি সেই পিঞ্জর হইতে তার মুক্তির জন্য অস্থিরতা আরও বাড়াইয়া দেয় না? বাহ্যিক চাকচিক্য পিঞ্জর তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে বটে, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? আমরাও ঐ পক্ষীর মত অসীম পরমাত্মার সীমাহীন চিদাকাশে অরূপ গতিতে উড়িতে উড়িতে এই সসীম ভৌতিক জগতে, সীমাবদ্ধ দেহ-পিঞ্জরে কাম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যখন আবার একবার সেই অনন্ত-গগন-তলে উঠিতে চাই, তখন এই সীমাবদ্ধ অবরোধ বাধা দিয়া যে যাতনা দেয়, সেই যাতনা কি সেই অবরোধ হইতে আমাদিগের মুক্তির জন্য অস্থিরতা বাড়াইয়া দেয় না? বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে সে অবরোধ আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে বটে, কিন্তু সেই বা কতক্ষণের জন্য? শৈশবে যদিও ভুলিয়া থাকি, কৈশোরে ত থাকি না—কৈশোরে যদিও থাকি যৌবনে ত থাকি না—আর যৌবনে যদিও থাকি বার্দ্ধক্যে ত থাকি না। একদিন না একদিন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যায়—একদিন না একদিন মুক্তির জন্য এ ব্যাকুলতা, এ অস্থিরতা, পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠে। (৫)

এইবার আমরা ঐ মুক্তির প্রশস্ত পথ কোনটি তাহাই খুঁজিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ, বি, এল।

(৫) আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভোগের মধ্য দিয়াও আমাদিগের অনন্তমুখী পিপাসা সীমাহেতু সম্পূর্ণরূপে মিটে না বলিয়া আমরা বেদনা পাই এবং সময় সময় ঐ সীমার হাত হইতে মুক্তির জন্য এত ব্যাকুল হই যে ভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করি। যেমন, যদি কেহ তাহার প্রিয়জনের সহিত অনন্ত মিলন-সুখ ভোগ করিতে চায় কিন্তু যখন তাহা সেই প্রিয়জনের সীমাবদ্ধ জীবনহেতু অতৃপ্ত রহিয়া যায়, তখন হয় ত সে এই সীমাবদ্ধ সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহার হাত হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুলচিত্তে ভোগ-পথ ছাড়িয়া সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করে। এ জগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

"বঙ্গবধূ।"

বাঙ্গালা দেশের বধূ তুমি বাঙ্গালা দেশের মেয়ে,
চোখের পরে স্বর্গ হেরি তোমার পানে চেয়ে,
তোমার শুভ্র শাঁখার সুরে,
দুঃখ জ্বালা যায়গো দূরে,
লক্ষ্মীমাতা হাসেন সুখে তোমার আঙ্গিনায়,
শান্তিধারা তোমার গৃহে সকল সময় বয়।
তোমার করুণ কণ্ঠস্বরে,
স্বামীর হিয়া আকুল করে,
বেণুর মত কোমল তানে ভুলাও স্বামীর প্রাণ ;
তপ্ত প্রাণের জুড়িয়ে জ্বালা, কর শান্তি দান।
তোমার মুখের মৃদু হাসি,
স্বর্গে কি এক সুধার রাশি,
নিঃস্ব হলেও মহৎ সেগো সারা ধরার মাঝে ;
যাহার গৃহে এমন ধারা বঙ্গবধূ রাজে।
সাঁঝের বেলা প্রদীপ হাতে,
তুলসী তলায় সন্ধ্যা দিতে,
ধীরে ধীরে যাও গো তুমি ভক্তিরাশি নিয়ে ;
হেরি মোরা লক্ষ্মী মাতায় তোমার পানে চেয়ে।
ভারত রামায়ণের গানে,
শৈব্যা সতীর উপাখ্যানে,
মনটি তোমার কর রত গৃহ কাজের পরে,
সতীর দুঃখ পাঠে তোমার চক্ষে বারি ঝরে।
বঙ্গ-গৃহের পালন তরে
(বিধি) ভার দিয়েছেন তোমার করে,
পালন কর বঙ্গ-গৃহ তোমার কোমল ভুজে ;
সদা যেন দেবের আশীষ মাথে তোমায় রাজে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

অন্যের কর্ম্মফল।

(সংস্কৃতানুবাদ)

পাপ কার্য্য করে খল
সাধু তার পায় ফল।
জানকীরে হরিল রাবণ
পারাবার পরিল বন্ধন॥

শ্রীমনীষীমোহন রায়।

কেন?

কেন মরণ তুষার ভেদিয়া (মোর)
উঠিছে নীরব কাতর শ্বাস?
কেন উঠিছে রজনী উঠিছে দিবস
উঠিছে বরষ মাস?
কেন জড়ায়ে জড়ায়ে ব্যাপিছে ভুবন
ঢাকিছে গগন দেশ?
কেন মথিত করিছে হৃদয় আমার
কিসের তাঁহার দ্বেষ?
কেন গরল আমার স্ফুরিছে শিথিলে
কিসের কারণে হায়?
কেন সিক্ত করিয়া সন্ধ্যা 'লালিমা'
কোমল কঠোর চায়?
কেন জাগিছে জীবনে গভীর স্বননে
গ্রথিত বেদনা সুর?
কেন সে দৃপ্ত মহিমা রিক্ত গরিমা
সকলি করিছে চুর?
কেন ভাঙ্গিয়া মলিন দীনতা আমার
দিতেছে কুসুম-রাশ?
দুখের স্বপন দেখায়ে আমারে
হাসিছে মৃদুল-হাস?

শ্রীকানাইলাল মুন্সী।

প্রবাহিনী।

(১)

স্ফীত বক্ষে হাসা মুখে কোথা যাও নারী!
কালের ভ্রুকুটী কত
উপেক্ষিয়া যুগ শত
কাহার উদ্দেশ্যে এত ঢালিতেছ বারি?

(২)

ভীষণ প্রলয়ে কত সৃষ্টি বিবর্ত্তন,
কিন্তু তুমি সেই ভাবে,
চির কুলকুল রবে,
কালসঙ্গে নানারঙ্গে করিছ গমন।

(৩)

কত লীলা জান তুমি ওগো মায়াবিনি!
দিনে রবি সমুজ্জ্বল
রাতে তারা ঝলমল
তোমার প্রশান্ত বক্ষে আসে নিশামণি।

(৪)

এই দেখি ধীর, স্থির, উদার, গম্ভীর
সুন্দর তোমার আস্য,
ক্ষরিছে মধুর হাস্য
পিলাইছ দুই করে স্নেহ জননীর।

(৫)

চেয়ে দেখি পরক্ষণে মূর্ত্তি সংহারিনী
পর্ব্বত প্রমাণ ঊর্ম্মি
অতিক্রমি বেলা-ভূমি
নিমজ্জিতে সমুদ্যত সমগ্র অবনী।

(৬)

কভু দেখি কল্লোলিনি! ভূধর নন্দিনি!
কার প্রেমে উন্মাদিনী
লুটায়ে অঞ্চলখানি
হেন বেশে ছুটিতেছ দিবস-যামিনী?

(৭)

কার তরে ফুটে ফুল তোমার সৈকতে?
কুতুহলে ভরি ডালি
নিত্য তুমি ফুল তুলি,
কোথায় লইয়া যাও কাহারে পূজিতে?

(৮)

কার তরে বহে বায়ু সৌরভে মাতিয়া?
গাঁথি রম্য ঊর্ম্মিহার
বুকে লয়ে তারে তার
কার পদ সেবিবারে যেতেছ ছুটিয়া?

(৯)

সকরুণ স্বরে গাও কাহার উদ্দেশ্যে?
মধুর সঙ্গীত হেন?
সপ্ত স্বরা বীণা যেন
অপ্সরার করে বাজে অমর নিবাসে।

(১০)

দেখা তুমি তাঁর কিগো পেয়েছ কখন?
নিশিদিন নাহি গণি,
নাহি শ্রান্তি অনুমানি,
যাঁর পদ পূজিবারে এত আয়োজন।

(১১)

বল বল পাব কোথা তাঁর দরশন,
ভেসে গেলে তব স্রোতে
পাব কি মরণ পথে
তক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ব্রজের রতন?

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়

ধনীর আদর।

কাঁচ বসান আংটী যদি রাজার হাতে দেখে
হীরা বলে সবাই তাহা আদর কোরে ডাকে।
চাষার হাতে সোনার বালা, দেখ্‌লে পরে সবে,
কেউ না করে আদর তাহার —পিতল বলে ভাবে,

শ্রীসুধীরেন্দ্র কুমার সান্যাল।

প্রেম।

প্রবাহিনী বহে যায় সাগরের পানে,
মিলাইতে দেহ তার বাঞ্ছিতের সনে।
সেইরূপ, হৃদি মোর চাহে অনিবার ;
পুলকে মিশিতে পদ-পঙ্কজে তাঁহার !

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

পূজা।

তোমার পূজা করিব আমি
এমন শকতি নাই,
তবু যা করেছি, আজি যা' এনেছি
তোমা হতে সব পাই।
আপন মানুষ এলে তুমি ঘরে,
অতিথি তোমার বলি কেমন করে ;
তুমি যদি এলে, যেওনাক্কো চলে,
এস প্রাণে মিশে যাই !
লজ্জা বস্ত্র-সজ্জা-আবরণে,
বর্ণ ঢাকি' বর্ণ আভরণে ;
আপন অঙ্গে দিল কিগো ফাঁকি,
চাহি ছি ছি লাজে মরে যাই !
তবু যদি তুমি থাকো কাল-ভরে,
এসো—তব পূজা দিনু মনে মনে ;
নয়নের জলে দিব ঢালি সখা,
তোমার পূজার ঠাঁই !
তোমার পূজা করিব আমি
এমন শকতি নাই !

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিদান।

কতকাল বঁধু তোমারে ভুলিয়া
শতদুঃখ বুকে নিয়েছি টানিয়া
সদা দিছ মোরে যাচিয়া যাচিয়া
শতেক স্নেহের দান
কিবা দিব প্রতিদান।
চিনেছি তোমারে এ জীবনে আর
কভু ভুলিব না আদেশ তোমার
যাপিব জীবন গাহি অনিবার
তোমার প্রেমের গান
এই দিছি মনে স্থান।
হৃদি-মন-প্রাণ সকলি তোমার
কি দিবার আছে বল না গো আর,
আছে মনে মোর বাসনা অপার—
সতত গাহিতে গান
লভিতে সুযশ মান।
যত যশোলিপ্সা বঁধু আজ হয়
সে বাসনা দিনু চরণে তোমার
লহ বঁধু লহ এই উপহার
এই মোর প্রতিদান
দেহ তবে পদে স্থান।

শ্রীদয়ানিধি চৌধুরী।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা।

উক্ত ভাবদ্বয় সাধারণতঃ হিংসাবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া মানবকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করে। ধর্ম্মপথগামী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই দুই কলুষভাব দূরীভূত করিয়া মানস-সরোবরকে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল করা একান্ত কর্ত্তব্য। মনকে কলুষিত করিতে, তাহার কমনীয় ভাব বিদূরিত করিতে এমন শত্রু আর নাই; যাহারা সদাসর্ব্বদা উক্তরূপ দোষদুষ্ট হইয়া মনপ্রাণের মলিনত্ব সাধন করে—তাহাদের তুল্য পাপী আর নাই—রৌরবেও তাহাদের স্থান হয় না।

আমরা জানিয়া শুনিয়াও ইহার হাত এড়াইতে পারি না; পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা না করিয়া যেন আমরা তিলমাত্র থাকিতে পারি না। ইহা যেন আজকাল আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংক্রামক রোগরূপে পরিণত হইয়াছে। এমন স্থান বা এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা না করিয়া জলগ্রহণ করেন। আজকাল সমাজে যেন ইহার আধিক্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অপরাপর সৎকথা, সৎপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন যেন লোকে পরপ্রসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। কেন এমন হইয়াছে; কেন এরূপ ভীষণ পাপে আমাদের মন ক্রমশঃ মজিতে প্রয়াসী হইয়াছে? পূর্ব্বে ত কই এরূপ ছিল না, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা লইয়া ত পূর্ব্বে কই লোকে এত জল্পনাকল্পনা করিতে ইচ্ছা করিত না। সময় পাইলে পূর্ব্বে লোকে সৎকথা, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াই অতিবাহিত করিত—ভুলেও পরের মন্দ চিন্তা লইয়া কাল কাটাইত না। এখন যে এরূপ হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—আমরা প্রাণের উদারতা হারাইয়াছি, সকল কর্ম্মে হীনবল হইয়াছি, নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তাই পরের দেখিয়া হিংসা হয়—পরের উন্নতি দেখিলে প্রাণে একটা তীব্র জালা অনুভব করি। হৃদয়ের সে প্রশস্ততা আর নাই—সে মহাপ্রাণতা নষ্ট করিয়া আমরা প্রাণকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া কাহার ভাল দেখিতে পারি না; তাই কেহ একটী ভাল কাজ করিলে বা কোন প্রকারে আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা করিলে সে আমাদের চক্ষুশূল হয়—আমরা নানা প্রকারে তাহার দোষ না দেখাইয়া থাকিতে পারি না। আমি যাহা করিতে পারি না—যাহা করিতে আমার শক্তি কুলায় না, অন্যে তাহা সম্পাদন করিল—যশোমণ্ডিত হইল; আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হিংসায় ফাটিয়া মরিলাম, নানা প্রকারে তাহার কুৎসা রটনা করিতে লাগিলাম; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের হৃদয়-পথের বিকাশ কম হইয়া গিয়াছে আমরা সকল সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি? আমি হয় ত একটা কাজ করিয়াছি; একটা ভাল কাজ আমার দ্বারা হয়ত হঠাৎ সম্পন্ন হইয়াছে; অপর দুই এক জন হয়ত তাহা পারিল না—অমনি তাহাদিগকে অতি হীন, অপদার্থ মনে করিয়া আমি তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিলাম; ইহা আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাকে অসমর্থ দেখিয়া তাহার

কার্য্যে বিরক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে; আজ তাহার দ্বারা যে কার্য্য হইল না, চেষ্টা করিলে কাল তাহার দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব তাহার জন্য মনে মনে অহঙ্কার বা নিন্দার ভাব কেন উদয় হয়? তুমি উচ্চ পদারূঢ় হও কিন্তু তাহার জন্য অহঙ্কৃত হইও না, লোক সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া তাহাদের নিন্দা করিও না, বরং তোমার সমান করিতে, মানুষ হইয়া মানুষকে মানুষ করিতে যত্নবান হও—তোমার মহত্ব অটুট থাকিবে। নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা, সৎশিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলো; কেবল নিন্দা করিয়া, গল্প গুজব করিয়া বেড়াইও না; মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার উপায় জানিয়া তাহা প্রস্তুত কর, আহার কর, তবে ত পেট ভরিবে—নতুবা কেবল দোকান দেখিয়া তাহার গল্প করিয়া বেড়াইলে ফল কি?

যখনই পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা তোমার মনে উদয় হইবে, তখনই একবার নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অকর্ম্মণ্যতার বিষয় চিন্তা করিবে; দেহ-গেহের অর্গল মোচন করিয়া তাহার আবর্জ্জনা রাশির প্রতি একবার অপাঙ্গ দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে তুমি কি, তাহা হইলে আর পরনিন্দা-পরচর্চ্চা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না। পরের বিষয় লইয়া বৃথা কাল-ক্ষেপ না করিয়া আপনার বিষয় চিন্তা করিবে। আমাদের নিজের দেখিবার শুনিবার, করিবার ভাবিবার এত বিষয় আছে; এত দুর্ব্বলতা, এত সামর্থ্যহীনতা আমাদের ঘেরিয়া রহিয়াছে যে, তাহাতে সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত করিলেও যখন সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব, তখন পরের বিষয় চিন্তা করিয়া কাটাইবার আমাদের সময় কই?

আমরা পরের দোষ দেখিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে বড়ই উৎসাহিত হই কিন্তু নিজের যে কত দোষ, কত ভুলভ্রান্তি তাহা একবার ভুলেও দেখিতে চেষ্টা করি না বা তাহা সংশোধনের জন্য ভাবনা আদৌ আমাদের হয় না। কত দোষে যে নিজে মাটী হইয়া যাইতেছি; আমার অন্তরাত্মা যে কত বিষম দোষে মলিন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার জন্য ভুলেও না দেখিয়া, তাঁহার মলিনতা ঘুচাইবার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া পরের দোষ দেখিলে কি হইবে ভাই! আগে নিজেকে ঠিক কর, নিজের ঘর সামলাও, তারপর পরের জন্য চেষ্টা করিও, আগে নিজেকে সকলের প্রিয় করিতে যত্নবান হও, তার পর পরের ভালবাসা লাভে প্রয়াসী হইও। পরে তোমার মনের মত নয় বলিয়া তাহাকে নিজের মত করিবার জন্য তাহার নিন্দা কর কিন্তু তাই তুমি এ জগতে কয় জনের মনের মত হইতে পারিয়াছ, কয় জন তোমার মনের মত হইতে পারিয়াছে? পরের নিকট ভালবাসা পাইবার আগে পরকে ভালবাসিতে শিখ। পরের নিকট সৌজন্য পাইবার আগে আপনি সুজন হওয়া উচিত নয় কি? কোন কাজে নিজে অগ্রে যুক্ত না হইলে পরকে যুক্ত করা যায় না, আপনি না কাঁদিলে পরকে কাঁদান যায় না। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যতক্ষণ তুমি নিজে মুগ্ধ না হইয়া যাইবে, ততক্ষণ

অপরকে দূর করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। এ জগতে তোমার অপেক্ষা কাহাকেও ছোট দেখিও না; নিজেকে ছোট দেখ, অন্য বস্তু দেখিবার পূর্ব্বে তোমার দর্শনশক্তি কোনরূপে দূষিত হইয়াছে কি না, পরীক্ষা কর; তারপর কে ভাল কে মন্দ বিচার করিতে যাইও। নিজে হীন হইয়া সহস্র দোষ দুষ্ট হইয়া যে পরের নিন্দা, পরের চর্চ্চা বা পরের ছিদ্রান্বেষণ করে, তাহার তুল্য মহা পাপী আর নাই।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" এমন যে সত্য কথা, যাহার একমাত্র আশ্রয়ে মানুষ স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে—শাস্ত্র তাহাও বলিতে নিষেধ করিতেছেন,—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" —"অপ্রিয় হইলে, তদ্দ্বারা কাহার প্রাণে আঘাত লাগিলে কদাচ তাহা বলিবে না।" তবে কেন যে আমরা পরের নিন্দা করিয়া কালক্ষেপ করি—তাহা বুঝিতে পারি না।

এ জগতে মানুষ মানুষ হইতে আসিয়াছে, নিজের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি আমরা তাহার জন্যই মহামায়া কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই মায়ার সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তিনি আমাদের বিশ্বজননী আমরা সকলেই তাঁহার প্রিয় সন্তান, প্রত্যেকেই সহোদর এক ভাইয়ের দোষ হইলে অপর ভাইয়ের মাথাও হেঁট হইয়া থাকে। অতএব তাহার নিন্দা না করিয়া তাহার দোষের সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে, আমাদের প্রত্যেকেই কোন্ দুরারোহ পিচ্ছিল পথে যাইতে হইতেছে, এ অবস্থায় সকলকেই সম্ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া উপরে উঠিতে হইবে। পরস্পর বন্ধুভাবে, প্রেম-ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়া মনের আনন্দে যাইতে না পারিলে অনতিক্রমনীয় সংসার সুমেরু উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। পরনিন্দা পরচর্চ্চা দ্বারা বিড়ম্বিত হইলে উত্থান অপেক্ষা পতনের সম্ভাবনাই অধিক। এক্ষেত্রে একান্ত মনে সকলে নিজ নিজ আত্ম-সম্মান, নিজ নিজ পদ মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়া নিজের ভাবনা ঠিক করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে ভবতারিণী মায়ের কৃপা-লাভ হইবে, তোমার ক্ষুদ্র শক্তিতে শক্তিরূপিনী মায়ের মহা-শক্তি সঞ্চারিত হইবে; তুমি অবহেলায় এই ভবাব্ধি উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চির ঈপ্সিত সেই আনন্দ-কাননে আনন্দময়ীর চরণ মকরন্দের সুধাপানে বিভোর হইবে-ভবের ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না—গোষ্পদের ন্যায় এই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া চির অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

সম্পাদক।

চাটনী

দশহরার দিন গঙ্গার ঘাটে কত লোকে কত কি স্তব স্তোত্র পাঠ করিতেছে। আমাদের কেবলরামেরও ভারি ইচ্ছা হইল, সে অমনি লোকের কিছু একটা পাঠ করে। সম্মুখে রামেশ্বর ভায়রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "গঙ্গার তীরে কি কইয়া যাবো ভাই?"

রামেশ্বর।—কও, হে মা জাহ্নবী, আমি তোমারে নমস্কার করি। আমার পাপ

খণ্ডাইয়া যাও।

কেবলরাম।—কি কইলেন, মা জাহ্নবী!

রামেশ্বর।—হাঁ, মা গঙ্গাদেবীর নামই ত জাহ্নবী।

কেবলরাম।—গঙ্গাদেবীর নাম জাহ্নবী! থামেন, থামেন।

কেবলরামের আর 'স্যাবা দেওয়া' হইল না; সিক্ত বস্ত্রেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ঘরে আছেন নি?"

"কে ডাকে" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কেবলরাম আভূমি প্রণতঃ হইয়া কহিল "একটা ব্যবস্থা লইতে আইচি।"

ভট্টাচার্য্য।—কও দেখি কি?

কেবলরাম।—আমার মাইয়ার নাম জাহ্নবী, আর মা গঙ্গাদেবীর নামও জাহ্নবী। আমি মা গঙ্গাদেবীরে স্যাবা দিতে পারি কি না?

সমস্যাটা কিছু কঠিন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুদ্ধির গোড়ায় ঘন ঘন নস্য প্রদান করিতে লাগিলেন। স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রমন্ত্রাদির পুঁথি পাঁথা যা ছিল, কিছু অনুসন্ধান করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেষে বহু গবেষণার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আইচ্ছা কেবলরাম!"

"কি কন?"

"তোমার যে মাইয়া জাহ্নবী, সে তোমার বয়ঃজ্যেষ্ঠা না কনিষ্ঠা?"

কেবলরামের এটা ত জানা ছিল না। সে প্রমাদ গণিল। কি করে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গৃহে গৃহিণীর কাছে গমন করিল।

"গৃহিণী গৃহিণী।"

গৃহিণী।—কি কও।

কেবলরাম।—তোমার যে মাইয়া জাহ্নবী, সে আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠা না কনিষ্ঠা?"

প্রশ্নে গৃহিণীর প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। তিনি সম্মার্জ্জনী হস্তে মিষ্ট আলাপ করিলেন "তবেরে পোড়া চোপা, আমি তোরে প্যাটে ধরুচি না জাহ্নবী প্যাটে ধরুচে।"

কেবলরাম অতঃপর গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিতে ক্ষান্ত হইল।

(২)

গৃহিণী পীড়িতা। কেবলকে কহিল "সরস্বতী পূজার কি করবা? আমি ত কিছু কত্তে পারলাম না।"

কেবলরাম উৎসাহের সহিত কহিল—"তাব ক্যান্। আমার হাত আছে, পাও আছে মায়ের ইচ্ছায় ইট্টু ইট্টু বুদ্ধিও আছে। তুমি বৈসা বৈসা ক্যাবল দ্যাখ; আমি কি কৈরা উঠি।"

কেবলরাম বাজারে হাজির, মুদির দোকানে গিয়া কহিল—"পূজার নৈবিদ্য চাই; কত পয়সা লাগ্‌ব?"

দোকানদার।—কত দিতে পারবা?

কেবলরাম।—দুই গণ্ডা।

দোকানদার দোকানের কানাচ হইতে একটা ছোট কদলী বৃক্ষ লইয়া আসিয়া কেবলকে দিল। কেবল রাগান্বিত, কহিল "কি আমারে বোকা বানাইছ! কলাগাছ নৈবিদ্যে লাগে!"

দোকানদার কহিল "আরে কলাইত নৈবিদ্যে লাগে। ঘরে নিয়া থোও, বড় বড় কলা ধরাইব।"

কেবলরাম পূজার যোগাড় করিয়া ফেলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজা করিতে বসিয়াছে

চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আরে, আরে, সর্ব্বাঃ নষ্টাঃ সর্ব্বাঃ নষ্টাঃ।"

কেবল সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "অষ্টম কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুপিতঃ কহিলেন "এইটা কি? আচারভ্রষ্টাঃ অনাচারাঃ।"

কেবল সসম্ভ্রমে কহিল—"কান্, উনিইত অইলেন নবিঞ্চ। কলা ত বাজারে দাখ্‌তে পাইলাম না। হেইয়ার লইয়া এনারে পূজা কর্‌তে আনচি। ঘরে লইয়া রাখেন কলা জমাইব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলাগাছ কুচান নৈবেদ্য-খানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—"অরে পাপীষ্ঠ; আমার লগে উপহাস কর্‌তে আছ। গাছ কুচা কুচা কর্‌চ ক্যান্? তোমার বিঞ্চা অইচে, না ভগবতী পূজা করচ;—আমারে গরু বানাইচ।"

কেবলরাম হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন যে এমন হইল বুঝিতে পারিল না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

লেখক ও গ্রাহকগণের প্রতি।

সাময়িক পত্র পরিচালনে দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলেও আমরা দুর্গতিনাশিনী মায়ের কৃপায় ১৩২৪ সাল শেষ করিলাম। নানা-প্রকার বাধা-বিঘ্ন কার্য্য-পরিচালনের অন্তরায় হইলেও আমরা সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া যথা-সাধ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছি। তবে কোনরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে কৃপাময় গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ মার্জ্জনা করিয়া লইবেন—ইহাই প্রার্থনা।

আলোচনার উদ্দেশ্য মহৎ। নূতন লেখক-গণের প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে "আলোচনা" যত-দূর উৎসাহ প্রদান করে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, দেশে আর কোন পত্রিকা তাহা করে না। যেমন লেখাই হউক, সংশোধন করিয়া তাহা "আলোচনায়" প্রকাশ করিয়া নূতন লেখকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করি। উৎ-সাহ পাইলে সকলের হৃদয়ই সৎসাহসে পূর্ণ হয়। আমাদের পত্রিকায় লিপিচালনা করিয়া অনেক লেখক এখন বড় বড় মাসিকে প্রবন্ধ লিখিতেছেন; "আলোচনা"র উৎসাহে অনেকে লেখক হইয়া গিয়াছেন, এরূপ একখানি পত্রিকার দীর্ঘজীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয়, অতএব নবীন লেখকগণ ও গ্রাহক মহোদয়গণ সকলেই দয়া করিয়া এবার বার্ষিক সাহায্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা করিয়া প্রদানে আমাদের সহায়তা করিবেন।

নবীন লেখকগণের প্রতি আমাদের আর একটী নিবেদন এই যে লিখিবার পূর্ব্বে পাঠের অত্যন্ত আবশ্যক; যত বেশী পড়া থাকিবে প্রবন্ধ তত ভাল হইবে, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত, চেষ্টা করিয়া যাহাতে প্রবন্ধ ভাল হয়, উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—তাহার প্রতি লেখকের দৃষ্টি না থাকিলে লেখক কখন জন-সমাজে সমাদৃত হইতে পারেন না। আমরা উৎসাহ দিতে পারি, সময় পাইলে সংশোধন করিয়াও পত্রস্থ করিতে পারি কিন্তু উন্নতির চেষ্টা নিজে না করিলে প্রবন্ধ ভাল হইবে কিসে? আজকাল দেখিতে পাই, আবর্জ্জনা-পূর্ণ কবিতাই সকলে পাঠাইয়া দেন, তাহার না আছে ভাব, না আছে ভাষা, এরূপ কবিতা যে কত আমাদের হস্তগত হয় তাহার সীমা নাই। সকলেরই ইচ্ছা নাম প্রকাশ করিব কিন্তু তাহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে তাহাতে সুনামের পরিবর্ত্তে দুর্নামই উপার্জ্জন করা হয়। নাম একবার খারাপ হইলে আর ভাল হওয়া দুষ্কর, এইজন্য লেখার সময় একটু পড়াশুনা এবং সাবধানতা আবশ্যক। গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে কেহ চেষ্টা করেন না কেন বলিতে পারি না; তাহা কষ্টসাধ্য এবং অনেক পড়িতে হয় বলিয়া যা তা একটা পদ্য লেখা অনুচিত। এই জন্য নবীন লেখকগণকে লেখার সময় প্রবন্ধটী সাধ্যমত ভাল করিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি, তার পর আমরা দেখিয়া দিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভগবত্যাঃ শতনাম-স্তোত্রম্

শৃণু মাতঃ প্রবক্ষ্যামি তব নাম শতাষ্টকম্।
যস্য প্রসাদ মাত্রেণ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
আদ্যা শ্যামা শিবানী চ কামিনী কালবারিণী।
ভক্তিস্তুষ্টিঃ প্রভা মুদ্রা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
ঘোররূপা মহামায়া নিত্যা কালবতী জয়া।
জ্বলিনী তপিনী জম্ভা মুক্তিরূপা ভবপ্রিয়া॥
ঘোরদংষ্ট্রা কুমারী চ বৃদ্ধা সন্ধ্যা যশস্বিনী।
মহাশক্তি বিশ্বমাতা ভব্যা ধাত্রী কপালিনী॥
কলকণ্ঠী কম্বুকণ্ঠী আশা সিদ্ধি রুচিপ্রদা।
অভয়া পার্ব্বতী বামা মানদা শুভদা সদা॥
রজোরূপা ত্রিনেত্রাচ জগদম্বা বলা সতী।
যোগমায়া শুভামাতা মাননীয়া ক্ষমাবতী॥
উগ্রতারা অপর্ণাচ সাধ্বী পুষ্টি মনোহরা।
চঞ্চলা শঙ্করী কৃষ্টা দেবমাতা বসুন্ধরা॥
ভবানী জননী সীতা জবারূপা বিভূতিনী।
শক্তিদা ভক্তিদা পুষ্পা অগ্নিরূপা তপস্বিনী॥
পদ্মাবতী তুঙ্গভদ্রা লক্ষ্মীরূপা সুতল্লিকা।
ব্রাহ্মণী সুন্দরী কাম্যা চণ্ডীরূপা সুতন্ত্রিকা॥
কুপটা বাসনা মেনা চিন্ময়রূপা করালিনী।
জগদ্ধাত্রী ক্ষমা মুদ্রা সর্ব্বব্রহ্মস্বরূপিনী॥
প্রচণ্ডা বহুলা লীলা ঘটরূপা কৃশোদরী।
বর্ণরূপা সৃষ্টিরূপা ছিন্না গৌরী শুভঙ্করী॥
মহাকালী বীজরূপা বীরা মৎস্যা শুভাষিনী।
ললিতা পুরুনারী চ জয়দা সর্ব্বমোহিনী॥
ইদং ভক্ত্যা পঠেৎ যস্তু তব নাম শতাষ্টকম্।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥
কাশীসদা লভেৎ কাম্যং পুত্রার্থী পুত্রলাভ ভবেৎ।
ধনার্থী ধনবাংশ্চাপি জ্ঞানার্থী জ্ঞানবান সদা॥
মন্ত্রসিদ্ধি লভেৎ মন্ত্রী প্রাণায়ামাৎ শ্রীপদং ধ্রুবং।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি মহামায়া প্রসাদতঃ॥

রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর।

হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিত্যকর্ম।

গুরু।—বৎস! কাল তোমাকে কর্ম যে অবশ্য করণীয়; সাধারণ অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন যে উদ্ধারের পন্থান্তর নাই, তাহা বলিবার সূত্রপাত করিয়া কেবলমাত্র তোমার প্রশ্ন অনুসারে ভোজন কার্য্যের বিষয়ই বলিয়াছি, ভোজন সম্বন্ধে কেমন আহার বিচার করিতে হয়—তাহা বোধ হয় তোমার বেশ বোধগম্য হইয়াছে?

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ। তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই একণে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অবতারণা করুন। আমার বিশ্বাস ছিল এবং ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু; ইহাতে কেবল কাদা ঘাটাই সার হয়—মাছ ধরা হয় না।

গুরু।—বাবা! মাছ ধরিবার জন্ম পুষ্করিণীতে নামিয়া কাদা না ঘাঁটিলে কে কবে মাছ ধরিতে পারিয়াছে? কর্ম্ম করিয়া পাকা না হইলে, তদ্দ্বারা জ্ঞানবান্ না হইলে সকল জ্ঞানের আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানকে কেমন করিয়া জানা যাইবে? গীতার প্রথমে যে স্বয়ং ভগবান কর্ম্ম করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন!

শিষ্য।—প্রভু! আমি শাস্ত্র বিষয় নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তবে যখন আপনি বলিতেছেন—তখন আমার কোন সংশয় নাই, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার শ্রেয়ঃলাভের জন্ম করণীয় কর্ম্ম সকলের উপদেশ প্রদান করুন

গুরু।—বৎস! পূর্ব্বে যাহারা যথার্থ কর্ম্মী হইবার জন্ম চেষ্টা করিতেন—তাহাদিগকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত; চারিটী আশ্রমের মধ্য দিয়া কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ কর্ম্মী হইতে পারা যায় এবং ক্রমশঃ সেই সকাম কর্ম্ম সকল নিষ্কামভাবে আচরণের ক্ষমতা লাভ করা যায়। কিন্তু এখন আমাদের আশ্রম-ধর্ম্ম শিথিল হইয়াছে; কাজেই ঠিক আশ্রমোচিত কর্ম্ম আর অনুষ্ঠিত হয় না। তবে যতদূর সম্ভব এবং যেরূপভাবে কর্ম্মের আচরণ করিলে সহজসাধ্য হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

শিষ্য।—হা ঠাকুর। যাহা সহজে করিতে পারি এবং যাহার দ্বারা আত্মোন্নতি সাধিত হয়, তাহাই উপদেশ করুন।

গুরু।—দেখ বাবা! শরীরকে দৃঢ় করাই সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক, সহ্যগুণ না থাকিলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ! সহ্য করিতে না পারিলে, আরাধ্য বস্তু লাভের জন্ম পরিশ্রম না করিলে তাহার প্রাপ্তির আশা কোথায়? এ তো আর ছেলের হাতের মোয়া নয় যে কাড়িয়া খাইব।

গুরু।—হাঁ বাবা! ক্রমশঃ সহ্যগুণ লাভ করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। যাবতীয় কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে; সকল বিষয়ের সংযম শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। অতিরিক্ত কোন বিষয়ের ভাল নয়?

শিষ্য।—হা প্রভু! অতি শব্দই খারাপ, তা জানি, এখন কিরূপভাবে কাজ করিতে হইবে—বলুন।

গুরু।—বৎস! জীবনে আমাদিগকে তিন প্রকার কর্ম্ম করিতে হয়—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম। আজ কেবল নিত্য কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি:—

ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজা, হোম, দান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম, ভোজনও যে নিত্যকর্ম্ম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইবে। এই সময় গাত্রোত্থানের জন্ম জপ সম্বন্ধে স্মৃতি বলিতেছেন:—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বোত্তিষ্ঠেৎ স্বাস্থ্যো ব্রহ্মর্ষমাবুষঃ।
শরীর চিন্তাং নির্ব্বত্যা মৈত্রং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

বুদ্ধিকর্ত্তব্য পথ অনুসরণ করিবে। শরীর সবল এবং মন সুস্থ থাকিবে। তারপর শয্যার উপরিভাগে বসিয়া শিরোভাগে সহস্রদল পদ্মের চিন্তা করিবে. ভাল করিয়া চিন্তা করিতে পারিলে পদ্মের সদাঙ্ক পর্য্যন্ত অনুভব হইবে। ঐ পদ্মে শ্বেতকায় গুরুচিন্তা করিয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত করতঃ "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতলে প্রদান করিবে। তারপর প্রাতঃস্মরণ করিবে :—

"ব্রহ্মা মুরারী স্ত্রিপুরান্তকারী ভানু শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্র শনি রাহু. কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্। প্রভাতেষঃ স্মরেন্নিত্যং . দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং আপদস্তস্য নশ্যন্তি, তমো সূর্য্যোদয়ে যথা; অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা, পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্; পুণ্যশ্লোক নলোরাজা পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোকাশ্চ বৈদেহি পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দন। জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্ম নচ মে নিবৃত্তি, ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।

তারপর ভগবানের দশাবতার এবং ভগবতীর দশাবতারের নাম উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ, গো, কিংবা অগ্নি দর্শন করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

শিষ্য।—প্রভু! ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কোন সময়?

গুরু।—বৎস! রাত্রি চারিটার সময় নিদ্রোত্থিত হইবে। এই সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, ঋষিরা সকলেই এই সময় শয্যাত্যাগ করিতেন।

শিষ্য।—আহা প্রভু! তার পর?

গুরু।—তারপর মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবন ও স্নানাদি করিবে—যদি শরীরে শ্লেষ্মার আধিক্য হয়—তাহা হইলে স্নান না করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া পবিত্র গঙ্গাবারি স্পর্শ করিবে, অভাবে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুচী হইবে। তারপর প্রাতঃসন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া প্রাতঃভ্রমণচ্ছলে পুষ্পচয়ণ করিতে যাইবে।

শিষ্য।—প্রভু! প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন না করিলে কি কোন দোষ হয়?

গুরু।—বৎস! প্রাতঃকালে পুষ্পচয়নচ্ছলে এই ভ্রমণ স্বাস্থ্যলাভের বিশেষ উপযোগী—ইহাতে দুই কাজই হয়—স্বাস্থ্যলাভও হয় দেবোদ্দেশে পুষ্পচয়ন করাও হয়। সূর্য্য-দেবের প্রথম উদয় সময়ে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিবে। এবং তাহাকে প্রণাম করিবে, ইহাতে চক্ষের জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল হয়।

শিষ্য।—গুরুদেব! এত প্রত্যূষে গাত্রো-খান কি ভাল? শরীর অসুস্থ হইবে যে, ঠাণ্ডা লাগিবে যে?

গুরু।—বৎস! শরীরের অসুস্থতা নিবা-রণের জন্যই শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিয়াছেন এবং আমাদের আর্য্য ঋষিগণ সেই অনুসারে কার্য্য করিয়া নিরোগ এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে :—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীর্মধুনক্ত মুতোষসঃ মধুমৎ

পার্থিবং রজঃ ইত্যাদি।

প্রাতঃকালের সমীরণ মধুময়, জল এবং পৃথিবীর ধূলি, পুষ্পবৃক্ষ মধুময় হয়। মধু-বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ নাশক গুণসম্পন্ন। প্রাতে এই সকল স্পর্শ করিলে ত্রিদোষ নাশ হইয়া ত্রিবিধ গুণের সমতা প্রাপ্ত হয়—ঐ তিন গুণের সমতা রক্ষিত হইলে শরীর সুস্থ থাকে, মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে শৌচাদির সময় জল স্পর্শ করা এবং প্রাতঃসমীরণ গাত্রে লাগান বিশেষ উপকারী জানিবে। কত লোক এই প্রাতঃভ্রমণে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল মুক্ত হইয়া সবল ও সুস্থকায় হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল, তুমি আচরণ করিলেই বুঝিতে পারিবে। উক্তরূপ আচরণ স্বধর্ম্ম, সদাচার, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায়—ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মানুষ যে অল্পায়ু হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শিষ্য। প্রভু! ধর্ম্ম জিনিষটা কি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কি করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়। আমাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিন।

গুরু। যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ। ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করে, ধর্ম্ম পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধারণ করে যে তাহাই ধর্ম্ম। যাহা হইতে আত্মোন্নতি ও পরম মঙ্গল সাধিত হয়—তাহাই ধর্ম্ম। যাহার দ্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে—তাহাই ধর্ম্ম। ইহার বিপরীত অধর্ম্ম। ধর্ম্মের দ্বারা সকল বস্তুর পবিত্রতা সাধিত হয়—অধর্ম্মের দ্বারা সমস্ত দূষিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম এই বিশাল বিশ্ব সংসারকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া ইহার কোন প্রকার ব্যত্যয় সাধিত হয় না।

শিষ্য। প্রভু! ধর্ম্মের লক্ষণ কি?

গুরু।—অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ, দানং দমো দয়া ক্ষান্তি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনং। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ধর্ম্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম হইতেই সব পাওয়া যায়—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে কাম, আর ধর্ম্ম হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুমি জগতে যে কোন কার্য্য করিতে যাও, যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টা কর না কেন, তাহাকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, ঠিক ভাবে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে হইলে ধর্ম্ম আশ্রয় তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। অধর্ম্মে যাহা সিদ্ধ তাহার ফল বেশী দিন থাকে না; অচিরে ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া তাহাকে অধঃপাতে ফেলিয়া দেয়। ভারত যে এত উন্নত হইয়াছিল, এত জগৎমান্য এবং তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যে এত বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল—ধর্ম্মবলই তাহার প্রধান কারণ, এখন যে এত অবনত, অপদস্থ; পদানত হইয়াছে, ধর্ম্মহীনতাই তাহার কারণ নয় কি?

ধর্ম্মই ঈশ্বর-লাভের একমাত্র উপায় এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিই সূর্য্যের ন্যায় তেজপ্রতাপসম্পন্ন। আমার বোধ হয় সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ এরূপ আছে, আমার ত অন্য শাস্ত্র গ্রন্থ কিছু জানা নাই; জানা থাকিলে বুঝাইয়া দিতাম।

শিষ্য।—হাঁ প্রভু! আমরা ইংরাজের পরম পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রেও পড়িয়াছি :—

For I say unto you, that except, your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and pharisees, ye shall in no case enter into the Kingdom of Heaven বাইবেল আরও বলেন,—Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their father.

গুরু।—তবেই বল দেখি বাপু! ধর্ম্ম ছাড়া, ধর্ম্মের উপদেশ ছাড়া কোন ধর্ম্মশাস্ত্র আছে; কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া চলি কয় জনে? বাবা! অধার্ম্মিকগণের আশু উন্নতি দেখিয়া কখন মুগ্ধ হইও না, কখন অধর্ম্মে মজিও না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধর্ম্ম দ্বারা প্রথমে মানুষ বাড়িয়া উঠে বটে কিন্তু তাহার পরিণাম অতিশয় ভয়ঙ্কর, দেখিতে দেখিতে সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য।—সদাচারপরায়ণ না হইলে কি ধর্ম্ম হয় না?

গুরু।—না, স্মৃতিশাস্ত্র ইহা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন। তস্মাদক্ষিণ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাচারবান দ্বিজঃ। সদাচারবান মানব দীর্ঘজীবী হয়--দীর্ঘজীবন লাভের শাস্ত্র সম্মত এমন সুন্দর উপায় আর নাই। সদাচারের অনেক গুণ, মনের মত সন্তান লাভ করিতে হইলে আচার সম্পন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ধন রক্ষা করিতে হইলেও আচারবান হওয়া বিশেষ দরকার। কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—

"আচারো পরমোধর্ম্ম আচারো পরমন্তপঃ,
আচারাবর্দ্ধতেহ্যায়ুরাচারাৎ পাপসংক্ষয়।"

শিষ্য।—আচ্ছা ঠাকুর, আমরা অনাচারী হইয়াই কি এত পীড়ার আকর হইয়াছি।

গুরু।—অনাচারেই ত যত পীড়া আসিয়া যুটে, অনাচারী হইলেই সে অপরিষ্কৃত হইবে, আমরা যেরূপভাবে বিশুদ্ধ হইয়া থাকি, আচারবিহীন ব্যক্তিগণ কখন সেরূপ পারিবে না—বা তাহা গ্রাহ্য মধ্যে আনিবে না। এই জন্যই পীড়া হয়। পূর্ব্বে আমাদের এত রোগভোগ করিতে হইত না, নানা প্রকার ব্যাধির প্রকোপও দেশে ছিল না। যত অধর্ম্ম ও অনাচারের বৃদ্ধি হইতেছে, নানা প্রকার ব্যাধিও তত দেশকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তুমি অনাচার দোষটা পরিহার করিবে—তাহা হইলে আর পীড়া ভোগ করিতে হইবে না।

শিষ্য।—প্রভু! আপনার বাক্য বেদবাক্য রূপে প্রতিপালন করিব, তবে যাহা সাধ্যাতীত হইবে তাহার আর উপায় কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার পাদপদ্ম সদা-সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া আপনার উপদেশমত কার্য্য করিতে পারি, ভ্রমেও যেন আর কখন অধর্ম্ম সঞ্চয় করতে না হয়।

গুরু। বৎস! ইচ্ছায় সকল কার্য্য সাধিত হয়, মনোগত ইচ্ছা বলবতী হইলে কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে ভগবান সহায় হন। আজ আর নয়, আর এক দিন তখন সমস্ত বলিব।

সম্পাদক।

ঐতিহাসিক সমস্যা।

প্রকৃত ইতিহাসের একান্ত অভাব। কোন দেশেরই আদিম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের কথা—প্রকৃত ইতিহাসের একান্ত অভাব, ভাট ও চারণেরা ঘটনা সমূহ যে ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের ইতিহাস। এ দেশের রাজন্যবর্গ পূর্ব্বপুরুষদিগের যশোভাগ্যের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন। কেবল তাহাদিগেরই জন্ত বংশাবলী বা যুদ্ধ-বিবরণ রচিত হইত, যাহা রচিত হইত তাহাও জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইত না, সেজন্ত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি লোপ পাইয়াছে। আবার কোন রাজবংশ লোপ পাইলে সে বংশের কীর্ত্তি-কলাপ আর গীত হইত না। অনেক রাজবংশের ইতিহাস পাওয়াই যায় না। পুরাণাদিতে কিছু কিছু বিকৃতভাবে পাওয়া যায় মাত্র। তাহাই এক্ষণে জাতীয় ইতিহাস। পুরাণ হইতে সত্য সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাও আনুমানিক। কিছু কাল পরে তাঁহাদেরও অনেক কথা বাদ দিতে হইবে।

যে আর্য্যজাতি হইতে হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমান, দেন বা জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি সমুদ্ভূত, তাহাদের আদি নিবাস কোথায়? এক্ষণে এক জন পণ্ডিত বলিতেছেন যে তাহারা বল্টিক সাগরের তটে বাস করিত। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সকলেই জানিত যে তাহারা পীবার মধ্যস্থলে ছিলেন এবং অন্যান্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা সে কথা উড়াইয়া দিতে চান, আমরাও লর্ড ক্লাইভ বা পলাশীর যুদ্ধ উড়াইয়া দিতে পারি, পল মাত্র উত্তোলিত অসি (=পলাসি) ক্লীবগুণ যুক্ত (ক্লৈব) কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় স্বরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে ঐ সকল পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তের কোন আভাস পাই না। কারণ অতি পুরাকাল হইতে নানা জাতি নানা কারণে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, আর্য্যজাতি যে সিন্ধু-নদীর পূর্ব্বপারে বাস করিত এবং তাহাদেরই বংশ ক্রমে পঞ্জাব অধিকার করে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে অনার্য্য জাতির সহিত তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধের ফলে কয়েক দল শূদ্র নামে আর্য্য-সমাজভুক্ত হয়।

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। নিজ নিজ কল্পনা ও যুক্তি অনুসারে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছেন। রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এমন কি ব্যাসদেব বলিয়া কেহ ছিলেন একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, গুজরাটে তাঁহার জমীদারী ছিল। ব্যাসদেব কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না—বেদ সংগ্রহকারীদের সমষ্টিকে ব্যাসদেব বলা যায়।

যাহারা বলেন—কলিযুগে আর্য্য জাতি ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মতে খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যেরা পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের

মতে খৃঃ পূঃ ৩০০০ তিন হাজার হইতে খৃঃ পূঃ ২০০০ দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সত্য যুগ, খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত ত্রেতাযুগ। খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত দ্বাপরযুগ, তারপরে কলিযুগ। সরস্বতী নদীর নিকটে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে যে বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়—তাহা শিরোধার্য্য, এই সময়ে পঞ্জাবেরই এক একটী সমাজ এক একটী রাজ্যে পরিণত হয়, অনেক পরে সূর্য্য, চন্দ্র, যদু, কুরু প্রভৃতি রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। সত্য-যুগে জাতিভেদ ছিল না—একথা বলা যায় না, কারণ আর্য্য ও অনার্য্য নামে দুই জাতি ছিল, সে সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই, তবে কোন্ সময়ে রামায়ণ বা মহাভারত রচনার সূত্রপাত হয়, কোন্ সময়ে কল্পসূত্রাদির উৎপত্তি, পাণিনি কোন শতাব্দীতে ব্যাকরণ রচনা করেন বা কপিল দেব কোন্ সময়ে সাংখ্যদর্শন রচনা করেন ইত্যাদি অনেক কথার উত্তর দেওয়া যায় না।

শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেব-তত্ত্ব।

আমাদের এই পৃথিবী সৌর-জগতের মধ্যে একটী গ্রহমাত্র হইতেছে। এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে, এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা উচিত, কিন্তু আমরা পৃথিবীর অধিবাসী জীব বলিয়া পৃথিবীকে গ্রহ না বলিয়া চন্দ্রকে গ্রহ বলিয়া থাকি। সেইরূপ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহও চন্দ্রসহ পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যও এই কয়েকটি গ্রহ লইয়া একটি সৌরজগৎ ধরা হয়। এই সৌরজগতের আকার ডিম্ব সদৃশ গোলাকার বলিয়া এই সৌরজগৎকে আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড নাম দেওয়া হইয়াছে। যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই সেই সূর্য্য এবং ইহার চতুর্দ্দিকের উপরে উক্ত গ্রহাদি ও আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্র লইয়া আমাদের সৌরজগৎ অর্থাৎ আমাদের ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দেবী ভাগবত, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে বরং ধূলিকণার সংখ্যা হইতে পারে তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা করা যাইতে পারে না, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এতাদৃশ এত অধিক পরিমাণ ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে যে তাহাদের সংখ্যা অনন্ত কোটী বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের এক এক অধিপতি থাকার উক্তি দেখা যায়, আবার এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রহেরও এক একটি করিয়া অধিপতি আছেন। সাধারণতঃ ইঁহারা দেবস্থানীয় হইতেছেন।

প্রণববাদ নামক একখানি অতি প্রাচীন লুপ্ত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ ঋষি গার্গায়ণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন, স্বয়ং মহাদেব প্রণবার্ণব নামে একটি শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিয়া যান, সেই গ্রন্থ যখন মানব মধ্যে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ রাখা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল তখন ঋষি গার্গায়ণ উক্ত গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়া ও কাট-ছাট করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রচার

করেন। এই গ্রন্থখানি ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রচার ছিল, ক্রমে ইহার প্রচার বন্ধ হয়, প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহার ইংরাজিভাষায় সংক্ষেপ মর্ম্ম মাত্র প্রচার হইয়াছে. এই গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ দেখা যায়।

এক সূর্য্য সাত গ্রহ সহ—একটি ব্রহ্মাণ্ড, ইহার অধিপতিকে ঈশ্বর কহে।

এইরূপ সাত ব্রহ্মাণ্ডে—একটি জগত, ইহার অধিপতিকে হরি কহে।

এইরূপ এক সহস্র জগতে একটি বিশ্ব, ইহার অধিপতির নাম হর।

এইরূপ পোনের কোটী বিশ্ব লইয়া এক মহাবিশ্ব হয়, ইহার অধিপতির নাম পরেশ্বর।

উক্তরূপ দুই শঙ্খ পরিমাণ মহাবিশ্ব লইয়া এক লোক হয়, এই লোকের অধিপতি পরমেশ্বর।

এক মহাশঙ্খ লোক একত্র করিয়া একটি মহালোক হয়, ইহার অধিপতি একজন মহেশ্বর।

এক শত পদ্ম মহালোক লইয়া একটী সংসার হয়, এই সংসারের অধিপতিকে মহাবিষ্ণু আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এই সংসারের পর কিরূপ নিয়মে কার্য্য চলিতেছে, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। উক্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডাদিদেশকে এইরূপে বিভাগযুক্ত প্রকাশ করিয়া কাল অর্থাৎ সময় সম্বন্ধে যেরূপ বিধান দেখাইয়াছেন তাহাও এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বর্ষ, ত্রেতাযুগ ১২,৯৬,০০০ বর্ষ, দ্বাপর যুগ ৮,৬৪,০০০, কলি যুগ ৪,৩২,০০০ বর্ষ। এই চারি যুগে এক চতুর্যুগ। এইরূপ এক সহস্র চতুর্যুগে এক বিযুগ, সহস্র বিযুগে এক মহাযুগ ও সহস্র মহাযুগে এক কল্প হইয়া থাকে। শত কল্পে এক মহাকল্প, চতুর্দ্দশ মহাকল্পে এক চক্র, চতুর্দ্দশ চক্রে এক নিষ্ঠা, চতুর্দ্দশ নিষ্ঠায় এক মনুর কাল, দুই মনুতে এক মন্বন্তর হয়। চৌদ্দ মনুর কাল, অর্থাৎ সাত মন্বন্তরে এক মহামন্বন্তর হইয়া থাকে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যোগী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উন্নত জ্ঞানীগণ চরম জ্ঞান লাভ করিয়াও এক মহামন্বন্তর কাল ব্যাপী ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই মহামন্বন্তরের অধিকার এক মহাবিষ্ণুর। এইরূপ মহাবিষ্ণুর অধিকারের বাহিরে মহাব্রহ্মা, মহা শিব প্রভৃতিগণ আছেন কি না এবং তাঁহারা মহাবিষ্ণুর মত অপর কোন সংসার আখ্যায় সীমাবদ্ধ বিরাট, অতি বিরাট রাজ্যের অধিপতি রূপে বিরাজ করিতেছেন, কি না, অথবা এই মহাবিষ্ণুর উপর অপর কেহ মহা-মহাবিষ্ণু আছেন কি না, তৎসম্বন্ধে এই বিরাট সংসার-ব্যাপী জীবগণের জ্ঞানলাভের কোন অধিকার নাই।

আমরা যতই উন্নতি লাভ করি না কেন, যতই সাধনা মার্গে অবস্থান করি না কেন, এই নির্দ্দিষ্ট সীমা ও নির্দ্দিষ্ট কালের বাহিরের জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। এমন কি আমাদের মুক্তিলাভ ঘটিলেও তাহা এই মহা মন্বন্তরের সীমা পর্য্যন্ত কাল ব্যাপী হইবে; এবং আমাদের দেশ অর্থাৎ স্থান হিসাবে এই সংসার নামক সীমাবদ্ধ বিরাট স্থানের বাহিরে যাইবার

অধিকার নাই ও বাহিরের স্থানের জ্ঞান লাভ বা উদ্দেশ লাভে আমরা বঞ্চিত।

একণে আমরা বুঝিলাম যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ও তাহাদের কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড যে স্থানে রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ আমাদের শূন্য বলিয়া বোধ হয়, শাস্ত্রে এই স্থানকে কারণার্ণব বা কারণ-সমুদ্র বলা হয়। ইংরাজি মতে এই স্থানকে Space বলা হয়, এবং ইহা ইথার নামক পদার্থে পূর্ণ, অনেকে এই ইথারকে আমাদের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে মরুৎ নামক ভূতের প্রতিশব্দ মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ইথার মরুত নামক ভূতের প্রতিশব্দ হইতে পারে না। এই ইথারকে একণে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ভিন্ন নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল যে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অন্তবর্ত্তী শূন্যাকার স্থান কোইলন (Kollon) নামক মূল প্রকৃতিতে পূর্ণ, বিজ্ঞান সম্প্রতি এই কথা প্রচার করিতেছেন। কাজেই আমরা বুঝিলাম যে কোইলন, ইথার, কারণ-সমুদ্র যে নামই বলি না উহার অর্থ এই যে ব্রহ্মাণ্ড সকল যে স্থানে ভাসিতেছে তাহা অবিকৃত প্রকৃতিতে পূর্ণ।

ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে আমরা মাটী সংগ্রহ করিয়া থাকি, সেই মাটীকে বেশ করিয়া মাখিয়া নরম করিয়া কাদা করি। আমি কর্ত্তা মাটি মাখিয়া কাদা করিতেছি। মাটী এই জিনিষ লইয়া কাজ করিতেছি। সেইরূপ কর্ত্তার দুই অংশ একজন কর্ত্তা তাঁহাকে পুরুষ বা চৈতন্য বা শিব আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি যে জিনিষ লইয়া কাজ করেন, তাহা প্রকৃতি, প্রধান, মহৎ কারণ, সমুদ্র প্রভৃতি আখ্যায় আমাদের শাস্ত্রে অভিহিত। এই প্রকৃতিকে লইয়া মাটী মাখিয়া কাদা করার ন্যায় কাজ করাকে, সৃষ্টির আদি বলা যায়, এই জন্য এই অবস্থার প্রকৃতিকে আদিতত্ত্ব বলা হয়, ইহার পরে বিকৃতি করায় প্রকৃতির যে অবস্থা হয়, তাহাকে অনুপাদকতত্ত্ব, তৎপরে আরও বিকৃতি করায় ব্যোমতত্ত্ব হয়, এই স্থানে রূপ অর্থাৎ প্রকৃতির আকার হইতে থাকে, ইহার পরে মরুৎতত্ত্ব, তৎপরে তেজঃ-তত্ত্ব, তৎপরে অপ্-তত্ত্ব, তৎপরে ক্ষিতি-তত্ত্ব অবস্থায় সৃষ্টির শেষ হয়। এই ক্ষিতি-তত্ত্বে প্রকৃতি কঠিন (Solid) অবস্থায় হয়। মাটী পুড়িয়া শক্ত কলসী হয়। তৎপূর্ব্বে অপ্-তত্ত্ব অবস্থায় প্রকৃতি তরল (Liquid) অবস্থায় থাকে। তৎপূর্ব্বে তেজ-তত্ত্ব অবস্থায় প্রকৃতি বাষ্পের মত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় কতকটা পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি-গোচর থাকে। ইহার পরের প্রকৃতির অবস্থা সকল আমাদের দৃষ্টির বাহিরের অবস্থা।

এই অনন্ত কারণ-সমুদ্রের কতক অংশ লইয়া আমাদের কথিত সংসার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংসারের অধিপতি মহাবিষ্ণু হইয়াছেন, তিনি এই সংসারের ভিতর ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ এই সংসারটী তাঁহার বিরাট শরীর, এই সংসারের অন্তর্গত মহালোক, লোক, বিশ্ব, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ইহার শরীরের অংশমাত্র, আমরা জীবরূপ সেই বিরাট দেহে অণু অপেক্ষা অণু ক্ষুদ্রাদপি

হইলেও ঐ দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। বায়ু যেমন কোন স্থানে নাই এমন নহে, সেইরূপ মহাবিষ্ণুর দেহ কোন স্থানে নাই এমন স্থান নাই। মানব দেহে যেমন রস-রক্ত-মাংস, অস্থি, মজ্জা, নাড়ী, ধমনী প্রভৃতি অনেক রকম অবস্থায় অস্তিত্ব দেখিতে পাই, সেই বিরাট মহাবিষ্ণুর দেহে সেইরূপ এক একটী ব্রহ্মাণ্ড, এক একপ্রকার জীবাদির অবস্থার প্রকারান্তর মাত্র।

বিজ্ঞান বলেন—আমাদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর দ্বারা গঠিত, এই অণু সকলকে সেলস্ (cells) কহে। আমাদের ভোজন দ্বারা এই অণু সকলের সৃষ্টি হইতেছে, এবং পরিশ্রম দ্বারা অণু সকলের ক্ষয় অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে; এইরূপে আমাদের দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে অণু সকলের মৃত্যু ও জন্ম হইতেছে। আমাদের দেহে এক্ষণে যে সকল অণু আছে, সাতবর্ষ পরে এই অণুসকলের একটীও থাকিবে না। সমুদায় নূতন অণুতে আবার দেহ পূর্ণ হইবে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত, এই জন্যই দেহ পবিত্র করিতে, অথবা জোজীদের দেহ পবিত্র হইতে, সাত বৎসর লাগিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়, আমাদের দেহে প্রতিনিয়তই যখন অণু সকলের মৃত্যু হইতেছে ও নূতন অণুর জন্ম হইতেছে, অথচ এই জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা আমাদের দেহের অবস্থান্তর বিশেষভাবে আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না, সেইরূপে সেই মহাবিষ্ণুর দেহে প্রতিনিয়ত আমাদের জন্ম-মৃত্যু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় দ্বারা তাঁহার বিরাট দেহের কিছুই ইতর বিশেষ অনুভব যোগ্য অর্থাৎ ধর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে না বলিয়া বেশ বুঝা যায় না কি?

এই মহাবিষ্ণু একটী দেব, এইরূপ শ্রেণীর অর্থাৎ লোক, মহালোক, মহাবিশ্ব, বিশ্ব, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির অধিপতি স্বরূপে পরমেশ্বর, মহেশ্বর, পরেশ্বর, হর, হরি, ঈশ্বর এই আখ্যাধারী অসংখ্য দেবতারও অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারিলাম। ইহারা সৃষ্টির অন্তর্গত লোক সকল শাসন জন্য কার্য্য করিতেছেন, সকলেরই কার্য্যের কাল ও বিধান রহিয়াছে ও সীমা নির্দ্দেশ করা রহিয়াছে। এইরূপে আবার ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর গ্রহগণেরও এক এক অধিপতি আছে, ইহারা নিজ নিজ অধিকারস্থ গ্রহের মধ্যে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ও গ্রহের স্থিতি পোষণ আদি করিতেছেন। এই যে গ্রহ সকলের নিয়মিত গতি আমরা দেখিতে পাই, এই অধিপতি দেবগণই সেই গতির চালনা করিয়া থাকেন।

আমাদের পৃথিবীর অধিপতি যিনি তাঁহাকে পৃথিবী অভিমানিনী বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি আছে, আবার অনেক স্থলে ইহাকে বিষ্ণু আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবী সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই কয়েকটী গ্রহের এক একজন অধিপতি আছেন। ইহাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নানা প্রকার নাম দেওয়া হইয়াছে, সাধারণতঃ ইহাদিগকে লোকপাল বলা হইয়া থাকে, ইহারা আমাদের সূর্য্যদেবের সপ্ত রশ্মিঘটিত সাত জন দেবতা ব্যতীত আর কেহই নহেন। ইহাদের উপর সেই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ

যাহার শরীর হিরণ্ময়, তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রধান পুরুষ। ইঁহারই অধীনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সাত গ্রহের অধিপতি লোকপালগণ সকলেই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত নারায়ণের (ঈশ্বরের) অধীন। ইহারা সূর্য্য মণ্ডল হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহা নিজ শরীরে পোষণ করিয়া সেই শক্তি গ্রহস্থিত জীবগণের সৃষ্টি, স্থিতি, পোষণ কার্য্যে উক্ত মহাপুরুষের সঙ্কল্প মতে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতির কোন মাসিক পত্রিকায় সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী এই দেবতার সম্বন্ধে একটী সুন্দর টিপ্পনী বাহির হইয়াছিল, আমরা তাহা এস্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "সৃষ্টি বা মন্বন্তর কালে সূর্য্যদেব সৌর-জগতের হৃদয়-কমলে অবস্থিত হইয়া সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার জীবন স্রোত সঞ্চালিত করেন। মানব-দেহে রক্তের সঞ্চালন করিতে যেমন এক সেকেণ্ড লাগে, সেই সৌরমণ্ডলে সৌরপ্রাণ সঞ্চালন হইতে দশ বৎসর লাগে। তদুপরি এক বৎসর আদিত্য হৃদয়ের মধ্যস্থ যন্ত্রাদির মধ্যে সঞ্চালন করিতে লাগে। ইহাই তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ব্ল্যাভাটস্কির কথা। সূর্য্যের প্রাণ সঞ্চালন ১১ বৎসর, আর লয়স্থানে অব্যক্তভাবে স্থিতি ১ বৎসর, সুতরাং ১২ বৎসরে সূর্য্যের যাহা হয়,আমাদের দেহে এক সেকেণ্ডে সেই সঞ্চালন হয়, ইহা হইতেই সূর্য্যের এক দিন হইতে আমাদের কত বৎসর লাগে—তাহা স্থির করা যায়। এই হিসাব মত আবার ব্রহ্মার এক দিন, ইন্দ্রের এক দিন, পিতৃগণের এক দিন প্রভৃতির পরিমাণ শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।"

উপরি উক্ত অধিপতি দেবতাগণ এক এক গ্রহ বা ব্রহ্মাণ্ড, বা অনেক ব্রহ্মাণ্ডের শাসন ও পালনের কর্ত্তারূপে কার্য্য করিতেছে না। ইহাদের অধীনে অসংখ্য অসংখ্য দেবতা নানা প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সকল দেবতাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, প্রজাপতি, সিদ্ধ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর দেবতা, ইহাদের উপরে লোকপাল ও লিপিকা। বিশ্বদেব, কামদেব, পিতৃদেব, কুমার প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেণী আছে।

দেবগণ যে কেবল সুখে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়ান—তাহা সত্য নহে,ইহারা এই বিশাল সংসার মধ্যে নানা প্রকার গুরুতর কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহারা সচরাচর ভূলোক ব্যতীত ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহালোক, জনলোক, তপঃলোক ও সত্যলোক এই ছয় লোকেই বাস করিয়া থাকেন, ভূলোকে তাহারা বাস করেন না, ইচ্ছা করিয়া বা মানবের আহ্বানে আসিয়া থাকেন মাত্র।

মানবের যেমন ভূলোকই সাধারণ বা মুখ্য বাসস্থান, সেইরূপ দেবতাদের মুখ্য বাসস্থান স্বর্গলোক। দেবতাদের মধ্যে যাহারা সাধন মার্গে উন্নত তাঁহারা মহ, জন, তপ ও সত্য-লোকেও থাকেন। আবার বিশ্বদেব, বায়-

দেব ও দেবযোনি অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর, পৈশাচ, গুহ্যক, বিদ্যাধর প্রভৃতি ভুবর্লোকে বাস করেন। যিনি যে লোকে থাকেন, সেই লোকের অনুরূপ পদার্থে তাঁহার দেহ গঠিত হইয়া থাকে। আমরা ভূলোকে থাকি, ভূলোক ক্ষিতিতত্ত্ব, আমাদের দেহ ক্ষিতিতত্ত্বপ্রধান অর্থাৎ কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত। যিনি ভুবর্লোকে থাকেন তাঁহার দেহ ভুবর্লোকের অপ্‌ তত্ত্বের দ্বারা তরল পদার্থে দেহ গঠিত, স্বর্গলোকবাসীর দেহ তেজস্তত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ উজ্জ্বল বাষ্পীয় পদার্থে গঠিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল, এফ-টি-এস্।

অনাদিলিঙ্গ গুপ্তেশ্বর।

ভারত-সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান বিভাগানুসারে যাহা এখন "মধ্য প্রদেশ" বা Central Provinces বলিয়া বিখ্যাত তাহার সীমার মধ্যেই এই গড় মণ্ডল। রাণী দুর্গাবতীর নাম ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। রাণী দুর্গাবতীর শৌর্য্যবীর্য্য অসীম ক্ষমতা ও আকবরের সহিত সংগ্রাম ও পরাজয় অনেকেই অবগত আছেন। এই গড়মণ্ডল গরীয়সী রাণী দুর্গাবতীর রাজধানী ছিল।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, আর সেই গরীয়সী রাজ্যেশ্বরী মহারাণী দুর্গাবতীও নাই, আর তাঁহার লোকবিশ্রুত রাজধানী গড়মণ্ডলও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। যাহা এক সময়ে ধনজনপূর্ণ ছিল, শৌর্য্যবীর্য্য এবং প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ ছিল, যে গড়মণ্ডলেশ্বরীর গৌরবময় কীর্ত্তিগাথা তাহার সেনাপতি আসফ খাঁ, সম্রাট আকবরের নামের সহিত চিরদিন বিজড়িত আজ সেই গড়মণ্ডল "গড়া" বা "গড়হা" নামধেয় এক সামান্য গ্রামে পরিণত। সে গড়মণ্ডলের অতীতের ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু ছিল—সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। আছে কেবল এক শোক-গীতিমাখা করুণস্মৃতি। আজ বড় অনিচ্ছার সহিত সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে হইতেছে।

এই "গড়হা" "গড়া" বা গড়মণ্ডলের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জব্বলপুরের অতি সন্নিকটে। যাহা এক সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজধানী ছিল, তাহা সামান্য গণ্ডগ্রামে পরিণত। কাল অতি নিষ্ঠুরের মত, অতীতের সেই সমুজ্জ্বল গৌরবময় স্মৃতিকে মুছিয়া দিয়া এখন তাহার স্থানে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রাখিয়া গিয়াছে।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কোন জরুরি সরকারী কার্য্যের জন্য আমায় জব্বলপুরে যাইতে হয়। সেই সময়ে আমি গড়মণ্ডলের অদূরে জঙ্গলের মধ্যে পরিভ্রমণকালে কোন স্থানীয় লোকে আমায় সন্ধান দিল—এই গড়-মণ্ডল হইতে তিন ক্রোশ দূরে রাণী দুর্গাবতীর প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী পাহাড় খুদিয়া নির্ম্মিত। প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাতন! এই পাহাড়গর্ভস্থ মন্দির বিরাজিত দেবতার নাম "গুপ্তেশ্বর অনাদি লিঙ্গ।"

কথাটা শুনিবামাত্রই একবার গুপ্তেশ্বরকে

দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ও আমার একটী বন্ধু—এক জন পথ-প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া পরদিনের নির্ম্মল উষায় এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

গুপ্তেশ্বরের মন্দির বাস্তবিকই দেখিবার জিনিস। প্রকাণ্ড পাহাড়ের গায়ে মন্দিরাকারে একটী স্থান কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই মন্দিরের দ্বার নাই। মন্দির মধ্যে কাশীধামের বিশ্বনাথ দেবের মত লিঙ্গমূর্ত্তি।

একজন ধনী মারোয়ারী মহাজন এই পর্ব্বতবক্ষঃ মধ্যস্থ গুপ্তেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে একটী "নাটমন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বহুশত বৎসর কাল এই মন্দিরটী বনজঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এই নাটমন্দির নির্ম্মিত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। নাটমন্দিরের চারিপার্শ্বে কয়েকটী ঘর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ঘরে কেহই নির্দ্ধারিতরূপে বাস করে না। তবে কোন সাধু সন্ন্যাসী আসিলে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। কারণ সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। এই অনাদিলিঙ্গ গুপ্তেশ্বরের একজন পূজক আছেন, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। মহাদেবের নিত্য পূজা আর সাধু সন্ন্যাসীর খবর লওয়াই তাঁহার কাজ।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম,লোকটী অতি নিষ্ঠাবান, অতি সরল হৃদয়। তিনি বলিলেন—"রাণী দুর্গাবতী একদিন স্বপ্নাদেশ পান—"তোর ইষ্টদেবতা আমি, অনাদৃত ভাবে পড়িয়া আছি। শীঘ্রই আমার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দে

এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাণী বড়ই বিচলিতা হইয়া পড়েন। তিনি এই অনাদি লিঙ্গের সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠান। বহু অনুসন্ধানের পর জঙ্গলমধ্যে এই গুপ্তেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।

পুরোহিত ঠাকুর আরও বলিলেন—"রাণী পর্ব্বত-গহ্বর হইতে এই লিঙ্গমূর্ত্তিটী উঠাইয়া লইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও তাহা স্থানভ্রষ্ট হইল না। পাঁচ সাত হাত খননের পর দেখা গেল তখনও জমীর মধ্যে পাথরখানি অটলভাবে গাড়িয়া আছে। সুতরাং এ চেষ্টার বিরাম এইখানেই হইল।"

এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, চার পাঁচ পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা এই দেবমন্দিরের পূজকগিরি করিতেছেন। গুপ্তেশ্বরের সেবার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি আর কয়েকটী আম্র-কানন সমর্পিত আছে। এই পূজক ব্রাহ্মণ তাহাতেই অনাদিদেবের নিত্যসেবা চালাইয়া থাকেন।

মন্দিরের বাহিরে দুইটী কূপ আছে। এই কূপ দুইটীর নাম গঙ্গা-যমুনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কূপটী গঙ্গা বলিয়া খ্যাত—তাহার জল দুধের মত সাদা। দুই চারি গণ্ডুষ পান করিয়া বুঝিলাম অতি সুমিষ্ট, অতি স্নিগ্ধ। যমুনাকূপের জল—মিশ কালো। খাইতে গঙ্গাকূপের জলের মত নয়।

আগামীবারে গৌরীঘাটের কথা পাঠকবর্গকে বলিব। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা জব্বলপুর ভ্রমণে যাইবেন—তাঁহারা যেন

একবার এই অনাদিলিঙ্গ ভবেশ্বরকে দেখিয়া আসেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ত্যাগ ও ভোগ।

মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে হইলে ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এ কথা হিন্দুশাস্ত্র পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছে। যদি পাশ্চাত্য মতে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ডারউইনের কথায় আমাদিগকে বলিতে হয় যে, মনুষ্যের মনুষ্যাকার প্রাপ্তিও এই ত্যাগ-ধর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। যাঁহারা ডারউইনের মতের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা এই কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্য সর্ব্বদাই ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, পরম পিতা পরমেশ্বর তাহাকে যে মন দিয়াছেন, তাহা তাহাকে উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু ত্যাগ-স্বীকার ভিন্ন এ উন্নতি সম্ভবপর নহে।

ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা মনুষ্য বিপুল মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া ও মানসিক বল সঞ্চয় করতঃ দেবতার আসনও টলাইতে পারেন। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। সর্ব্বত্যাগী, মহর্ষী, পুণ্যাত্মা ঋষিগণ যখনই কঠোর তপস্যায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তখনই ইন্দ্রদেবের মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে, ঐকান্তিক অনুশীলনের দ্বারা মানস রাজ্যে যে অদ্ভুত শক্তিলাভ করা যায়, তাহা আজকাল পাশ্চাত্য-দর্শনকেও ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে।

আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি—তাহা আমাদিগকে অহরহঃ ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; সেই প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, ভোগ-বাসনা ত্যাগের নামই সংযম। যাঁহার মনে এই সংযমের উজ্জ্বল বহ্নি জ্বলিতে থাকে, তাহার নিকট ইন্দ্রিয়-বাসনা সমস্ত ছারখার হইয়া যায়। তিনি ক্রমে ক্রমে মানবত্বের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকেন। আর যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ভোগের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া আপন-হারা হইয়া যান, তিনি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যত্বের নিম্ন স্তরে নামিতে নামিতে পশুত্বের সীমায় আসিয়া উপনীত হ'ন, তখন তিনি মনুষ্যাকারে পশু হইয়া পড়েন; আহার, বিহার, মৈথুন প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে পশুর আমোদ, ঠিক সেই সকল বিষয়ে তাহারও আমোদ হইয়া থাকে। তাই বলি ত্যাগে স্বর্গ, ভোগে নরক; ত্যাগে দেবত্ব, ভোগে পশুত্ব; ত্যাগ কার্য্য, ভোগ ত্যাজ্য। ত্যাগ ও ভোগের যথাক্রমে সারবত্তা ও অসারতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে। নিম্নে কয়েকটী দেওয়া যাইতেছে:—

"ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসায় চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥"—

মনুঃ ৬।৬০

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, রাগ দ্বেষাদির ক্ষয় ও প্রাণিমাত্রের অহিংসা দ্বারা মনুষ্য অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হয়।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

মনু ২। ৯৪

অর্থাৎ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥"

মনু ২। ৯৯

সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয় দূষিত হয়, তদ্দ্বারা লোকের প্রজ্ঞাক্ষয় হয়। যেমন কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলেই তদ্দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়।

"রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টং
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়ণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথব ধীরঃ॥"

মহাভারত; বনপর্ব্ব ২১০। ২৩

অর্থাৎ পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্বযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ পরমসুখে সঞ্চরণ করে।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

ভীষ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ যদি মন স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলময় করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

"অর্থানামীশ্বরোঃ যঃ স্যাদিন্দ্রিয়ণামনীশ্বরঃ
ইন্দ্রিয়ণামনৈশ্বর্য্যাদৈশ্বর্য্যাদ্ ভ্রশ্যতে হি সঃ॥"

উদ্যোগপর্ব্ব ৩৩। ১১০১

অর্থাৎ যিনি অর্থের অধীশ্বর, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর নহেন বলিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে চ্যুত হয়েন।

"সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈবকুর্ব্বন কারয়ন্॥"

গীতা—৫।১৩।

বশীভূতেন্দ্রিয় অনাসক্ত পুরুষ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করেন, আত্মা নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ-মন্দিরে বিরাজিত থাকিয়া কি স্বয়ং কিংবা অন্য দ্বারা কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না।

এইরূপ ত্যাগ ও ভোগ সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ আমরা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হই। ইহা ব্যতীত ত্যাগের যে সকল দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আজিও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কি কঠোর ত্যাগবলে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সাদরে বনবাস ক্লেশকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন, কি কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া পতিপ্রাণা সতী সীতাদেবী স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন, আর কি মহান্ সংযমের বলে বলীয়ান্ হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কখনও ভুলিতে পারিবে?

শ্রীরামচন্দ্র দেবতা, সীতা দেবী আর লক্ষ্মণও দেবতার আসন পাইয়া আসিতেছেন। এখনও শত শত নরনারী উঁহাদিগকে দেবদেবী জানে উঁহাদের মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। আর ভরত, শত্রুঘ্ন—কৈ, তাঁহাদের মূর্ত্তি কেহ বড় একটা পূজা করে না? আমি বলি, রাম, লক্ষ্মণ সীতা দেবতার আসন পাইয়া আসিয়াছেন—ত্যাগের বলে, সংযমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে; আর ভরত, শত্রুঘ্ন—সে সম্মানটুকু হারাইয়াছেন, কেবলমাত্র ভোগের আবর্ত্তে পড়িয়া।

তার পর মহাভারতের কথা ধরুন। পাণ্ডবগণ যেরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছিলেন, কৌরবগণ সেরূপ পারিয়াছিলেন কি? তাই পাণ্ডবগণের কাহিনী এখন পর্য্যন্ত লোকের মন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাই তাঁহারা দেবতা; আবার তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ সংযমী যুধিষ্ঠির সকলের অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। কিন্তু ভোগপরায়ণ কৌরবগণের নাম করিলে লোকের মনে স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামানুজ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই ত্যাগ-ধর্ম্মের—এইরূপ সংযমের এক একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-লালসাকে পদদলিত করিয়া, স্বার্থের মোহন মন্ত্রে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া, ভোগের খণ্ড খণ্ড লোভনীয় পদার্থকে দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহারা মহাপুরুষ নামে আখ্যাত হইয়া শত শত লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। যদি তাঁহারা এইরূপ ত্যাগ-ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিয়া ভোগের একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়-বাসনা চরিতার্থ করিয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগকে পূজা করিত, কে তাঁহাদের জন্য অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রত্ন-সিংহাসন পাতিয়া রাখিত? কোন্ অতীতের কোলে তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া যাইত; তাই বলি, ত্যাগে স্বর্গ, ত্যাগে অমৃত, ত্যাগে অমরত্ব; আর ভোগে ঠিক তাহার বিপরীত।

ব্যষ্টিতে ত্যাগের যে মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়া থাকে, সমষ্টিতেও সেইরূপ। কথাটা একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলি। যে জাতি বা যে সমাজ যত ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিক্ষা করিয়াছে, যত বিলাস-বিমুখ হইতে—আত্ম-সংযম করিতে শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতি বা সে সমাজ জগতে তত উন্নতি করিতে, তত সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের ব্রাহ্মণ-জাতি এই ত্যাগ-ধর্ম্মের জন্য আজিও হিন্দুর নিকট পূজনীয়, আজিও শত শত হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট নতশির। ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে, তাহা সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ নিজের জন্য রাখিলেন কি?—রাখিলেন বেদাধ্যয়ন, রাখিলেন শাস্ত্রানুশীলন, রাখিলেন জপ, তপ, আর কঠিন তপস্যা। ইহা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সম্পদ্ অন্য তিনটী বর্ণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এমন একদিন

ছিল, যখন ত্যাগের এই মহান্ আদর্শ সমগ্র ভারতকে—শুধু ভারতকেই বা বলি কেন—এই বিশাল ভূমণ্ডলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়া গিয়াছেন,—

"ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড়-দরশন,
ভারতের বেদ ভারতের কথা
ভারতের বিধি ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, যুনানী-মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।"

এখন সে ব্রাহ্মণ নাই, সে বর্ণবিভাগ নাই, সে কঠোর তপস্যা নাই, কিন্তু নাই বলিয়া কি ভারত সে অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগের মহিমা এখনও ভুলিতে পারিয়াছে, এখনও সে পুরাস্মৃতি শত শত লোকের মাথা নোয়াইয়া থাকে। ত্যাগের এমনই মোহিনী শক্তি যে, শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কত ঘাত-প্রতিঘাত আসিয়া সমাজের উপর কত বিপ্লব ঘটাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আদর্শের স্মৃতি ভারত-গাত্র হইতে কিছুতেই মুছিয়া যায় নাই। ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ এই ব্রাহ্মণগণের যে সকল হতভাগ্য বংশধর ভোগের আবর্ত্তে পড়িয়া আজ-কাল হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে আত্ম-সম্মান নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে ত্যাগের সহিত ভোগের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু কোন কোন দার্শনিকের মত অনুশীলন করিলে বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের দার্শনিকদের মধ্যেও ভোগের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে চার্ব্বাকের নাম শুনিয়াছেন, তিনি একজন পরম ঋষি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ভোগের উপাসক হিন্দু ঋষিগণের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সুললিত কবিতায় চার্ব্বাকের কতকগুলি মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাহা কিছুকিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

ধর্ম্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচারে স্বর্গভোগ সেই ভোগ দেহ-যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু।"
"ভেদ-জ্ঞান মহারোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়!
বিবেক বৈরাগ্য আদি, মত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয়।"
"ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব ধুক্ষু।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য।"

পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যেও আমরা এইরূপ এক খাও দাও, স্ফূর্ত্তি উড়াও মতের পরিচয় পাইয়া থাকি। এপিকিউরিয়ান (Epicurean) মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন, Eat, drink and be merry এই সকল মতানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য,

বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। তবে কি প্রবৃত্তি-মার্গের দিকে ধাবিত হওয়াই মানুষের শ্রেয়ঃ? আমাদের মনে হয়, এই সকল প্রবৃত্তি-মূলক মতেরও উদ্দেশ্য সংযম, বা নিবৃত্তি বা ত্যাগের দিকে মানবকে ক্রমশঃ টানিয়া লইয়া যাওয়া। প্রবৃত্তির একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, হিতাহিত বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যক নাই, ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে যেখানে লইয়া যাইতে চায়, সেইখানেই যাও, তাহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিও না, অবশেষে তুমি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইবে, যখন ভোগে আর তোমার স্পৃহা থাকিবে না, তখন আবার স্রোত ফিরিয়া যাইবে, ঘাতের পর প্রতিঘাত হইতে থাকিবে, মন তখন স্বতঃই নিবৃত্তির দিকে ছুটিতে থাকিবে। এইজন্যই ইংরাজীতে একটী কথা আছে, Drink deep or taste not the Pierian stream. যদি ভোগ-বাসনা তোমার হৃদয়ে প্রবল থাকে, তাহা হইলে খুব বেশী রকম ভাবে ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, তাহা না হইলে এ পথে যাইও না। হয় প্রবৃত্তির উচ্চতম স্তরে উঠিতে হইবে, না হয় নিবৃত্তিমার্গ তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলে পরিশেষে কাম্যবস্তু লাভ হইবে। তাহা না করিয়া যদি তুমি ভোগ ও ত্যাগের সংমিশ্রণ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমার উন্নতি হইবে না। তাহা হইলে মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে তুমি সমর্থ হইবে না। এইজন্যই উক্ত ইংরাজী প্রবচনের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, taste not, অর্থাৎ ত্যাগের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে না পার, তাহা হইলে ইহার আস্বাদন পর্য্যন্ত করিও না, নিবৃত্তিমার্গই তোমার শ্রেয়ঃমার্গ। সুতরাং ভোগ-মতাবলম্বিগণও যে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, সে পথ দিয়া মনুষ্য আপনাকে পরিচালিত করিলে পরিশেষে ত্যাগের পথে গিয়া উপনীত হইবে। ভোগের পথ বড় সহজ পথ নয়, ইহাতে বিপদ অনেক। ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতে করিতে মানব যদি আপনাকে হারাইয়া বসে, যদি পাপের গভীর পঙ্ক হইতে উত্থিত হইবার শক্তি-সীমায় উপনীত হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার পশু-জীবন থাকিয়া যায়, অমরত্ব লাভ করা তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে না। আবার ত্যাগের পথেও মানবের বিপদ যে না আছে তাহা নয়। যে কখনও ভোগের মোহে মুগ্ধ হয় নাই, আজীবন ত্যাগের লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া জীবন কাটাইতেছে, সে যদি কখনও ভোগের মোহিনী শক্তির আবর্ত্তে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে আবর্ত্ত হইতে উত্তোলন করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য পুরাণে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অনেক আজন্ম সন্ন্যাসী কঠোর ব্রতাবলম্বী-ত্যাগী ঋষি ভোগের বস্তু সম্মুখে পাইয়া তাঁহাদের বিপুল সংযমের তপস্যার ফল হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আকণ্ঠ পরিপূরিত ভোগের পর যদি হৃদয়ে ত্যাগের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা আর কখনও নির্ব্বাপিত হইবার নহে, তাহা মানবকে মোক্ষধামে লইয়া যাইবেই যাইবে।

কিন্তু ত্যাগের পর যদি ভোগ-বাসনার উদ্রেক হয়, তাহা মনুষ্যকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী করিয়া থাকে। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল এবং চন্দ্রশেখরের প্রতাপ এরূপ ভোগ ও ত্যাগের অদ্ভুত রহস্য প্রতিপাদন করিয়াছে। সুতরাং প্রাচ্য চার্ব্বাকের মত, কিংবা পাশ্চাত্য এপিকিউরিয়েন মত একেবারে কিছু নয় বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না; ইহার মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব এবং মানব-হৃদয়ের অতি গূহ্য রহস্য নিহিত আছে দেখিতে পাই।

সকল মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি (conscience) নিহিত আছে, তবে কাহারও ভিতর তাহা জাগ্রত, কাহারও ভিতর তাহা সুপ্ত। অতি বড় যে পাষণ্ড, নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, চৌর্য্য মিথ্যাপবাদ যাহার নিত্যসহচর, সেও পাপকার্য্য করিয়া এই বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তর বিচলিত হইয়া থাকে; তাহার সুপ্ত বিবেক-বুদ্ধি প্রত্যেক পাপ কার্য্যের পর আবার জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে অনবরত ঘাত দিতে দিতে প্রতিঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়, সুপ্ত বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণ জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহা পরিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। নরহত্যাকারী ঘোর পাপী রত্নাকর এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা জগন্মান্য ঋষি বাল্মিকীতে পরিণত হইয়াছিলেন, ভোগাসক্ত রূপ-সনাতন ভগবৎপ্রেমিক হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেবকে নির্য্যাতন করিয়াপরম ভক্ত জগাই মাধাইও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, ঐশ্বর্য্যমদদৃপ্ত লালা বাবু "বাসনাতে আগুন দাও" এই কথা শুনিয়া ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া ত্যাগের পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, আজিও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অনেক বিপথগামী ভোগবিলাসী যুবক ভোগের ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া অবশেষে বিবেকবুদ্ধির তাড়নায় ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতেছে।

ত্যাগ ও ভোগে এইরূপ নিকট সম্পর্ক থাকিলেও ভোগ আমাদের কাম্য নহে, ত্যাগই কাম্য। ত্যাগের জন্যই ভোগকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। ভোগের আসনে ত্যাগকে বসাইতে পারিলেই মানবজন্মের সফলতা সম্পাদন করিতে পারা যায়। ত্যাগের আসনে কিন্তু আর ভোগকে বসান ঠিক নহে। যদি এপিকিউরিয়েন মত অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংযমবাদে (stoicism এ) পরিণত হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ভোগ লইয়া জীবন কাটাইলে চলিবে না, ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত হইতে না পারিলে মনুষ্য-জীবনের সারসুখ অনুভব করিতে পারিবে না।

তাই বলি, ভোগে দুঃখ,—অনন্ত দুঃখ, ঘোর নরক, ভোগে পাপ, ভোগে পশুত্ব। আর ত্যাগে অপার আনন্দ, ত্যাগে অমৃত, ত্যাগে অমরত্ব, ত্যাগে অনন্ত স্বর্গ; ত্যাগে মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে পারে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল।

[illegible]।

স্বাধীন দুহিতা

(গল্প)

(ক)

মাষ্টার শশিভূষণ দরজার বাহির হইতে ডাকিল, "লবঙ্গ!"

লবঙ্গ দরজা খুলিয়া বলিল, "আসুন।"

মাষ্টার গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলের সম্মুখস্থ নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসিলেন। লবঙ্গ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনমনে 'ডিক্সেনারির' পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ঘরটী ইংরাজী কায়দায় সাজান; মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধা অনেকগুলি বিদেশীয় ছবি সারি সারি দেওয়ালে লম্বমান। পাশে একটী বইভরা আলমারি। তাহা প্রায় ইংরাজী, বাঙ্গালা নভেলেই পূর্ণ।

এই কামরাটী খাস্ লবঙ্গলতার পড়িবার গৃহ ও বিশ্রাম ভবন। বাটীর একধারে অবস্থিত; কাজেই কেহ এদিকে বড় একটা আসে না। মাষ্টার নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রী লবঙ্গলতাকে পড়াইয়া আসেন।

চেয়ারে বসিয়াই মাষ্টার দেখিল টেবিলের নিকটস্থ বিছানায় উপর "অনন্ত-মিলন" উপন্যাসখানি খোলা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিনও গৃহে প্রবেশ করিয়া এই বইখানি লবঙ্গলতাকে পড়িতে দেখিয়া মৃদু তিরস্কারের সহিত তাহা হইতে বিরত হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আজও আসিয়া বইখানা খোলা দেখিলেন। মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া সে বহিটি হাতে করিয়া আনিলেন। যেখানে খোলা ছিল সেখানে একটা চিত্র ছিল। সেটীর দিকে মাষ্টারের চক্ষু পড়িবামাত্র লবঙ্গলতা জোর করিয়া বহিটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। বাস্তবিক মাষ্টা ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। চতুর ছাত্রী তাহা বুঝিয়া একটু অপ্রতিভের ন্যা তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষ্য ন করিয়া বেশ একটু বিরক্তির ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ লবঙ্গ, তোমাকে আমি কা ও বইখানা পড়তে বারণ করে গেলাম তবুও আজ তুমি ওটা পড়ছিলে আমার কথা যে শুনবার দরকার করে না, তা না হয় তুমি বুঝেছ—কিন্তু তবুও আমাকে দেখিয়ে তোমার ওখানা পড়া কতদূর সঙ্গত হচ্ছে, তা' যে তুমি বুঝতে পার না তা' নয়। তোমাকে যে আমি কত দিন থেকে বলছি, উপন্যাসের, বিশেষতঃ ও রকম উপন্যাসের শিক্ষাটা কত খারাপ!

ছিঃ—যাক্, যা অন্যায় তা' একবার বলে দিলেও কি বুঝতে পার না। ভারী ছেলেমানুষ তুমি!"

"ছেলেমানুষ" এ কথার উত্তরে মৃদুহাসির সহিত লবঙ্গ আরম্ভ করিল,—"মাষ্টার মশায়, উপন্যাস পড়লেই যে লোকে খারাপ হয়ে যায় এ কিন্তু আপনার ভারী অদ্ভুত ধারণা। আর একটা কথা হচ্ছে আবার আপনি এত কচিখুকিটী ভাববেন না যে দুটো উপন্যাস পড়লেই আমার মাথা বিগড়ে যাবে—আর চাই কি আমি যার তার প্রেমে——"

বাধা দিয়া শশিভূষণ বলিলেন,—থাক, থাক, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। কচি খুকি নও—ভারী প্রবীণা তুমি। বাজে কথা যাক, আজকার কাজ আন।"

নবজলতা কোন কথা না বলিয়া একখানা খাতা ও "রয়েল রীডার নং ২" আনিয়া মাষ্টারের নিকট রাখিল "এই এক পাতা লিখা হ'য়েছে বুঝি ;—কি বিশ্রী লিখা। লিখার দিকে ত আদৌ মন নাই। দেখি পড়া কেমন তৈরি করেছ পাতা খোল।"

নির্দ্দিষ্ট পাতা খুলিয়া ছাত্রী শিক্ষকের হাতে দিল।

(খ)

বাঁকুড়া জেলার ময়নাগ্রামে বাবু শ্যামসুন্দর রায় সপরিবারে বাস করেন। শ্যামসুন্দর বাবু সুশিক্ষিত, প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। তাহার জমিদারীর মাসিক আয়ও বেশ। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন তখন ঘটনাচক্রে কোন ব্রাহ্মদুহিতার প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়েন এবং পরিশেষে স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর তিনি হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক আচার-ব্যবহার গুলির উপর হাড়ে চটা হইয়া গেলেন। তিনি বিশেষ পক্ষপাতী হইলেন স্ত্রীস্বাধীনতার।

বিবাহের দশ বৎসর পরে তিনি একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। এই কন্যাই তাঁহাদের দ্বিতীয় ও শেষ সন্তান। ইহারই নাম নবজলতা।

নবজলতার ১৩ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত ধনী ও প্রাচীন ব্রাহ্মপুত্র সুরেন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের সহিত বিবাহ হয়। সুরেন্দ্রমোহন তখন কলিকাতায় "সিটি" কলেজে বি-এ, পড়িতেছিলেন। বিবাহের কয়েক মাস পরে সুরেন্দ্র বি-এ পাশ করিলেন।

সুরেন্দ্রের পিতা রমাকান্ত বাবু শুধু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন সুতরাং ফল বাহির হইবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য পুত্রকে বিলাত পাঠাইলেন।

বিবাহের পর কয়েক দিন মাত্র একবার সুরেন্দ্র শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। সুরেন্দ্রের পিতা বড়ই কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুত্রকে বিলাত পাঠাইবেন বলিয়া পাছে বর্ত্তমান পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটে এই জন্য তিনি তাহাকে 'ওদিকের' নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে দিতেন না। সুরেন্দ্রও পিতাকে বিশেষ ভয় করিত। এমন কি সুরেন্দ্র ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাইবার সময় ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও একবার নবজের সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারিলেন না।

বিলাত যাইয়াও সুরেন্দ্র শ্বেতাঙ্গিনী মহলের মার্ব্বেলশুভ্র রূপ ও কুঞ্চিত সোনালী কেশপাশে বদ্ধ হইলেন না। নবজ সুন্দরী। তিনি প্রকৃতই নবজকে ভাল বাসিতেন। বিলাত হইতে স্ত্রীকে ও শ্বশুরকে নিয়মিত ভাবে পত্র লিখিতেন।

একবার সুরেন্দ্র নবজকে পত্রে ইংরাজী পড়িতে অনুরোধ করিয়া লিখেন। কথাটা ক্রমে মাতার কান হইতে পিতার কানে উঠিল। শ্যামসুন্দর বাবু এ কথার সারবত্তা বুঝিলেন। প্রকৃত পক্ষে ব্যারিষ্টার-জামাতার উপযুক্তা হইতে হইলে তাঁহার কন্যার ইংরাজী-শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা তিনি উত্তম রূপে বুঝিলেন।

পাড়াগাঁয়ে শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দূরের কথা শিক্ষক পাওয়াই কঠিন। তাহার উপর এরূপ সুদূরে সহর হইতে উপযুক্তা মহিলা কখনই অল্প বেতনে আসিতে চাহিবে না। এই সব নানা চিন্তার পর তিনি শশিভূষণকেই শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

শশিভূষণের পিতা হরিশ বসু বড়ই গরীব। মাসে ১২৲ টাকা বেতনে তিনি শ্যামসুন্দর বাবুর সেরেস্তায় গোমস্তাগিরি করিতেন। এই অল্প বেতন দ্বারা তিনি পুত্রকে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। আর খরচ যোগাইতে না পারিয়া পুত্রের পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য

হইলেন। যখন শ্যামসুন্দর বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রকে ১৫৲ টাকা বেতনে লবঙ্গলতার শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চান, তখন বেচারী হরিশের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সানন্দে ও অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই হইতে শশিভূষণ প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে লবঙ্গলতাকে পড়াইতে আসিত।

দরিদ্রের সন্তান হইলেও শশিভূষণের চেহারা বেশ সুন্দর ছিল। গৌরবর্ণ একহারা শরীর, ও মাথার উপর কুঞ্চিত কেশগুলি তাহাকে বেশ মানাইত।

তাহার চরিত্রও বেশ সুন্দর। কখনও কুকথা মুখে আনিতেন না; কুসঙ্গে মিশিতেন না; কুপথে চলিতেন না। তাহার আর এক গুণ ছিল যে সে কুগ্রন্থের উপর হাড়ে চটা ছিলেন।

আর লবঙ্গলতা? তাহার চরিত্রও বেশ নির্ম্মল ছিল। এক্ষণে সে পূর্ণযৌবনা। কয়েক মাস শশিভূষণ তাহাকে পড়াইবার পর কি জানি তাহাকে লবঙ্গের চক্ষে কেন এত ভাল লাগিতে লাগিল। একবার এ কথাটা সে মনে মনে ভাবিত, আবার লজ্জায় নিজের মনে সে নিজেই মাটী হইয়া যাইত—না—না, তাহা কখনই হইতে পারে না; অসম্ভব একেবারে অসম্ভব। তবে তাঁহাকে মনে স্থান দেওয়া কেন? তাঁহার একবার জ্বর হওয়ায় কয়েক দিন তিনি আসিতে পারেন নাই, তাহাতেই বা লবঙ্গের এত ব্যাকুলতা কেন? এসব প্রশ্ন সুমতি তাহার মনে জাগাইয়া দিলেও কুমতি তাহার একটা না একটা উত্তর খাড়া করিয়া দিত।—'আহা, বেঁচারি নাকি বড় গরীব? তাহার উপর সহানুভূতি প্রকাশ করায় দোষ কি?' ইত্যাদি—।' এইরূপে লবঙ্গ মনের কতগুলির আরোগ্যের উপায় না করিয়া সেগুলিকে চাপিয়া রাখিতে লাগিল।

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল লবঙ্গ ততই উন্মনা হইতে লাগিল। সে আর মনকে কোন রকমে স্থির রাখিতে পারে না। মাষ্টারকে একদিন না দেখিলে তাহার আর চলে না। সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না—এ সব কি হইতেছে!

(গ)

আরও কিছুদিন গত হইল। লবঙ্গ নাচার হইয়া নিজের মনের উপর আধিপত্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। একদম ছাড়িয়া দিয়া সে যেন অনেকটা ক্ষণিক শান্তি লাভ করিতেছে।

এইরূপে লবঙ্গ তাহার পাঠ্য "রয়েল রীডার" শেষ করিয়া ফেলিল। শশিভূষণ আবার তাহাকে নূতন বহি পড়াইতে সুরু করাইয়াছেন। পড়িবার সময় সে যেন কেমন কেমন ভাবে অজ্ঞান হইয়া মাষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিত।

শশিভূষণ কিন্তু তখনও অটল।

সেদিন তখন সন্ধ্যা। শরতের চাঁদ গগনে উঁকি মারিতেছে। চন্দ্র-কিরণ লবঙ্গের কক্ষের সম্মুখস্থ শেফালি গাছের উপর পড়িয়া সেটীকে রৌপ্য-কিরণ-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। লবঙ্গ দরজার সম্মুখে বসিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। এমন সময় বাহির হইতে শশিভূষণ ডাকিল,—"লবঙ্গ!"

"আসুন" বলিয়া লবঙ্গ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশিভূষণ বসিয়া Illustrated London Newsএর পাত উল্টাইতে লাগিল। সেখানা টেবিলের উপরই পড়িয়াছিল। লবঙ্গলতা যেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না, বলিল—"দেখুন দেখুন শরতের চাঁদের আলো কেমন গাছটার উপর পড়েছে। কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখুন?"

বহির পাতা হইতে মাথা না উঠাইয়াই সে সংক্ষেপে উত্তর দিল,—"হুঁ"।

লবঙ্গ এ উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আপনার কি কিছুই ভাল লাগে না? শরতের চাঁদ কেমন সুন্দর! সারা দুনিয়াটি প্রকৃতির নির্ম্মল বর্ষাস্নাত রূপে কেমন উথলে

উঠেছে, আর আপনি ও সব কি ছাই নিয়ে আছেন? এই পোড়ার ভিতর দিয়ে প্রেমের—"

"বই আন; আজ আমি বেশী দেরী পার্ব্বো না।"

"আজ—আজ আপনি যান্। আজ আমার শরীর বড় খারাপ, আজ পড়া থাক।"

"ওঃ, তা এতক্ষণ বল্লেই ত হ'ত। তবে আসি আমি আজ।" শশিভূষণ উঠিল।

তাহাকে যাইতে দেখিয়া লবঙ্গলতা বলিল,—"দেখুন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, বলবেন?"

"কি বলই না, অত হেঁয়ালির দরকার কি?"

"আপনার স্ত্রীর নাম কি? আমি তাঁকে একখানা বই উপহার দিব।"

"আমার বিবাহ হয় নাই। সে তখন দিও পরে, এত তাড়াতাড়ি কেন তার জন্য।"

"আচ্ছা নাই থাকুক, আপনার হবু-স্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই বইখানি আপনাকে দিলাম। আমার দিবা এখানি আপনি নিন। ঘরে গিয়ে বরং একবার পড়ে দেখবেন।" এই বলিয়া লবঙ্গ কাগজে মোড়া একখানা পুস্তক শশিভূষণের হস্তে দিল। সে নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

* * *

শশিভূষণ আহারাদির পর রাত্রে নিজ নির্জ্জন কক্ষে গিয়া মোড়ক খুলিতেই—একখানা সুন্দর বাঁধানো বহি বাহির হইল। কি আশ্চর্য্য সেখানি "অনন্ত-মিলন।" এইখানিই লবঙ্গের আদরের বহি। তিনি ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বর্ত্তমান লবঙ্গের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছায় তিনি বইটার পাতা উল্টাইয়া চলিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একখানি চিত্রের নিকটে আসিয়া শশিভূষণ থামিয়া গেলেন। সেখানি মিলন-চিত্র। সেই চিত্রের নিম্নে "রমেশ ও সাবিত্রী" লিখিত ছিল। সেই মুদ্রিত অক্ষরগুলি কাটিয়া কে তাহার নিচে লাল কালীতে লিখিয়া দিয়াছে, "শশিভূষণ ও লবঙ্গলতা।" তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এত লবঙ্গের নিজ হস্তের লেখা। তার মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল! তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনো পড়াইতে যাওয়া দূরে থাক ওমুখো হইবে না।

তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা-পালনের পক্ষে শত বাধা উপস্থিত হইল। দুই দিন না যাইবার পরে দারবান ডাকিতে আসিল। পিতা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অথচ তাঁহার মনের কথা বলিয়া কাহারো নিকট কৈফিয়ৎ দিবার উপায় নাই। কি বিপদ!

ফলে তৃতীয় দিন শশিভূষণকে আবার "পুনর্মূষিকো ভব" হইতে হইল।

(ঘ)

শশিভূষণের চরিত্রের তথাকথিত দৃঢ়তা থাকিলেও সে সম্পূর্ণ সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ। যৌবনকালে একেই ত ইন্দ্রিয় সকল প্রায়ই দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে, তাহার উপর আবার উত্তেজক দ্রব্য সংঘর্ষে আসিলে তাহাদিগকে দমন করা দেবতারও অসাধ্য হইয়া থাকে। তাঁহার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ ধারণ করিল। তিনি কয়েকবার লবঙ্গের শিক্ষকতা-কার্য্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সাংসারিক অভাব ও পিতার তিরস্কারের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কি যেন একটা আকর্ষণ-শক্তি তাঁহাকে লবঙ্গের দিকে টানিতে লাগিল।

তিনি প্রথম প্রথম লবঙ্গলতাকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কোমলতর চরিত্রের সংস্পর্শে তাহার চরিত্রও যেন কোমল হইতে লাগিল। ঘৃত অগ্নির মৃদু তেজে কতদিন ঠিক থাকিতে পারে? তিনি স্বপনেও ভাবেন নাই যে, যে লবঙ্গলতাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাহাকে এত বুঝাইতে হইতেছে—তিনি নিজেই শেষে তাহাতে মজিয়া পড়িবেন।

লবঙ্গ তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সে কেবল উপন্যাসেই তাহার জীবনের এতগুলা দীর্ঘ বর্ষ কাটাইয়াছে। কতকগুলা নভেলী প্রেমের ভাব তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বভাব-দুর্ব্বলা বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিগড়াইয়া দিয়াছিল। সে বর্ত্তমান সুখ-সাগরেই তাহার জীবন ভেলা ভাসাইয়া দিল। এখন বর্ত্তমানই তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আর ভবিষ্যৎ? এখন যে চিন্তায় তাহার আনন্দ, যাহার ধ্যানে প্রাণ পুলকিত—সে চিন্তা, সে ধ্যান, ছাড়িয়া সে কোন্ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্ত্তমান সুখকে বিসর্জ্জন দিবে? কেই বা তাহাকে এ শিক্ষা, এ ত্যাগের মহিমা শিখাইয়াছিল!

মানবচরিত্র যতদিন দৃঢ় ততদিন প্রস্তরের মত, কলুষিত হইলে তাহা জলের আকার ধারণ করে। সুতরাং নিম্নগামিনী লবঙ্গলতা নিম্ন হইতে নিম্নতর পথে চলিতে [illegible]। যে মনকে সে নিজেই উন্মার্গগামী হইতে দিয়াছে, সে মন তাহার বাধা শুনিবে কেন?

বাধা দিবারও কেহ নাই—তাহাদের এ অবস্থায় কেহই বাধা দিবার নাই। শ্যামসুন্দর বাবু এগুলি বুঝিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। তাঁহার ধারণা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী-চরিত্র ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইতে থাকে; কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন না যে, অপাত্রে অকালে স্বাধীনতা প্রদানের কি বিষময় ফল! স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচার বা বেয়াদবীর চূড়ান্ত নহে। স্থান-কাল-পাত্র ভাবিয়া স্বাধীনতার প্রয়োগই সুফলপ্রদ, অন্যথায় বিষের আকর।

এইরূপে তাহাদের পাপস্রোত অবাধ-গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল।

একদিন লবঙ্গলতা শশিভূষণকে বলিল,—"দূর ছাই! এরূপ গোপনে চোরের মত ত আর পারা যায় না; প্রাণের শশি! আমি ত তোমায় কতদিন থেকে বলছি, আজও মুক্তকণ্ঠে, এই নিশিথে, এই জ্যোৎস্না-পুলকিত আব ওলে সমগ্র মানব-জগতের, সমগ্র সুন্দর অধীশ্বর জগদীশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি-তুমিই আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা, তুমিই আমার স্বামী! প্রাণের পবিত্র প্রেম প্রকাশের জন্য তবে কেন এ হীন গুপ্তভাব? কেন এ ঘৃণিত ছদ্ম? প্রাণের শশি, চল এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়াই!" শশি-ভূষণ এ সব প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে বৃথা! লবঙ্গলতা যে তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়াছে, সাধ্য কি তাহাকে ছাড়িয়া পাশমুক্ত হয়।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন জমিদার-প্রাসাদে [illegible] পড়িয়া গেল। লবঙ্গকে পাওয়া যাইতেছে না। আর জমিদার-গৃহিণীর ক্যাস বাক্স ভাঙ্গিয়া ৫০০০৲ টাকার নোট লইয়া কে চম্পট দিয়াছে!

অপরাহ্নে বজ্রাহত তরুর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণমুখে জমিদার শ্যামসুন্দর বাবু বসিয়াছিলেন। তারানাথ বাচস্পতি তাঁহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,—"ভায়া হে, আমরা মূর্খ মানুষ কি বুঝব বল। মেয়েকে ইংরিজি পড়াবার জন্য পুরুষ-শিক্ষক রাখবার দরকার কি? আমি মাঝে তোমাকে একবার এ কথা বলায় তুমি শুনলে না—বরং আমাদের অন্ধ ও কুসংস্কারপূর্ণ ধারণাকে অবজ্ঞা কত্তে লাগলে। আজ তাহার ফল দেখ!"

শ্যামসুন্দরবাবু ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"এ ব্যাপার আমি সহজে ছাড়ব নাকি! আমি কালই ওয়ারেণ্ট বার কচ্ছি!"

শ্রীমোহম্মদ খলিলর রহমান।